সূচী।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১১শ ভাগ] শ্রাবণ, ১৩১২ ; আগষ্ট, ১৯০৫। [১ম সংখ্যা।

মহিলার একাদশবর্ষ বয়ঃক্রম।

ঈশ্বরকৃপায় মহিলা বর্ত্তমান শ্রাবণমাসে দশম বর্ষ অতিক্রম করিয়া একাদশ বর্ষে উপনীত হইলেন। গত বৎসর বিঘ্নবিনাশন মঙ্গলময় পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে ইনি নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবিচলিভাবে নিজের শুভসঙ্কল্পসাধনে ব্রতী ছিলেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও কৃপা ইঁহার একমাত্র সম্বল। তাঁহার শুভ ইচ্ছাপালন মহিলার যেন চিরজীবনের ব্রত হয়। গত বৎসর যে সকল মনস্বিনী মহিলা ও নারীহিতৈষী বন্ধু মহিলার উন্নতিজন্য যত্ন করিয়াছেন, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদিদানে ইহার গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন, মহিলা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছেন, এবৎসরও তাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন মহিলা এরূপ আশা করেন।

স্ত্রীনীতিসার।

ইয়ুরোপীয় খ্রীষ্টবাদিনী নারীদিগের এবং এ দেশের হিন্দু নারীদিগের স্বামীর প্রতি নীতি এক প্রকার নহে। ইয়ুরোপীয় লোকেরা নারীকে পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন; স্বামী স্ত্রীকে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ করিয়া থাকেন; স্ত্রী স্বামীর প্রতি সর্ব্বদা আত্মতুল্য ব্যবহার করেন। সাধারণতঃ আপনা অপেক্ষা উচ্চ মনে করিয়া তাঁহারা স্বামীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন না, তুল্য বা নিকৃষ্ট ভাবিয়া প্রেম করিয়া থাকেন।

হিন্দু জাতীয় স্ত্রীর স্বামী গুরু। যদিচ স্ত্রীকে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গী বলা হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি নিকৃষ্ট অর্দ্ধাঙ্গী। স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞাধীনা হইয়া তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। স্বামী তাঁহার উপর এক প্রকার প্রভুত্ব করেন।

স্ত্রী আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া স্বামীকে গুরুরূপে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। হিন্দু নারী স্বামীর প্রতি "তুমি" শব্দ ব্যবহার করেন না, সম্মানসূচক "আপনি" বলিয়া থাকেন।

আমাদের মতে স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গী। তবে স্বামী সচরাচর বয়োজ্যেষ্ঠ হন, এবং স্ত্রীর অভিভাবকস্বরূপ হইয়া থাকেন। তজ্জন্য প্রীতির সহিত তাঁহার প্রতি নম্র ব্যবহার স্ত্রীর পক্ষে স্বাভাবিক। ইয়ুরোপীয় ও হিন্দুজাতীয় পতির প্রতি পত্নীর যেরূপ নীতি প্রচলিত, তাহার মধ্য পথ অবলম্বন করাই বিধেয়।

সিন্ধুদেশীয় মহিলা।

ভারতবর্ষের পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তে সিন্ধুদেশ। সে দেশের অন্তর্গত আরবসাগরের উপকূলে কারাচি নগর বৃহৎ বন্দর। মধ্যস্থলে সিন্ধু দেশের পূর্ব্বতন রাজধানী হায়দরাবাদ নগর। লাহোর হইতে করাচি নগরে যাইতে হইলে হায়দরাবাদ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। হায়দরাবাদ হইতে করাচি নগর ১২০ মাইল, কলিকাতা হইতে করাচি ন্যূনাধিক দুই সহস্র মাইল দূরে। সম্প্রতি আমরা লাহোর নগর হইতে করাচি বন্দরে গিয়াছিলাম, পরে তথা হইতে হায়দরাবাদে যাওয়া হইয়াছিল। উভয় নগরেই সে দেশীয় ব্রাহ্মপরিবারে আতিথ্যগ্রহণে কিছু দিন অবস্থিতি করিতে বাধ্য হওয়া গিয়াছিল। তত্রত্য মহিলাদের রীতিনীতি আচার ব্যবহার কথঞ্চিৎ জানিতে পারা গিয়াছে।

করাচি ও হায়দরাবাদের মহিলাদিগের রীতি নীতিতে কিছু পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ সিন্ধুদেশীয় মহিলাগণ পায়জামা ও পিরাণ পরেন, এবং পিরাণের উপর চাদর ব্যবহার করেন; চাদরের একাংশ দ্বারা মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন, অবগুণ্ঠন ধারণ করেন না। বালক বালিকারা মস্তকে টুপি পরিয়া থাকে। বালকবালিকা উভয়ের মধ্যে পরিচ্ছদে কোন প্রভেদ নাই; কেবল বালকেরা কেশচ্ছেদন করিয়া থাকে, বালিকাগণ তাহা করে না। ইহা দ্বারাই কোন্‌টী বালক ও কোন্‌টি বালিকা চিনিতে পারা যায়। বয়ঃস্থা ও বিবাহিতা নারীগণ মস্তকে টুপি ধারণ করেন না। তাঁহারা অলঙ্কারপ্রিয়া নহেন; কিন্তু অনেকের নাসিকায় নথ ঝুলিতেছে দেখা গেল। শরীরে কোন প্রকার অলঙ্কার না দেখিয়া একটী তরুণবয়স্কা মহিলাকে আমরা বলিয়াছিলাম, আমাদের দেশের সধবা স্ত্রীলোককে হাতে চুড়ী বা বালা পরিতে হয়। তিনি এক হাতে এক গাছী সরু চুড়ী প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "এই আমার সধবার চিহ্ন। আমার ২।৩ হাজার টাকার অলঙ্কার আছে, কিন্তু সেই অলঙ্কার পরিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হয় না।" সিন্ধী মহিলাদের মধ্যে অবরোধ প্রথা নাই। তাঁহারা পদব্রজে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কোন নবাগত পুরুষ তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলে তাঁহারা পৃষ্ঠ দেশ প্রদর্শনপূর্ব্বক সবেগে প্রস্থান করেন না, বা লজ্জিতভাবে মুখ ফিরাইয়া থাকেন না; নবাগত পুরুষের সঙ্গে কথা কহেন। তাহাতে মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন হয় না।

করাচির কোন ব্রাহ্ম পরিবারে চাকর চাকরাণী নাই। গৃহস্বামিগণ এক শত দেড় শত টাকা বেতনে মারচেণ্ট আফিসে কাজ করেন। তাঁহারা বাজার হইতে খাদ্য দ্রব্যাদি গৃহিণীকে আনিয়া দেন। গৃহিণী রন্ধনাদি করেন, উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি মার্জ্জন ও গৃহ কর্ম্মাদি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্বহস্ত-প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি দুই বেলা আমাদিগকে ভোজন করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের রন্ধনপ্রণালী বাঙ্গালীদিগের রন্ধনপ্রণালী অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্ন প্রস্তুত হইয়া আসিলেই তাঁহারা তাহাতে ঘৃত ঢালিয়া দেন, এবং উপযুক্ত পরিমাণ লবণ দিয়া থাকেন, জ্বালে রাখিয়া ফেণ শুকাইয়া লন, ভাতের ফেণ গালেন না; কিন্তু খিচুড়ীর ফেণ গালিয়া থাকেন; শাক ও আলু বা বেগুন কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া তাহা সিদ্ধ করিয়া এক প্রকার ঘণ্ট করেন, সেই শাক ঘণ্ট শুষ্ক নয়, তরল হয়। তাহাতে প্রচুর পরিমাণে পলাণ্ডু বা লশুনের যোগ হইয়া থাকে। বেগুন উৎসে ইত্যাদি ভাজিতে হইলে, সে সকল কয়েক দিন পূর্ব্বে গৃহে রাখিয়া শুষ্ক করিয়া লন। সে সমস্ত রসাল থাকিতে প্রায় ভাজা হয় না। তাঁহারা সেই তরকারি ঘৃতে ভাজিয়া থাকেন, কোন ব্যঞ্জনেই তৈল ব্যবহার করেন না। ব্যঞ্জনাদির বাহুল্য হয় না। তাঁহারা নানা বিধ ব্যঞ্জন যে রাঁধিতে জানেন এরূপ বোধ হয় না। ব্যঞ্জনাদিতে পেঁয়াজ লশুন ব্যতীত অন্য মসলা অতি অল্পই ব্যবহৃত হয়। কাহারও গৃহে শীল নোড়া নাই। সচরাচর গোল মরিচ চূর্ণ ডাইল ও তরকারিতে প্রক্ষিপ্ত হয়। রুটী উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হয়, তাহার সঙ্গে উপকরণস্বরূপ এক প্রকার শুষ্ক ডাইল সিদ্ধ যোগ করা হইয়া থাকে। তাঁহারা অল্প পরিমাণে মৎস্য মাংস ভোজন করেন। অন্নপরিবেশনের সঙ্গে কিছু রুটি ও পাপর ভাজা পরিবেশন করা হয়। বড় বড় ভোজেও দধি দুগ্ধের স্বাদগ্রহণ দুর্ল্লভ হইয়া থাকে। আহারান্তে তরমুজ ও খরমুজা ইত্যাদি ফল ভক্ষণের নিয়ম। যখন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল পান করিতে হয়, তখনই পাপর ভাজা খাওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে। জলপানের সঙ্গে পাপর ভাজা না খাইলে অসুখ হয়, তাঁহাদের এই সংস্কার।

আমরা করাচি নগরে যাইয়া যখন একজন ব্রাহ্ম বন্ধুর গৃহে প্রথমে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন অন্নের সঙ্গে ডাইল মুখে অর্পণ করিয়াই ফেলিয়া দি। তাহাতে লশুনের তীব্র দুর্গন্ধ ছিল। গৃহিণী ও গৃহস্বামী ডাইলে অরুচি প্রকাশ করায় কারণ জিজ্ঞাসা করেন। আমরা বলি ইহাতে লশুনের যোগ হইয়াছে, যাহাতে লশুনের দুর্গন্ধ তাহা আমাদের অখাদ্য। গৃহিণী আমাদের কথা বুঝেন না, গৃহস্বামী সিন্ধী ভাষায় তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন। তিনি-লশুন দেওয়া হয় নাই, থোমা দেওয়া হইয়াছে, এরূপ বলিলেন। আমরা বলিলাম, ডাইলে নিশ্চয় লশুনের যোগ হইয়াছে। তিনি তাহা কিছুতেই স্বীকার না করিয়া একটি লশুন আনিয়া প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন, "ডাইলে এই থোমা দেওয়া হইয়াছে।" আমরা বলিলাম, এই বস্তুকেই আমরা

লসুন বলিয়া থাকি। আমাদের পক্ষে ইহা দুর্গন্ধ বিষের ন্যায় অখাদ্য। আমরা ডাইল পরিত্যাগ করিয়া উক্ত শাকের ঘণ্টের প্রতি মনোযোগ বিধান করি, তাহাও দুর্গন্ধময় ছিল। তাহাতে 'বসর' দেওয়া' হইয়াছিল, সিন্ধী ভাষায় পেঁয়াজকে 'বসর' বলে। পেটে ক্ষুধা আছে, খাইতে পারি না, আমাদের যেন কান্না আসিতে লাগিল। উপকরণশূন্য অন্ন রুটি ও ফল ইত্যাদি দ্বারা কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করা গেল। গৃহিণীকে সাবধান করিয়া দেওয়া গেল যে, আমাদের জন্য যে ব্যঞ্জন হইবে তাহাতে যেন থোমা ও বসরের যোগ না হয়। সাবধান করিলে কি হইবে, প্রায় প্রতিদিনই ডাইল বা শাকের ঘণ্টে ভুল হইতে লাগিল। কোন কোন দিন ভুল হয় নাই। সেই সকল ব্যঞ্জন স্মরণ করিতেও আমাদের বমনো দ্রেক হয়। কিছু অধিক পরিমাণে দুগ্ধের ব্যবস্থা করা গেল। দুগ্ধযুক্ত রুটি আমাদের প্রধান ভোজ্য হইল। সিন্ধী মহিলারা বাঙ্গালী হিন্দুদিগের ন্যায় উচ্ছিষ্টের বিচার করেন না, ভোজনার্থ বিছানার উপর ভোজ্য পাত্র স্থাপন করেন। তাঁহাদের মধ্যে আচমনাদির দৃঢ়তা নাই। একজন সিন্ধী মহিলা বলিলেন, "যে অন্ন মুখে অর্পণ করিয়া উদরস্থ করা হয়, যাহাতে জীবন রক্ষা হইয়া থাকে, বাঙ্গালীরা তাহা ও সেই অন্নপাত্র স্পর্শ করিলেও হস্ত অপবিত্র হইল বলিয়া হস্ত ধৌত করেন, আশ্চর্য্য ব্যাপার!!" আমরা করাচি নগরে এক দিন একটী সিন্ধী বন্ধুর গৃহে ভোজন করিতে গিয়াছিলাম। গৃহে প্রবেশমাত্র তরুণ বয়স্কা গৃহিণী বাঙ্গালা ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেমন আছেন? এখানে আসিয়া আপনারতো কোন কষ্ট হয় নাই?" সিন্ধী কন্যার মুখে বাঙ্গলা কথা শুনিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই-লাম, জিজ্ঞাসা করিলাম; ইনি বাঙ্গলা-ভাষা কোথায় শিখিলেন। তখন জানিতে পারিলাম, কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তিনি স্বামী-সহ কলিকাতায় গিয়াছিলেন, আমাদের একটি ব্রাহ্ম বন্ধুর আলয়ে আট মাসকাল বাস করিয়াছিলেন, সেখানে ২।১ খানা বাঙ্গালা পুস্তকও পড়িয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গলা ভাষায় কলিকাতাস্থ আমাদের আত্মীয় বন্ধুদিগের কুশল বার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং আমাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন আমরা তাঁহাকে আমাদের আদরের কন্যা বলিয়া চিনিতে পারিলাম। তিনি আমাদিগকে রাঁধিয়া খাওয়াইতে বিশেষ যত্ন করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তিনিও অনেক সময় থোমা ও বসর ভুলিতে পারেন নাই। সিন্ধী মহিলারা ব্যঞ্জনাদিতে তৈল ব্যবহার করেন না। তথাকার ঘৃতও উৎকৃষ্ট নহে।

সপ্তাহ অতীত না হইতেই আমরা করাচি হইতে হায়দরাবাদে চলিয়া যাই। হায়দরাবাদস্থ বালিকাবিদ্যালয়ে আমাদের আত্মীয়া দুইটী বাঙ্গালী কন্যা (দুই ভগিনী) শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের বিধবা গর্ভধারিণীও তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিতেছেন। আমরা পূর্ব্বেই মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, হায়দরা-বাদে যাইয়া তাঁহাদের গৃহে ভোজনের ব্যবস্থা

করা যাইবে,অতঃপর সিন্ধী পরিবারে আহার করিব না। হায়দরাবাদে মাধ্যাহ্নিক ভোজনের ব্যবস্থা তাঁহাদের গৃহে করা যায়। তাঁহারা তাহাতে আহ্লাদিত হন। কন্যাদ্বয়ের মাতা প্রতিদিন যত্নপূর্ব্বক অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিতেন, আমরা তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিতাম। আমরা তাঁহাদের আবাসের অদূরেই বাস করিতেছিলাম, মধ্যাহ্নে যাইয়া ভোজন করিতে বিশেষ কোন কষ্ট হইত না। হায়দবাদের কোন২ সম্ভ্রান্ত বন্ধু তাহাতে দুঃখিত হন। "তাঁহারা তাঁহাদের গৃহে ভোজন করাইবার জন্য বিশেষ যত্ন প্রকাশ করেন। রুচিপূর্ব্বক দুইমুটো ভাত খাইয়া প্রাণটা তো বাঁচাইতে হইবে। আমরা তাঁহাদের সেই অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া কেবল রাত্রির জন্য দুগ্ধ রুটি পাঠাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি। তথাপি ২।৩ বাড়ীতে মাধ্যাহ্নিক ভোজনের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। তাহা কিছুতেই এড়াইতে পারি নাই। নিমন্ত্রণ খাইতে যাইয়া আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইত। কোন কোন বন্ধুর গৃহে ভোজন করিতে বসিয়া ডাইলে প্যাঁয়াজ বা লসুনের দুর্গন্ধ পাওয়া যায় নাই। তাঁহারা বোধ হয় সাবধান হইয়াছিলেন। আমরা এক মাত্র ডাইল উপকরণেই ভোজন করিয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করিয়াছিলাম। বড় বড় ভোজে দধি দুগ্ধাদির সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। ভোজনান্ত হইলে একটী গৃহিণী খণ্ড খণ্ড করিয়া কিছু তরমুজ উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই তরমুজ লবণে জড়িত ছিল বলিয়া বিস্বাদ হইয়াছিল। আমরা বলিয়াছিলাম, তরমুজে লবণ মিশ্রিত করা হয় কেন? তাহার সঙ্গে চিনি মিশ্রিত করিতে হয়। তিনি বলিলেন, "আমরা চিনিসংযুক্ত করিয়া তরমুজ ভক্ষণ করি না, লবণ যোগে তাহা খাইতে আমাদের ভাল লাগে।" বিচিত্র রুচি!!

হায়দরাবাদের মহিলাদিগের রন্ধন ও গৃহকর্ম্মাদিতে অত্যন্ত উপেক্ষা। আমাদের দেশে অনেক পরিবারে যেমন শিশুদিগকে দোলাতে শোওয়াইয়া দোল দেওয়া হয়, হায়দরাবাদে প্রত্যেক গৃহে বড় বড় দোলা ঝুলান আছে,গৃহিণীরা ও তাঁহাদের বয়স্থা কন্যাগণ সেই দোলাতে চড়িয়া সর্ব্বদা দোল খাইয়া থাকেন। বুড় বুড় স্ত্রীলোকের এরূপ প্রবৃত্তি দেখিয়া হাসি পায়। ইহাতেই তাঁহাদের অত্যন্ত আনন্দ। প্রত্যেক গৃহে এক এক জন পাচক আছে। রন্ধনাদির ভার সম্পূর্ণ তাহার উপর ন্যস্ত। গৃহিণী দোলায় ঝুলিতে ঝুলিতে লসুনের ছাল ছাড়াইতে থাকেন। ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার!

প্রায় কোন সিন্ধী মহিলাকে কাল কুৎসিত দৃষ্ট হয় নাই। অনেক রূপ লাবণ্যবতী মহিলা নয়নগোচর হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা বিরল। কিন্তু অনেকে লেখাপড়া জানেন, সিন্ধী ও গুরুমুখী ভাষায় পুস্তকাদি পড়িয়া থাকেন। সিন্ধুদেশে গুরুনানকের জীবনের প্রভাব বিশেষরূপে পড়িয়াছে, অধিকাংশ নরনারী শিখধর্ম্মাবলম্বী ও গুরুনানকের শিষ্যানুশিষ্য। সিন্ধী মহিলারা গুরু মুখী ভাষায় শিখধর্ম্ম গ্রন্থ "গ্রন্থসাহেব" সচরাচর পড়েন।

অনেকে সিলাই কাজ ইত্যাদি করিয়া থাকেন।

একদিন হায়দরাবাদে দেওয়ান কুন্দন মলের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় তাঁহার অনুরোধক্রমে দেখিতে যাওয়া হইয়াছিল। এক বৎসর হইল উক্ত বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; প্রায় দুই মাস যাবৎ দুইটী বাঙ্গালী শিক্ষয়িত্রী শিক্ষা দান করিতেছেন। এই অল্প সময়ে ছাত্রীগণ অনেক বিষয়ে বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে। হাতের লেখা ও ড্রয়িং অতি সুন্দর ও পরিষ্কার দেখা গেল। উক্ত বিদ্যালয়ের বালিকারা সিলাই কাজে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। সিন্ধী ভাষার সহিত ইংরাজি শিক্ষা হয়। ১৪। ১৫টী বালিকা দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দি ও সিন্ধী ভাষায় সমস্বরে পাঁচ ছয়টী সঙ্গীত করিয়াছিল, তাহা শ্রুতিমধুর বোধ হইয়াছিল। সিন্ধু দেশে বাল্য বিবাহ প্রচলিত। ১২।১৩ বৎসর বয়সের অধিক প্রায় বালিকাই অবিবাহিতা থাকে না। বিবাহ হইলেই স্কুলে লেখা পড়া বন্ধ হয়।

বঙ্গমহিলাদের উপন্যাসপাঠ:

লেখা পড়া শিখিয়া অনেক মহিলাই উপন্যাসপাঠে বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র উপন্যাসপাঠবিষয়ে ইংরাজি পত্রিকাবিশেষে যেরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেলন, এস্থলে তাহা অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

"পৃথিবীর উপন্যাস পাঠ করা চাইই। উপন্যাসপাঠরূপ সুখবিলাস পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে পারে না। অলীক গল্পেই পৃথিবীর আমোদ আহ্লাদ। দীর্ঘ তীব্র প্রতিবাদ করিলে যাঁহারা উপন্যাস পাঠ পরিত্যাগ করিবেন তাহাদের সংখ্যাত অত্যল্প। উত্তম উপন্যাস, মনোরম গল্প, মিষ্ট গল্পের পুস্তক দেখিলে মানুষের মুখে যেন জল আইসে। তাঁহাদের মন্দ ভাগ্য যাঁহারা উপন্যাস পাঠ রহিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু রক্ত মাংসের স্বভাবাধীন-চিত্ত শত শত লোক যেমন চিত্তমুগ্ধকারী সাঙ্ঘাতিক প্রণয়গল্পের জন্য লালায়িত, নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন লোকরা তদ্রূপ পুস্তক পাইতে আকাঙ্ক্ষা করেন না। যাঁহারা প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম করেন তাঁহাদের জন্য আত্মার উপযোগী সার এবং স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য শোভা পায়। আচার্য্য, প্রচারক, ধর্ম্মোপদেষ্টা, সাধক এবং অন্যান্য যাঁহারা আত্মার উন্নতিকল্পে যত্নবান্ তাঁহাদের উচিত যে, উপন্যাস পাঠ হইতে দূরে থাকেন। আমরা এরূপ উপন্যাসপাঠকে পাপ বলিয়া গণ্য করি না। উপন্যাস পাঠমাত্রেই কলুষসঞ্চারক কিংবা নীতির নীচতাসম্পাদক নহে। এরূপ শ্রেণীর লেখার মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে, এবং এরূপ অনেক গ্রন্থ আছে যাহাতে নিশ্চয়ই নৈতিক এবং নীতির দিকে চিত্ত উন্মুখকারী ভাব আছে। কিন্তু এ প্রকার কতকগুলি বিশেষ গ্রন্থ ব্যতীত উপন্যাস সকল সাধারণতঃ যুবকদিগের চিত্ত কলুষিত এবং বিষাক্ত করে। অতএব ধার্ম্মিক লোকদের প্রতি আমাদের এই পরামর্শ যে, যে সকল কার্য্যে তোমার

ভ্রাতার পদস্খলন সম্ভাবনা সে সমস্ত বিষয় হইতে বিরত থাকার পবিত্র মতের অনুরোধে তাহাদিগকে উপন্যাসপাঠ হইতে সম্পূর্ণরূপে ক্ষান্ত থাকা কর্ত্তব্য। যদি আমরা দুর্ব্বলভ্রাতাদের হিতার্থ মদ্য মাংস পরিত্যাগ করিতে পারি তবে যাহা আমোদ উদ্দীপ্ত চিন্তাহীন যুবকদের শারীরিক প্রবৃত্তি এবং কাম উদ্রেককারী কল্পনাকে অতিমাত্রায় পোষণ করে এমত সমস্ত অবধারিত দোষ হইতে আমরা বিমুখ হইব না কেন? যদি তুমি অর্দ্ধডজন পরিমাণ উপন্যাস পাঠ করিয়া থাক তাহাই যথেষ্ট। উপন্যাসপাঠরূপ দোষকে কখনও প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না, যেহেতু উহা পাঠে যে আমোদ তাহা এত শারীরিক যে, আমরা উহাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিব। পৃথিবীর পরিত্রাণ জন্য এই সন্দিগ্ধ পূর্ণ আমোদকে পরিত্যাগ করাটা একটী ত্যাগস্বীকারের বিষয় বলিয়া মনে করিব।"

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

(বোধ রাজ্যে গমন।)

২য়।

বোধের বর্ত্তমান রাজার নাম শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রদেব বাহাদুর। গড়জাতের অন্য রাজার ন্যায় তিনি বহু বিবাহদোষে দূষিত নহেন। তাঁহার একটী মাত্র রাণী। রাজান্তঃপুরে বহু অবিবাহিতা নারী স্থিতি করিতেছে। ব্রাহ্মণেরাও নিজেদের কন্যা রাজার অন্তঃপুরে পাঠাইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে। রাজা ক্ষত্রিয় এই রাজবংশ বহু প্রাচীন। ৪৮ পুরুষ যাবৎ ইঁহাদের বোধে রাজত্ব। বোধরাজ শৈব, মৎস্য মাংস-প্রিয়। নগরের পার্শ্বে কয়েকটি বহু প্রাচীন শিব মন্দির বিদ্যমান, এবং সেখানে বৌদ্ধ কীর্ত্তিও আছে। বোধ নগরের জনসংখ্যা ৪৩০০, বোধ রাজ্যের আয়তন ১২৬৫ বর্গ মাইল। সর্ব্ব শুদ্ধ ৮ লক্ষ প্রজা, রাজ্যের অধিকাংশস্থল অরণ্য ও পর্ব্বতে আকীর্ণ। রাজত্বের মূল আয় ৭৫ হাজার টাকামাত্র। গবর্ণমেণ্টকে ৮ শত টাকা কর দেওয়া হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে অরণ্য বিক্রয় করিয়া রাজা এক যোগে ২। ৪ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। ইহাই বিশেষ লাভ। পূর্ব্বে আট মালিক রাজ্য বোধ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৪ সালে আটমালিক বোধ রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে। ৪৯ বৎসর যাবৎ কন্দমল রাজ্য গবর্ণমেণ্টের হস্তগত। কন্দমলে কন্দ প্রজা প্রায় ত্রিশ হাজার, হিন্দু প্রজা ২৮ হাজার। সেই রাজ্যের বার্ষিক আয় ৩৮ হাজার টাকা। এক্ষণও প্রায় দশ সহস্র কন্দ প্রজা বোধরাজের অধীনে আছে। ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান মধুসূদনরাওতার অত্যাচার ও কুশাসনের জন্য তাঁহাকে হত্যা ও রাজাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে অসভ্য কন্দগণ সমুদ্যত হইয়াছিল। তখ গুপ্ত সাহেব উড়িষ্যা ডিভিজনের কমিশনর ছিলেন। তিনি স্বয়ং বোধে যান, কন্দদিগকে শাসন এবং দেওয়ানকে কর্ম্মচ্যুত করেন, অপিচ উত্তমরূপে রাজ্যশাসন করিতে না পারিলে রাজ্যচ্যুত হইতে হইবে বলিয়া রাজাকে ভয় প্রদর্শন করেন। তখন

দেওয়ান জগন্নাথ রাও আটমালিক রাজার দেওয়ান ছিলেন, তিনি কমিশনর গুপ্তসাহেব কর্ত্তৃক বোধ রাজের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। তদবধি সুশাসনে রাজের উন্নতি হইতেছে।

কন্দজাতি ঘোরতর অসভ্য। ইতি পূর্ব্বে তাহারা এক প্রকার উলঙ্গ থাকিত। বৃক্ষ পত্রমাত্র লজ্জানিবারণের জন্য তাহাদের আচ্ছাদন ছিল। এখন তাহারা ক্ষীণ কৌপীনমাত্র পরিধান করিয়া থাকে। তীক্ষ্ণ টাঙ্গী অর্থাৎ কুঠার বিশেষ তাহাদের প্রধান অস্ত্র। তাহারা আপনাদের দেশে হরিদ্রার চাস করিয়া থাকে। ক্ষেত্রে নরশোণিত সিঞ্চিত হইলে প্রচুর হলুদ জন্মে, এই সংস্কারবশতঃ কন্দেরা প্রতি বৎসর নরবলি দান করিত। রাজা তাহা নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। এজন্য গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎসম্বন্ধে কন্দমল শাসনের ভার গ্রহণ করিয়া সেই রাজ্যে উপযুক্ত সৈন্য নিযুক্ত করেন। তাহাতে নরহত্যা নিবারিত হয়। এক্ষণ বোধরাজ কন্দমল পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টায় আছেন।

কন্দেরা প্রত্যেক লাঙ্গলের জন্য রাজাকে বার্ষিক ৴৹ আনামাত্র খাজানা দিয়া থাকে। বোধ রাজ্যের অন্তর্গত ১১৯২ বা ১১৯৩ গ্রাম। প্রত্যেক গ্রামের জন্য ১৲ বা ॥৹ বার্ষিক খাজানা নির্দ্দিষ্ট। তাহাও ২।৩ বৎসরে প্রজাবর্গ হইতে আদায় হইয়া উঠে না। প্রজাদের অত্যন্ত হীনাবস্থা। সকলেই নিতান্ত অলস মূর্খ ও দরিদ্র। বর্ত্তমান দেওয়ান রাজ্যের সুশৃঙ্খলা ও কর-বৃদ্ধির চেষ্টায় আছেন।

এদেশের সাধারণ লোকেরা মহিষ ও ইন্দুরের মাংস ভক্ষণ করে। অধিকাংশ লোক মৎস্য মাংস পুড়িয়া সঞ্চিত করিয়া রাখে, ক্রমে তাহা বৎসরাবধি কাল ভক্ষণ করে। মাচাঁর উপর মৎস্য মাংস স্থাপিত করিয়া তন্নিম্নে অগ্নি স্থাপন করা হয়। মৎস্য মাংস ঝলসে উঠিলে তাহা হইতে তৈল নির্গত হইয়া যায়। সেই দগ্ধ মৎস্য ও মাংস অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। কিছু কাল পরে তাহাতে কীট জন্মে। পান্ত ভাতের সঙ্গে এই অন্নোপকরণ উড়িষ্যাবাসীদিগের নিকটে অতিশয় প্রিয় সামগ্রী। রাজজনও সেই পোড়া মৎস্য ও মাংস সাদরে রক্ষিত হয়। রাজা বন্য শূকরও ভক্ষণ করেন, তিনি শিকারী পশু পক্ষীর মাংস প্রায়ই উপহার প্রাপ্ত হন। এ স্থানের লোকেরা লাউ খায় না, কিন্তু মিষ্ট কুষ্মাণ্ড তাহাদের অত্যন্ত প্রিয়। রাজপরিবারেও পান্তভাত আদৃত। এদেশে শিশুর জন্মগ্রহণাবধি তাহাকে প্রতিদিন কিছু আফিং খাওয়াইয়া রাখা হয় তিন চারি বৎসর বয়স হইলে আফিং এর মাত্রা ন্যূন করা হইয়া থাকে।

বোধ আটমালিক প্রভৃতি রাজ্য পূর্ব্বে অসভ্য কন্দদের অধিকারভুক্ত ছিল। পরে ক্ষত্রিয় রাজারা আসিয়া এ দেশ অধিকার করেন। ষাট, সত্তোর বা এক শত দেড় শত গ্রামে এক ব্যক্তি কর্ত্তৃত্ব করিত, তাহাকে মুণ্টামালিক বলিত, তিন চারি পরগণাতে একজন জমীদার কর্ত্তৃত্ব করিত।

গড়জাতের অধিকাংশ রাজারই বহুপত্নী। বিবাহিতা স্ত্রী ভিন্ন অনেকগুলি

অন্য প্রকার স্ত্রী আছে। এক এক বিবাহে রাজজামাতা অনেক যুবতী নারী উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হন। বোধের রাজপরিবারে এইরূপ প্রায় দেড় শত অবিবাহিতা কন্যা প্রতিপালিত হইতে ছিল। ইতিমধ্যে রাজকন্যাদের বিবাহে ২৪টী কন্যা উপঢৌকনস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। এক রাজকুমারীর সঙ্গে ১২টী অপর দুই কুমারীর সঙ্গে ছয়টী করিয়া যুবতী উপঢৌকনরূপে দেওয়া গিয়াছে। প্রথম রাজকুমারীর ২৬ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছে। আর দুইটী ২৪ ও ২২ বৎসর বয়সে পাত্রস্থা হইয়াছেন! রাজা যোগীন্দ্র দেবের সাত কন্যা, এক পুত্র। রাজ কুমার সর্ব্বকনিষ্ঠ। বর্ত্তমান দেওয়ান কার্য্যভার গ্রহণ করিলে পর কুমার জন্মগ্রহণ করেন, নির্ব্বিঘ্নে তিন চারিটী কন্যার বিবাহ হয়। অপিচ নানা কর্য্যের সুশৃঙ্খলা ও রাজ্যের অনেক উন্নতি হইতেছে, তজ্জন্য রাজপরিবারস্থ সকল লোক বর্ত্তমান দেওয়ান বাহাদুরের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন। ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানের কর্ত্তৃত্বকালে ধনসম্পত্তিলুষ্ঠি ও দিন দিন ঋণবৃদ্ধি হইতেছিল, প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচারের একশেষ হইয়াছিল। বিচার না করিয়াই অনেক লোককে করাগারে ২।৪ মাস অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইত। যখন দেওয়ান জগন্নাথ রাও মহাশয় কার্য্যভার গ্রহণ করেন তখন তিন শত লোক জেলে বদ্ধ ছিল, এক্ষণ ত্রিশটি মাত্র কয়েদি জেল থানায় বাস করিতেছে। গড়জাতের রাজগণ রাজ্যশাসনে পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত। কিন্তু ইদানীংকাহারও প্রাণদণ্ড করার অধিকার তাঁহাদের নাই।

"উৎকলে দেবরঃ পতিঃ" এই বাক্য সত্য। গড়জাত প্রদেশে জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রীকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিয়া থাকে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বয়োবৃদ্ধা বিধবা পত্নীকে অল্পবয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ করিতে কোন আপত্তি নাই। এইরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা পত্নীর সঙ্গে কনিষ্ঠের বিবাহ গড়জাতেই বিশেষ ভাবে প্রচলিত। কাহারও স্ত্রী কোন কারণে অপর পুরুষকে মনোনীত করিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলে স্বামীর আর তাহার উপর অধিকার থাকে না। এই ব্যাপারকে "পয়সামুণ্ডী" বলে। উৎকলে দেবর পতি, বাঙ্গলা দেশে ভগনীপতি পতি। সভ্য বাঙ্গালীসমাজে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মৃত্যু হইলে অনেক কনিষ্ঠা ভগিনী সেই ভগিনীপতিকে বিবাহ করেন। ব্রাহ্মসমাজেও এই কুনীতির দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

দেওয়ান সুনীতির দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিলে রাজার চরিত্র অনেক ভাল বিষয়ে আকৃষ্ট হইতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রাও মহাশয় আটমালিকে যখন দেওয়ান ছিলেন, তখন আটমালিকের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ মহেন্দ্র দেবের একটী প্রিয় নর্ত্তকী ছিল, সে এক দিন রাজার ইঙ্গিতক্রমে জগন্নাথ রাওয়ের আবাসে নৃত্য করিতে চাহিয়াছিল, জগন্নাথ রাও তাহাতে দৃঢ়তর অমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সুনীতির দৃষ্টান্তে রাজাও সতর্ক হন।

গড়জাতের করদ রাজগণ উড়িষ্যা ডিভিজনের কমিশনার সাহেবের তত্বাবধানাধীন। কমিশনরের গড়জাতসম্বন্ধীয়

পাসেনল আসিষ্টাণ্ট সুদাম বাবুর রাজা ও রাজকুমারদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তিনি একটু যত্ন করিলে—সুদৃষ্টান্ত দ্বারা শাসন করিলে অনেক শুভ ফল হইতে পারে। রাজা ও রাজকুমারদিগের চরিত্রের উন্নতি সুশিক্ষা ও সুনীতি তাঁহার যত্নের উপর অনেক নির্ভর করে। এ বিষয়ে তাঁহার গুরুতর দায়িত্ব। কার্য্যতঃ তিনি তাহা কত দূর করিতেছেন, তিনিই জানেন। কমিশনরকে জ্ঞাপন করিয়া তিনিই অনেক দুঃশাসিত ও দুশ্চরিত্র রাজাকে শাসন ও সংশোধন করিতে সমর্থ।

বোধরাজ্যে এইরূপ প্রথা প্রলিত যে কন্যার বিবাহের সময় কন্যার মাতা কন্যার দুগ্ধের মূল্যস্বরূপ নয় খানা শাড়ী বরের পিতা হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বর দুইটী গরু বা মহিষ উপহার প্রাপ্ত হয়। কৃষক ও তন্তুবায় শ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যেই এই প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত। সেদেশে বিধবাদের বৈধব্য ও ব্রহ্মচর্য্যাদি নাই। শ্রুত হইল বোধের বিধবা রাজমাতা মৎস্য মাংস ভক্ষণ করেন ও শাড়ী পরিয়া থাকেন। বোধের রাণীর শতাধিক পরিচারিকা, রাজমাতার জন্যও ৩০।৪০ জন দাসী নিযুক্ত।

১৩ই চৈত্র অপরাহ্ণে রাজবাড়ীর দালানে "রাজা ও প্রজা" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। সেই দিন রাত্রিতে রাজভবনে যাইয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করা গিয়াছিল। তখন রাজবাড়ীতে সত্যপীরের গীত আরম্ভ হইতেছিল। কতকগুলি লোক নানা বর্ণের চিত্র বিচিত্র টুপি ও চাপকানাদি পরিয়া মৃদঙ্গ করতালসহ উপস্থিত হইয়াছে দৃষ্ট হইয়াছিল। গায়কগণ দুই দলে বিভক্ত। সমুদায় রাত্রি ও প্রাতে ৭।৮ টা বেলা পর্য্যন্ত মাসাবধি কাল হইতে এই সত্যপীরের গীত হইয়াছে। রাজভবনের অদূরেই দেওয়ান বাহাদুরের ভবন। আমরা সেখানে স্থিতি করিয়া গায়কদিগের সমুচ্চ কণ্ঠস্বরে ও বড় বড় করতালের বিকট ধ্বনিতে অস্থির থাকিতাম, পুনঃ পুনঃ আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হইত। রাজান্তঃপুর বাসিনীগণ নাকি সেই গীতবাদ্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইতেন।

বোধরাজের বড় বড় আম্রকানন আছে। আম্র পাকিবার সময় তিনি রাজ্ঞী ও রাজকুমারীগণ সহ আম্রোদ্যানে যাইয়া কিয়ৎকাল স্থিতি করেন। সেখানে তাঁহাদের আবাসের জন্য পটমণ্ডপাদি স্থাপিত হয়। রাজ্ঞী ও রাজকন্যাগণ স্বহস্তে সুপক্ক চ্যুত ফল শাখাচ্যুত করিয়া আনন্দে ভক্ষণ করেন।

রাজার ৭।৮টা হস্তী ২০।২২ টী অশ্ব ও একটী উষ্ট্র এবং কয়েক খানা গাড়ী আছে। দেওয়ান বাবু শকটারোহণে আমাদিগকে নগরের প্রান্তস্থ প্রাচীন মন্দিরাদি প্রদর্শন করিতে লইয়া গিয়াছিলেন। নগরে একটি বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়াছে। তত্রত্য লোকেরা সেই মূর্ত্তিকে "বুড়রাজ" বলিয়া থাকে। ১২ই চৈত্র অপরাহ্ণে দেওয়ান বাহাদুরের দিগ্বিজয়নামক বৃহৎ হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া দেবী সিংহ সমভিব্যাহারে নগর হইতে ৭ মাইল দূরে গান্ধারিনামক স্থানে পুরাতন দেবমন্দির সকল দর্শন করিতে যাওয়া হইয়াছিল। তিনটি বৃহৎ মন্দির দৃষ্ট হইল, একটি মন্দিরে

নীলমাধবনামক বিষ্ণুমূর্ত্তি, অপর দুইটি মন্দিরে সিদ্ধেশ্বর ও পছিনাথ নামক শিব প্রতিষ্ঠিত। গন্ধমাদননামক একজন ব্রাহ্মণ রাজা কর্ত্তৃক সেই সকল মন্দির প্রতিষ্ঠিত। উক্ত রাজা হইতে বর্ত্তমান রাজার পূর্ব্ব-পুরুষ বোধ রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

আমরা পাঁচ দিনমাত্র বোধে দেওয়ান জগন্নাথ রাও মহাশয়ের সাদর আতিথ্য গ্রহণে তাঁহার আবাসে স্থিতি করিয়াছিলাম। গৃহ-কর্ত্রী "পাল পখাল" (পান্ত বিশেষ) ও পাল সন্দেশ এবং উড়িষ্যা দেশীয় অন্য অন্য উপা-দেয় সামগ্রী যত্নপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া খাও-য়াইয়াছেন। ১৫ই চৈত্র বোধ হইতে জল পথে কটকে যাত্রা করার দিন স্থির হয়। প্রায় ৮ দিনে কটকে পঁহুছিতে হইবে, এই কথা শুনিয়া মন নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। কি করা যায়, গমনের অন্য সুবিধা নাই। দেওয়ান বাহাদুর যাত্রার দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে একটি ভাল নৌকা স্থির করি-বার জন্য থানার সব ইনস্পেক্টরের প্রতি আদেশ করেন। এবার আমাদের জন্য নৌ-কার ব্যবস্থা হয়। নৌকায় তিনটি প্রকোষ্ঠ ছিল, তাহার ছাপ্পর দুই হাত আড়াই হাত উচ্চ ছিল। নৌকার ভিতরে দাড়ান যাইতে পারিত। সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ আরও ২।৩ জন লোক যাইবে এরূপ স্থির হইয়াছিল। উড়িষ্যার লোকেরা পাচক ব্রাহ্মণকে পূজারি বলিয়া থাকে। ১৪।১৫ মাইল দূরস্থ পল্লীবিশেষ হইতে একজন পূজারি আনয়ন করার জন্য যাত্রার পূর্ব্বদিন সোও-য়ার গিয়াছিল। গৃহকর্ত্রী ৮।১০ দিন ভোজন করা যায় এরূপ ডাইল তরকারি মসলা ও জল খাওয়ার সামগ্রী সঙ্গে দিলেন। বোধরাজের ওভারসিয়ার যুবক ব্রাহ্মণ মায়া-ধর কর, এবং কটকনিবাসী অপর দুই জন লোক সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সমুদায় প্রস্তুত, যাত্রা করা গেল, তখনও পূজারি আসিয়া পঁহুছে নাই। গৃহকর্ত্রী নিজের পূজারিকে আমাদের সঙ্গে যাইবার জন্য নৌকায় পাঠাইয়া দিলেন। নৌকা চালিত হইবে, এমন সময় যে পূজারির জন্য লোক প্রেরিত হইয়াছিল, সে আসিয়া পঁহুছিল। আমরা মাধ্যাহ্নিক আহারান্তে যাত্রা করিলাম। বিষমের পর বিষমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। সকলেই বলিলেন, আটমালিক পার হইলে পর আর বিষমের আশঙ্কা নাই। শোণপুর হইতে বোধ ২৪ মাইল, বোধ হইতে আট-মালিক ১৬ মাইল দূরে। পর দিন মধ্যাহ্নে আটমালিক রাজধানীতে পঁহুছান গেল। দেওয়ান জগন্নাথ রাও বাহাদুর, ৯ বৎসর আটমালিক রাজার দেওয়ান ছিলেন। এই আটমালিক হইতে বিষমের আশঙ্কা বিদূ-রিত হইল।

গড়জাতের অন্তর্গত ন্যূনাধিক ১৮টি রাজ্য। তন্মধ্যে ময়ূরভঞ্জ রাজ্য প্রধান। ১৮৭৪ সালে বোধ রাজ্য হইতে আটমালিক স্বতন্ত্র হয়। তৎপূর্ব্বে আটমালিকের রাজা বোধরাজের সামন্ত ছিলেন। আটমালিকের পরলোক গত রাজা মহেন্দ্র দেবের নানা বিষয়ে সুখ্যাতি ছিল, তিনি মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বিবুধেন্দ্র দেব এক্ষণ রাজত্ব করিতেছেন। এই রাজার ৩১।৩২ বৎসর বয়ঃক্রম। তিনি

রাজকার্য্যে বিশেষ নিবিষ্ট ও চরিত্রবান্ যুবা। তাঁহার রাজ্যের আয় ৪৫ হাজার টাকা। গন্দ্‌নামক অসভ্য জাতি তাঁহার রাজ্যে বাস করে। শোণপুর হইতে সাতকুশিয়া ঘাটীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ দিনের পথ মহানদীর উত্তর কূলে আটমালিক রাজ্য এবং দক্ষিণকূলে বোধরাজ্য বিস্তৃত। উভয় রাজ্যের অধিকাংশস্থান অরণ্য ও পর্ব্বতাকীর্ণ।

১৯ই চৈত্র মধ্যাহ্নে আটমালিকের ঘাটে আমাদের নৌকা সংলগ্ন হয়। আমরা আমাদের পাচক ব্রাহ্মণ কুঞ্জবিহারী দাসকে* রন্ধন করিতে বলিয়া ডাঙ্গায় অবতরণ করি, উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ প্রায় এক মাইল পথ পদব্রজে সহযাত্রী মায়াধর কর সহ অতিক্রম করিয়া ঠিকাদার বাবু কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের আবাসে উপস্থিত হই। তাঁহার নামে দেওয়ান জগন্নাথ রাও মহাশয়ের পত্র ছিল। তিনি পত্র পড়িয়া আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন, এবং সেখানেই স্নানাহার করিতে বাধ্য করেন।সে দিন অবস্থিতি করিয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমরা তাহাতে সম্মত না হইয়া গোশকটযোগে নৌকায় প্রত্যাগত হই। আটমালিক ছাড়িয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে পর বিষমের সঙ্গে বড় সাক্ষাৎ হয় নাই। পর দিন সায়ংকালে সাতকুশীয়া ঘাটীতে উপস্থিত হওয়া যায়। সাত কুশীয়ার বর্ণনা ইতি পূর্ব্বে আমরা অনেকের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম। এক্ষণ স্বচক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ করা গেল। সাত কুশীয়া অর্থাৎ ১৪ মাইল ব্যাপিয়া মহানদীর জল কাচের ন্যায় নির্ম্মল ও স্বচ্ছ। নদী অত্যন্ত গভীর, কিন্তু নাতি প্রশস্ত, উহা ঋজু গতিতে পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়াছে, সামান্য বায়ুহিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। তাহার উভয়কূলে নিবিড় অরণ্যাকীর্ণ তুল্যাকৃতি সমুচ্চ গিরিমালা অবিচ্ছিন্নভাবে দণ্ডায়মান। সেই সমস্ত শৈলশ্রেণী হস্তী ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির বাসস্থান। সাতকুশীয়া ঘাটী দর্শনে নেত্র পরিতৃপ্ত, হৃদয় মুগ্ধ হয়। এস্থানে প্রকৃতি দেবী বিচিত্র রূপের ছটা বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন। সায়ংকালে সাতকুশীয়া ঘাটীতে নদীর দক্ষিণ কূলে নৌকা সংলগ্ন করিয়া রন্ধনাদির আয়োজনে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। রাত্রিতে বন্য হস্তী ও শার্দ্দূলাদির ভয়ে আমরা কিছু ভীত হইয়াছিলাম। পর্ব্বতশিখরে অনেকগুলি ময়ূরের এবং পর্ব্বতমূলে বন্য কুক্কুটের শব্দ শুনা গেল। অদূরে অরণ্যে সম্বরনামক গো জাতীয় পশু পুনঃ২ গভীর গর্জ্জন করিতেছে শ্রুত হইল। নিশার অবসানমাত্র নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া গেল, তখন অনুকূল বায়ু প্রবাহে নদী-বক্ষে তরঙ্গশ্রেণী খেলা করিতেছিল। তরঙ্গাঘাতে নৌকা সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমাদের অযোগ্য লেখনী দ্বারা আমরা সাত কুশীয়ার বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না কোন ভাবুক কবি তাহা দর্শন করিয়া কবিতার আকারে সেই সুদৃশ্য গম্ভীর ছবি প্রকাশ করিলে, এবং কোন সুনিপুণ চিত্রকর চিত্রে সেই সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করিলে সেই জীবন্ত ভাব ও সৌন্দর্য্য

* উড়িষ্যা দেশীয় ব্রাহ্মণের উপাধি দাস ও কর হইয়া থাকে।

কিয়ৎ পরিমাণে প্রস্ফুটিত হইতে পারে। সাতকুশীয়ার পূর্ব্ব সীমাতে পঁহু ছিলে প্রাতঃকালে টীকরপাড়া নামকস্থানে প্রয়োজনবশতঃ নৌকা সংলগ্ন করা হয়। সেখানে অদূরে ঢোলের বাদ্য শুনিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করা গেল। বাদ্যকে লক্ষ্য করিয়া যাইয়া দেখা যায় বাজারের উটনে দুইটী বৃদ্ধ পুরুষ রঙ্গিণ কাপড় পরিয়া ও বাদলার আঁচল ঝুলাইয়া নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছে ও গীত গাইতেছে। কয়েকটি লোক বসিয়া তাহা দর্শন ও শ্রবণ করিতেছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল "দণ্ডযাত্রা" হইতেছে। এই ব্যাপার আমাদের হাস্যজনক হইল।

সাতকুশিয়া পর্য্যন্ত মহানদীর দক্ষিণকূলে বোধ রাজ্য, উত্তর কূলে আটমালিক রাজ্য দুর্গম পর্ব্বত ও অরণ্যাকীর্ণ, লোকের বসতি বিরল। শুনিয়াছি আসামগবর্ণমেণ্ট আসামের অরণ্যাকীর্ণ ভূমি দশ বৎসরের জন্য নিষ্কর পত্তনি দিতেছেন, প্রজারা জঙ্গল কাটিয়া আবাদ করিলে পর দশবৎসর পর্য্যন্ত প্রতি একর ভূমিতে যৎসামান্য কর গ্রহণের নিয়ম করিয়াছেন। ভূমি শস্যশালিনী হইলে প্রতি দশ বৎসরে কিছু কিছু করিয়া করবৃদ্ধি হইবে। গড়জাতের রাজগণ সেই নিয়মে জঙ্গল পরিষ্কারপূর্ব্বক প্রজাবৃদ্ধির চেষ্টা করিলে রাজ্যের উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু আসামের পক্ষে ইহা যেমন সহজ, গড়জাতের পক্ষে সেরূপ সহজ নয়। রেলওয়ে ইত্যাদি বিস্তার হওয়াতে আসাম গড়জাত অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে।

আমরা ১৮ই চৈত্র মধ্যাহ্নে সাতকুশীয়া ঘাটী পার হইয়া বড়মূলনামক স্থানে উপনীত হই, তথায় নদী পুলিনে রন্ধন ও ভোজন হয়। আমাদের পূজারি কুঞ্জবিহারী দাস গড়জাতের গ্রাম্য লোক, রন্ধনকার্য্যে নিতান্ত অপটু, আমাদের নৌকাতে কটক-নগরনিবাসী একজন মিস্ত্রী ছিল, মিস্ত্রী রন্ধনে নিপুণ, কুঞ্জবিহারী উক্ত মিস্ত্রী কর্তৃক চালিত হইয়া ভুনখিচুড়ী ও আলুর দম ইত্যাদি উৎকৃষ্টরূপে রন্ধন করিয়াছে। রামায়ণ আমাদের পূজারির মুখস্ত। তিনি উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীতাকারে রামায়ণ গান করিতেন, আর মাঝি মাল্লা তাহা শুনিয়া উৎসাহিত হইত, এবং বেগে নৌকা চালাইত। সাতকুশীয়াঘাটী পার হইলেই মহানদীকে অতিশয় চৌড়া ও অগভীর দৃষ্ট হইল। কোন কোন স্থানে তাহার পরিসর এক মাইল দেড় মাইল বোধ হইল। স্থানে স্থানে বালুকাপুঞ্জ নৌকার গতিরোধ করিতে লাগিল। অনেক স্থানে নদী-পুলিনে ৫।৭ টী কুম্ভীর সূর্য্যোত্তাপ গ্রহণ করিতেছে দৃষ্ট হইল।

বোধ হইতে কটক যাইতে মহানদীর দক্ষিণ কূলে বোধ, দশপল্লা, খণ্ডপাড়া-রাজার রাজ্য এবং বাম কূলে আটমালিক, ঢেঙ্কানল, এবং গবর্ণমেণ্টের এলাকার অন্তর্গত অনুকূল প্রাপ্ত হওয়া যায়। খণ্ডপাড়ায় হস্তিদন্তে সূক্ষ্ম কারুকার্য্যযুক্ত অতি সুন্দর পুত্তলিকা ও অন্যান্য সামগ্রী নির্ম্মিত হয়। রাজপরিবারস্থ লোকেরাও নাকি সেই কার্য্যে সুনিপুণ। এস্থানে দারু নির্ম্মিত কৌটা ইত্যাদি উৎকৃষ্ট হয়। ৭ম দিবস অপরাহ্নে নারাজে উপনীত হওয়া যায়। নারাজে

মহানদী হইতে বেগবতী কাটজুড়ী নদী উৎপন্ন হইয়াছে, উভয় নদীর সঙ্গমস্থলে একটি ডাক বাঙ্গলা আছে, তথা হইতে স্থলপথে কটকনগর দশ মাইলমাত্র। তথায় মহানদীর তীরে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বতমূলে খড়িমাটী ও তিলক মাটী ইত্যাদি পাওয়া যায়। উক্ত পর্ব্বতের দৃশ্য রমণীয়। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আমরা একজন বন্ধু সমভিব্যাহারে নারাজে গিয়াছিলাম। সেখানে নদীতীরে লতামণ্ডপে উপাসনা এবং রন্ধন ভোজন হইয়াছিল, পরে ডাক বাঙ্গলায় বিশ্রাম করিয়া সেই দিনই কটকে ফিরিয়া আসা গিয়াছিল।

নারাজ অতিক্রম করিয়া মহানদীর মধ্যস্থলে একটি রমণীয় দ্বীপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। সেই দ্বীপে ধবলেশ্বরনামক শিবেরমন্দির এবং কটকনিবাসী কোন কোন বড় লোকের রমণীয় স্বাস্থ্য নিবাস স্থাপিত। দ্বীপটীর অপূর্ব্ব দৃশ্য। সেই দ্বীপের নিকটেই আমাদের রাত্রিযাপন হয়। পরদিন (২৩শে চৈত্র) যাত্রার অষ্টম দিবসে মধ্যাহ্নে আমরা কটকনগরে উপনীত হই। কটকে পঁহুছিয়া অন্য কোন বন্ধুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া দেওয়ান বাহাদুরের বাগানবাড়ীতে তাঁহার কন্যার আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য আমরা বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে উপনীত হওয়া যায়। স্নেহের কন্যা আমাদিগকে পাইয়া আনন্দ প্রকাশ কর্ল্লেন। সেখানে তিনি ২।৩টী আত্মীয়া মহিলা ও নিজের পুত্রকন্যাসহ বাস করিতেছেন। ২৫শে চৈত্র সায়ংকালে মেল ট্রেণে কটক হইতে কলিকাতায় যাত্রা করা যায়। ২৬শে কলিকাতায় স্থিতি করিয়া ২৭শে তারিখে আমরা পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করি।

দুর্গেশ নন্দিনী।

সেকালে এক অসুর রাজা ছিলেন। তাঁর এক রাণী আর এক মেয়ে ছিল। রাজার নাম বীরেণ ও রাণীর নাম বিরাণী, মেয়ের নাম বরাননী, কিন্তু তাঁকে সকলে দুর্গেশনন্দিনী বলিত। দুর্গেশনন্দিনী কেন বলিত জান? অসুর রাজা একটি উচ্চ পর্ব্বতের উপরে একটি দুর্গে বাস করিতেন। সেই জন্য লোকে তাঁকে দুর্গেশ অর্থাৎ দুর্গের প্রভু বলিত, এবং বরাননী তাঁর মেয়ে, সেই জন্য তাঁকে দুর্গেশনন্দিনী বলিত।

বোধ হয় তোমারা অসুর কাহাকে বলে জান না। অসুর ঠিক মানুষের মতন দেখিতে, কিন্তু মানুষের চেয়ে রংফরসা, হাত পা খুব বড় বড় খুব লম্বা, গায়ে ভারি জোর, এত জোর যে আমাদের মতন ছুটো মানুষকে দুই হাতে ধরে গোলার মত লোপা লুপি করিতে পারে। আমাদের মত খুব লম্বা মানুষ দাঁড়ালে অসুরের হাঁটুর কাছে মাথা লাগে।

দুর্গ কাহাকে বলে জান কি? একটি খুব বড় জায়গা, খুব শক্ত উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, এবং তার ভিতরে অনেক বাড়ী ঘর রাস্তা, পুকুর, বাগান, হাট বাজার থাকে, এই খানেই রাজবাড়ী থাকে। এই খানেই

সিপাই ও বড় বড় কর্ম্মচারী বাস করে। আর লড়াই করিবার জন্যে অনেক অস্ত্র শস্ত্র থাকে।

বীরেণ রাজার আমাদের মত অনেক মানুষ প্রজা ছিল। তাদের অসুরেরা বলিত ছোটিয়া (ছোট লোক)। তারা সকলে পর্ব্বতের তলার চারি দিকে গ্রাম নগর তৈরি করে বাস করিত, তারা অনেক ব্যবসায় বাণিজ্য, অনেক রকম শিল্প কাজ এবং অনেক রকম কৃষিকাজ করে সংসার চালাত, কিন্তু অসুর রাজারা মাঝে মাঝে পর্ব্বত থেকে নেবে এসে তাদের অনেক রকম কষ্ট দিত, তাদের ঘর দরজা ভেঙ্গে দিত, এবং লুট পাট করে জিনিষ পত্র নিয়ে যেতো; কিন্তু বীরেণ সে রকম রাজা ছিলেন না। তাঁর বাপ পিতামহের তুলনায় তাঁকে রাম রাজা বলিলেও হয়। বোধ হয় অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র এবং সীতার পতি রাজা রামচন্দ্রের কথা তোমরা জান। তিনি প্রজাদের বড় ভাল বাসিতেন, এবং তাহাদের সুখে রাখিবার জন্য নিজে অনেক প্রকার কষ্ট নিতেন। রাণী বিরাণী এক প্রকার মন্দ লোক ছিলেন না। তিনি আপনার ঘর কন্নার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকিতেন। রাজকাজে হাত দিতেন না, তবে মাঝে মাঝে ঝী চাকরদের বকিতেন, এবং রাজার কাছে কখন কখনও আবদার করিতেন। দুর্গেশনন্দিন বড় ভাল মেয়ে ছিল, যেমন রূপ ও তেমনি গুণ। তার বয়স ১৮ বছর, কিন্তু অসুরদের পরমায়ু আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। সেজন্য তাদের হিসাবে সে যেন ছয় বছরের মেয়ে ছিল। এই বালিকা আপনায় দুর্গের ভিতরে থাকিত, কখনও বাহিরে আসিত না। দুর্গের বাহিরে কি রকম দেশ কি রকম ঘর বাড়ি ছিল, কি রকম লোক জন বাস করিত, তাহা সে কিছুই জানিত না, এবং তাদের কখনও দেখে নাই ও তাদের কথাও শুনে নাই। একদিন খেলা করিতে করিতে হঠাৎ দেখতে পেলে যে দুর্গের ফটকের দরজা খোলা আছে, এবং পাহারা-ওয়ালা সিপাই ঘুমাইয়ে পড়েছে। সে ফটকের বাহিরে এসে দেখিল যে, পাহাড়ের তলায় সব খেলানার মতন লোক জন গরু বাছুর বেড়াচ্ছে, তা দেখে তার ভারি আমোদ হলো, এবং এক লাঁফে পাহাড় থেকে নেবে পড়িল, আর তার ঘাগরার আঁচলে গোটা-কতক মানুষ ও গরু বাছুর বেঁধে নিয়ে চলে এলো। তখন তার বাপ খাবার জন্যে অন্দর মহলে এসে ছিলেন, সে সেই সময় তাঁর কাছে গিয়ে খুব খুসী হয়ে বলিতে লাগলো, "দেখ বাবা, কেমন মজার খেলনা এনেছি, এরা আপনারাই নড়ে চড়ে, এমন পুতুল তুমি তো কখনও আমায় দাও নি।" বাবা বলিলেন, "দেখি মা কি এনেছো।" সে আপনার কাপড় খুলে পুতুল গুলো নাবিয়ে দিলে। গরু গুলি ভয়ে গাঁ গাঁ করে ডাকতে লাগলো; এবং মানুষ গুলো ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলো। রাজা বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ করেছো? এসব কোথায় পেলে? এরা যে ছোটিয়া আমার প্রজা, এদেরই পরিশ্রম এবং বুদ্ধিবলে অসুরেরা খেয়ে পরে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে। এরা আমাদের জন্য চাষ করে; আমাদের ব্যবহারের জন্য না না

প্রকার জিনিষ তৈয়ারী করে, যুদ্ধ করবার জন্য অস্ত্র শস্ত্র তৈয়ারি করে, কয়লার খনির ভিকরে গিয়ে কয়লা খুঁড়ে আনে। আমাদের বাড়ী ঘর দোর গাড়ী পাল্কী আর কত কি করে,এই সব পরিশ্রমের জন্যে তারা দুবেলা দুপেট খেতে পায়, তাইতে তারা খুসী থাকে। কিন্তু যখন আমাদের সিংহাসনে নির্দ্দয় রাজা বসেন, তখন ছোটিয়াদের অনেকে দুবেলা দুমুটো খেতেও পায় না, না খেয়ে মরে যায়। না খেতে পাবার সময়কে দুর্ভিক্ষ বা আকাল বলে। সে সময়ে অসুরেরা কিছু সাহায্য করে।"

দাদামহাশয়। সরলা, এ গল্পটি শুনে কি বুঝিলে দিদিমণি,এটি সত্যি কি মিথ্যে।

সরলা। এ গল্পটি তো সত্যি হইতেই পারে না, কিন্তু শুন্‌তে বেশ মিষ্টি, এ শুনে ছেলেদের খুব আমোদ হবে।

দাদা। গল্পটি মিথ্যাও বটে ও সত্যিও বটে, সত্যি সত্যি যে অসুর বলে কোন প্রকার লোক আছে তাহা নয়,কিন্তু এই মানুষের ভিতরেই অসুরপ্রকৃতি লোক আছে। তাহারা সবল হইয়া দুর্ব্বলকে রক্ষা করা দূরে থাক আপনাদের স্বার্থ-সাধনের জন্য তাহাদিগের রক্ত শোষণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। পর্ব্বতের উপর হইতে পর্ব্বতের মূল দেশের দৃশ্য এবং লোক জন যে রূপ ক্ষুদ্র দেখায় এই অসুর শ্রেণীর লোদের দৃষ্টিতে তাঁহাদের নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা সেই রূপ। বড়বড় রাজা জমিদার উচ্চপদস্থ ধনীদের মধ্যে এমন যে কত অসুর আছে কে বলিতে পারে? এ সংসারে চির কালই অসুরের রাজ্য চলিয়া আসি-তেছে। "জোর যার মুলক তার" Might is right এই কথাই আসুরিক রাজ্যের মূলমন্ত্র। সবলের দ্বারা দুর্ব্বলের নির্য্যাতন চলিতেছে। আহা! কোথায় গেল সেই পুরাতন রামরাজ্য, আর কবেই আসিবে ঈশার সেই প্রত্যাশিত স্বর্গ রাজ্য, আজও খ্রীষ্টীয় রাজ্যে যুদ্ধ বিদ্রোহ রক্তপাত এবং দুর্ব্বলের উপরে সবলের নির্য্যাতন সময়ে সময়ে চলিতেছে। আমরা প্রজাবৎসল খ্রীষ্টীয় রাজ্যে বাস করি, ব্রিটিশ রাজ্যের অধীনে থাকিয়া কত সুখ শান্তি সম্ভোগ করি,তাঁহাদিগের প্রবল হস্ত কত আসুরিক নিষ্ঠুর প্রকৃতি দস্যুর হস্ত হইতে আমা-দিগকে রক্ষা করিতেছে। কিন্তু সময়ে সময়ে নির্দ্দয় এবং কুটিলবুদ্ধি রাজ পুরুষ-দের হস্তে রাজকার্য্যের ভার পড়ে, তাঁহারা কুটিল বুদ্ধিজাল বিস্তার করিয়া এবং কুটিল কৌশল সকল নিয়োগ করিয়া আমাদের দেশের অর্থবিত্ত শোষণ করিতে ক্রুটি করেন না। "হাতে মারিব না,ভাতে মারিব" এই তাঁদের মূলমন্ত্র। তাঁহারা অস্ত্রের খোঁচা দিয়ে লোক মারেন না, কিন্তু তাঁহা-দের কলমের খোঁচাতে লোকে অস্থির।

সরলা। দাদামহাশয়, এই সংসারে এত অত্যাচার চলিতেছে! এ সকল দেখে শুনে ঈশ্বর কেমন করে চুপ করে বসে আছেন; তুমি না তাঁকে বল "প্রেমঘন হরিসুন্দর"।

দাদা। না দিদিমণি, তিনি কি চুপ করে বসে আছেন? তাঁহার স্বর্গরাজ্য স্থাপনের জন্য যুদ্ধ চলিতেছেই। এ সংসারে দেবাসুরের যুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, এবং অন্যান্য

মহাজন এবং তাঁহাদিগের শিষ্য প্রশিষ্যগণ দেবদলের সেনাপতি এবং যোদ্ধা, এঁদেরই জয় হয়ে আসিতেছে ও হবে। "সত্যমেব জয়তে।"

একটী কন্যার প্রতি পত্র।

শৈলাশ্রম, খসাং।
২০শে এপ্রিল। ১।

প্রিয় কন্যা মহালক্ষ্মী,

ঠিক এক হপ্তা হল এখানে এসেছি। দুবছরের পর আসা বুঝিতে পার কত অগোচাল, কত অসুবিধা, সঙ্গে চাকর বাকর কাউকে আনি নাই। এখানকার মেড়ুয়াবাদী ধরে কোন রকমে কায সারা। আমিত এক রকম মনের শান্তি গাম্ভীর্য্য রেখে চলি, কিন্তু এঁয়ার কষ্ট অসীম। আশা করি অবিলম্বে সুবন্দবস্ত হবে।

এতদিনে হয়ত তুমি সেরেছ, এবং মুখের বেদনা কমেছে। আমার দৌহিত্রী দৌহিত্রগণ কেমন আছে? তাদের একবার এই দেবলোকে গরমের সময় আনিতে ইচ্ছা হয়। এ শীতল প্রাণপ্রদ বায়ু, এ বিহঙ্গকুজিত গভীর অরণ্য, এ দীর্ঘকায় নিঃশব্দ হিমালয়শিখর, গহ্বর, এর মধ্যে তাদের ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয়। ভরসা করি কোন দিন তা হবে, তুমি মেষমাতার ন্যায় তোমার মেষশিশু নিয়ে এ ব্রহ্মচারীর কুটীরে আসীন হবে।

শান্তি, চিত্তস্থৈর্য্য, আত্মসম্বরণী মুমিষ্টব্যবহার দিন দিন উপার্জ্জন কর। প্রার্থনা সরস ও গম্ভীর হউক, সংসার স্বর্গাশ্রম হউক।

নিত্য শুভপ্রার্থী
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

কলিকাতা।
১৭।১০।

মাতঃ মহালক্ষ্মী,

এখানে এসে অবধি ইনি এমন অকুল-সংসারে ডুবেছেন যে, কর্ম্ম কায ছাড়া আর কিছু করিবার সময় পান না। সুতরাং তোমাকে চিঠী লিখিবার ইচ্ছা হলেও লিখিতে পারেন না। তুমি অভিমান না করে আমাদের উভয়কে ক্ষমা করিবে। আজ কাল করুণার সঙ্গে প্রায় রোজ দেখা হয়। আমার হাতে আঘাত হওয়া অবধি সে ড্রেস করিতে ও ঔষধ দিতে আসে। খেতে বলিলে খায় না, কোন কোন দিন খায়। তার শরীর বেস আছে, তবে পরিশ্রম অনেক, একটা মাস খেটে খুটে যদি পাস্ হয় তাহলে মহা ভাগ্য। তোমরা প্রতিজন কেমন আছ? আশা করি একথা সত্য নয় যে, বাঁকি পুরে আবার প্লেগ আরম্ভ হয়েচে? খ্রীষ্ট মাস উপলক্ষে তোমরাও কি ভাগলপুর অঞ্চলে যাবে। তাহলে হয়ত আমাদের সঙ্গে দেখা হবে। আমার কনিষ্ঠ ভাই মনিকে এবং দেবকন্যাদিগকে আমার শুভ সম্ভাষণ জানাইবে।

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

মহিলাদিগের রচনা *।

ঊষা।

পরিয়া নবীন বেশ ঐ ঊষা আসিল।
কাঁপাইয়া তরুলতা সমীর বহিল॥
ঊষা আগমনে কত ফুটিল কুসুম শত।
সুগন্ধ ছড়ায়ে ঐ বিকশিত হল কত॥
মালতী সৌরভযোগে চারিদিক্ আমোদিত।
সুন্দর সুবাস পেয়ে হল অলি উল্লসিত॥
বায়ু বহে নিরমল আর অতি সুশীতল।
প্রাণ মন কাড়ি লয় আহা কি বা সুবিমল॥
দিক দশ আলোকিয়া সাথে লয়ে রাঙ্গাছবি
পূরবগগনে হেসে উদিল তরুণ রবি॥
ঊষা আমগনে ধীরে তিমির বসন খানি।
খুলিয়া ফেলিল দূরে আপনি ধরিত্রীরাণী॥
যিনি পাঠালেন ভাই ঊষারে মোদের তরে।
করি প্রণিপাত তাঁরে এস সবে ভক্তিভরে॥

ফুল।

অতুলন তুমি ফুল জগত মাঝারে,
তুলনা কাহায় সাথে দিব হায় তোমারে।
হেরিলে তোমার মুখ, উপজয় কত সুখ,
বর্ণিব কি আমি তব বর্ণনা অপার,
নাহিক তুলনা ফুল নাহিক তোমার।
যবে তুমি ফুট ফুল, হয়ে সৌরভে আকুল
যায় অলিকুল তোমাপানে ধেয়ে।
গুণ গুণ করে তব গুণ গেয়ে।
কোরে এত নিরমল,কে তোরে সৃজিল বল,
কার সুকোমল করে তোর ও বদনআঁকা;
তোর দেহে ঐ ফুল কার ও পদাঙ্ক রেখা।
ওরে ফুল সুকোমল, মোরে বল দেখি বল,
কোন শিল্পী চমৎকার এমন বিচিত্র কোরে।
সৃজিলেন তোর দেহ বল রে বল মোরে।

বিধাতার সৃষ্টি।

বিধাতার অপূর্ব্ব সৃজন,
প্রকাশিতে পারে কোন জন;
নদী গিরি বন সুশোভন,
সকলিত তাঁহারি সৃজন,
তাঁহারি রচিত প্রকাণ্ড তপন,
নিয়তই করে জ্যোতি বিকিরণ।
তাঁহার রচিত অপূর্ব্ব জগত,
লাটিমের মত ঘুরে অবিরত,
তাঁহারি রচিত জ্যোতিষ্মান্ শত
অনন্ত আকাশে ঘুরিছে নিয়ত।
তাঁহার ইঙ্গিত এক মুহূর্ত্ত পেলে,
প্রকাণ্ড ধরা যেতে পারে রসাতলে।
এমনি কত শত মহিমা তাঁর।
তিনিই অচিন্ত্য সর্ব্বমূলাধার।

প্রতাপ-বিয়োগে।

দ্বাবিংশতি বর্ষ পরে, ভাগীরথী বক্ষঃপরে,
আবার ভাসিল ভস্ম বিধান যোগীর,
আবার শ্মশান-বক্ষে, আবার নিবৃত কক্ষে,
বহিল অশ্রুর ধারা ভারতবাসীর।
এই স্থানে কেশবের, এই স্থানে প্রতাপের,
এই স্থানে উভয়ের ভস্মের মিলন,
দুয়ে এক দেহে যবে, দুয়ে এক মর ভবে,
অদেহেও দুয়ে এক এইত জীবন।
অনেক দিনের পরে, ভাগীরথী বক্ষপরে,
বিধান-যোগীর ভস্ম হয় দরশন,

* এই কবিতাটী হইতে তিনটী কবিতা একটী বালিকা কর্ত্তৃক রচিত। পূর্ব্ব অনেক সংখ্যায় ইহার কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতভগিনীদলে, নিরাশার অশ্রুজলে,
আজি কি ক'রবে সবে কাতরে ক্রন্দন ?
নিরাশার কিছু নাই, তাঁর কাছে চল যাই,
তাঁর কাছে আছে চির সান্ত্বনা মোদের,
তাঁর কাছে যাই চল, ঘুচে যাবে অশ্রুজল,
দেখাবেন চিত্র তিনি ভক্ত প্রতাপের।
আসল তাঁহার চিত্র "পিতা সহ প্রিয় পুত্র,
দেখেছ যেমন সেই ভক্ত কেশবের,
সেই চিত্র ভগ্নীগণ, কর আজ্ দরশন,
এই চিত্রে আজি ভগ্নী! সান্ত্বনা মোদের।
বাঁকিপুর শ্রীমতি সু—

তুমি চাও, আমি চাই।

(বালিকার গান।)

১

তুমি চাও,—হ'বে তুমি অসীম আকাশ
আমি হব অতি ক্ষুদ্র তারা ;
ঘুরে ঘুরে অবিরত, হ'ব শ্রান্ত হব ক্লান্ত,
তবুও আমারে তুমি নাহি দিবে ধরা।

২

তুমি চাও—তুমি হবে জগতের কেহ
আমি হব ধরণীর ধূলি ;
অবহেলে অবহেলি, চলিবে গায়েতে ঠেলি,
কখনো নেবে না তারে চরণেতে তুলি।

৩

তুমি চাও—তুমি হ'বে মহৎ মহান্
আমি হ'ব কাননের ফুল ;
কেন তারে তুলে নেবে,কোমল পরশে ছোঁবে
বাগানে ফুটেছে কত গোলাপ বকুল।

৪

তুমি চাও—তুমি হ'বে কোথাকার রাজা
নিতি আমি ভিখারীর বেশে—
দাঁড়াব তোমারি দ্বারে তবুও চাবে না ফিরে
অশ্রু ভরা আঁখি নিয়ে ফিরিবে সে শেষে।

৫

আমি চাই—সমস্ত হৃদয়।
জগৎ রহিবে পাছে, আমি র'ব কাছে কাছে,
আমি র'ব প্রাণে প্রাণে—হয়ে প্রাণময়।

৬

আমি চাই—তোমার নয়ন
কোন দিকে নাহি চাবে,কোন দৃশ্য নাহি পাবে
আমার মাঝারে বিশ্ব করিবে দর্শন।

৭

আমি চাই—তোমার শ্রবণ
ভুলিয়া সকল স্মৃতি, শুনিবে আমারি গীতি
আমার কাহিনী মাঝে হবে নিমগন।

৮

আমি চাই—তোমার শ্রীকর
কিছু নাহি পরশিবে, আমারে ঘিরিয়া রবে,
মুছাবে আমারি অশ্রু—জুড়াবে অন্তর,
আমি চাই—তবশ্রীচরণ
আমার জীবন তীরে,দাঁড়াবে আসিয়ে ধীরে,
আমারি মাঝারে শুধু করি বিচরণ।
আমি চাই,—আদি অন্ত তব,
আমি শুধু লুটে নিব, কারে ভাগ নাহি দিব
তুমি যে আমারি দেব অনন্ত বিভব।
কটক। শ্রীমতী—রে।

একটী কন্যার ভ্রমণবৃত্তান্ত।

বিনীত ভাবে ভক্তির সহিত প্রণাম করি।

আমাদের বাঁকিপুরে এবার প্লেগ খুব ভয়ানক রূপে দেখা দিয়াছে। আহা কত লোক যে তাহার ভীষণ করাল গ্রাসে জীবন

হারাইতেছে তাহার ঠিক নাই। কি জানি কি অভিপ্রায়ে এই দুরন্ত রোগ দেশে আসিয়াছে। মঙ্গলময় বিধাতা যিনি, তিনিই জানেন ইহার ভিতর তাঁহার কি মহান্ মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। সেই মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমরা ক্ষুদ্র জীব কেবল অবাক্ হইয়া দেখিতে থাকি। প্লেগের জন্য এখনকার বালিকা বিদ্যালয়ের এক মাস ছুটী হইল, সেই জন্য আমরা ৮ই মার্চ্চ কলিকাতা যাইবার জন্য সকালবেলা ৮টার সময় বম্বে মেলে রওণা হইয়া সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। ইহার আগেই কটক হইতে প্রিয় ভগিনীর নিকট হইতে সমুদ্র দেখিবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। সেই জন্য কয়েক দিন কলিকাতায় থাকিয়া স্নেহের ভ্রাতার শিশু কন্যাটির জাতকর্ম্মের উপাসনায় যোগদান করিয়া ১৩ই মার্চ্চ সোমবার রাত্রি ১০॥টার সময় মান্দ্রাজ মেলে কটক যাত্রা করিয়া পর দিন বেলা প্রায় ৯॥টার সময় এখানে উপস্থিত হই, ভগিনীর বাড়ীতে আসিয়া আদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়া সুখী হইলাম। এই ক্ষুদ্র অধম দীনা কন্যার প্রতি করুণাময়ী জননীর কতই করুণা! ভাবিয়া প্রাণ যেন অবাক্ হইয়া যাইতেছে। কোথায় বাঁকিপুর, আর কোথায় এই কটক ও পুরী, দয়াময়ী তাঁর বিশ্বরাজ্যের অসীম সৌন্দর্য্যরাশি দেখাইয়া বিশেষরূপে প্রকাশিত হইবেন ও ক্ষুদ্র প্রাণকে মুগ্ধ করিবেন বলিয়া কত আদর যত্ন করিয়া কত নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত, দেশ জনপদ বন জঙ্গল পার করিয়া হাতে ধরিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছেন। তিনি ছাড়া পাপীকে এমন করিয়া ভাল বাসিতে কি আর কেউ পারে? এখানকার যত সব আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক শোভা ও মনোহর দৃশ্য দেখিলাম সে সব বর্ণনা করিবার শক্তিত আমার নাই, কেবল মোটামুটি আমাদের ভ্রমণ-বিবরণ কিছু লিখিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রিয় মহিলায় প্রকাশিত করিলে সুখী হইব।

আমাদের এখানে আসার ২। ৪ দিন পরে বাঁকিপুর হইতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দামোদর পাল মহাশয়ের স্ত্রী একটি কন্যাও ছোট পুত্রটিকে লইয়া পুরী সমুদ্র প্রভৃতি দেখিবার জন্য আসিলেন। পরে ২০শে মার্চ্চ মঙ্গলবার সকাল বেলা ৮ টার সময় মান্দ্রাজ মেলে আমরা ভুবনেশ্বর দেখিবার জন্য চলিলাম; বেলা ৯॥ টার সময় ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হইলাম। আমরা সকলে মিলিয়া ১০ জন ছিলাম। দুই খানি গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া (ঐ স্থানে গরুর গাড়ী করিয়াই যাইতে হয়, গাড়ী গুলি প্রস্তুতই থাকে) উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি দেখিতে গেলাম। ঐ পাহাড় গুলি ভুবনেশ্বর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে, বেলা প্রায় এগারটার সময় সেখানে পঁহুছিলাম। প্রথমে আমরা উদয়গিরি পাহাড়ে উঠিলাম। সেখানে হস্তিগুম্ফা, ব্যাঘ্রগুম্ফা, অর্থাৎ হাতী ও বাঘের মুখওয়ালা পর্ব্বতের গুহা সব দেখিলাম। ঐ গুহাগুলি বৌদ্ধধর্ম্মের ভিক্ষুদের সাধন করিবার স্থান ছিল। তার পর সেখান হইতে নামিয়া খণ্ডগিরি পাহাড়ে উঠিলাম। এ

পাহাড়টি আরো বড় ও উঁচু, খুব উচ্চ স্থানে উঠিয়া একটি মন্দির দেখা গেল। সেখানে একজন লোক বসিয়াছিল,তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাশের একটি ঘরে আমাদের উপাসনায় বসা হইল। পাহাড়ের অত্যুচ্চ স্থানে সুন্দর ঘরে বসিয়া পরম দেবতার উপাসনা করা গেল। সেই সর্ব্বসুখ দাতা ভগবান্ বিনা এ সুখের দিন আর কে আনিয়া দিতে পারে? ভক্তিভাজন অপূর্ব্ব বাবু মহাশয় উপাসনা করিলেন। অতি সুন্দর গভীরভাব-পূর্ণ উপাসনা হইল। সম্ভোগ করিয়া সুখী ও পরিতৃপ্ত হইলাম। তার পর পাহাড় হইতে নামিয়া আবার গরুর গাড়ীতে উঠিয়া বেলা ৩টার সময় ভুবনেশ্বরে ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে বিন্দুসরোবর নামে একটি বড় পুকুর আছে তাহাতে নামিয়া মুখ হাত পা ধুইয়া মন্দির দেখিতে গেলাম। অনেক গুলি মন্দির দেখিলাম। প্রত্যেক মন্দিরের ভিতরে পাথরের ঠাকুর আছে, তাহাতে ফুল চন্দন সিঁদুর মাখাইয়া রাখিয়াছে। সে সব যাহা হউক, মন্দির গুলির সেই উচ্চ দিক্ হইতে নিম্নদেশ পর্য্যন্ত কি চমৎকার কারু কার্য্য করা রহিয়াছে। কত শত সহস্র বৎসর হইয়া গিয়াছে, তবু সেই কারুকার্য্য সকল কেমন সুন্দর ও অক্ষুণ্ণ ভাবে রহিয়াছে। দেশের শিল্পকরগণের সুন্দর অধ্যবসায় ও কারুকার্য্য সকল দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল ধন্য হইলাম। সকলে মিলিয়া সেই শিল্পকরগণকে শত শত ধন্যবাদ দিলাম। মন্দির দেখিয়া আসিয়া পাণ্ডাদের নিকট অতিথি হইলাম। তাহারা আমাদের সকলকে বেশ আদর যত্নের সহিত একটি ঘরে বসাইয়া গরম ভাত ডাল ব্যঞ্জন ও সন্দেশ দিয়া আহার করাইল, তখন বেলা প্রায় ৪টা। ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণ গুলি কাতর হইয়া পড়িয়াছিল; পাণ্ডাদের সযত্ন আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। আহারান্তে গরুর গাড়ীতে উঠিয়া ষ্টেশনে আসিলাম, তখন ট্রেণ আসিতে বিলম্ব ছিল। ৫টা ৪৪মিনিটে ট্রেণ আসিল, ঠিক সেই সময়ে খুব বৃষ্টি আসিল। সকলে মিলিয়া ভিজিতে ভিজিতে ট্রেণে উঠিলাম। প্রায় ৭ টায় কটকষ্টেশনে ট্রেণ আসিল। তখনও খুব মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছিল, অনেক কষ্টে নামিয়া ষ্টেশনে বিশ্রাম ঘরে গিয়া বসিলাম। বৃষ্টি একটু কমিলে ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া রাত্রি প্রায় ৮॥টায় বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ভগিনীর সেবা যত্ন গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। তার পর ৪দিন কটকে ২। ৩ জন ব্রাহ্ম বন্ধুদের বাড়ীতে দেখা সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। পরে ২০শে মার্চ্চ শনিবার সকাল বেলা ৮টার সময় মেল ট্রেণে আমরা ১২ জনে মিলিত হইয়া পুরী যাইবার জন্য যাত্রা করিলাম। বেলা প্রায় ১১টার সময় পুরী ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। সেখানে নামিয়াই কেমন যেন একটা আনন্দ ও বিশুদ্ধভাব মনে হইতে লাগিল, এবং অনেক দিনের সাদ বিশাল সমুদ্রের উত্তাল নৃত্য দেখিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইতে লাগিল। কটক হইতে পুরীর একজন ভদ্রলোককে বাড়ী ঠিক করিবার জন্য পত্র লেখা হইয়াছিল। তিনি

বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়া ষ্টেশনে লোক পাঠাইয়াছিলেন, সেই লোকের সঙ্গে তিন খানা গরুর গাড়ী করিয়া বাসার দিকে চলিলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাসায় উপস্থিত হইলাম। বাড়ী খানী বেশ সুন্দর, রোজ ৫টাকা করিয়া ভাড়া দিতে হইবে, ইহাই ঠিক করা হইয়াছিল। পরে বাসায় জিনিষ পত্র গুলি রাখিয়া সমুদ্র দেখিতে ও স্নান করিতে যাওয়া হইল। বাসাটি সমুদ্রের খুব নিকটেই ছিল। অল্পদূর যাইতে যাইতেই সমুদ্রের গভীর গর্জ্জন শোনা যাইতে লাগিল। ক্রমে সমুদ্রের ধারে উপস্থিত হইলাম। আহা কি সুন্দর দৃশ্যই দেখিলাম! তীরে দাঁড়াইয়া সেই অকূল অসীম জলরাশির উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া ও গভীর গর্জ্জন শুনিয়া প্রাণ মন একেবারে মোহিত হইয়া গেল। অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রঙ্গময়ী মার রঙ্গ ও লীলা দেখিতে লাগিলাম। পরে সকলে মিলিয়া স্নান করিবার জন্য জলে নামিলাম; মহা আনন্দের সহিত স্নান করিলাম। প্রথমে খুবই ভয় হইতেছিল, পরে ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। যাহা এ পর্য্যন্ত দেখি নাই কখনও যে দেখিব তাহা মনেও করি নাই, তাহাই আজ দয়াল শ্রীহরির কৃপায় দর্শন করিলাম, সম্ভোগ করিলাম। স্নানের পর বাসায় ফিরিলাম। সে সময় রৌদ্রের তেজ খুব অধিক ছিল, সেই সমুদ্রের ধারে তখন উপাসনার সুবিধা হইল না। বাসায় আসিয়াই উপাসনায় বসিলাম। শ্রদ্ধাস্পদ অপূর্ব্ব বাবু মহাশয়ই উপাসনা করিলেন, প্রায় এক ঘণ্টা উপাসনা হইল। পরে কটক হইতে আমাদের সহযাত্রী একটী শ্রদ্ধেয়া ভগিনী খিচুরী বেগুন ভাজা ও চাট্‌নি প্রস্তুত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। উপাসনার পরে সেই সুন্দর অন্ন পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করা হইল। পরম প্রীতিভাজন ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বেণী বাবু আমাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। তিনি আমাদের সমস্ত ঠিক করিয়া দিয়া বৈকাল বেলাতেই কটকে চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

ধর্ম্মপুত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

এই কথা যেমন ভাবিতেছেন এমন সময়ে দস্যুর আগমন-শব্দ পাইলেন। প্রথমে মনে করিলেন যাইতেছে যাউক, কিছু বলিয়া লাভ নাই, কারণ বলিলে তো বোঝে না। কিন্তু পরক্ষণেই সেই ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, এবং তিনি রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন দস্যুর মুখ বিষণ্ণ, সে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি মাটীর দিকে। ধর্ম্মপুত্রের হৃদয়ে করুণা উপস্থিত হইল, তিনি দৌড়িয়া গিয়া দস্যুর হাঁটু জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন "ভাই রে আর আত্মার দুর্গতি করিও না। তোমার সেই দেবতা রহিয়াছেন, তথাপি এত লোককে কষ্ট দিতেছ এবং নিজে কষ্ট পাইতেছ, না জানি আর কত পাইবে। পরমেশ্বর তোমাকে কত ভাল বাসেন, কত সুখের আয়োজন তোমার জন্যও করিয়া রাখিয়াছেন।

ভাই রে আপনার সর্ব্বনাশ করিও না, এখনও জীবন পরিবর্ত্তন কর।"

দস্যু ভ্রূকুটি করিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল,"আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

ধর্ম্মপুত্র আরও দৃঢ় করিয়া তাহার জানুদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দস্যু মুখ তুলিয়া তাহার মুখোপরি চাহিয়া রহিল, পরে ঘোটক হইতে অবতরণ করিয়া ধর্ম্মপুত্রের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া বলিল, হে বন্ধু, আমি তোমার নিকট পরাজিত হইলাম। আজ বিশ বৎসর ধরিয়া সর্ব্বদা আমি তোমার সহিত সংগ্রাম করিয়াছি, আজ তুমি আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়াছ; আর নিজের উপর আমার কোন ক্ষমতা নাই। আমাকে দিয়া যাহা করাইতে হয় করাও। তুমি প্রথমবারে যখন আমার সঙ্গে কথা কহিয়াছিলে তখন আমার ক্রোধ হওয়াতে আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক দুষ্কর্ম্ম করিতে লাগিলাম। যখন তুমি মানুষের আস্থাতে গিয়া বাস করিতে লাগিলে, যখন দেখিলাম তুমি মানুষের নিকট কিছুই চাও না, তখন হইতে তোমার কথা গুলি মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলাম। সেই দিন হইতে তোমার জন্য আমি গাছের ডালে খাবার রাখিয়া দিতেছি।

ধর্ম্মের পুত্রের তখন সেই রমণীর মেজ সম্মার্জ্জনের কথা স্মরণ হইল। তোয়ালা খানা পরিষ্কার করিয়া যখন ধোয়া হইল তখনই তদ্দ্বারা টেবিল পরিষ্কৃত হইল। যখন নিজের ভাবনা বিসর্জ্জন করিয়া চিত্ত নির্ম্মল হইল তখনই পরের চিত্ত নির্ম্মল করিবার ক্ষমতা জন্মিল।

দস্যু আবার বলিল, "যখন দেখিলাম তুমি মৃত্যুকে ভয় কর না, তখন আমার হৃদয়ে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল।

তখন ধর্ম্মপুত্রের স্মরণ হইল, যে গোল জিনিষটার উপর রাখিয়া চাকা গোল করিতে হইবে সেটা যত ক্ষণ না দৃঢ়ভাবে বসিয়াছিল ততক্ষণ চাকার কাঠ ঠিক মত নোয়ান যায় নাই। যখন মৃত্যুর ভয় অতিক্রম করিয়া তিনি নূতন জীবন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন, তখনই স্বেচ্ছাচারী ঈশ্বরদ্রোহীকে তিনি বশীভূত করিতে সমর্থ হইলেন।

দস্যু পুনরায় কহিল, "যখন তুমি আমার প্রতি করুণার্দ্র হইলে, আমার জন্য অশ্রুপাত করিতে লাগিলে তখন আমার কঠিন হৃদয় একেবারে দ্রবীভূত হইল।" শুনিয়া ধর্ম্মপুত্রের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, তিনি যেখানে দগ্ধ কাষ্ঠ রোপণ করিয়াছিলেন, দস্যুর হাত ধরিয়া সেই খানে লইয়া গেলেন। আসিতে আসিতে দেখিলেন শেষ কাষ্ঠ খানি হইতে আর একটি নব (আপেল) বৃক্ষ উদ্গত হইয়াছে। ধর্ম্মের পুত্রের তখন স্মরণ হইল যে, প্রবল অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে পরই রাখালেরা ভিজা কাষ্ঠ জ্বালাইতে সক্ষম হইয়াছিল। তাহার নিজের হৃদয় যখন ঈশ্বর-প্রেম প্রবল ও উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠিল, তখনই সেই অগ্নি অন্য হৃদয় জ্বালাইয়াছে। এত দিনে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল জানিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। তাঁহার

জীবনের ইতিহাস তিনি দস্যুর নিকট বিবৃত করিলে তাঁহার আয়ু শেষ হইল। দস্যু তাঁহার মৃতদেহ সমাধিস্থ করিয়া তাঁহার উপদেশ মত জীবন যাপন করিয়া সকলকে শিক্ষা দিতে লাগিল।

সংবাদ।

আজমিরের অনতিদূরে পুষ্কর তীর্থ। বঙ্গদেশ হইতেও দলে দলে যাত্রিকগণ সেই তীর্থদর্শনে গমন করে। পুষ্করে একটি উচ্চ পর্ব্বতের উপর মন্দিরমধ্যে সাবিত্রী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। লোকের এরূপ সংস্কার যে সধবা নারী সাবিত্রী মূর্ত্তির কপালে সিন্দূরের ফোঁটা দিতে পারিলে সে আর বিধবা হয় না। সধবাগণ বহু ক্লেশে সেই দুরারোহ উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া উক্ত মূর্ত্তির কপালে সিন্দূরের ফোঁটা দিতে যায়। অর্থ-গৃধ্নু পাণ্ডা প্রণামিস্বরূপ ২॥৴০ আনা না পাইলে কাহাকেও ফোঁটা দিতে দেয় না। অবোধ স্ত্রীলোকেরা তাহা দান করিয়া সাবিত্রীর কপালে সিন্দূরের ফোঁটা দিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন সাবিত্রীর পূজার জন্য নৈবিদ্য ও বস্ত্রাদি প্রদান করে। কুসংস্কার মানুষকে কত অন্ধ করিয়া থাকে।

সম্প্রতি আমরা ন্যূনাধিক চারি মাস কাল বিহার, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা প্রদেশ, বুঁদেল খণ্ড, পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ এবং রাজপুতনার প্রধান প্রধান স্থান ও নগর ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছি। গত ২৪শে শ্রাবণ ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ে সেই সমস্ত স্থানের বিশেষ বিশেষ বিবরণ—বিশেষতঃ নারীসমাজের বিবরণ বক্তৃতার আকারে বর্ণন করা গিয়াছিল, এবং সেই সকল দেশ হইতে আনীত বিশেষ বিশেষ শিল্প দ্রব্য সামুদ্রিক ও উদ্ভিজ্জ বস্তু প্রদর্শন করা হইয়াছিল। তৎশ্রবণে ও দর্শনে মহিলাগণ আনন্দিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন।

ইয়ুরোপ আমেরিকাতে নারীজাতির আকৃতি প্রকৃতি আচার ব্যবহার পরিচ্ছদাদিতে অধিক ভিন্নতা নাই, এবং সকলেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী। ভারতে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। স্থানে স্থানে সকল বিষয়ে অতিশয় বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা। ইহা আমরা পরে প্রদর্শন করিব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বিগত আষাঢ় মাসে মহিলার দশম বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণ তাঁহার একাদশ বৎসর চলিতেছে। বহু গ্রাহক গ্রাহিকার নিকট হইতে গত দশম বৎসরের মূল্য এমন কি অনেকের নিকট হইতে তৎপূর্ব্ব ২।৩ বৎসরের মূল্য পাওয়া যায় নাই। তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিলম্বে মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করিবেন। ইতিমধ্যে মূল্য প্রাপ্ত না হইলে আগামী মাসের মহিলা আমরা ভি, পি, যোগে অনেকের নিকটে পাঠাইতে বাধ্য হইব। সাধারণতঃ। সাময়িক পত্রিকার গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা অগ্রিম মূল্যে প্রার্থনা করিতেছি না, গত বৎসর ও তৎপূর্ব্ব বৎসর সকলের মূল্যপ্রার্থী।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

মার্টিন লুথার *।

গত বারের লেকচারে আপনাদিগকে মার্টিন লুথারের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। তিনি খুব গরীবের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজের শক্তিতে নিজের গুণে জনসমাজে কিরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং এখনও মার্টিন লুথার জনসমাজে কিরূপ আদরণীয় তাহা সকলেই জানেন। তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বের লেকচারে অনেক বলিয়াছি, অদ্য তাঁহার জীবনের দুই একটী বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা বলিতেছি।

তাঁহার জীবনে সাধারণ লোকের অপেক্ষা অনেক বিশেষত্বঃ দেখা যায়। তাঁহার প্রত্যেক কথা, প্রার্থনা ও গল্পের মধ্যে এমন একটা ধর্ম্মের ভাব দেখা যেত, যে লোকে তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার প্রার্থনা লোকে লিখিয়া লইত; শুধু যে প্রার্থনা লিখিয়া লইত তাহা নহে, তিনি যখন গল্প কর্‌তেন সেই গল্পের মধ্যেও এমন সমস্ত উচ্চ উচ্চ কথা বলিতেন যে, লোকে সেই সময়কার সেই কথা গুলিও লিখিয়া লইত। তিনি গানসম্বন্ধে ও অনেক কথা বলেছিলেন। গানে তাঁহার খুব শক্তি ছিল। ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে তিনি কি কর্‌বেন ভাব্‌তেন। ছোট ছোট ছেলেদের তিনি যেরূপে শিক্ষা দিতেন, তাহা শুনিলে আমাদের অনেক জ্ঞান লাভ হয়। তাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস অতি আশ্চর্য্য রকমের ছিল, ঈশ্বরে যেরূপ বিশ্বাস তাঁহার জীবনে দেখা যেত সেরূপ সচরাচর কোথায়ও বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি ভূত বিশ্বাস করিতেন, ভূতের ভয়টা তাঁহার প্রবল ছিল। তিনি ভূতকে যেরূপ ভাবে বিশ্বাস করিতেন, আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি না। খ্রীষ্টানেরা ভূত বলে না বটে, কিন্তু মন্দ আত্মাকে বিশ্বাস করে, তাঁহারও সেইরূপ ছিল, অর্থাৎ তিনি মন্দ আত্মাকে বিশ্বাস করিতেন ও খুব ভয় করিতেন। মন্দ আত্মা যে মনুষ্যের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে এ বিশ্বাস তাঁহার খুব ছিল। আমরা বুদ্ধ দেবের জীবনে ও মার্টিন লুথারের জীবনে অনেক সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। লুথার ও বুদ্ধদেবে ছোট ছোট এক একটা বিষয়ে মিল দেখিতে পাই। ঐতিহাসিক ভাবে ধরিতে গেলে বেশ ভাল রূপে বুঝিতে পারি। ঐতিহাসিক আর কিছু নয়। আমরা এক জনের সম্বন্ধে হয়তো ভাল রূপে জানি না, ইতিহাস পড়িলে বেশ ভাল রূপে জানিতে পারি। ইতিহাস লিখিবার উদ্দেশ্য মানুষের সম্বন্ধে ভাল রূপে জানিবার জন্য।

* বিগত ২৯শে সেপ্টেম্বর ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথলাল সেন প্রদত্ত বক্তৃতামূলক।

কখন কোথা হতে যে একটা বাতাস আসে সেই বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, মানুষ তাহা বুঝিতেও পারে না। মার্টিন লুথার জর্ম্মণি দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে জন্ম গ্রহণ বরিয়াছিলেন, সে সময়ে জর্ম্মণির অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। তখন লোকে খুব পাপাচরণ করিত, শাসনেরও ভয় ছিল না, কাজেই লোকে বড়ই অন্যায়াচরণ করিত। ফরাশী ও ইটালি এই দুইটীদেশের তুলনা করিলে অনেক প্রভেদ দেখিতে পাই। ম্যাক্‌স মুলার যে দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দেশে লুথার জন্ম গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তবুও দুই জনের মাথার দিক্‌টা অনেকটা মিলিত। ম্যাক্সমুলারের মাথা দেখিয়া তাঁহাকে জর্ম্মণি দেশের লোক বলিয়া মনে হতো। তাঁহার মাথার আকৃতি দেখিয়া লোকে মনে করিত, তিনি (ম্যাক্সমুলার) জর্ম্মণি দেশীয়। কপালের ভাগটা চেপ্টা চওড়া, মুখ খানি খুব বড়, মাথাটাও খুব বড়। মুখ ও মাথা দেখিয়া মনে হয় খুব বুদ্ধি আছে। যেমন সমস্ত বিষয় মনে রাখিতে পারে, আবার তেমনি ধারণা শক্তি ও খুব বেশী, বুঝিবার ক্ষমতা বেশী, মস্তিষ্কের ক্ষমতা খুব বেশী। লুথারকে দেখিলেই খুব মাথাওয়ালা লোক বলিয়া মনে হইত। লুথার অনেক বই লিখে গিয়েছেন। তাঁহার সেই সমস্ত বই লোকে অতি যত্নের সহিত তুলিয়া রাখিয়াছে। এখন সেই সমস্ত বই থেকে লোকে তাঁহার কথা প্রচার করিতেছে ; লোকে তাহাতেই জানিতে পারিতেছে। আমাদের মন যখন ভাল থাকে, তখন লোকের সঙ্গে সহজ ভাবে কথা বলি। যখন মন ভাল থাকে তখন সরলতা ভিন্ন অসরলতার ভাব দেখা যায় না। মানুষ যদি মানুষের সঙ্গে যে সমস্ত কথা বলে তাহা লিখিয়া রাখিয়া দেয়, তবে দেখিতে পায় মানুষ কখন সরল ভাবে আর কখন কপট ভাবে কথা বলে।

বই ছোট আকৃতির হইলেও তাহাতে অনেক সার কথা থাকে। অনেক বড় বড় বইয়ে সার কথা তেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু ক্ষুদ্রাকৃতি বইতে অনেক ভাল ভাল কথা দেখা যায়। লুথারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বই সার কথায় পরিপূর্ণ। তাঁহার কোন পুস্তকে অসারতার ভাব দেখা যায় না। জনসন্ একটা অভিধান লিখেছিলেন, সেই অভিধান অদ্যাবধি লোকের নিকট আদরণীয়। মার্টিন লুথার অনেক প্রবন্ধও লিখেছেন, কিন্তু লোকে তাহা বড় একটা তুলিত না, তাঁহার কথা গুলিই তুলিয়া লইত। ক্যারোলাইন ও অনেক কথা বলেছেন, ও লিখে গিয়েছেন। বই অনেকে পড়িতে চায় না, লোকে বক্তৃতা শুনিতেই অধিক ইচ্ছুক। ক্যারোলাইনের বক্তৃতা অতি সহজ। ক্যারোলাইন লুথারের বিষয় অনেক লিখেছেন, এবং বক্তৃতাতেও অনেক বলিয়াছেন।

মার্টিন লুথার ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মেছিলেন, প্রকাণ্ড রাজ্যে জন্মেছিলেন। তিনি সন্ন্যাসীদের মধ্যে বাস করিতেন। তাঁহার প্রকৃতিও সন্ন্যাসীদের ন্যায় হইয়াছিল। তাঁহার জন্মিবার সময় শুধু যে ধর্ম্মজগতের অবস্থা শোচনীয় ছিল তাহা নহে, লোকে

মূল্যপ্রাপ্তি।

৬ষ্ঠ বৎসর।

শ্রীমতী সরোজিনী চৌধুরাণী, চট্টগ্রাম ২৲

৭ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার দাস, ব্যাটরা ২৲

শ্রীমতী প্রেমলতা দেব, কলিকাতা ২৲

৮ম বৎসর।

শ্রীমতী প্রেমলতা দেব, কলিকাতা ২৲

" শরৎ কুমারী গুপ্ত, " ২৲

৯ম বৎসর।

শ্রীমতী শান্তশীলা সাসমল, কাঁথি ২৲

" মনোমোহিনী বসু, কলিকাতা ১॥০

" প্রিয়বালা রায়, ক্ষিরুওয়া বগতার ২৲

" লক্ষ্মীমণি সেন, ভাগল পুর ২৲

" হেম কুসুম মল্লিক, বাঁকিপুর ২৲

শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রাও, বোধ ১॥০

" রায় বি, সি, মিত্র বাহাদুর, কটক ২৲

" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিয়রী ১৲

" যোগীন্দ্র নাথ সেন, কলিকাতা ১৲

" পূর্ণচন্দ্র মজুমদার, মুর্শিদাবাদ ১৲

" প্রসন্ন চন্দ্র চৌধুরী, কিশোর গঞ্জ ২৲

" নুটবিহারী দাস, কলিকাতা ১৲

" মহারাজা মুণীন্দ্র নাথ নন্দী, কাঃ ২৲

১০ম বৎসর।

শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী সেন, চট্টগ্রাম ২৲

" প্রফুল্ল কুমারী, পিনমালা ২৲

" সুবোধবালা দেবী, টাঙ্গু ২৲

" নারায়ণী দেবী, চট্টগ্রাম ১৲

" সুরমা দত্ত, কলিকাতা ২৲

" চপলা সুন্দরী দত্ত, পুরুলিয়া ২৲

" সুনীতি ঘোষ, কলিকাতা ২৲

শ্রীমতী যাদুমণি রায়, " ২৲

" সূর্য্য কুমারী কাস্তগিরি, " ২৲

" ক্ষিরোদাসুন্দরী বসু, " ২৲

" অন্নদায়িনী সরকার, " ২৲

" আশালতা গুপ্ত, চট্টগ্রাম ২৲

" মহারাণী ময়ূরভঞ্জ ২৲

" উমাশশী রায়, গাজিপুর ২৲

" মৃণালী দাস, বাঁকিপুর ২৲

" নিস্তারিণী দেবী " ২৲

" লক্ষীমণি সেন, ভাগলপুর ২৲

" সরসী বালা, সীতাপুর ১৲

শ্রীযুক্ত চুণী লাল বসু, কলিকাতা ২৲

" শরৎ কুমার লাহিড়ি, " ২৲

" হেমেন্দ্র লাল কাস্তগিরি, " ২৲

" যাদব চন্দ্রচক্রবর্ত্তী, " ২৲

" মধুসূদন সেন, " ২৲

" রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ২৲

" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিয়রী ২৲

" শশিভূষণ সেন, ঢাকা ২৲

" জানকী নাথ বসু, কটক ২৲

" বিমলানন্দ নাগ, কলিকাতা ২৲

" ইন্দ্রচাঁদ নাহাটী, " ২৲

" অরুণ চন্দ্র দাস, " ২৲

" দামোদর পাল, বাঁকিপুর ২৲

" দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কলি ২৲

" বরদাপ্রসাদ ঘোষ, কলিকাতা ২৲

" রাধাগোবিন্দ সাহা " ২৲

শ্রীমতী নিশিতারা সেন, রাজশাহি ২৲

" শরৎকুমারী দেবী, টাঙ্গাইল ২৲

" সুহাসিনী ডিঙ্গরা, অমৃতসর ২৲

শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত, কলিকাতা ২৲
„ ভূপেশনন্দিনী সেন, কৃষ্ণনগর ১৲
„ সৌদামিনী দেবী, নওয়াখালি ২৲
„ অশোকলতা দাস, দেরাদুন ২৲
„ হেমন্তকুমারী দেবী ঘুসরী ২৲
„ ইচ্ছাময়ী দাস, ঢাকা ২৲
„ সরলাবালা দত্ত, সীতারামপুর ২৲
„ সুশান্তবালা বসু, তারকেশ্বর ২৲
„ হেমলতা দাস, ব্যাঁটরা ২৲
„ সুরবালা মজুমদার, ঢাকা ১৲
„ সুশীলাসুন্দরী সেন, কলিকাতা ২৲
„ সরস্বতী সেন, কলিকাতা ২৲
„ সরলাসুন্দরী দাস, কটক ২৲
„ মনোরমা দেবী, ঢাকা ২৲
„ কিরণশশী দাস, কলিকাতা ২৲
„ কুমুদিনী দাস, „ ২৲
„ অভয়া দেবী, বাঁকিপুর ২৲
„ রাণী রায়, চন্দননগর ২৲
শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু, লক্ষ্ণৌ ২৲
শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ঘোষ, শিবপুর ২৲
„ হাজারিলাল পূর্ণিয়া ১৲
„ মোহিতলাল সেন, কুচবিহার ২৲
„ সুরেন্দ্র নাথ দত্ত, শিলচর ২৲
„ ভুবনমোহন রায়, লক্ষ্ণৌ ২৲
„ কালীমোহন মুখোপাধ্যায়, „ ২৲
„ মহারাজা মনীন্দ্রনাথ নন্দী, কা-বা ২৲
„ রামলাল গয়া ১৲
„ ভোলানাথ কুণ্ডু, খগোল ২৲
„ জগন্নাথ রাও, বোধ ॥৹
„ গোপালচন্দ্র গুহ, পিংনা ১৲
„ গগনচন্দ্র সেন, জামালপুর ২৲
„ সূর্য্যকুমার গুহ, সিরাজগঞ্জ ২৲
„ শরচ্চন্দ্র সেন, কলিকাতা ২৲
„ নলিনবিহারী সরকার, কলিকাতা ২৲

১১শ বৎসর।

শ্রীমতী নিহারিকা ঘোষ, ঢাকা ২৲
„ অভয়া দেবী, বাঁকিপুর ২৲
শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল রায়, গাজীপুর ২৲

অতি উশৃঙ্খল ও দুর্নীতিপরায়ণ ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি জন্মিয়া ক্রমশঃ সেই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল ভাব দূর করেন। লোকের যাহাতে ধর্ম্মের দিকে মতি হয় তাহার চেষ্টা করেন। তাঁহার সময়ে তিনটী বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল। ১ম রাজ্যে বিদ্যুৎ পড়িয়া অনেক লোক মারা যায়। ২য়, তিনি এক খানা বাইবেল পান, তাহাতে যীশু খ্রীষ্টের উপর তাঁহার খুব বিশ্বাস হয়। ৩য়, তিনি রোমে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া যে সমস্ত জিনিষ দেখেছিলেন, তাহাতে তাঁহার জীবনে মহাপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সেখানকার বাহিরের শোভা ঐশ্বর্য্য দেখিয়া পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, সেখানকার ধর্ম্মভাব দেখিয়া তাঁহার এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

একটী জর্ম্মান সন্ন্যাসী ৪০ বৎসর কাল সাধন ভজন করেও মনে শান্তি পেতেন না। তিনি যে সব কাজ করিতেন, তাহাতে বোঝা যেত যে প্রত্যেক কাজের মধ্যে একটা নিরাশার ভাব থাকিত। (এই সন্ন্যাসী আর কেহ নহেন, মার্টিন লুথার) এই নিরাশার ভাব তাঁহার দূর হইয়াছিল বাইবেল পড়িয়া। তিনি যখন বাইবেল পড়িতে লাগিলেন, যখন ধর্ম্মের অতি উচ্চ উচ্চ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন, অনেক ধর্ম্মবন্ধু পাইলেন, তখন তাঁহার সে নিরাশার ভাব দূর হইল। বাইবেলের মধ্যে আলোক পাইয়া তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়াছিল। যীশু বলেছেন—"আমাকে যে বিশ্বাস করে সে পরিত্রাণ পায়।" এই সমস্ত পড়িয়া তাঁহার বিশ্বাস জাগিয়া উঠিল। তখন তাঁর মনে হতে লাগ্‌লো যীশুই সব। আমরা মনে করিতে পারি যে তবে আর তিনি কিরূপ মানুষ ছিলেন, যদি যীশুকেই পরিত্রাণকর্ত্তা বলিয়া মনে করিলেন, তবে আর তাঁহার ভ্রম সংস্কার দূর হইল কি প্রকারে? তিনি মনে করিতেন যীশুকে বিশ্বাস করিলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মভাব আর এক প্রকার। কিন্তু বুদ্ধদেবের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে অনেকটা মেলে। বুদ্ধদেব মাঝামাঝি একটা পথ অবলম্বন করেন। বুদ্ধদেব যেমন 'দয়া ও প্রেম' করিতেন, সকলের প্রতি তাঁর দয়া ও প্রেম দেখা যাইত; লুথারের মধ্যে সেইরূপ বিশ্বাসের ভাব খুব প্রবল দেখা যাইত। যীশুকে যখন তিনি বিশ্বাস করিতে লাগিলেন, তখন তিনি শক্তি পেলেন, বল পেলেন। আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক মহাপুরুষ প্রকৃতির এক একটী খণ্ড বিশেষ। প্রকৃতির সঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়া তাঁহারা সুখে বাস করেন। কোন রূপ দুঃখ কষ্ট তাঁহাদের হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহারা সর্ব্বদাই সুখী ও আনন্দিত হইয়া থাকেন।

এই বারে মার্টিন লুথারের প্রার্থনা কয়েকটি আপনাদিগকে শুনাইব। মার্টিন লুথার যেরূপ ভাবে প্রার্থনা করিতেন, তাঁহার সেই প্রার্থনা শুনিলে বুঝিতে পারা যায়, তিনি বিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের নিকট কিরূপ জোর করিতেন, কিরূপ আব্দার করিতেন। তাঁহার এ বিশ্বাস ছিল যে, আমি যাহা চাইব, তাহা ঈশ্বর দিবেনই। তাঁর যা জিনিষ তাহা আমার হইবে। আর আমি যাহা চাহিব তাহা তাঁহারই জন্য। একবার একটী

মহাসভা হয়, তাহাতে অনেক বড় বড় লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি সভার পূর্ব্বে যে প্রার্থনা করেছিলেন তাহাও লেখা আছে। সেই সময়ে তিনি ভগবান্‌কে জোর করে বলেছিলেন, হে ঈশ্বর, যে জন্য আমরা এখানে সমুপস্থিত হইয়াছি, এ বিষয় তো আমাদের কিছুই নয় ইহা তোমারই, তোমারই জন্য আমাদের এই সভা। যে বিষয়ে আমি লড়িতে যাইতেছি ইহাতো তোমারই জন্য। আমার যে জীবন ধারণ তাহাও তোমারই জন্য। যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে আমি এ জীবন পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছি" এই ভাবে খ্রীষ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেন। বিবাহের সময়ে কিরূপ ভাবে প্রার্থণা করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ আপনাদিগকে শুনাইব। তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন—হে ঈশ্বর, তুমি কেন আমাকে বিবাহ করিতে বলিলে? আমার সহধর্ম্মিণী যিনি হইতেছেন, তিনি আমার ন্যায় যীশুকে বিশ্বাস করিবেন কি না? তাহার পর আমার যে সন্তান সন্ততি হইবে তাহাদের কিরূপ শিক্ষা দিব? কিরূপ ভাবে শিক্ষা দিলে তাহাদের জীবন গঠিত হইবে তাহারা তোমাকে ভক্তি ও বিশ্বাস করিবে। আমি যদি তাহাদের এ সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দিতে না পারি, তবে তো তাহারা মূর্খ থাকিবে, তোমাকে চিনিতে পারিবে না। প্রভু, আমাকে বল দাও। আমাকে এরূপ শক্তি দাও, যাহাতে আমি সন্তানদের সুশিক্ষা দিতে পারি। আমার জীবন দেখিয়া সন্তানেরা শিক্ষা লাভ করিবে। তিনি যেরূপ স্ত্রী ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন ঠিক্ সেই রূপ স্ত্রীই পাইয়াছিলেন। লুথারের স্ত্রী মনে করিতেন আমার যিনি স্বামী তিনি স্বয়ং খ্রীষ্টের ন্যায়; খ্রীষ্টের ন্যায় তিনি স্বামীকে ভক্তি করিতেন, ভাল বাসিতেন, এবং বিশ্বাস করিতেন। স্বামীও তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন ও ভাল বাসিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন আমরা যদি উভয়কে উভয়ে এইরূপ ভাল বাসিতে ও শ্রদ্ধা করিতে পারি, তবে আমাদের পরিবার ঈশ্বরের পরিবার হইবে। তিনি যাহা আশা করিয়াছিলেন, তাহার অপেক্ষা অধিক পাইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, বিবাহ শুধু আমি নিজের জন্য করি নাই, জগতের জন্য করিয়াছি। তিনি নিজের দিকে তাকাইতেন, জগতের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেন। স্বামী, স্ত্রী যখন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিতেন, তখনও তাঁহাদের মধ্যে অনুরাগের ভাব দেখা যাইত। তিনি স্ত্রীকে ও ছেলেদিগকে যে সমস্ত চিঠি লিখিতেন, তাহাও ধর্ম্মেতে পরিপূর্ণ প্রার্থনার ভাবই তাহাতে অধিক থাকিত। মার্টিন লুথারের যখন পীড়া হইত, তখন তিনি স্ত্রীকে প্রবোধ দিতেন, বলিতেন, দেখ আমার জন্য তুমি ভেব না। তোমাপেক্ষা একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আছেন যিনি আমার বিষয় দিবা রাত্রি ভাবেন। তিনি আমার সেবায় রত আছেন, সুতরাং আমি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিব। আমি কখনও মরিব না, যীশু কখনই আমাকে মারিবেন না, আমি মরিলে তাঁহার কাজ হইবে না, তিনি আমাকে বাঁচাইয়া রাখিবেন। তিনি জোর করিয়া বলিতেন আমি কখনই মরিব না।

যুদ্ধ বিগ্রহের সময় তিনি বলিতেন, আমরা তো জিতিব, নিশ্চয়ই হারিব না, কারণ আমরা হারিলে তো শুধু আমরা হারিব না, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরও হারিবেন, সুতরাং তিনি আমাদিগকে হারাইবেন না, নিশ্চয়ই জিতাইবেন, এমনি তাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস, এমনই তাঁহার ঈশ্বরে জোর। এক বার বৃষ্টির জন্য অনেক দিন লোকে হাহাকার করিতে ছিল, তিনি তখন প্রার্থনা করিলেন, প্রভু বৃষ্টি দাও, বৃষ্টি না হইলে এত গুলি লোক মরিবে। এত গুলি লোক মারিয়া তোমার কি ফল হইবে? আমাদিগকে তোমার বৃষ্টি দিতেই হ'বে। বৃষ্টি না দিলে হবে না পিতা। তার পর প্রার্থনা করিয়া তিনি সমস্ত লোককে বলিলেন আমি নিশ্চয় বলিতেছি, বৃষ্টি হইবে। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে. তাহার পর বাস্তবিকই বৃষ্টি হইল, এবং লুথারও খুব যীশুকে বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস খুব বেশী না থাকিলে কেহ ঈশ্বরকে জোর করিয়া কথা বলিতে পারে না। ঈশ্বরের নিকট আব্দার করিতে পারে না।

মেলান্দুন তাঁহার খুব বন্ধু ছিলেন। মেলান্দুনের একবার খুব অসুখ হইয়াছিল। তিনি মেলান্দুনের নিকট বসিয়া কত ধর্ম্মের কথা শুনাইতেন, কত প্রকারে তাঁহাকে আশ্বাস দিতেন, বলিতেন দেখ তুমি মরিবে না, তুমি যদি মর তাহা হইলে ঈশ্বরের কাজ করিবে কে? আমি বলিতেছি ঈশ্বর কখনই তোমাকে মারিবেন না, তুমি নিশ্চয় বাঁচিবে, এবং বাঁচিয়া উঠিয়া আরও তেজের সহিত ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিবে। তিনি তোমাকে কখনই মারিবেন না। মেলান্দুনের তখন মরিতেই ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার তেজোময় কথা শুনিয়া আবার বাঁচিতে সাধ হইল, তিনি ভাবিলেন তাইতো আমার মরা এখন ভাল নয় মেলান্দুন যখন আরোগ্য লাভ করিলেন, তখন লুথার বলিয়াছিলেন, দেখিলে আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া তোমাকে বাঁচাইলাম। আমার প্রার্থনা তিনি কেমন শোনেন। লুথারের যে সময়ে কন্যা মারা যায়, সে সময়েও তাঁহার অনন্ত বিশ্বাস দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। তিনি কন্যাকে প্রাণপণে ভাল বাসিতেন। যখন কন্যা মারা যায় সেই সময়ে তিনি দেবমন্দিরের কাছে দাঁড়াইয়া যেরূপ ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার ভাব কতকটা এইরূপ —হে ঈশ্বর, তুমি জান যে আমি এই কন্যাকে বড়ই ভাল বাসি। এই কন্যাকে যদি তুমি লও, তবে আমার কিরূপ কষ্ট হবে তাহা তুমি জান। জানিয়া শুনিয়াও যদি তুমি এই কন্যাকে লও, তবে ভাল হ'বে না, তাহলে তোমার বড়ই অন্যায় বিচার করা হবে। আবার পরক্ষণেই বলিলেন, তা আমার কন্যাকে লওয়া যদি তোমার ইচ্ছা থাকে তবে লও, আমার অতি আদরের কন্যা তোমার নিকট গিয়া কত সুখী হ'বে, তুমি তাহাকে কত যত্নে রাখিবে, কত আদর করিবে। লও পিতা, আমার কন্যাকে তোমার নিকট দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। পরে কন্যাকে বলিলেন—প্রিয় ম্যাগ্‌ডলিন, তুমি আমার নিকট হইতে চলিলে, আমি যে তোমার পিতা, আমা অপেক্ষাও যিনি পিতার পিতা, যিনি জগৎপিতা তাঁহার

নিকট যাইতেছ, সুতরাং মা, তোমার দুঃখ করিবার কিছুই নাই। তুমি ত্রাণকর্ত্তা প্রভুকে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তোমার মধ্যে দুর্ব্বলতা আসিবে না, মৃত্যুকে ভয় হ'বে না, মনের আনন্দে জগৎপিতার নিকট যাইতে পারিবে। তুমি যেখানে যাইতেছ সে স্থান বড়ই সুন্দর, তুমি সেখানে সূর্য্যের ন্যায় হইয়া থাকিবে। কিন্তু মা, ভাব্‌তে পার্‌ছি না যে, তোমাকে ছাড়িয়া কিরূপে থাকিব। ভাব্‌তে বড়ই কষ্ট হচ্ছে। শরীর সইতে পার্‌ছে না, কিন্তু আত্মা সুখী হ'চ্ছে। যে সময়ে কন্যা মারাগেলেন, তখন সকলের নিকট বলিলেন, আমার কন্যা স্বর্গে গিয়া ধন্যা হইলেন। তাঁহার আত্মা তিনিই রক্ষা করিবেন। আমরা তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিলেও বাঁচাইতাম না। এস, আমরা সকলে সমবেত হইয়া তাঁহার করুণার জয় ঘোষণা করি। কি জ্বলন্ত বিশ্বাস, ঈশ্বরকে এরূপে যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহারাই ধন্য। একদিকে অসহ্য কষ্ট পাচ্ছেন, আর এক দিকে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন।

এই রূপ সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার বিশ্বাস দেখা যাইত। প্লেগের সময়ও তাঁহার খুব বিশ্বাস দেখা গিয়াছিল। প্লেগের সময় সকলে পলাইয়াছিল, কিন্তু তিনি পলান নাই। তাঁহাদের দেশে যখন প্লেগ হইল, সকলে পলাইল এবং তাঁহাকেও পলাইতে অনুরোধ করিল, কিন্তু তিনি পলাইলেন না। তিনি বলিলেন—তোমরা দেখিও আমি কখনও মরিব না, তোমরা ফিরিয়া আসিয়া আমাকে পুনরায় দেখিতে পাইবে।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"

১০শ ভাগ] ভাদ্র, ১৩১২ ; সেপ্টেম্বর, ১৯০৫। [২য় সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

যত সৎকর্ম্ম ও সদাচার তৎসমুদায় নীতিমূলক ; অনীতি হইতে কেবল অসৎ কর্ম্ম ও অসদাচার হইয়া থাকে। অন্তরে এরূপ আলোক প্রকাশ পায় যাহা নরনারীকে সৎকর্ম্মে ও সদাচারের দিকে পথপ্রদর্শন করে ; উহাই নীতি বা ঈশ্বরের ইঙ্গিত কিংবা আদেশ। অনেকে উহাকে কর্ত্তব্য জ্ঞানও বলে। কল্যাণি, যদি তুমি স্বামী বা পিতা মাতা গুরুজনকে মান্য কর, তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত হও, তাহা হইলে তোমার এই কার্য্য নীতিমূলক সৎকার্য্য হয়, তাঁহাদিগকে অপ্রেম ও অশ্রদ্ধা করিলে ও তাঁহাদের অবাধ্য হইলে তুমি নীতিবিহীনা অসদাচারিণী বলিয়া গণ্যা হইবে।

নীতিপালনেই জীবন ও চরিত্র সুন্দর ও সুগঠিত হয়। যে নারী নীতিহীনা সে চরিত্রহীনা, জীবনহীনা ; তাহার জীবন সকলের অপ্রিয়। সে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া স্বামীকে অগ্রাহ্য ও অমান্য করিয়া চলে, পুত্র কন্যার নিকটে রাগ দ্বেষের কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে, বিবাদ কলহ করিয়া আত্মীয় প্রতিবেশীদিগকে জ্বালাতন করিয়া থাকে, সে অসত্যাচরণে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। সেই নারী দুঃখ ক্লেশে চিরজীবন যাপন করে।

নীতিপরায়ণা নারীই সতী লক্ষ্মী; তিনি সংসারে সুখী পুণ্যবতী। তাঁহার চরিত্রে ও আচরণে সকলের সুখ ও আনন্দ হয়। তিনি প্রাণপণে দুঃখীর দুঃখ দূর, দরিদ্রের দারিদ্র্যভঞ্জন করিয়া থাকেন। তাঁহার জীবনে ন্যায় সত্য প্রেম প্রস্ফুটিত হয়। তিনি কাহারও অনুরোধে ন্যায়কে অতিক্রম করেন না, লোকভয়ে অসত্য পথে চলেন না, অপ্রেমের কার্য্য বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। তিনি পরম জননীর সতী সাধ্বী কন্যা। স্বর্গ হইতে শুভাশীর্ব্বাদ-কুসুম সর্ব্বদা তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হয়। তাঁহার জীবন ধন্য।

—

নারীগণের সাধুসেবা।

নারীর কোমল হৃদয় স্বভাবতঃ ভক্তি-প্রবণ; পুরুষের কঠিন মন সহজে ভক্তি-রসে আর্দ্র হয় না। সাধুদর্শনেই সরল-প্রকৃতি নারীর মনে ভক্তির উচ্ছ্বাস হয়, ভক্তির আবেগে তিনি তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কেবল দর্শনে নয়, চক্ষুর অগোচর দূরস্থ বা স্বর্গগত সাধুর চরিত্রকাহিনী শ্রবণে সহসা নারীর হৃদয় ভক্তিরসে প্লাবিত হয়। তিনি সাধুর সেবা ও তাঁহার গৌরববর্দ্ধনার্থ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

মহামুনি বুদ্ধদেব যখন উরুবিল্বগ্রামের সন্নিহিত অরণ্যে দীর্ঘকালব্যাপিনী কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত থাকিয়া অনশন ও অনিদ্রায় কঙ্কালমাত্রাবশেষ এবং ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়াছিলেন, তখন উক্ত পল্লীবাসিনী সুজাতানাম্নী সতী কন্যা আসিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত হন, প্রতিদিন পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া আনিয়া তাঁহাকে ভোজন করিতে দেন। সাধ্বী সুজাতা-প্রদত্ত সেই পরমান্নসেবনে মহামুনির দেহে শক্তির সঞ্চার হয়; তিনি ক্রমে সুস্থ বলিষ্ঠ হইয়া উঠেন, গতিশক্তি লাভ করিয়া উক্ত তপোবন হইতে বহির্গত হন, এবং অভীষ্ট প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। বুদ্ধদেব তপস্যা পূর্ণ করিয়া চলিয়া আসিবার সময় সুকন্যা সুজাতা দেবীকে প্রসন্নবদনে পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদসহকারে কৃতজ্ঞতা দান করিয়াছিলেন। সাধুর আশীর্ব্বাদে সুজাতা ধন্যা হইয়াছিলেন।

পরম সাধু যিশুখ্রীষ্ট স্বীয় জন্মভূমি নেজারাত প্রদেশে দীন দুঃখী লোকের গৃহে যাইয়া তাহাদের সেবা করিতেন। সেই সময় সে দেশে মেরী ও মার্থানাম্নী ভগিনীদ্বয় এক গৃহে বাস করিতে ছিলেন। একদা যিশু তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হন। দুই ভগিনী অতিশয় ভক্তিসহকারে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ এবং স্বহস্তে তাঁহার চরণ প্রক্ষালন করেন। মেরী সতৃষ্ণ হৃদয়ে যিশুর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার মুখে স্বর্গীয় তত্ত্ব সকল শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং মার্থা তাঁহার ভোজনের আয়োজনে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তিনি মেরীকে ডাকিয়াব লিয়াছিলেন, "ভগিনি, আমাদের ন্যায় দুঃখিনীর গৃহে প্রভুর শুভাগমন হইয়াছে; আজ বড় শুভ দিন, তুমি তাঁহার সেবার আয়োজন না করিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছ? এ তোমার কি প্রকৃতি? আসিয়া রন্ধনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।" এই কথা শুনিয়া ভগবদ্গতপ্রাণ যিশু বলিলেন, "মার্থা, তোমার ভগিনী মেরীই আমার প্রকৃত সেবা করিতেছেন। তিনি যে স্বীয় আত্মার কল্যাণ ও পরিত্রাণের জন্য স্বর্গীয় তত্ত্ব সকল আমার মুখে শ্রবণ করিতেছেন, ইহাতে আমি কৃতার্থ হইতেছি।" মেরীর আত্মদৃষ্টি প্রবল ছিল, তিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্বসুধাপানে সমুৎসুক ছিলেন, যিশুকে পাইয়া অন্য কাজ কর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া তাঁহা হইতে জীবনপ্রদ উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন, যিশু তাহাতে তৃপ্ত হইয়া মেরী তাঁহার বিশেষ সেবা করিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া-

ছিলেন। মেরী তত্ত্বপিপাসু ব্রহ্মবাদিনী নারী, মার্থা সৎকর্ম্মনিপুণা পরসেবাপ্রিয়া স্ত্রীপ্রজ্ঞাসম্পন্না ছিলেন।

বুদ্ধদেবকে দর্শন করিয়া একজন গণিকার হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয় সে সশিষ্য তাঁহাকে আপন গৃহে ভোজন করাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া নিমন্ত্রণ করে। তথাগত সেই গণিকার আগ্রহ ও ভক্তি শ্রদ্ধাদর্শনে প্রসন্ন হইয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, এবং তাহার গৃহে যাইয়া তাহার সেবা গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাকে ধন্য ও কৃতার্থ করেন।

ভক্তকুল শিরোরত্ন শ্রীচৈতন্য যখন পুরুষোত্তমে বাস করিতেছিলেন, তখন বঙ্গীয় নারীগণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার সেবা করিতে না পারিয়া অতিশয় কষ্ট বোধ করিয়াছিলেন। বঙ্গ দেশ হইতে অনেক ভক্তিমতী মহিলা গৌরাঙ্গের প্রিয় খাদ্য সামগ্রী ডাইলের বড়ী ও আচার ইত্যাদি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া তৎসহ দূরতর পুরু-ষোত্তমে গিয়াছেন, কেহ কেহ যাত্রিকদিগের সঙ্গে সযত্নে তাঁহার নিকটে তাহা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ভক্তমাল গ্রন্থে অনেক ভক্তিমতী সেবা-প্রিয়া বৈষ্ণব মহিলার জীবনবৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পুরাকালে জয়পুরনগরে মাধব সিংহনামক এক রাজা ছিলেন. তাঁহার সাধুভক্ত রাণী সাধুসেবায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাণী বৈষ্ণব ছিলেন, পরম যত্নে নিত্য সাধু বৈষ্ণব-দিগের সেবা করিতেন। তাঁহার সেবা পরিচর্য্যাবিষয়ে উক্ত গ্রন্থে এরূপ উল্লিখিত আছে ;—

"ইহা ভাবি আরম্ভিল বৈষ্ণবসেবন,
যূথে যূথে আসিতে লাগিল সাধুগণ।
নানা জাতীয় লাড়ু পেড়া মিষ্ট অন্ন,
পাকওয়ান করি নিজহস্তে ভিন্ন ভিন্ন।
কৃষ্ণে নিবেদিয়া সাধুগণের খাওয়ায়,
ভুক্ত শেষ আর যে চরণামৃত পায়।"

ভক্তমাল।

রাজা মাধব সিংহ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছি-লেন। রাণীর ঈদৃশ বৈষ্ণবসেবায় মহা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া-ছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন হয়, তিনি অনুতপ্ত হইয়া রাণীর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং রাণীর সাধু সেবাকার্য্যে সহায় হন।

রাজ্ঞী দ্রৌপদী দেবী অতিশয় ভক্তিনিষ্ঠার সহিত সাধু সেবা করিতেন। তিনি স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া অভ্যাগত শত সহস্র ঋষি মুনিকে ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করা-ইতেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। তিনি নানা উপায়ে তাঁহার সেবা করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছেন। মহাভারত গ্রন্থে দ্রৌপদী দেবীর সাধু-সেবার আশ্চর্য্য বিবরণ সকল উল্লিখিত আছে।

অনেক গৃহিণী যোগী সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব দিগকে আপন গৃহে অতিথিরূপে প্রাপ্ত হইলে শ্রদ্ধা সহকারে অন্নদানাদি করিয়া তাঁহাদের সেবা পরিচর্য্যা করেন। এই রূপ আতিথ্যসৎকারে বৈষ্ণব পরিবারের মহিলারা অতিশয় নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করেন।

ভগবদ্‌গত প্রাণ পরম সাধু যিশু শিষ্য দিগকে বলিয়াছিলেন, আমার তিরোধানের

পর অনেক ভণ্ড পাষণ্ড লোক সাধু বলিয়া আত্মপরিচয় দান করিয়া নরনারীকে প্রতারিত করিবে, তোমরা সেই সকল প্রবঞ্চকগণসম্বন্ধে সাবধান হইও। বাস্তবিক যিশুর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল। এস্‌লামধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মোহম্মদের পরলোকগমনের পর অনেক ভাক্ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ভাক্ত সাধু প্রাকাশিত হইয়া আরবের নরনারীদিগকে প্রাতারিত করিয়াছিল। সেই ভাক্ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে দুই এক জন মহিলাও ছিল। এদেশেও অনেক স্বার্থপর ধূর্ত্ত লোক শ্মশ্রুধারণ ও গৈরিক বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক প্রেমানন্দ স্বামী বা জ্ঞানানন্দ স্বামী নামে আপনাদের পরিচয় দান করিয়া লোকদিগকে প্রতারিত করিয়া থাকে। সেবাপ্রিয়া সরলা নারীগণ তাহাদের ভেক দেখিয়া,২।১টী ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষ ভাবে প্রতারিত হইতেছেন। এই রূপ ভাক্ত স্বামীজীদের অভাব নাই। মহাপ্রভাবশালী অনেক স্বামী ও মহান্ত এবং গুরুজী ব্যভিচারপাপের জন্য কারাগারও ভোগ করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অবোধ মহিলাগণ ভক্তিপূর্ব্বক ঈদৃশ সাধুদিগকে প্রণামী দান করেন, কোন কোন সাধুকে গাঁজা মদ যোগাইয়া রুগ্ন ছেলে মেয়ের রোগ এবং বন্ধ্যার বন্ধ্যাত্ব নিবারণের ঔষধ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই রূপ অনেক সাধু সরলা অবলার সতীত্বকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া থাকেন। পশ্চিম প্রদেশে ঈদৃশ বহু সাধু ভিক্ষুকের বেশে গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হইয়া লোটা বাটী বস্ত্রাদি চুরি করিয়া লইয়া যায়। বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় যখন পুরুষেরা কর্ম্মস্থলে স্থিতি করে, গৃহে কেবল স্ত্রীলোকেরা থাকে, সচরাচর সেই সময় উক্ত কপট সাধুগণ গৃহস্থের গৃহে আসিয়া দর্শন দান করিয়া থাকে। দেখিয়া শুনিয়া অনেক গৃহিণী এক্ষণ সাবধান হইয়াছেন। তাঁহারা দূর হইতে এই রূপ ভাক্ত সাধুদিগকে দেখিলেই অন্য গৃহীণীকে সাবধান করিয়া বলেন, "দিদি, সাধু আসিয়াছে গো,দুওয়ার বন্ধকর।" এই তো সাধুমর্য্যাদা! পল্লীগ্রামে অনেক চোর দস্যু ফকির ও বৈরাগীর বেশে ভিক্ষাগ্রহণচ্ছলে গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করে। বৈরাগী ফকির সাধুশ্রেণীর অন্তর্গত, তাহাদের অন্তঃপুরে প্রবেশে কোন বাধা নাই। তাহারা ভিক্ষা করার ছলে দিবাভাগে অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া কোথায় কোন জিনিষ আছে দেখিয়া শুনিয়া যায়, রাত্রিতে যাইয়া চুরি বা ডকাতি করে। ভক্তমাল গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কয়েক জন চোর সাধু বৈষ্ণব সাজিয়া এক গৃহস্থের বাড়ীতে যাইয়া অতিথি হইয়াছিল। সেই বাড়ীর ভক্তিমতী নারীগণ নানা প্রকার যত্নে তাহাদের সেবা করিয়াছিলেন, রন্ধন ও পরিবেশনপূর্ব্বক ভক্তি শ্রদ্ধা যত্ন সহকারে তাহাদিগকে ভোজন করাইয়াছিলেন। রাত্রিতে সেই সকল সাধু নিদ্রাবস্থায় উক্ত সেবিকা রমণীদিগের গাত্র হইতে মূল্যবান্ অলঙ্কার সকল উন্মোচনপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিল।

এদেশে হিন্দু সমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের

অনেক ভোগী বিলাসী অলস অকর্ম্মণ্য লোক সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার উদ্দেশ্যে স্বামীজী ও মহান্তজী সাজিয়া কুসংস্কারাপন্ন লোকের উপর বিশেষতঃ অবোধ স্ত্রীলোকদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। মূর্খ স্ত্রীলোকেরা তাহাদের বাহ্যিক ধার্ম্মিকতা ও ভেকদর্শনে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, তাহারা সেই সকল লোককে ভক্ত সাধু জানিয়া গুরুপদে বরণপূর্ব্বক নানা ভোজ্য সমাগ্রী ও বস্ত্রাদিদানে সেবা করিয়া থাকে। শুনিয়াছি সেই সমস্ত মহান্ত জীর অবর্ত্তমানে তাহাদের পাদুকার পূজা, ছবির পূজা, পর্য্যন্ত হইতেছে। কি দুঃখের ব্যাপার!

কিছু কাল হইল পূর্ব্ব বঙ্গের পল্লী বিশেষে একজন চণ্ডাল জাতীয় ধূর্ত্ত আসিয়া হরি ঠাকুর বলিয়া নিজের পরিচয় দান করে। সে দেখিতে সুপুরুষ, তাহার কণ্ঠস্বর মিষ্ট, সুন্দররূপে সে কীর্ত্তন ও নৃত্য করিত। পল্লীর সমুদায় লোক বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা সেই হরি ঠাকুরের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণ বৈদ্য শূদ্র জাতীয় সকল লোক তাহাকে প্রণাম ও তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিত। সকলে তাহার নৃত্য গীতে বিহ্বল হইয়া তাহাকে ঘেরিয়া নাচিত। অনেক মহিলা তাহাকে স্বামী বলিয়া অন্তরে বরণ করিয়াছিল, তাহারা নানা প্রকার সুখাদ্য সামগ্রী স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত করিত, এবং ভক্তিপূর্ব্বক তাহার প্রসাদ লইত। দিবা রাত্রি তাহার নিকটে স্ত্রীলোকের ভিড় হইত। তাহার প্রসন্নতালাভ ও তাহার মুখের কথা শ্রবণ করিবার জন্য সকলে ভক্তি ও ব্যাকুলতার সহিত প্রতীক্ষা করিত। অনেক নারী পরস্পর এইরূপ বলিত, আজ আমি হরি ঠাকুরকে চতুর্ভুজরূপে দর্শন করিয়াছি, কেহ বা বলিত সৌভাগ্যক্রমে আজ তিনি আমার নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এক দিন সেই হরিঠাকুর সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে সদলে রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছে, এমন সময় তাহার গ্রাম নিবাসী এক ব্যক্তি যে তখন সেই পল্লীতে আসিয়া ছিল, হঠাৎ সে তাহাকে দেখিয়া ডাকিয়া বলিল, "অরে রামা, তুই আবার এই গ্রামে আসিয়া লোকের পূজা লইতেছিস, তোর অসাধ্য কিছুই নাই।" সেই লোকটিকে দেখিয়া ও তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া হরিঠাকুর চম্পট দিলেন, তিনি একেবারে অদৃশ্য হইলেন, তাঁহাকে আর কেহ খুঁজিয়া পাইল না। উক্ত আগন্তুক ব্যক্তি পরে প্রকাশ করিল যে, "এ লোকটি আমাদের গ্রামে বাস করে, জাতিতে চাঁড়াল। সে বেশ নাচিতে ও গাইতে পারে, কিন্তু ভয়ানক দুষ্ট ও ধূর্ত্ত।" হরিঠাকুরের এই পরিচয় পাইয়া সকলের চৈতন্যোদয় হইল। যে সকল লোক তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা প্রায় সকলেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইল। যাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহে নাই, তাহাদের উপর গুরুতর সামাজিক শাসন হইল। পরে শাসনে বাধ্য হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতিতে উঠিল। কিন্তু হরিঠাকুরের সেবিকা প্রসাদান্নভোগিনী কোন নারী কিছুতেই প্রায়শ্চিত্ত করিলেন না, তিনি

বলিলেন, "উনি আমার হৃদয়ের স্বামী, আমি জন্মান্তরে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব।"

আমরা বলি সাধুসেবা কোমলপ্রকৃতি নারীদিগের সম্বন্ধে পরম ধর্ম্ম। তাহাতে তাঁহাদের জীবনের অনেক কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু অসাধুকে সাধু বলিয়া সেবা করিলে, সাধুর প্রাপ্য শ্রদ্ধা ভক্তি তাহাকে প্রদান করিলে, জীবনের অধোগতি ও অত্যন্ত অকল্যাণ হইয়া থাকে। অতএব তাঁহারা সাধুসেবা বিষয়ে সাবধান হইবেন। উপযুক্ত পাত্রের সেবা পরিচর্য্যা করেন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়; অপাত্রকে সাধু বলিয়া সেবা করিবেন না। তাঁহারা যেন গৈরিক বস্ত্র ও দীর্ঘ শ্মশ্রু দর্শন করিয়া ভুলিয়া না যান। আজ কাল অনেক ধূর্ত্ত প্রতারক লোক দুষ্ট অভিসন্ধিসাধন এবং শ্রদ্ধা ভক্তি ও সেবালাভের জন্য ছদ্মবেশধারণে সাধু মহান্ত হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমের নারীবৃন্দ।

"পূর্ব্ব ও পশ্চিমের নারীবৃন্দ" এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের নারীদিগের অবস্থা বিবৃত হইয়েছে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চল বঙ্গদেশ, পশ্চিমাঞ্চল বিহার, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং আযোধ্যা, পঞ্জাব প্রভৃতি দেশ। বঙ্গ-দুইভাগে বিভক্ত, পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ। এই সকল দেশের নারীদিগের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারে অত্যন্ত ভিন্নতা, এমন কি অনেক স্থলে একেবারে বৈপরীত্য। পূর্ব্ব বঙ্গের নারীগণ প্রতিদিন একবারমাত্র স্নান করেন, অধিকক্ষণ জল ঘাঁটেন না, তাদৃশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন না। তাঁহারা স্থূল বস্ত্র কোমরে ২।৩ পেঁচ দিয়া পরিধান করেন। পশ্চিম বঙ্গের মহিলা-দিগের জলের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠতা। তাঁহারা সকালে বিকালে অনেক বার স্নান করেন বা দেহ প্রক্ষালন করিয়া থাকেন, পুনঃ পুনঃ বস্ত্র ধৌত করেন। সামান্য পীড়া স্নান ও দেহপ্রক্ষালন হইতে তাঁহা-দিগকে শীতকালেও নিবৃত্ত রাখিতে পারে না। অনেকের অস্বাভাবিক শুচিপ্রিয়তা, তাঁহারা ঘরের মেজে বাসন পত্র পুনঃ পুনঃ ধৌত প্রক্ষালন করেন, তাঁহাদের দৌরাত্ম্যে মেজে সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে। তাঁহারা জল-চর জীবের ন্যায় জল ভাল বাসেন। এক পেঁচ দিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করা তাঁহা-দের রীতি। তাহাতে তাঁহারা লজ্জা বোধ করেন না। সচরাচর হিন্দু সমাজের মেয়ে-দের এইরূপ আচরণ, ব্রাহ্মসমাজে প্রায় সেরূপ নয়। ব্রাহ্মসমাজের মহিলাদিগের দৃষ্টান্তে অনেক হিন্দু মেয়ে পরিধেয় বস্ত্রের উপর লম্বা ফ্রক বা জ্যাকেট পরিধান করেন। ব্রাহ্মিকাদের দৃষ্টান্তে তাঁহাদের অস্বাভাবিক শুচি প্রিয়তাও কমিয়া আসিয়াছে।

বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বিহার প্রদেশে গমন কর, এবং তাহা ছাড়িয়া আরও পশ্চিমে চলিয়া যাও, দেখিবে বিপরীত দৃশ্য। তথাকার মেয়েরা গ্রীষ্মকালেও মাস দুইমাসান্তে স্নান করেন কি না সন্দেহ। তাঁহারা যে ঘাঘরাও পায়জামা এক বার পরিধান করেন তাহা ছিন্ন হইয়া অব্যবহার্য্য না হওয়া পর্য্যন্ত

তাহা প্রায় কখনও পরিত্যক্ত ও পরিবর্জ্জিত এবং প্রক্ষালিত হয় না। অনেকের ঘাগরায় ছার পোকাও জন্মিয়া থাকে। তাহারা সুক্ষ্ম বস্ত্র স্পর্শ করে না। যে সকল বস্ত্র পরিধান করে তাহাতে লজ্জাসম্ভ্রম উভয় রক্ষা পায়। কিন্তু স্নান প্রক্ষালনাদির সঙ্গে তাহাদের বড় সম্বন্ধ না থাকাতে তাহাদের শরীরে দুর্গন্ধ, কাপড়ে দুর্গন্ধ এবং সর্ব্বদা দেহ ও বস্ত্র মলিন থাকে। সামান্য শ্রেণীর এক একটী নারীকে পিশাচী বলিয়া বোধ হয়। সে অঞ্চলে বাঙ্গালী পরিবারে তাহারাই চাকরাণী ও রাঁধুনীর কার্য্য করে। তাহাদের হস্তে জলপান ও তাহাদের প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন ভোজন অনেক বাঙ্গালীর পক্ষে নিতান্ত কষ্টসাধ্য। তবে অনেক স্থলে বাঙ্গালী পরিবারে বাঙ্গালী মেয়েদের শাসনে তাহারা কিয়ৎপরিমাণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে বাধ্য হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি, যখনও স্নান করিতে ইচ্ছা হইলে পঞ্জাবী মেয়েরা নিজেদের পরিধেয় পায়জামা উন্মোচন করিয়া নির্লজ্জভাবে সরোবরে বা নদীতে অবগাহন করে, জল-স্পর্শ হইতে পরিধেয় বস্ত্রকে রক্ষা করিয়া থাকে।

আমরা মনে করি রন্ধনাদি কার্য্যে ও পিষ্টক মিষ্টান্নাদি প্রস্তুতিকার্য্যে পূর্ব্ব-বঙ্গের মহিলারা পশ্চিমবঙ্গের মহিলাগণ অপেক্ষা সুদক্ষা। নিরামিষ ও আমিষ সুস্বাদু ব্যঞ্জনাদির বাহুল্য ও বিচিত্রতা পূর্ব্ব বঙ্গের মহিলাদিগের দ্বারা যেরূপ হয় ভারতের অন্য স্থানের এমন কি পৃথিবীর কোন দেশের মহিলাদিগের দ্বারা সেরূপ হয় কি না সন্দেহ। পশ্চিম বঙ্গের মহিলারা অনেক প্রকার সুরস ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে পারেন। কিন্তু সেই প্রকার ব্যঞ্জনের বাহুল্য ও বিচিত্রতা অধিক নয়, আমিষ ব্যঞ্জনাদিরন্ধনে তাঁহাদের পটুতা অধিক নাই। ক্ষীর চিনি ও নারীকেলাদি যোগে পূর্ব্ব বঙ্গের মেয়েরা যেরূপ নানা প্রকার মিষ্টান্ন ও পিষ্টকাদি প্রস্তুত করেন, পশ্চিম বঙ্গের পরিবার সকলে সেরূপ হইয়া উঠে না। অনেক স্থলে পূর্ব্ব বঙ্গের মহিলাগণ স্বদেশীয় শিল্পের গৌরব যেরূপ রক্ষা করিতেছেন পশ্চিম বঙ্গের মেয়েরা সেরূপ রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা প্রায় বিলাতী শিল্পের অনুকরণ করেন। পূর্ব্ব বঙ্গের মহিলারা রন্ধনাদি কার্য্যে গৃহ কর্ম্মে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে সমর্থ, পশ্চিমবঙ্গের মহিলাগণ সাধারণতঃ সেই সকল কার্য্যসাধনে তদ্রূপ শ্রমপটু নহেন। তবে তাঁহারা কথার মিষ্টতা বুদ্ধিচাতুর্য্য সভ্যতা ও পারি পাট্যাদি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্যা। এই সকল কথা আমরা নিরপেক্ষ ভাবে লিখিলাম, ইহা সকলেই মনে করিবেন। পূর্ব্ববঙ্গে যে সকল মহিলা কলিকাতা অঞ্চলে বাস করিতেছেন, তাঁহারা অনেক বিষয়ে এ অঞ্চলের মেয়েদের অনুকরণ করিয়া থাকেন। অবরোধ বিষয়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের নারীদিগের প্রায় তুল্যাবস্থা। যাঁহাদের পিতা বা পতি বিলাতে গিয়াছেন, এদিকে যাঁহারা ইংরাজি লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহাদের চলা ফেরা রীতি নীতি ভোজ্য পরিচ্ছদ স্বতন্ত্র। তাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত সমুদায় ব্যাপারের

অতীত। সেই সকল মহিলা অবগুণ্ঠনা-চ্ছাদিত হইয়া অন্তঃপুরে গৃহকোণে বসিয়া থাকেন না, পিঁড়ীতে বসিয়া ডাইল চচ্চড়ী যোগে ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করেন না, নিজে কুটন কুটিয়া রন্ধন করেন না, খানসামা বাবুর্চ্চির হস্তে সকল ভার অর্পণ করিয়া থাকেন। সেই সমস্ত মহিলা প্রমুক্ত ভাবে সভা সমিতিতে পুরুষমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হন, চেয়ারে বসিয়া টেবিলে খানা খাইয়া থাকেন। তাঁহারা অনেক বিষয়ে বিবী-দিগের অনুকরণ করেন। অনেকে বিবী-দিগের দৃষ্টান্তে মদ্য মাংসের প্রতিও অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বসন ভূষণ সভ্য জনোচিত। তাঁহারা প্রাচীন শ্রেণীর মহিলাদিগের ন্যায় কর্ণ নাসিকাতে ছিদ্র করিয়া বড় বড় ঝুমকা ও নথ ঝুলাইয়া অলঙ্কার পরিধানের সাধ পূর্ণ করেন না। কিন্তু কোন উৎসব ক্ষেত্রে প্রকাশ্য স্থলে উপবিষ্ট একটী বঙ্গীয় যুবতীকে নিতান্ত অস্বাভাবিক নির্লজ্জ পরিচ্ছদ পরিহিত দেখিয়া আমরা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছি। আমরা ইয়ুরোপীয় মহিলাদিগের Night Dress কে নিতান্ত লজ্জাকর বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি। সেই মহিলার Dress তাহা অপেক্ষাও কুৎসিত ও লজ্জাকর। বড় ঘরের অনেক নব্য মহিলা সচরাচর গৃহকর্ম্ম ও রন্ধনাদিকে উপেক্ষা করিয়া দুই চারি জনে বসিয়া পরস্পর হাস্য গল্প করেন, (তন্মধ্যে পরনিন্দা ও পরচর্চ্চার মিষ্ট রসও কিছু কিছু থাকে।) উপন্যাস পড়েন, তাস খেলেন। বিধাতা যেন এ সকল আমোদের জন্য তাঁহাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের যেন কোন উচ্চলক্ষ্য ও উচ্চ কার্য্য নাই।

এক্ষণ বিহার প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের মেয়েদিগের কথা বলিতেছি। তাঁহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কিছুই জানেন না। তাঁহাদের ঘর বাড়ী সর্ব্বদা জঞ্জালে পূর্ণ অপরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধময় থাকে। তাঁহারা রন্ধনাদি কার্য্যে নিতান্ত অপটু। সেই সকল রমণী ধনে বাটা ও প্রচুর পলাণ্ডু ও লসুন যোগে অন্ততঃ দুই চারি প্রকার ডাইল তরকারি রাঁধিয়া থাকেন। বেগুনের সঙ্গে আলু বা পটল যোগে ব্যঞ্জন রাঁধিতে জানেন না। বেগুন, আলু ও পটল ইত্যাদি তরকারি অমিশ্র ভাবে স্বতন্ত্র রাঁধিয়া থাকেন। কিছু দিন অভ্যাস ও সাধন না করিলে কোন বাঙ্গালী তাঁহাদের প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি স্বচ্ছন্দে গলাধঃকরণ করিতে পারে না। বিহারী মেয়েদের প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি প্রথম ভক্ষণে পলাণ্ডু লসুনের দুর্গন্ধে সাত্বিক ভোজী বাঙ্গালীর বমনোদ্রেক হইবারই কথা। তবে "সর্ব্বংহি তপসা সাধ্যম্।" সাধনে সকল বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করা যায়। সাহেব বিবীদিগের প্রিয়খাদ্য শূকরের চর্ব্বি ও পলাণ্ডু লসুনাদিসংযুক্ত অর্দ্ধ দগ্ধ বা অর্দ্ধ সিদ্ধ মাংসখণ্ড সকল বাঙ্গালী মেয়েরা পর্য্যন্ত সাধন ও অভ্যাসবলে ছুরি কাঁটা যোগে ছিন্ন ও বিদ্ধ করিয়া অনায়াসে ভক্ষণ করেন। অভ্যাস ও সাধন প্রভাবে বিহারী মেয়েদের প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি বাঙ্গালীরা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করিবে আশ্চর্য্য নহে। তবে রাজজাতি সাহেব বিবীদিগের খানা খাওয়া অনেক বাঙ্গালী যুবক যুবতী নিজেদের গৌরবের কারণ মনে করেন; তজ্জন্য তাঁহারা সেই

কৃচ্ছ সাধনের কষ্টকে কষ্ট বোধ করেন না। গরিব বিহারীদিগের কষ্টসাধ্য খাদ্য খাওয়ার অভ্যাস করিতে কাহার ইচ্ছা হয়? উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মেয়েদেরও রন্ধনপ্রণালী প্রায় তদ্রূপ। তবে তাঁহাদের কোন কোন ব্যঞ্জন যে সুখাদ্য নহে,এরূপ বলা যায় না। তাঁহারা নানা প্রকার উৎকৃষ্ট আচার চাট্‌নি প্রস্তুত করিতে পারেন। বাঙ্গালী মেয়েরা সে রূপ প্রস্তুত করিতে অক্ষম। পঞ্জাবী মহিলারা কুটন কুটা ও রন্ধনাদির দায় হইতে এক প্রকার মুক্ত। নগরস্থ ভদ্র নারীগণ সচরাচর বাজার হইতে ডাইল রুটি খরিদ করিয়া আনিয়া ভোজন করেন ও আত্মীয় স্বজনকে ভোজন করান। পল্লী-নিবাসিনী গরিব মেয়েরা রাঁধেন। সেই রন্ধন উল্লেখ যোগ্য নহে। তাঁহারা সচরাচর রুটি খান, অন্নভোজন করেণ না। রুটীর সামান্য উপকরন কিছু শাক ভাজা আলু বেগুণ ভাজা কিংবা ডাইল প্রস্তুত করিয়া লন। নানা প্রকার ব্যঞ্জন তাঁহাদের হস্তে প্রস্তুত হয় না।

সাধারণতঃ পশ্চিমাঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তার হয় নাই, বিলাতী রীতি নীতি প্রবেশ করে নাই, দেশীয় ভাবই প্রবল। পশ্চিমাঞ্চলের সকল ভদ্র মহিলাই পরদানিসিন, কেবল পাঞ্জাবী মহিলাদিগের মধ্যে পরদার দৃঢ়তা নাই। তাহাদের প্রায় সকলের মধ্যে কোন রূপ নূতন ভাব ও উন্নতি দৃষ্ট হয় না। কুসংস্কারনিগড়ে সকলেই বদ্ধ। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের নারীবৃন্দবিষয়ে আমাদের আগামীতে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

—

তুমুল আন্দোলন ও মহিলাদিগের প্রতি নিবেদন।

সম্প্রতি ভারত সাম্রাজ্যের মহামান্য রাজপ্রতিনিধি ও প্রধান শাসনকর্ত্তা লর্ড কুর্জ্জন পদ ত্যাগ করিয়াছেন। এই পদত্যাগের কারণ সৈন্যসংক্রান্ত আয়ব্যয়-বিষয়ে প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনারের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তাঁহার নিজের মত হোম গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রক্ষা না পাওয়া। লর্ড কুর্জ্জনের পদে লর্ড মিণ্টো নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রত্যেক রাজপ্রতিনিধি পাঁচ বৎসরের জন্য সুবিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্যশাসনের ভার প্রাপ্ত হন, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু লর্ড কুর্জ্জন নিজের যোগ্যতা ও কার্য্য দক্ষতার জন্য তদতিরিক্ত দুই বৎসরকালের নিমিত্ত শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই দুই বৎসর পূর্ণ না হইতেই পদত্যাগ করিয়াছেন।

লর্ড কুর্জ্জন কয়েকটি কাজের জন্য প্রজাদের অতিশয় অপ্রিয় হইয়াছেন। তন্মধ্যে বঙ্গবিভাগ কার্য্য প্রধান। সম্প্রতি তাঁহার চেষ্টায় পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসাম রাজ্যশাসনের জন্য একজন স্বতন্ত্র লেপ্টনেণ্ট গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। ঢাকা বা চট্টগ্রাম নগর রাজধানী হইবে। এই বিভাগ কার্য্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া বাঙ্গলার সহস্র সহস্র লোক তুমুল আন্দোলন ও তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমরা রাজনৈতিক বিষয়ে অভিজ্ঞ নহি। এই পরিবর্ত্তন ও নূতন রাজ্যশাসনব্যবস্থার সুফল না

কুফল হইবে, সুশাসন না কুশাসন হইবে, এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করিতে এবং রাজ-প্রতিনিধির দোষ গুণ ও এই ব্যবস্থার মধ্যে তাঁহার দুরভিসন্ধি না সদভিসন্ধি আছে, বিচার করিতে অপ্রস্তুত। এই ব্যাপারে আমাদের শোকচিহ্ন ধারণ করারও কোন কারণ বিদ্যমান নাই; স্বাধীন শাসনকর্ত্তা রাজ্যশাসনবিষয়ে অভিনব ব্যবস্থাস্থাপনে কতকগুলি প্রজার অভিরুচি ও অভিমতের অনুবর্ত্তন না করিতে পারেন। মহিলাগণ এ বিষয়ের আন্দোলন না করিলেই ভাল। রাজনৈতিক বিষয়ে আন্দোলন তাঁহাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। এই আন্দোলন ও প্রতিবাদের স্রোতে পড়িয়া স্কুলকলেজের অনেক বালক বুঝিয়া হউক বা না বুঝিয়া হউক স্বদেশ উদ্ধারের জন্য যে রূপ ভীষণ উত্তেজনা ও অবিনয় প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের জীবনের যে কত দুর কল্যাণ হইয়াছে আমরা জানি না। এ বিষয়ে তাহাদের স্বদেশহিতৈষী নেতৃগণের গুরুতর দায়িত্ব। মহিলারা যেন কাহারও অনুরোধে এই রূপ রাজনৈতিক আন্দোলনস্রোতে পড়িয়া নিজেদের স্বাভাবিক নম্রতা ও শিষ্টতা বিসর্জ্জন না করেন, ইহাই আমাদের নিবেদন। আমরা জানি মফস্বলের অনেক মহিলা এই আন্দোলন-প্রবাহে পতিত হইয়া সভা সমিতি করিয়াছেন। প্রেম ও কৃতজ্ঞতাশূন্য protesting spirit অত্যন্ত অনিষ্টজনক। বিদেশীয় বিজেতা রাজা দয়া করিয়া আমাদের ন্যায় পরাধীন পরাজিত জাতিকে যে বলিবার লিখিবার স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, সেই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার আমাদের দ্বারা না হইলে বোধ হয় তাহা আর অধিক দিন অব্যাহত থাকিবে না। ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীন প্রজাদিগের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না। আমরা সমস্ত ব্যাপারে তাহাদের অনুকরণ করিতে পারি না। তাহাদের সকল আচরণই যে ভাল ও অনুকরণীয় তাহা নহে। জাতীয় একতা নিতান্ত প্রার্থনীয়, কিন্তু সকল অবস্থায় নহে। ঔদ্ধত্য অবিনয়, অনীতির ফল কখনও ভাল হইবার নহে।

বিলাতী বস্ত্রাদিদ্রব্য ব্যবহার না করিয়া স্বদেশীয় বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবেন বলিয়া এ দেশের বহুলোক প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন। তাহা লেখনীচালনায় ও বক্তৃতাতে বদ্ধ না রাখিয়া শীঘ্র শীঘ্র বিশেষরূপে কাজে পরিণত করিতে পারিলেই ভাল হয়। ইহার মূলে যেন স্বদেশ-প্রেম স্বদেশহিতৈষিতা থাকে। রাজপ্রতিনিধি বা ইংরাজজাতির প্রতি ক্রোধবিদ্বেষ এই কার্য্যের প্রবর্ত্তক হইলে ইষ্ট হইবে না, এবং এ কাজ স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। বিলাতী চিকিৎসা, অস্ত্র শস্ত্র ও ঔষধাদি এবং বিলাতী কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্রাদি স্বদেশীতে পরিবর্ত্তিত করিয়া স্বদেশপ্রেমিক বক্তারা এই মহাব্যাপারে নিজেদের স্বার্থত্যাগ ও সৎসাহসের পরিচয়দানপূর্ব্বক বক্তৃতা করিলে বিশেষ কাজ হইতে পারে, নতুবা দৃষ্টান্তবিহীন উপদেশ বক্তৃতায় এক প্রকার পণ্ডশ্রম হইবারই কথা।

পাটের চাসে বঙ্গ দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবীর, পাটের কুঠীতে কেরাণীগিরি

কাজে সহস্র সহস্র বাঙ্গালী বাবুর, পাটের গুদামে মজুরের কাজে সহস্র সহস্র শ্রমজীবীর জীবনোপায় হয়। আমরা শুনিয়াছি, দেশীয় লোকের ব্যবহার্য্য থান কাপড় ইত্যাদি বিলাতে এদেশজাত পাটে প্রস্তুত হয়। কাপড় প্রস্তুত না হইলেও অন্য কাজের জন্য ৮ কোটি টাকার পাট এদেশ হইতে বিলাতে রপ্তানি হয়। বিলাতী কাপড় খরিদ বন্ধ করিলে বিলাতের বণিক্‌গণ তাহার প্রতিশোধ লওয়ার জন্য যদি পাট খরিদ বন্ধ করে, পাটের অপ্রয়োজনবশতঃ তাহার চাস বন্ধ হইবে, বা চাস নিতান্ত কমিয়া যাইবে। তাহাতে রেলীকোম্পানি প্রভৃতির পাটের কুঠী ও গুদাম সকল উঠিয়া গেলে বিষম বিপদ্। এক বিঘা ভূমিতে পাটের চাসে কৃষকদের যেরূপ লাভ হয়, দশ বিঘা ভূমিতে ধান্যের চাসে সেরূপ হয় না। পাট প্রস্তুত হইলেই চাসারা একযোগে তাহার মূল্য নগদ প্রাপ্ত হয়। যে বৎসর বিলাতে পাটের রপ্তানি কম হইয়াছে,সেই বৎসর অর্থকষ্টজন্য পূর্ব্ব বঙ্গের কৃষিজীবী প্রজাগণ হইতে খাজনা আদায় করা জমীদারদিগের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। জমীদারগণও সঙ্কটাপন্ন হইয়াছেন। শুধু মেয়েদের চরকার সূতাতে এক্ষণ আর কুলয় না। সে কালে সঙ্কুলন হইত। তখন পরিচ্ছদের বাহুল্য ও আড়ম্বর ছিল না, এক্ষণ সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে পোষাকের আড়ম্বর অনেক বাড়িয়াছে। আন্দোলনকারী মহাশয়গণ পূর্ব্বাপর এ সকল চিন্তা করিয়া সকল দিক্ যাহাতে রক্ষা পায় তাহার সদুপায় বিধান করেন, স্বদেশের হিত করিতে যাইয়া যেন অহিত করিয়া না বসেন। এই প্রার্থনা।

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

(সীতাপুর ও নৈমিষারণ্য।)

আমরা প্রায় মাসান্তে গত ২৬শে চৈত্র উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া ২৭শে তারিখ সুদূর পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণার্থ যাত্রা করি। পূর্ব্বে এরূপ কল্পনা ছিল যে, উড়িষ্যার গড়জাত প্রদেশ হইতে সম্বলপুরে ফিরিয়া গিয়া মধ্য ভারত বর্ষের পথে যাত্রা করিব, তাহাতে অনেক অসুবিধা বোধ করিয়া জলপথে কটকে যাওয়া যায়। আমরা কটক হইতে খড়্গপুর জংশনে যাইয়া পুরুলিয়ার পথে পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হইয়াছিলাম। কিন্তু সিনি জংসনে অনেক সময় Corresponding train পাওয়া যায় না। তজ্জন্য যাত্রিকদিগকে প্রায় ১০।১৫ ঘণ্টা সেই ষ্টেশনে বসিয়া ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। এজন্য অনেক বন্ধু সেই পথে যাইতে বারণ করিলেন, কলিকাতা হইয়া যাওয়াই পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া যাত্রা করা যায়।

আমরা ২৮শে চৈত্র প্রাতঃকালে ভাগলপুর নগরে উপনীত হই। ষ্টেশনে পঁহুছিয়াই তত্রত্য এক জন পরম বন্ধুর প্রিয়তম যুবক পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়। সেই যুবা পূর্ব্ব দিন জ্বররোগে পরলোক যাত্রা করিয়াছিল। এই সংবাদ পাইয়া মন অতিশয় সন্তপ্ত হয়। নানা কারণে ভাগলপুরে

একের শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সপ্তাহাধিক কাল স্থিতি করিতে হইয়াছিল। ভাগলপুরের বৃত্তান্ত ইতি পূর্ব্বে মহিলায় একবার প্রকাশিত হইয়াছে। এবার আর কিছুই উল্লেখযোগ্য নহে।

৬ই বৈশাখ ভাগলপুর হইতে লক্ষৌনগরে যাত্রা করা যায়। আমরা ৭ই তারিখ সেখানে উপনীত হই। লক্ষৌ হইতে সীতাপুরে যাওয়া এবং তথা হইতে নৈমিষারণ্য গমন প্রধান লক্ষ্য ছিল। লক্ষৌ নগরে আমরা অনেক বার গিয়াছি, এবং দীর্ঘকাল স্থিতি করিয়াছি। পরম রমণীয় সমৃদ্ধ লক্ষৌ নগরের বিস্তারিত বিবরণও মহিলায় প্রকাশিত হইয়াছে।

লক্ষৌ নগর হইতে সীতাপুর নগর ৫৫ মাইল দূরে উত্তর পূর্ব্বাংশে। সেখানে বিহার প্রদেশপ্রবাসী আমাদের একজন পরম বন্ধুর প্রিয়তমা কন্যা স্বামী সহ অবস্থিতি করিতেছেন। কয়েক বৎসর হইল সেই কন্যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইয়াছে। আমরা তাঁহার বিশেষ আদর ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া পড়িয়াছি। তিনি জ্যেঠা মহাশয় বলিয়া আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্বদা পত্রাদি লিখেন। ইতি পূর্ব্বে উক্ত কন্যা সীতাপুরে যাইবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সীতাপুর হইতে নৈমিষারণ্য অধিক দূরে নহে। তিনি নৈমিষারণ্য তীর্থ দর্শন করিবার জন্য আমাদিগকে যত্নপূর্ব্বক পাঠাইয়া দিবেন বলিয়াছিলেন।

আমরা ৯ই বৈশাখ প্রাতঃকালের ট্রেণে লক্ষৌ হইতে সীতাপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়া মধ্যাহ্নে তথায় উপনীত হই। ষ্টেশন হইতে নগর প্রায় দেড় মাইল দূরে। কন্যাটি নিজের বাহক এবং ভৃত্যকে আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেশনে পাঠাইয়াছিলেন। তখন তাঁহার স্বামী স্বদেশে ছিলেন, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পল্লী-বিশেষে তাঁহার জন্মস্থান। আমরা গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র কন্যাটি সহাস্য বদনে "আমার কি সৌভাগ্য, আজ কত আনন্দ,আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি!" হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে এই রূপ বলিতে বলিতে অগ্রসর হইলেন। স্নেহভাজন কন্যাগণসম্বন্ধে আমরা সময়ে সময়ে কিছু কিছু লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। রক্ত মাংসসম্বন্ধে আমরা কন্যা-বিহীন এবং বহু বৎসর হইতে মাতৃহীন, কিন্তু ভগবানের কৃপায় নানা স্থানে স্বদেশে বিদেশে অনেক তরুণবয়স্কা কন্যা ও মাতার আদর ও যত্ন পাইতেছি। আমাদের আর এ বিষয়ে অভাব কিছুই নাই। কেহ আমাদিগকে আদর করিয়া পিতা কেহ বা জ্যেঠা মহাশয় বলেন,এবং নানা প্রকারে ভালবাসা প্রকাশ করেন। এ জন্য আমরা সুখী ও সৌভাগ্যশালী। এই স্নেহের কন্যাসম্বন্ধে এস্থলে কিছু লিখিতে বাধ্য হওয়া গেল।

সীতাপুরস্থ এই কন্যাটীর আদর যত্নের কথা কি লিখিব? আমরা যে যে ব্যঞ্জন খাইতে ভালবাসি তাহার অনুসন্ধান লইয়া দুই বেলা তিনি সযত্নে স্বহস্তে তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন, এবং বলিতেন, বলুন "আপনি কি খাইতে ভালবাসেন।" তখন বাজারে ভাল তরকারি পাওয়া

যাইতে না বলিয়া তাঁহার বড় আক্ষেপ ছিল, নারীকেলের অভাবে ইচ্ছানুরূপ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে পারিতেছিলেন না বলিয়া দুঃখিত ছিলেন। ইতিমধ্যে আমাদের জামাতা (গৃহস্বামী) স্বদেশ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নিকটে কয়েকটি নারীকেল পাইয়া কন্যার আনন্দের সীমা রহিল না। তখন গ্রীষ্মকাল ছিল, (তীব্র গ্রীষ্ম ছিল না) কন্যাটী সর্ব্বদা পার্শ্বে বসিয়া বীজন করিতেন, যখন কার্য্যান্তরে লিপ্ত থাকিতেন ভৃত্যের প্রতি বা পুত্র কন্যার প্রতি সেই ভার অর্পণ করিতেন। তাঁহার একটি পুত্র ও একটী কন্যামাত্র। দুইটিরই অল্প বয়স। আমরা দিবা ভাগে আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ নিদ্রাগত হইয়াছি, মা যেমন গ্রীষ্মকালে নিদ্রিত শিশু সন্তানের পার্শ্বে বসিয়া তাহার সুখনিদ্রার জন্য বাজন করিয়া থাকেন সেই-রূপ স্নেহের কন্যাটী আমাদের শয্যার পার্শ্বে বসিয়া বাজন করিতেন। আমরা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি; ঠিক যেন স্নেহময়ী পবিত্র মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি। তিনি প্রতিদিন নিজের বালক দ্বারা সুগন্ধি পুষ্পহারে আমাদের কণ্ঠদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রিয়তমা কন্যার সেবা যত্নে আমরা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম। নিষেধ করিলেও মানিতেন না। কেন যে তিনি এত আদর যত্ন করিতেন আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইতাম। আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয় এই ছিল যে, তিনি প্রত্যহ আমাদের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবানের পূজায় যোগদান করিয়াছেন, ধর্ম্ম কথা বলিয়াছেন, নিজের জীবনের অভাব ও পরীক্ষা সকল মুক্তকণ্ঠে জানাইয়াছেন। হিন্দু পরিবারে বাস করিয়া সত্যরক্ষার জন্য তাঁহাকে অনেক সংগ্রাম করিতে এবং গঞ্জনা নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। সম্প্রতি তিনি যে আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল, তাঁহার ভালবাসা যে কত দূর তাহাতে প্রকাশিত হইবে।

"ধর্ম্মতত্ত্বে আপনার টাকার বিষয় পড়িয়া কষ্ট অনুভব করিলাম। টাকার জন্য আপনি আসিতে পারিতেছিলেন না। আমরা আপনার কিছুই করিতে পারি নাই। আপনার কষ্টের বিষয় অবগত হইয়া প্রাণে বড়ই কষ্ট বোধ হয়। যাহা হউক পরমমঙ্গলময়ের চরণে ধন্য বাদ যে, তিনি আপনাকে সর্ব্বদা চখে চখে রাখিয়া আপনার অভাব পূরণ করিয়াছেন।

"আপনাকে আমি অত করিয়া লিখিতে জানি না, তবে জ্যেঠামহাশয়, মনের যে ভাব তাহা যেন না লিখিয়া থাকা যায় না। বলিতে কি আপনাকে পাইয়া আমরা বড় উপকৃত হইয়াছি। দয়াময় পরমেশ্বর আপনাকে আরও কিছু দিন এই পৃথিবীতে রাখুন; এই প্রার্থনা করি। যখনই আপনার বিষয় ভাবি মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। * * * আপনার স্নেহ দয়ায় আমরা মোহিত হইয়াছি। পরম করুণাময়ের করুণায় আমরা এমন স্নেহময় জ্যেঠামহাশয় পাইয়াছি যে, আপনার কথা ভাবিলে প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। আপনি আমাদের অসংখ্য ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।" "আপনার বড় মেয়ে মা—"

কন্যাটী ক্ষীণাঙ্গী চিররুগ্না। সম্প্রতি জামাতা গুরুতর সাঙ্ঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণ একটু ভাল। টেলিগ্রাফ পাইয়া কন্যার পিতৃদেব সেখানে গিয়াছেন। তথাকার হাস্‌পাতালের ভারপ্রাপ্ত সুযোগ্য আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার শশী বাবু তাঁহাদের পরম বন্ধু, তাঁহার সুচিকিৎসায় অনেক সুফল হইয়াছে।

সীতাপুর হইতে নৈমিষারণ্য ২৪ মাইল দূরে পশ্চিম প্রান্তে। ইহা হিন্দুদিগের পরম তীর্থ। মহাভারতাদি পুরাণ শাস্ত্রে নৈমিষারণ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা পবিত্র তপোবন বিশেষ। শ্রী ব্যাস দেব নৈমিষারণ্যে তপস্যা করিয়াছিলেন; সেখানে স্থিতি করিয়াই সুবিস্তীর্ণ মহাভারত পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য সূতমুনির আশ্রম ও নৈমিষারণ্যে ছিল। মহারাজ মনু এবং রাণী সত্যরূপা উক্ত তপোবনে তপস্যা করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবও কিছুকাল নৈমিষারণ্যবাসী হইয়াছিলেন। তথায় অনেক সাধু তপস্বীর আশ্রম ছিল। গোমতী তীরে আম্র কাননে সে সকলের কতক গুলি নিদর্শন এবং কতগুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতিবৎসর নানা দূর দেশ হইতে সহস্র সহস্র যাত্রিক নৈমিষারণ্য তীর্থে গমন করিয়া থাকে। এই প্রসিদ্ধ তীর্থের সঙ্গে রেলওয়ের যোগ নাই। সীতাপুর হইতে রেলওয়ে বিস্তারের উদ্যোগ হইয়াছে। এক্ষণ যাত্রিকদিগকে পদব্রজে বা গোশকটে কিংবা একা যোগে যাইতে হয়। সীতাপুর হইতে এবং সব ডিভিজন-সাণ্ডিলা হইতে ও হরদুই নগর হইতে নৈমিষারণ্যে যাওয়ার প্রশস্ত পথ আছে। সাণ্ডিলা ও হরদুই নগরেও Railway ষ্টেশন বিদ্যমান। সাণ্ডিলা হইতে নৈমিষারণ্য সীতাপুরের তুল্য পথ ২৪ মাইল দূরে, হরদুই হইতে এতদপেক্ষা কিছু অধিক দূরে। সীতাপুর হইতে যাইতেই অধিকতর সুবিধা। কেন না রাস্তায় ২।৩ স্থানে বিশ্রামের স্থান আছে। অধিকাংশ পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী ছায়া বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

১০ই বৈশাখ রাত্রি ৪টার সময় একটি বৃহৎ গো শকটারোহণে নৈমিষারণ্যে যাত্রা করা স্থির হয়। কন্যাটী যাত্রার সমুদায় ব্যবস্থা করেন, দুই তিন দিনের ভোজনের ও জল খাওয়ার সামগ্রী এবং বাসনপত্রাদি সঙ্গে দেন। তিনি গুরুওয়ারে নামক প্রভুভক্ত সুচতুর পরিশ্রমী বিশ্বস্ত ভৃত্যকে আমাদের সঙ্গে যাইবার জন্য নিযুক্ত করেন, আমাদিগকে বলেন, কোন বিষয় ভাবিতে হইবে না, সকল কার্য্য আপনার ইঙ্গিত মতে গুরুওয়ারে নির্ব্বাহ করিবে। নৈমিষারণ্যে যাহা দর্শন করিবার এই চাকরই স্বয়ং দর্শন করাইবে। পাণ্ডার সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না। যাত্রার প্রাক্‌কালে রাত্রি ৩টার সময় গৃহস্বামী স্বদেশ হইতে প্রত্যাগত হন। তিনি চাপরাসী শ্রেণীর এক জন সবলকায় পুরুষকে আমাদের সঙ্গে যাইতে অনুমতি করেন, এবং আমাদিগকে বলিলেন, আত্মারাম পাণ্ডার গৃহে আপনারা স্থিতি করিবেন, তথায় সযত্নে থাকিবেন।

প্রাতঃকালে ৬মাইল অন্তর রামকোট নামক স্থানে উপনীত হওয়া যায়। এই স্থানে এক জন বড় জমীদার বাস করেন। আমরা রামকোট হইতে ১০মাইল দূরে মিশ্রী নামক স্থানে মধ্যাহ্ন কালে উপস্থিত হই। মিশ্রী সীতাপুরের সবডিভিজন, এক প্রান্তে দধীচি মুনির আশ্রম, উহা তীর্থবিশেষ। এখানেও অনেক গুলি পাণ্ডা বাস করে। চারি কুল পাথরে বাঁধা একটি সুরম্য বৃহৎ সরোবরের উত্তর ও পূর্ব্ব কূলে অনেক গুলি বড় বড় মন্দির দৃষ্ট হইল। সরোবরের জল কদর্য্য, পাণ্ডা সেই জলে আমাদিগকে স্নান করিতে বলিল। আমরা তাহা হস্তে স্পর্শ করিতেও সম্মত হইলাম না। একটি গৃহে মহান্ত দেবের গদি দৃষ্ট হইল। তখন তিনি আহ্নিক করিতেছিলেন। দধীচি মুনির আশ্রমে চৈত্র নবমীতে মহাঘটা করিয়া তিন মন ঘৃতযোগে হোম হয়। হোমকুণ্ডে হোমাবশেষের পুঞ্জীভূত ভস্ম দৃষ্ট হইল। পুরাণে এরূপ উল্লিখিত আছে যে, অসুরসংহারার্থ বজ্রনির্ম্মাণের জন্য দধীচি মুনি নিজের অস্থি দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। দধীচির আশ্রমপদের পার্শ্বে পথপ্রান্তে বৃক্ষতলে বসিয়া লুচি তরকারি মিষ্টান্নাদি যোগে জলযোগান্তর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া যাত্রা করা যায়। ১২টি গ্রামের উপস্বত্বে দধীচি মুনির আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

শুনিলাম নৈমিষারণ্যে সাত শত পাণ্ডা যাত্রিকদিগের রক্তশোষণ করে। পথে অনেক পাণ্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তাহাদের হাত এড়াইয়া আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৈমিষারণ্যে পঁহুছিয়া আত্মারাম পাণ্ডার গৃহে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদিগকে আদরপূর্ব্বক স্থান দান করিলেন। রাত্রিতে তাঁহার স্ত্রী আমাদিগ হইতে চাউল ডাইল তরকারী প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া তাহা রন্ধন পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা আত্মারামের সঙ্গে তথাকার দর্শনীয় সকল দর্শন করিতে গেলাম। প্রথমতঃ এক উচ্চ ভূমিতে পুরাতন বৃহৎ মন্দিরের ভিতরে ভীমকায় বিশাল হনুমান মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। পরে পাণ্ডা পঞ্চ পাণ্ডবের পাষাণময় দুর্গের ভগ্নাবশেষ ও জীর্ণ তোরণ এবং একটি নবনির্ম্মিতমন্দিরে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবের প্রতিমূর্ত্তি, একটি পুরাতন কূপ আমাদিগকে প্রদর্শন করেন। আত্মারাম বলিলেন,তিথিবিশেষে কূপের অর্দ্ধাংশ জল লবণাক্ত অর্দ্ধাংশ সুমিষ্ট হইয়া যায়। গোমতীতীরে কোন কোন সাধু তপস্বীর গুফা ও সাধনক্ষেত্র এবং ব্রহ্মাবর্ত্ত ও গঙ্গোত্রী প্রভৃতি কুণ্ড দর্শন করিয়া ব্যাসাশ্রমে যাওয়া যায়। সেখানে অতি পুরাতন সুবিশাল নিমতরুর মূলে ব্যাসদেবের সমাধি, তাহার অদূরে রাজা মনু ও রাজ্ঞী সত্যরূপার সমাধি প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। তৎপর আমরা সূত মুনির, আশ্রম,ললিতা দেবী ও বিমলা দেবীর মন্দির পরস্পর সন্নিহিত আরও কতক গুলি দেবমন্দির এবং দুই একটি রমণীয় সরোবর দর্শন করি। যে স্থানে এই সকল দেবমন্দির বিদ্যমান, তাহাকে চক্রতীর্থ বলে। এই চক্রতীর্থে ললিতা দেবীর বিশেষ প্রাধান্য।

তাহার গলদেশে সকল সাত্ত্বিক শ্বেত সুগন্ধ কুসুমের মালা অর্পণ করিয়া থাকে। আমরাও পুষ্পমালাদানে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অনুরোধ রক্ষা করি নাই। নৈমিষারণ্যের অধিকাংশ স্থান নিবিড় আম্রকাননের শীতল ছায়ায় আচ্ছন্ন। সেই আম্রকাননে প্রতিমাসে অমাবস্যা তিথি উপলক্ষে বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। সেই মেলায় নানা স্থান হইতে ৫০।৬০ সহস্র লোক আসিয়া সমবেত হয়। তদ্ভিন্ন আরও দুইটি পর্ব্বাহোপলক্ষে বৃহৎ মেলা হয়। প্রতিবৎসর চৌদ্দটি বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। আম্রকাননের ইতস্ততঃ কতক গুলি সবৎসা গাভী বিচরণ করিতেছে দৃষ্ট হইল। আত্মারাম বলিলেন, এই সকল গো কোন গৃহস্থের নহে। ইহাদের রক্ষক কেহ নাই। ইহারা অরণ্যচারী গো। নৈমিষারণ্যের অরণ্যদর্শনে স্বভাবতঃ মনে হয় যে, এই স্থান এক সময় পবিত্র তপোবন ছিল। এই অরণ্যে ঘন-সন্নিবিষ্ট আম্রতরুই অধিক। অশ্বথ নিম্ব বৃক্ষেরও অভাব নাই। ইতিপূর্ব্বে বহুদূরব্যাপী নানা জাতীয় বৃক্ষের বৃহৎ অরণ্য ছিল, তন্মধ্যে নীলগাও হরিণ ইত্যাদি পশু বিচরণ করিত, এক্ষণ অধিকাংশ আবাদ হইয়া গিয়াছে। নৈমিষারণ্যের সুদূরব্যাপী নিবিড় আম্রকানন শীতল ছায়াপ্রদ, তাহার নিম্নদেশ পরিষ্কৃত। সহস্র সহস্র যাত্রিক সেই কাননে প্রযুক্ত স্থানে সুখে বাস করিতে পারে। কিন্তু এই স্থানে মর্কটের বড় দৌরাত্ম্য। নৈমিষারণ্যে যাইবার পথে সর্ব্বত্র তরুমূলে ও তরুশাখায় দলে২ শাখামৃগ বিহার করিতেছে দৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত তীর্থভূমির দর্শনীয় দর্শন করিয়া আত্মারামের গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময়ে কতক গুলি ভিখারী বালক বালিকা আমাদের সঙ্গী হইয়াছিল। তাহাদিগকে ২।১ পয়সা দান করিয়া বিদায় করা যায়। বিদ্যাশঙ্কর নামক একজন মান্দ্রাজী যুবা ভিক্ষার্থী হইয়া আত্মারামের গৃহে আমাদের নিকটে উপস্থিত হন। তিনি উচ্চ বেতনে একজন স্কুলমাষ্টার ছিলেন; বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধনজন্য নৈমিষারণ্যে বাস করিতেছেন। তাঁহাকে একটি আধুলি দেওয়া যায়। তাহা পাইয়া তিনি আনন্দিত হইয়া ধন্যবাদ দান করিয়া চলিয়া যান।

নৈমিষারণ্যের চিড়া প্রসিদ্ধ। লক্ষ্ণৌ নগরস্থ আত্মীয়দিগের নিকটে আমরা উহার প্রশংসা শুনিয়াছিলাম। সেই দিন পূর্ব্বাহ্ণে অন্ন ভোজন না করিয়া দধি চিড়ায় ফলার করা গিয়াছিল। চিড়া কিছু নূতন রকমের। তাহা অতিশয় শুভ্র ও চেটাল, এবং হাল্‌কা। এক একটি চিড়া, অপর ৮।১০টী চিড়ার ন্যায় বৃহৎ হইবে। খাইতে তত সুস্বাদু বোধ হইল না। কতক গুলি চিড়া সঙ্গে আনাইয়াছিল। কলিকাতায় লইয়া আসিব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু লক্ষ্ণৌ নগরের আত্মীয়েরা আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া সমুদায় আত্মসাৎ করেন। আমরা তথা হইতে চলিয়া যাইবার সময় কিছু চিড়া চাহিয়া লইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

আমরা বেলা ১০টার সময় আত্মারামের আশ্রম হইতে সীতাপুরাভিমুখে

যাত্রা করি। আত্মারাম সস্ত্রীক আমাদিগকে অতিশয় আদর যত্ন করিয়া নিজ গৃহে স্থান দান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভদ্রতা ও সৌজন্যে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাঁহারা আমাদের সামান্য দানে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে রামকোট পল্লীতে উপনীত হইয়া তথায় নিশাযাপনের ব্যবস্থা করি। সঙ্গের ভৃত্য শুরুওয়ারের শ্বশুর বাড়ী সেই স্থানে। সে আমাদিগে তথায় লইয়া যায়, ভোজন ও শয়নের বন্দোবস্ত করে।

রামকোটে মহাকীর্ত্তিশালী ব্রাহ্মণ জমীদার কালিকা ভকত ঠাকুরের বাসভবন। তাঁহার কীর্ত্তি ও বাসগৃহ প্রদর্শন করিবার জন্য শুরুওয়ারে আমাদিগকে লইয়া যায়। চারি কুল ইষ্টকে বাঁধা রমণীয় সরোবর, দেবমন্দির এবং উদ্যানের এক পার্শ্বে স্থাপিত কয়েকটি বিশালকায় ভীমমূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। কালিকা ভকতের প্রধান কার্ত্তি "লাক্ পেরে" নামক লক্ষ আম্র তরুর নিবিড় উদ্যান। উহা প্রায় এক মাইল স্থান ব্যাপী। রামকোট পার হইয়া সেই আম্র কাননের ভিতর দিয়াই নৈমিষারণ্যে যাইতে হইয়াছিল। উক্ত উদ্যানের ফল কালিকা ভকতের নিজের বা নিজের পরিবারের ভক্ষণের জন্য নয়, বিক্রয়ের জন্যও নয়। শাখাচ্যুত সুরস সুগন্ধ ফল পথিক যাত্রিকগণ ও পশু পক্ষী সকল স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করিবে, এই উদ্দেশ্যে এই সুবৃহৎ উদ্যান নির্দ্দিষ্ট। সে দেশে অসংখ্য আম্রবৃক্ষ। কিন্তু কিয়দ্দিন পূর্ব্বে কয়েক দিন ব্যাপিয়া তুষারপাত হওয়াতে সমুদায় আম্র তরুর শাখা প্রশাখা ও পল্লব যেন অগ্নি-দগ্ধ হইয়া শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। আসিবার সময় রেলওয়ের উভয় পার্শ্বে আম্রতরু সকলের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া এরূপ কেন হইল আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। পরে ইহার কারণ অবগত হই। কালিকা ভকত ঠাকুরের অন্যতর কীর্ত্তি, রামকোট হইতে মিশ্রি সবডিভিজন পর্য্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে অর্দ্ধ মাইল বা এক মাইল অন্তর পথিকদিগের স্নান ও পানের জন্য বড় বড় কূপ খনন এবং গোমেষছাগাদি পশুযূথের পানের জন্য জলপূর্ণ জলাধার স্থাপন। তদ্ভিন্ন তাঁহার অনেক সৎকার্য্য ও অনেক প্রকার দান ধর্ম্ম ছিল। বহুকাল হইল তিনি স্বর্গগত হইয়াছেন। তাঁহার তিন পৌত্র বিদ্যমান। তাহারা তিন ভ্রাতা পরস্পর বিবাদ কলহ ও মোকদ্দমা করিয়া উৎসন্ন হইয়াছে। এত ঋণ হইয়াছে যে, সমুদায় জমিদারী বিক্রী হইলেও তাহা পরিশোধ হয় কি না সন্দেহ। সীতাপুরের কালেকটর সাহেব মধ্যস্থ হইয়া এই অপাত্রদিগের বিবাদ মিটাইবার জন্য যত্ন করিতেছেন।

শুরুওয়ারে এক জন ব্রাহ্মণ ধরিয়া আনিয়া আমাদের জন্য অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধনে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। অন্ন প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া পল্লীর একটী স্ত্রীলোক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; "ক্যা ভাত খানেছে কভি পেট ভর্‌তা ?" সে দেশের লোকের সংস্কার যে, মোটা মোটা রুটি না খাইলে পেট ভরে না। আহারান্তে তর-

তলে খাটিয়ার উপর শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করা যায়। নিশাবসান না হইতেই যাত্রা করা হয়। পরদিন বেলা ৮টার মধ্যেই আমরা সীতাপুরে উপনীত হই। নৈমিষারণ্যে গমন ও তথা হইতে সীতাপুরে প্রত্যাগমনের সমুদায় ব্যয় স্নেহের কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন। এ দিকে তাঁহার সাংসারিক স্বচ্ছলতা কিছুই নয়।

কিয়দ্দিন পূর্ব্বে প্রিয়তমা কন্যার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরলোক হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত তিনি এই শোক-সংবাদ শ্রবণ করেন নাই। জামাতার উপস্থিতিমতে এই দুঃসংবাদ জানান হইবে এরূপ স্থির করা হইয়াছিল। সীতাপুরে প্রত্যাগমনের এক দিন পরে অপরাহ্নে তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া জ্ঞাপন করা হয়। তিনি শোকসন্তপ্ত হইয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করেন, অস্থিরতা প্রকাশ ও আর্ত্তনাদ করেন না। পরে আমাদের নানা প্রকার সান্ত্বনাবাক্যে শান্তি লাভ করেন।

এক্ষণ সীতাপুর নগরের বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া উপসংহার করা যাইতেছে। নগরটি ক্ষুদ্র, কিন্তু পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন। নগরের লোক-সংখ্যা ১৬ হাজার মাত্র। রাজপথ প্রশস্ত, পথপ্রান্তে সুবিশাল পাদপশ্রেণী ছায়া বিস্তার করিয়া আছে, বিটপিপুঞ্জ-বিহারী বিবিধ বিহঙ্গকুল কূজনে প্রাতঃ সন্ধ্যা কর্ণকুহর অমৃতসিক্ত হয়। আমাদের দেশে আম্র ফল প্রচুর জন্মে, এবং তাহা অত্যুৎকৃষ্ট। আরব দেশে অগণ্য খোর্ম্মা ফলের উদ্যান। সে দেশের লোকের নিকট খোর্ম্মা অতিশয় প্রিয় ও আদরণীয়। আরব হইতে আনীত শুষ্ক খোর্ম্মা ফলের স্বাদ আমরা গ্রহণ করিয়াছি। সীতাপুরে খোর্ম্মা বৃক্ষ নূতন দেখা গেল। পরে পেশওয়ারেও খোর্ম্মা তরু দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। উহা খর্জ্জুর জাতীয় বৃক্ষ। সীতাপুরের ক্রিকেট বাগ ও কোম্পানির বাগ দর্শনযোগ্য। ক্রিকেট বাগের পার্শ্বে তুলসীদাস নামক সাধুর সমুচ্চ পাদপশ্রেণীসমাচ্ছন্ন রমণীয় আশ্রম। সে স্থানে তাঁহার ও তাঁহার গুরু মুরলীদাসের সমাধি বিদ্যমান। আশ্রমস্থানটি অতিশয় মনোমুগ্ধকর ও সাধনভজনের উপযুক্ত ভূমি। নগরের উত্তর প্রান্তে একটী ক্ষীণ তোয়া নদীর কূলে উন্নত ভূমিতে নানক পান্থী মহাত্মা গোপাল দাস বাবার আশ্রম। তিনি স্বর্গগত,তাঁহার প্রতি লোকের অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি। তাঁহার কতিপয় অনুগামী সে স্থানে বাস করেন। সেই আশ্রমে সুন্দর কোটাবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। নগর হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিম প্রান্তে একটি সমুচ্চ সুরম্য দেব মন্দির, চারি কূল পাথরে বাঁধা সুন্দর সরোবর ও তৎসংলগ্ন পান্থশালা বিদ্যমান। তাহার এক পার্শ্বে প্রসারিত প্রান্তর, অপর পার্শ্বে বিশাল বৃক্ষ শ্রেণী দর্শকবৃন্দের নয়ন মন হরণ করে। সীতাপুরের সাধারণ প্রবাসী লোকের বিশ্রামের জন্য ব্যবস্থিত পান্থনিবাস (সরাই) অতিশয় বিস্তৃত। নগরের দক্ষিণ প্রান্তে প্রসারিত মাঠ, মাঠের পূর্ব্ব প্রান্তে সেনানিবেশ। এখানে ঘোড়ার গাড়ী, একা ও বয়লী সচরাচর ভাড়া পাওয়া যায়, ভাড়াটিয়া উটের গাড়ীরও অভাব

নাই। সাধারণ অরোহিবর্গ সহ মটর গাড়ীও চালিত হয়। ৮৯০ জন মাত্র বাঙ্গালী বাবু এখানে বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে বাস করেন। সাধারণ হিতকর কার্য্যে তাঁহাদের কোন উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায় না। শুনিয়াছি তদ্দেশীয় ধনী ব্যবসায়ী মহাজনগণ জনহিতার্থে মুক্ত হস্ত।

১৭ই বৈশাখ রবিবার আমরা মাধ্যাহ্নিক ভোজনান্তে লক্ষ্ণৌ নগরে যাত্রা করি। তখন স্নেহের কন্যার মুখমণ্ডল বিষাদ কালিমায় মলিন হয়। বিদায় কালে তিনি বলিতে লাগিলেন, "আজ আমার পক্ষে চারি দিক্ অন্ধকার" পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সময় তিনি সীতাপুর হইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। গৃহস্বামী ষ্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইয়া টিকিট ক্রয় করিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দেন। আমরা অপরাহ্ণে লক্ষ্ণৌ নগরে প্রত্যাগত হই।

স্ত্রীলোকের অবরোধপ্রথা।

আমরা ইতি পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, অনেক ভদ্রঘরের মোসলমান মহিলা বোর্কা-নামক অবগুণ্ঠনবিশেষে আচ্ছাদিত হইয়া পেশওয়ার নগরের জনাকীর্ণ রাজপথে ও বাজারের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন দৃষ্ট হইয়াছে। বোর্কা পরিহিত মহিলাদিগকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই সকলকে দেখিতে পারেন। সে দিন হদিস শাস্ত্র মেস্কাতশরিফের বঙ্গানুবাদ করিতে যাইয়া এই রূপ হদিস পাওয়া গেল;—স্ত্রীজাতির সুদৃঢ় অবরোধপ্রথার প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মোহম্মদ এক দিন গৃহে বসিয়া আছেন, তাঁহার নিকটে ওম্মসোলমা ও ময়মুনানাম্নী তাঁহার পত্নীদ্বয় উপবিষ্ট, এমন সময় তাঁহার প্রিয় সহচর এবন ওম্ম-মক্তুম (ওম্ম মক্তুমের পুত্র) সেখানে উপস্থিত হন। তিনি অন্ধ ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উক্ত মহাপুরুষ ওম্ম-সোলমা ও ময়মুনা দেবীকে বলেন, "এক জন পুরুষ আসিলেন, তোমরা শীঘ্র সরিয়া যাও।" এই কথা শুনিয়া ওম্ম সোলমা বলেন, "এ যে অন্ধ, এ তো আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না। আমরা কেন লুক্কায়িত হইব।" তিনি বলিলেন, "এ তোমাদিগকে দেখিতে পাইবে না সত্য; কিন্তু ইহার উপর তোমাদের দৃষ্টি তো পড়িবে।" কি জানি কোন বেগম বা কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টি করিবার সুযোগ পান, এই আশঙ্কায় বাদশা, নবাব ও আমিরগণের অন্তঃপুরে উচ্চ প্রাসাদ—দ্বিতল প্রসাদ নির্ম্মাণ করার নিয়ম নাই। অন্তঃপুর সমুচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করা হয়। এ দেশের হিন্দু মহিলারা মোসলমান মহিলাদিগের অনুকরণে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া অন্তঃপুরে বাস করেন। কিন্তু বাড়ীতে অন্য পুরুষের সমাগম হইলে গবাক্ষপথে, চিক্ বা পরদার আড়াল দিয়া তাঁহারা উকি মারিয়া দেখেন। বাহিরের কোন পুরুষ তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। হিন্দু মহিলারা বোর্কা পরিধান করেন না। অপর পুরুষের নিকট দিয়া তাঁহাদের গমন করা আবশ্যক হইলে, সাধারণ অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত হইয়া

গমন করেন। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার জ্ঞান সভ্যতাসমুন্নত মহিলাগণ কোনরূপ অবগুণ্ঠন ও আবরণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না, তাঁহারা প্রমুক্ত ভাবে পুরুষমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গাদি করেন; অপিচ সময়ে সময়ে পরপুরুষের সঙ্গে নৃত্যও করিয়া থাকেন। আমরা পরদার সম্পূর্ণ সপক্ষ বা বিপক্ষ নহি। পরদার প্রয়োজন আছে, আবার অবস্থাভেদে অপ্রয়োজন, ইহা স্বীকার করি। এদেশের হিন্দু ও মোসলমান মহিলাদিগের পরদা এবং বিলাতের মহিলাদিগের সম্পূর্ণ প্রমুক্ত ভাব, এ দুইই অস্বাভাবিক, এই দুইয়ের মধ্য-পথ অবলম্বন আবশ্যক।

মহিলাদিগের রচনা।

সিন্ধু-দর্শনে।

সুদূরে ছুটিয়া, সংসারভুলিয়া,
কিসের সঙ্গীত উঠেছে অই?
বিরলে বসিয়া, কহিছে স্বনিয়া,
সকলি অসার বিধাতা বই।
কত দিন হ'তে অনন্ত বক্ষেতে
উঠিছে গম্ভীরে গভীর তান
মানব সন্তান তবুও সে তান
শোনে না বোঝে না প্রাণের গান।
কত দিন হায়! সংসার মায়ায়
রহিবে মানব জড়িত হইয়া
কত দিন আর "সংসার" "সংসার"
করিবে চীৎকার তাঁরে ভুলিয়া।
সিন্ধুর সঙ্গীত হয়ে অবহিত
শুন হে মানব, শুন একবার
সংসার অসার কহে বার বার
একমাত্র তিনি জীবনের সার।

বাঁকিপুর। শ্রীসু—

ভারতমাতার প্রতি।*

(কাঁদ।)

হা মাতঃ ভারত একি দশা তোর?
হেরিয়া দুর্দ্দশা প্রাণ কাঁদে মোর!
প্রিয় জন্মভূমি! ভারত আমার
আসিবে কি আর? আসিবে কি আর?
সেই সব পুত্র ধর্ম্মকর্ম্মবীর
মহাত্মা বিদুর রাজা যুধিষ্টির?
আর সেই তপো নিষ্ঠ মুনি ঋষিগণ
বীরত্বের চূড়ামণি ক্ষত্রিয়-তপন?
সত্যপ্রিয় সেই রাজা দশরথ
তাঁহার সদৃশ আরো কত শত।
প্রাণ যায় তবু প্রতিজ্ঞাপালনে
বিমুখ কখন হন নি জীবনে॥
কাঁদ মা ভারত কাঁদ যত পার
সেই সব পুত্র আসিবে না আর।
হা মাতঃ ভারত বীর-প্রসিবিনি।
কোথা তোর সে সব পুত্র গুণমণি?
স্বদেশের তরে ত্যেজেছে পরাণ
কোথা সেই সব রাজ-সুত গণ?
পাপের অনলে দেশ গেল জ্বলে
কাঁদ মা ভারত ভাসি অশ্রু জলে।

---

* পূর্ব্ব সংখ্যায় যে বালিকার পদ্যরচনা প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা তাঁহাকর্ত্তৃক রচিত।

ধন গেল বুদ্ধি গেল, গেল যশ মান
শেষে কি মা টানা টানি লইয়া পরাণ।
কাঁদ মা কাঁদ মা কাঁদ যত পার
সে সব ঐশ্বর্য্য পাবে নাক আর॥

(কেঁদনা)

উঠ মা জননি, কেঁদ নাক আর
ছাড় শোক শয্যা ছাড় গো তোমার।
বল মা জননি, বল মা আমার
জাগ বৎসগণ ঘুমায়ো না আর।
যদিও তোমরা মোর অযোগ্য তনয়
তথাপি মায়ের স্নেহ ভুলিবার নয়।
অলসে ঘুমায়ে তাই রয়োনাক আর
উঠ উঠ বৎসগণ উঠ হে আমার।
কে বলে ভারত মাতা দীন হীন
এত পুত্র যার সে কি কভু দীন?
বল মা ভারত বল মা সবারে
জলন্ত বচনে বল রে বল রে।
ধর বীর সাজ ধর পুত্রগণ
জননীর দুখ কর রে মোচন।
মাথা রাখ মোর ছুয়োনাক কেহ
পাপরাক্ষসের ও ভীষণ দেহ।
মজ না উহাতে মজ না কখন
রাখ পুত্রগণ মায়ের বচন।
দুখিনী মায়ের একটি বচন
রাখ বৎসগণ রাখ বৎসগণ।
এত কষ্ট করি পালিতেছি বক্ষে
আমার দুর্দ্দশা দেখিবেনা চক্ষে।
বল মা ভারত বল মা বারেক
জাগো পুত্রগণ জাগ রে যতেক
না হয়ে এমন পুত্র অকল্যাণ
দেখিব কেমনে রহিতে পরাণ।
ভূশয্যায় আর থেক না পড়িয়া
বাঁচিয়া থাকিতে নিৰ্জ্জীব হইয়া।
মনেতে উৎসাহ হৃদে বল লয়ে
এস পুত্রগণ আগুয়ান হয়ে।
এই জপমন্ত্র সবে কর রে মনন
'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।'"

একটী কন্যার ভ্রমণবৃত্তান্ত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আমরা আহারের পর একটু বিশ্রাম করিয়া সমুদ্রের ধার ও আরও অন্যান্য স্থান বেড়াইবার ও দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। এখানকার একজন ভদ্র লোক আমাদের সমস্ত দেখাইবার জন্য সঙ্গে চলিলেন।

প্রথমে সমুদ্রের ধারে বেড়াইয়া ছোট বড় সকলে মিলিয়া ঝিনুক কুড়াইতে লাগিলাম। যত দেখি ততই আরো কুড়াইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সমুদ্রের তীরে একটা উচ্চ স্থানে উঠিয়া সূর্য্যের অস্তগমন দেখিতে লাগিলাম। সে এক কি মনোহর দৃশ্য! যাহা দেখিলাম তাহা কখনও ভুলিব না। পরে বেড়াইতে বেড়াইতে ভক্ত হরিদাস বাবাজীর সমাধি শ্রী নানকের সমাধি ও ভক্ত শ্রী চৈতন্য দেবের লীলা স্থল ইত্যাদি সব দেখিলাম। রাবণ রাজার স্বর্গের সিঁড়ি অর্দ্ধ প্রস্তুত অবস্থায় দেখিলাম। একটি খুব গভীর বড় কূপ দেখিলাম। পরে মন্দিরের ভিতর বাজার প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে বাসায় ফিরিলাম। একটু বিশ্রামাদি করিয়া কিছু জলযোগের পর শয়ন করা হইল। পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃ-

কৃত্য শেষ করিয়া সকলে মিলিয়া সমুদ্রের ধারে সেই ভূমা মহান্ জগন্নাথের চরণ অর্চ্চনা বন্দনা করিবার জন্য গমন করিলাম। সেখানে একটি তাঁবুতে এক জন বন্ধু ছিলেন। সেই তাঁবুতে উপাসনায় বসা হইল। উনি উপাসনা করিলেন; সকলেই প্রার্থনা করিলাম। অসীম সমুদ্রের গোঁ গোঁ শব্দে ও তরঙ্গের ছবিতে সেই ভূমা মহান্ অনন্ত পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তি মহিমা ও প্রেমমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। উপাসনার পর স্নান করিতে গেলাম। পূর্ব্বদিনের অপেক্ষা আজ ঢেউ আরো উচ্চ হইয়া আসিতেছিল। স্নান করিতে করিতে একবার অন্যমনস্ক ভাবে তাকাইয়া ছিলাম, হঠাৎ পড়িয়া গিয়া প্রবল তরঙ্গের স্রোতে খানিক দূর ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম, পরে অনেক কষ্টে উঠিলাম। যদি ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতাম তাহা হইলে এই প্রাণবিন্দু কোথায় কোন্ অনন্তের সহিত মিশাইয়া যাইত! স্নানের পর বাসায় আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া পুরীর মন্দির দেখিতে গেলাম। মন্দির প্রভৃতি দেখিয়া অন্ন ব্যঞ্জন কিনিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম জগন্নাথের মন্দিরে ঠাকুরের প্রসাদ বিক্রয় হয়, তাহাই কেনা হইল। সকলে মিলিয়া আহারাদি শেষ করা গেল। দুপ্রহরে খানিক ক্ষণ বিশ্রাম করা হইল। সে দিন রবিবার বৈকাল বেলা উপাসনার জন্য সমুদ্রের ধারে যাওয়া হইল। সেই তাঁবুতে বসিয়া উপাসনা হইল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব বাবু মহাশয় উপাসনা করিলেন। উপাসনান্তে বাসায় ফিরিলাম। পর দিন ভোর বেলা পুরী ছাড়িয়া চিল্কাহ্রদ দেখিবার জন্য রম্ভা ষ্টেশনে যাত্রা করি। ভোর বেলা ৬॥ টার সময় পুরী ষ্টেশন হইতে ট্রেণ ছাড়িল। ট্রেণ চলিতে চলিতে খানিক দূর গিয়া কিছু দূরে সেই ছোট বেলার ভূগোলে পড়া চিল্কাহ্রদ দেখা যাইতে লাগিল। ট্রেণে চলিতে চলিতে পথের দুই ধারের প্রকৃতির শোভা অবর্ণনীয় ও অতুলনীয়। একধারে অত্যাচ্চ আকাশভেদী পর্ব্বত শ্রেণী, অপর ধারে স্নিগ্ধ প্রশান্ত ঈষৎ নীল জলরাশি পূর্ণ সুবৃহৎ চিল্কাহ্রদ! কোন্ দিকে ফিরিয়া দেখিব ভাবিয়া পাইতে ছিলাম না। পাপী অবিশ্বাসী মনুষ্য সন্তানকে সেই বিশ্বপতির মোহন ছবি দেখাইবার জন্য প্রকৃতি বুঝি এই সুন্দর সাজে সাজিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! ধন্য সেই চিত্রকর! ধন্য তাঁহার চিত্র! চিল্কা অনেক দূরে দেখিতে দেখিতে ক্রমে ট্রেণের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সমস্ত পথ সেই সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় ১১টার সময় রম্ভা ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। সেখানে থাকিবার কোন স্থান ছিল না, কিন্তু নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যিনি তাঁহারই সেই অপার করুণায় আশ্রয়স্থান পাওয়া গেল। একটি ছোট মন্দিরের পার্শ্বে ছোট এক খানি চালা ঘর পাওয়া গিয়াছিল, কিছু সামান্য পয়সা ভাড়া দিয়া ২ঘণ্টার জন্য সেখানে থাকা হইল। সঙ্গে খাবার ছিল তাহাই সকলে মিলিয়া আহার করিলাম। তার পর ৩টার ট্রেণে উঠিয়া সন্ধ্যার ৬॥টার সময় কটকে উপস্থিত হইলাম,আমরা রাত্রি প্রায়

৭॥টার সময় বাড়ী আসিলাম। বিশ্বরাজের মংতীর্থ ভ্রমণ ও দর্শন করিয়া পরমানন্দে বাড়ী ফিরিলাম। ভগিনী ও তাঁহার সন্তানগণের সহিত কথা বার্তায় পরম সুখ ও আনন্দ অনুভব করিলাম। পরে কটকের নানা স্থানে ভ্রমণ ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া কতই সুখী হইলাম। এই রূপে সর্ব্বদাই দয়াময়ী জননীর অনন্ত করুণা সম্ভোগ করিতেছি। সেই মঙ্গলময়ের চরণে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করি। আশা করি আপনারা সকলে ঈশ্বর-প্রসাদে ভাল আছেন। আপনাদের শ্রীচরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করি। আমরা ভাল আছি।

শ্রীমতী সু—

সংবাদ।

বঙ্গ দেশের বহু লোক বিশেষ কারণে সমুত্তেজিত হইয়া বিলাতী দ্রব্যাদি ব্যবহার না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবেন, এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। তজ্জন্য নানা স্থানে বিরাট সভা ও বিরাট বক্তৃতা হইয়াছে ও হইতেছে। এই আন্দোলনের সময় মহিলারা মূল্যবান্ বিলাতী বিলাসদ্রব্য ব্যবহারে ও বিলাতী পরিচ্ছদপরিধানে এবং বিলাতী ভোজ্যভোজনে নিবৃত্ত হইয়া স্বদেশীয় ভদ্রোচিত দ্রব্য এবং ভোজ্য পরিচ্ছদাদির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিলে তাঁহাদের স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। আচার্য্য কেশব চন্দ্র এক জন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক লোক ছিলেন। তিনি বিলাতে যাইয়া দীর্ঘ কাল বাস করিয়াছিলেন, কখনও বিলাতী পোষাক পরেন নাই, বড় বড় লর্ডদের বাড়ীতে ও মহারাণীর প্রাসাদে ভোজনার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াও বিলাতী খানা খান নাই। সর্ব্বত্র তাঁহার জন্য নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তিনি বিলাতে ও স্বদেশে ধর্ম্মমন্দিরে ও গৃহে সর্ব্বদা স্বদেশী ভাব ও স্বজাতীয়তা রক্ষা করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র বিলাতে সাহেব বিবীদিগের সভায় তাঁহাদের ভোজ্যপরিচ্ছদের অস্বাভাবিকতা-বিষয়ে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এক্ষণ তাঁহার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ অনুগামীদিগের অনেকে বিলাতের ভূমি পদে স্পর্শ না করিয়েই সাহেবী পোষাক হ্যাট কোট পরিধান করেন, এবং সাহেবী খানা খান। বর্ত্তমান আন্দোলনের বিরাট সভায় কোন কোন স্বদেশপ্রেমিক বক্তা কি বিলাতী পোষাক পরিয়া "তোমরা বিলাতী দ্রব্য স্পর্শও করিও না, বলিয়া বক্তৃতাদি করেন নাই? কেশব চন্দ্রের প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, ব্রাহ্মিকা মহিলাগণ ঋষিকন্যাদিগের ন্যায় স্বজনে নির্জ্জনে ভক্তিভাবে একতন্ত্রিযোগে ভগবানের গুণ কীর্ত্তন ও নিভৃতে যোগাসনে বসিয়া যোগ ধ্যান করিবেন। সেই মহিলাদিগের অনেকে যোগভক্তিসাধনে বিরাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক বুট মুজা পরিয়া টী পার্টী ও গার্ডেনপার্টী এবং ইভিনিং পার্টিতে কেবল ছুটা ছুটী করিয়া থাকেন ও আমোদ গল্প করিয়া বেড়ান, ইহা দেখিয়া তিনি মনে বড় কষ্ট পাইয়াছেন।

মহিলার পাঠিকাগণ রুষজাপানের সুদীর্ঘকালব্যাপী ভীষণ সংগ্রামের তত্ত্ব অবগত আছেন। লক্ষ লক্ষ লোকের শোণিত পাত ও প্রাণনাশ এবং সহস্র সহস্র নগর গ্রাম উৎসন্ন হওয়ার পর সম্প্রতি উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। বিপুল সৈন্যসম্পৎশালী মহাগর্ব্বী রুষসম্রাট পরাজিত এবং সুনীতিপরায়ণ মহাপরাক্রান্ত জাপান সম্রাট্ সর্ব্বতোভাবে বিজয়ী হইয়াছেন। জাপান যুদ্ধব্যয়াদিপূরণ করিবার জন্য রুষের নিকটে তিন শত কোটী টাকা দাবি করিয়াছিলেন, রুষ তাহা দানে অসমর্থ হইয়াছেন। পরে জাপান রুষের নিকটে তদধিকৃত কতকগুলি রাজ্য চাহিয়াছিলেন, রুষ তাহাও দিতে পারেন নাই। অনন্তর জাপান তাহা হইতে সামান্য রাজ্যাংশ গ্রহণপূর্ব্বক সন্ধি করিয়া শান্তি স্থাপন করিয়াছেন। জাপানের প্রজাবর্গ ও বহু সৈনিক কর্ম্মচারী এই রূপ ত্যাগস্বীকারে অসন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মহা আন্দোলন এবং রাজ্যে অশান্তি উপস্থিত করিয়াছিল। জাপান গবর্ণমেণ্ট সকরুণ ব্যবহারে তাহাদিগকে অনেক শান্ত করিয়াছেন। পৃথিবীতে জাপানের অতুল বাহুবল, ধর্ম্ম ও নীতির বল, ক্ষমার বল চির প্রতিষ্ঠিত হইল। "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়।"

উড়িষ্যার গড়জাত রাজ্যবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ আমাদের এক জন সম্ভ্রান্ত আত্মীয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ;—

"আজ মহিলায় আপনার বোধ ভ্রমণ বৃত্তান্ত অতি সন্তোষের সহিত পাঠ করিলাম। দুই একটা স্থানগত ভুল তাহা আপনাকে জানাইতেছি।

"১৩ পৃষ্ঠা ;—টিকর পাড়া সাতকুশীয়ার পশ্চিম প্রান্তে স্থিত, পূর্ব্ব প্রান্তে নয়। যদিও সাতকুশীয়া গণ্ড সাধারণতঃ টীকর পাড়ার দুই মাইল পশ্চিম হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাতকুশীয়া পশ্চিমে টীকর পাড়া হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ব্বে বড়মুলনামক স্থানে শেষ হইয়াছে।

"মহানদীর বামে অর্থাৎ উত্তর কূলে ক্রমান্বয়ে আটমল্লিক, (গবর্ণমেণ্টের এলাকার) অঙ্গুল, নরসিংহপুর, বড়ম্বা টিগিরিয়া এবং আটগড় (অষ্ট দুর্গ) রাজ্য। ধবলেশ্বর আটগড়ের অন্তর্গত। ডেঙ্কালন মহানদী হইতে দূরে অবস্থিত।

"টীকর পাড়ার নিকট মহানদীর উভয় পারে দুই দুইটি করিয়া চারিটি পর্ব্বতশৃঙ্গ আছে। তাহার এক একটিকে প্রহরী (Senti nel) বলিলেও হয়। দক্ষিণ পারের একটি বৌধ এবং অন্যটি দাসপাল্লার অন্তর্গত, আর উত্তর পাড়ের দুইটি আটমল্লিক এবং আঙ্গুলের অধীন। অতএব টীকর পাড়ায় চারিটি রাজ্যের সীমানা।"

আমরা শ্রীমতী হামিদা দেবীর প্রেরিত প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছি। উহা সুদীর্ঘ, এজন্য এবার স্থানাভাবে প্রকাশ করা হইল না।

পূজার ছুটী নিকটবর্ত্তী, এই সময়ে যন্ত্রালয়ের কর্ম্মচারীদিগকে মাহিয়ানা চুকাইয়া দিতে হয়। গ্রাহক গ্রাহিকাগণ দয়া করিয়া অন্ততঃ পূর্ব্ব বৎসরের দেয় মূল্য অবিলম্বে প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগকে উপকৃত করেন, এই প্রার্থনা। বাকি মূল্যের জন্য বিদেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রাহক ও গ্রাহিকার নিকটে ২।৩ বার পত্র লিখা গিয়াছে। সেই পত্র পাইয়া অল্প গ্রাহক গ্রাহিকাই মনোযোগ বিধান করিয়াছেন। অতঃপর মূল্য না পাইলে আমরা অনেকের নামে মহিলা ভি, পি, তে পাঠাইতে বাধ্য হইতেছি।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

দুগ্ধ *।

দুগ্ধের বিষয় আগেই বলিয়াছি যে, ৪ভাগ শ্বেতসার ৪ভাগ অণ্ডলাল আর ৪তোলা ঘি জাতীয় বস্তু ১০০ভাগের মধ্যে অবশিষ্ট ৮৮ অংশ জল। এখন দেখা যাক এই অণ্ডলাল, ঘি, চিনিজাতীয় বস্তু মিলিয়া কি প্রকারে সাদা রং হইল। আচ্ছা এই পাত্রে খানিকটা জল লইলাম, তাতে কোন প্রকারের একটু তৈল দিলাম। সকলেই জানেন তৈলে জলে কখনও মিশে না, তৈল জলের উপর ভাসে। জলের উপর তৈল ভাসাইয়া আলো জ্বালান হয়। অর্থাৎ তৈলে জলে কিছুতেই মিশে না। তার পর খানিকটা soda বা ক্ষার জাতীয় জিনিষ দিলাম ; দিয়া খুব ভাল করে নাড়া দিলাম, দেখুন জলটা কেমন সাদা হয়ে গেল। দেখুন দুধের বর্ণের সঙ্গে প্রায় তফাৎ নাই। সাদা হল কেন ? জলের মধ্যে যে তৈলটা ছিল, soda গিয়ে তাকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার অংশে পরিণত করিল, অর্থাৎ ইহাকে বিভক্ত করিল, উহা সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল, এবং উহার মধ্যে বাতাস পূর্ণ হইয়া সমস্ত শ্বেত বর্ণ করিল। দুধের বিষয়েও ঠিক সেই প্রকার হইয়াছে। আচ্ছা আবার দেখা যাক ইহাকে কেমন করিয়া বর্ণহীন করিয়া ফেলি। ইহার মধ্যে খানিকটা Ether দিলাম, Ether টা বেশ করে নাড়িয়া দিলাম, নীচে পরিষ্কার জল পড়িয়া গেল, আর উপরে ঘিয়ের মত জিনিষটা ভাসিতে লাগিল। ইহার কারণ কি ? Ether টা গিয়াই ঐসব তৈলবিন্দুর চারি দিকে সাবানের একটা আবরণ থাকে তাহাকে সরাইয়া দেয় আর সব তৈল বিন্দু এক চাপ হইয়া যায়। আমাদের পেটেও এই রকম সাবানজাতীয় বস্তু প্রস্তুত হয়, তাহা আগেই বলিয়াছি। আমরা কোন জিনিষ থেকে তৈল বাহির করিতে হইলে Ether দিয়া করি। সব জিনিষেই প্রায় তৈল আছে। একবার আমি চা হইতে যেন বাহির করিয়াছিলাম। চাকে খুব ভাল করে শুকাইয়া লইয়া, খানিকটা Ether এর মধ্যে ডুবাইয়া খুব মিশাইয়া দিলাম। তার পর একটা Blotting paperএ ঢাকিলাম। তখন সেই কাগজে তৈলের মত একটা দাগ পড়ে। আর Ether টা উড়েই যায়, একটু খোলা পেলেই তাহা খুব শীঘ্র উড়ে যায়।

তার পর দেখা যাক দৈ কি করে হয়। সকলেই জানেন রাত্রিতে দুধে একটু অম্বল দিয়ে রাখিলেই সকাল বেলা চাপ দৈ হয়ে থাকে। অম্লজাতীয় জিনিষ পাইলেই দুধ টক

---

* ১৯০১ সক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের বক্তৃতামূলক।

হয়ে যায়। দুধ একটু গরম করে লেবু তেঁতুল কিছু দিলেই দৈ হয়। এই আমি এখানে দৈ করিলাম, দুধের মধ্যে একটু Acid দিলাম কত শীঘ্র দৈ হয়ে গেল। দৈ উপরে ভাসে নীচে খানিকটা জল পড়ে থাকে, অর্থাৎ ঘোল। আচ্ছা দেখা যাক দৈ এর মধ্যের কোন্ কোন্ বস্তু আছে, আর জলেই বা কি আছে। দৈটা বেশ পুষ্টিকর জিনিষ, অর্থাৎ উহার মধ্যে ঘি ৪তোলা অণ্ডলাল ৪তোলার কিছু কম, আর চিনি খুব সামান্য থাকে. আর ঘোলে সব জলটা আর চিনির অধিকাংশ, অণ্ডলাল খুব সামান্য, অর্থাৎ ঘোলটার বিশেষ কোন সার নাই। দৈটা জমে কেন, অণ্ডলাল জাতীয় জিনিষটা বড় শীঘ্র জমে যায়, ভাল দুধ হলে তার উপর জমে যায়। এখানকার দৈ তত জমে না, কিন্তু বিলাতে যে দৈ করে তাহা ভয়ানক শক্ত, ঢালিলে পড়ে না; বিলাতে থম্বীর দিয়ে দৈ করে। গরু বাছুরের থম্বীর নিয়ে তাই দিয়ে করে। থম্বীর দিয়ে করাতে টক হয় না। বিলাতের দুধওয়ালাদের দোকান এমন পরিষ্কার কি বলিব, বড় বড় কাচের পাত্রে করে দুধ রেখেছে, চাহিলেই পরিষ্কার কাচের গ্লাসে করে দেয়। অনেকে ছোট ছেলেদের এক চুমুকে দুধ খেতে বলেন, সেটা কিন্তু ভাল নয়; এক সঙ্গে খাইলে সব দুধটা পেটের থম্বী-রের দ্বারায় এক চাপ দৈ প্রস্তুত হয়, এবং সে দৈ হজম করা শক্ত হয়। সেজন্য অল্প অল্প করে থেমে থেমে খাওয়া ভাল? তাতে ছোট ছোট চাপ প্রস্তুত হয়, হজমের সুবিধা হয়, আর চুণের জল দিয়ে যদি খওয়ান হয় তবে সেগুলি আরও ছোট হয়। খুব ছোট ছেলেকে যদি গরুর দুধ খাওয়াতে হয়, তবে খাঁটি দুধটা না খাওয়াইয়ে, জল মিশাইয়া খাওয়ান ভাল, আর অল্প একটু চিনি দেওয়া ভাল। তার পর ছানা। ছানা করিতে হইলে তা থেকে ঘি উঠাইয়া লইতে হয়। সর তুলে রেখে তাহা বাটিয়া মেয়েরা বাড়ীতে ঘি করেন। ঐরকম দুধ হতে সর উঠাইয়া লইতে হয়, পরে ছানা করিতে হয়। ছানায় অণ্ডলাল থাকে, ঘি থাকে না। বিলাতে যে cheese (পনির) তৈয়ারি হয়, সেটা খুব পুষ্টি-কর খাদ্য, বিশেষতঃ যাঁরা মাছ মাংস খান না, তাঁদের খুব উপকারী। অল্পেতে খুব সার আছে। অত্যন্ত বলকারী। মাখন ঘি হয় Terment দিয়ে দুধ জমাইয়া সেই চাপকে একটা পাত্রে রাখে ও তার উপর ভার চাপাইয়া দেয়, তার উপর আবার আর এক চাপ দেয়, এই রকম করে করে মস্ত একটা শক্ত চাপ হয়, এত শক্ত যে ছুরি দিয়ে কাটা যায় না। সাহেবদের মধ্যে একটু বড় লোকেরা খাবার শেষে অল্প একটু রুটী দিয়ে খায়। কিন্তু বিলাতের শ্রমজীবীরা ইহা অনেক পরিমাণে খায়, তারা সকালে একখণ্ড cheese আর এক রুটী লইয়া বাহির হয়, কাজ কর্ম্ম করে আর কামড়ে কামড়ে রুটী খায়। ঐ খাইয়া সমস্ত দিন থাকে। উহা আমরা বেশী হজম করিতে পারি না, পরিশ্রমের তার-তম্য বুঝিয়া পরিমাণ করিতে হয়। ঐ সকল শ্রমজীবীরা অত্যন্ত পরিশ্রম করে, সুতরাং অনায়াসে হজম করিয়া ফেলে। কিন্তু আমাদের তা অল্প অল্প করে খাইলে ভাল হয়। আমরা যে বাতাস সর্ব্বদা গ্রহণ করি তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু আছে, তাহারা

আমাদের ভয়ানক শত্রু। সকল রোগের কারণ এই জীবাণু ইহা দ্বারাই রোগ উৎপন্ন হয়। এই জন্য যখন দুধ নষ্ট হয়, তখন বাতাসের এই সকল জীবাণু দুধে প্রবেশ করিয়া তাহার মিষ্ট অংশ খাইয়া ফেলে ও একটা অম্লরস উৎপাদন করে। এই জন্য নষ্ট দুধ খাওয়া অপকারী।

মূল্যপ্রাপ্তি।

৬ষ্ঠ বৎসর।

শ্রীমতী মন্দাকিনী দাস,	চট্টগ্রাম	২৲

৭ম বৎসর।

শ্রীমতী মন্দাকিনী দাস,	চট্টগ্রাম	২৲

৮ম বৎসর।

শ্রীমতী প্রিয়লতা বসু,	মেদিনীপুর	২৲
শ্রীযুক্ত হরিনাথ নিয়োগী,	পিংনা	১॥০

৯ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেন,	ফরিদপুর	২৲
„ হরিনাথ নিয়োগী	পিংনা	॥০

১০ম বৎসর।

শ্রীমতী সুলতা দেবী,	সম্বলপুর	২৲
„ শচীবালা সিংহ,	বাণীবন	২৲
„ প্রেমময়ী আইস,	নওয়াখালি	১৲
„ রাণী ক্ষামাসুন্দরী ও উমাসুন্দরী	ভুবলকাটী	২৲
„ সুজাতা সেন,	কলিকাতা	২৲
„ মৃণালকুসী দত্ত,	মরিয়াণী	২৲
„ পরিমল দেবী,	পাকুর	২৲
„ কুন্দমালা সেন,	কলিকাতা	২৲
„ জগন্মোহিনী রায়,	আদাইর	২৲
„ অমলাসুন্দরী চন্দ,	সতীশপুর	১৲
শ্রীযুক্ত কালিদাস দাস,	খুরুপ	২৲
„ উমেশচন্দ্র সেন,	ফরিদপুর	২৲
„ বিপিনবিহারী গুপ্ত,	কটক	২৲
„ বৈদ্যনাথ কর্ম্মকার,	ময়মনসিং	২৲
„ সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী,	কলিকাতা	২৲

ভ্রমসংশোধন।

গত শ্রাবণ মাসে শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী সেনের মূল্যপ্রাপ্তি ১০ম বৎসরে স্বীকার ভুল হইয়াছে নবম বৎসর হইবে।

সূচী।

গভর্ণমেণ্টমেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজের

কেশরঞ্জন তৈল।

উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিদিগের পত্র।

বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অতিরিক্ত সব্‌জজ (পাটনা),—"ইহা ব্যবহার করিয়া বড়ই উপকার পাইয়াছি।"

বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত সব্‌জজ, (কলিকাতা)—"ইহার সৌরভ অতি উৎকৃষ্ট ইহা চটচটে নহে; মাথা ঠাণ্ডা করে এবং কেশের ঔজ্জ্বল্য সাধন করিয়া থাকে।"

বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল, সব্‌জজ, (মুঙ্গের দুর্গ),—"কেশরঞ্জন মাথা ঠাণ্ডা করে এবং কেশদাম চাঁচর চিকুরবৎ সুন্দর রাখে।"

বাবু দ্বারকনাথ ঘোষ সবজজ (যশোহর),—"মাথা ঠাণ্ডা করে এবং ইহার মনোহর সুগন্ধ আছে।"

বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ, সবজজ (হুগলি),—"এই প্রকার কেশতৈলের মধ্যে এইটী উৎকৃষ্ট।

জাল ধরিতে পারিলে পুরস্কার।

বাজারে প্রচারিত, সর্ব্ববিধ কেশতৈলের মধ্যে কেশরঞ্জন তৈল, নিজ গুণে, সুগন্ধে ও উপকারিতায় সকল গুলির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কেশরঞ্জনের বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া, অসৎ লোকের চোখ্ টাটাইতেছে। তাহারা উপায়ন্তর না দেখিয়া "কেশরঞ্জনের" জঘন্য জাল প্রস্তুত করিয়া বাজারে খরিদদারকে ঠকাইতেছে। প্রত্যেক ক্রেতাকে আমার সবিনয় অনুরোধ, যেন তাঁহারা কেশরঞ্জনের চতুষ্কোণ মোড়কটী বেশ ভাল রূপে পরীক্ষা করিয়া লয়েন উপরে আমার প্রতিকৃতি দেখিয়া লইলে, ভবিষ্যতে আর তাঁহাদের অনুতাপ করিতে হইবে না। ন্যায্য মূল্য দিলাম—অথচ তাহার পরিবর্ত্তে আসল জিনিসটী না পাইয়া একটী জঘন্য জাল জিনিস কিনিয়া প্রতারিত হইলাম—ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কিছুই নাই! যাঁহারা "জাল কেশরঞ্জন" ধরিয়া দিতে পারিবেন—আমরা বিবেচনামত তাঁহাদের পুরস্কৃত করিতে পারি।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১৲ টাকা।
ডাকমাশুলাদি	...	।/০ আনা।

১৮।১নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটি বাজার, কলিকাতা।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"

১১শ ভাগ] আশ্বিন, ১৩১২ ; অক্টোবর, ১৯০৫। [৩য় সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, "পরুষাণ্যপি চোক্তা যা দৃষ্টা ক্রুদ্ধেন চক্ষুষা, সুপ্রসন্নমুখী ভর্ত্তু র্যা নারী সা পতিব্রতা।" অর্থাৎ কঠোর কথা বলিলে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিলেও যিনি ভর্ত্তার প্রতি প্রসন্নমুখী তিনিই পতিব্রতা। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "নেক্ষেৎ পতিং ক্রূরদৃষ্ট্যা শ্রাবয়েন্নৈব দুর্ব্বচঃ। নাপ্রিয়ং মনসা বাপি চরেৎ পত্যুঃ পতিব্রতা।" অর্থাৎ পতিব্রতা ভার্য্যা পতিকে ক্রূর দৃষ্টিতে দেখিবেক না, কথনও দুর্ব্বাক্য শুনাইবেক না, এবং মনেও কথনও পতির অপ্রিয় চিন্তা করিবেক না। মূল কথা পতি ক্রুদ্ধ হইয়া অপ্রিয়াচরণ করিলেও পতিব্রতা ভার্য্যা সুপ্রসন্নবদনে পতির প্রতি প্রিয় আচরণ করিবেন, কথনও তাঁহার প্রতি ক্রূর দৃষ্টি করিবেন না, দুর্ব্বাক্য বলিবেন না, মনেও অপ্রিয় চিন্তা করিবেন না। পতি-সম্বন্ধে সতী নারীর এই উচ্চ নীতি।

পতি দুর্ব্ব্যবহার ও অত্যাচার করিলে স্ত্রী তাহাকে ভাল বাসিবে ও ক্ষমা করিবে, এ কেমন নীতি? ভাল বাসার বিনিময়ে ভাল বাসা সামান্য লোকে দান করিয়া থাকে, পশু পক্ষীর মধ্যেও এই প্রকার বিনিময় লক্ষিত হয়। অত্যাচরিত হইয়া অত্যাচারীকে দেবতাই প্রেম করেন। জগজ্জননীর প্রতি আমরা কত অত্যাচার করি, কিন্তু তাঁহার ক্ষমা ও প্রেমের কি বিরাম আছে? তোমরা সেই পরমা সতী জগন্মাতার চরিত্রের অনুকরণ করিয়া তাঁহার সুকন্যা হইয়া জগতে সম্মানিত হও।

পতি ভার্য্যার বহু উপকার করিয়া থাকেন, তুমি কথনও তাহা ভুলিও না, অকৃতজ্ঞ হইও না। অপ্রিয়াচরণের পরিবর্ত্তে অপ্রিয়াচরণ করিও না। তাহা করিলে দুর্নীতিই প্রকাশ পাইবে। তজ্জন্য অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করিবে।

মোসলমানরাজত্ব ও ইংরাজ-রাজত্ব এবং ভারতরমণী।

এক্ষণ অনেকে বলেন, ভারতে ইংরাজ-রাজত্ব অপেক্ষা মোসলমানরাজত্ব ভাল ছিল। যেহেতু তখন দেশের টাকা দেশে থাকিত, হিন্দুরাও মোসলমানদিগের সঙ্গে তুল্যরূপে রাজকীয় উচ্চপদ প্রাপ্ত হইত। তখন অন্য অনেক বিষয়ে সুবিধা ছিল। এই দুই রাজত্বের ভাল মন্দ অবস্থা, বিশেষতঃ মোসলমান ও ইংরাজরাজত্বে ভারতরমণীর অবস্থা, এই প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

ন্যূনাধিক সাত শত বৎসর মোসলমান রাজগণ পর্য্যায়ক্রমে ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছিলেন। সমুদায় মোসলমান রাজাই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে রাজ্যে অত্যাচার ও অরাজকতার এক শেষ ছিল। কোন প্রকার নিয়ম বিধি ছিল না। রাজা বা রাজপুরুষদিগের অনীতি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন প্রজার মুখ স্ফুট করিয়া একটী কথা বলিবার সাধ্য ছিল না। কেহ এবিষয়ে কোনরূপ সাহসিকতা প্রকাশ করিলে প্রাণদণ্ডপর্য্যন্ত হইত। তখন সংবাদপত্র ছিল না, বিরাটসভা ও বিরাটবক্তৃতা করিবার কাহারও সাধ্য ছিল না। প্রজাবর্গ রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হইত না। শিক্ষাদানের কোন নিয়ম ব্যবস্থা ছিল না। কোন্ কোন নগরে বা জনপদে সামান্য মকৃতব ও মাদ্রাসা ছিল, তাহাতে অল্পসংখ্যক বালক সাধারণভাবে আরব্য বা পারস্য ভাষার চর্চ্চা করিত। সেই সকল মকৃতব বা মাদ্রাসার কার্য্য কোন বিশেষ ব্যক্তির বা সাধারণ লোকের সাহায্যে চলিত। প্রায় সকল পাঠশালাই রাজকীয় সাহায্যে বঞ্চিত ছিল। ভারতের সর্ব্বত্র দস্যু তস্করাদি দুষ্ট লোকের ভীতি এত প্রবল ছিল যে, লোকে এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে প্রাণভয়ে ভীত হইত। বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ কাহারও দূরদেশে যাইতে হইলে, আত্মীয় স্বজনের নিকট অশ্রুপূর্ণ লোচনে চিরজীবনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতে হইত। পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে না ভাবিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আত্মীয় বন্ধুগণ বিদেশযাত্রিককে বিদায় দান করিতেন। তখন রেলওয়ে ষ্টীমারাদি কিছুই ছিল না, সাধারণতঃ পদব্রজে কিংবা নৌকাযোগে বা গোযানে লোকে গমনাগমন করিত। স্থল-পথ অরণ্যময় দুর্গম ছিল। স্থানে স্থানে স্থলপথে স্থল-দস্যুর জলপথে জলদস্যুর দ্বারা সচরাচর যাত্রিকগণ আক্রান্ত হইত। রাজ্যে সর্ব্বদাই সমরানল প্রজ্বলিত থাকিত। রাজনিয়োগে সৈনিক পুরুষগণ পররাজ্য গ্রহণ ও লোকের ধনসম্পত্তিলুণ্ঠনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত, যে পর্য্যন্ত যবনসম্রাটের অধীনতা ও দাসত্ব স্বীকার না করিতেন সে পর্য্যন্ত দুর্ব্বল হিন্দুরাজাদিগের নিস্তার ছিল না। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ বিপদাক্রান্ত হইতেন। তাঁহাদের ধন প্রাণ স্ত্রী পরিজন নিরাপদে থাকিত না। ভারত সাম্রাজ্যের মোসলমান-রাজাদিগের মধ্যে সম্রাট্ আকবরের চরিত্র ও তাঁহার রাজ্যশাসনপ্রণালী অধিক প্রশংস-নীয় ছিল, কিন্তু তিনিও পর-রাজ্যগ্রহণার্থ সর্ব্বদা সেনাপতিদিগকে নিযুক্ত রাখিতেন।

তাঁহারও বহু পরিণয় ছিল, তিনি হিন্দু রাজার কন্যাদিগকেও বিবাহ করিয়া ছিলেন। তাহা বলে না হইলেও ছলে কৌশলে সম্ভব। অপর মোসলমান রাজগণ পরিণয়বিষয়ে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। সেই সময়ে ভারতে কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদির উন্নতি ছিল না, রেলওয়ে ষ্টীমারাদির অভাবে বহির্বাণিজ্য বা অন্তর্বাণিজ্যের কোন সুব্যবস্থা ছিল না। স্বদেশের কৃষিজাত দ্রব্যই সকল লোকের জীবনধারণের প্রধান উপায় ছিল। বিদেশ হইতে পণ্য দ্রব্যাদির আমদানি অতি সামান্যই হইত। ভারতের ইতস্ততঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য ছিল। সচরাচর প্রবল যবন রাজা হিন্দু রাজাদিগকে সৈন্যবলে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লইতেন ও পরাজিত অনেক হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মোসলমান করিতেন, অনেকে হিন্দুযুবতীদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া নিজেদের অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, হিন্দুদিগের ধর্ম্মমন্দির ধ্বংস করিয়া মসজেদে পরিণত করিতেন। আমরা আর্য্যজাতি মোসলমান রাজাদিগের দ্বারাই হিন্দু নাম প্রাপ্ত হইয়াছি। হিন্দু পারস্য শব্দ, পারস্যাভিধানে হিন্দু শব্দের অর্থ চোর, ডাকাত, গোলাম। এই চোর, দস্যু বা গোলামদিগের বাস বলিয়া মোসলমানেরা আর্য্যস্থান ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান বলে। হিন্দু শব্দ আমাদের জাতিগত গৌরবসূচক শব্দ নহে, বিশেষ অপমানসূচক শব্দ, ইহা পরিত্যাজ্য। এই শব্দ সংস্কৃতমূলক নহে। পণ্ডিতবর দয়ানন্দ সরস্বতী আপনাকে আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিতেন, হিন্দুনামে পরিচয়দান তিনি অতিশয় অপমানসূচক মনে করিতেন। পরাক্রান্ত মোসলমানেরা হিন্দুকীর্ত্তি সকল বিলোপ করিতেন। হিন্দু রাজাদিগের রাজধানী ও হিন্দু তীর্থস্থান সকল ভ্রমণ করিলে অনেক স্থানেই ইহার জাজ্বল্য প্রমাণ দৃষ্ট হয়। মোসলমান রাজা ও রাজ পুরুষগণ প্রায় সকলেই পরধর্ম্মদ্বেষী এবং হিন্দুধর্ম্মের বিষম শত্রু ছিলেন। পঞ্জাবে শিক সম্প্রদায় একেশ্বরবাদী, তাঁহাদের উপরও তাঁহারা সামান্য অত্যাচার করেন নাই, কোন২ শিখগুরুকে বধ করিয়াছেন। তাঁহাদের করবালের আঘাতে সহস্র সহস্র শিকের মস্তক ছিন্ন হইয়াছে। সম্রাট্ জাহাঙ্গির কোন প্রসিদ্ধ হিন্দুমন্দিরে যাইয়া হিন্দুদিগের মনে ক্লেশোৎপাদন করিবার জন্য মন্দিরের দ্বারে গরু জব করিয়াছিলেন। গজনীর অধিপতি সোলতান মাহমুদ গুজরাটে যাইয়া হিন্দুদিগের পরমারাধ্য দেব সোম নাথ মূর্ত্তিকে চূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কত দূর অত্যাচার করিতেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে। সম্রাট্ আক্‌বরের পিতা সম্রাট্ হোমায়ুন ছিলেন। পুরোহিত শ্রেণীর একজন সম্ভ্রান্ত লোক কাহারও অপরাধ মার্জ্জনা করিবার জন্য সানুনয়ে হোমায়ুনকে অনুরোধ করিয়া ছিলেন, তজ্জন্য হোমায়ুন সেই নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করিয়া বধ করিয়াছিলেন। যাহা হউক এসকল সাধারণ দুঃখকাহিনীর আলোচনা আর অধিক করিতে চাহি না। সেই বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দু রমণীদিগের যে কি বিষম দুঃখ

দুর্গতি ছিল তদ্বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

মোসলমান রাজাদিগের রাজত্বকালে হিন্দু রমণীদিগের সতীত্ব রক্ষা পাওয়া দুষ্কর ছিল। সতীত্ব বা আক্রান্ত হয় এই ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা লুক্কায়িত থাকিতেন, বাটীর বাহির হইতে পারিতেন না। বোধ হয় হিন্দুরমণীদিগের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকা সেই হইতে প্রবর্ত্তিত। তাঁহাদের গুণগ্রাম ও রূপলাবণ্যের কথা জানিতে পারিলে মোসলমান রাজা বা রাজপুরুষ কিংবা সৈনিকপুরুষগণ তাঁহাদিগকে অন্তঃপুর হইতে ধরিয়া আনিয়া নিজেদের অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিতেন। যুদ্ধে জয়ী হইয়া কোন দেশ অধিকার করিলে মোসলমান সৈনিক পুরুষেরা সেদেশের অবলাজাতির প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার করিত। তাহাদের আক্রমণভয়ে সহস্র সহস্র উপায়হীনা সতী নারী প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। চিতোর প্রভৃতি নগরের ইতিহাস ইহার জলন্ত প্রমাণ। কত রাজ্ঞী ও রাজকুমারী এইরূপ জলন্ত অনলে জীবনাহুতিদান করিয়াছিলেন, বলিয়া উঠা যায় না। শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, রাজা বল্লাল সেনের পূর্ব্ব বঙ্গস্থ রাজধানী রামপালে যবনরাজার সঙ্গে সংগ্রামে বল্লাল সেন পরাজিত হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার অন্তঃপুরস্থ বহু সতী কন্যা জলন্ত অনলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। জীবন অপেক্ষা সতীত্ব তাঁহাদের নিকটে অধিকতর প্রিয়সামগ্রী ছিল, সতীত্বের জন্য তাঁহারা প্রজ্বলিত হুতাশনে জীবনাহুতি দান করিতেন। গজনির মহাপ্রতাপান্বিত দুর্দ্দান্ত অধিপতি সোলতান মহামুদ ক্রমে দ্বাদশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ভারতরমণীদিগের দুর্দ্দশার একশেষ করিয়াছিলেন। তিনি সসৈন্যে বেলুচি স্থানের পথে ভীষণ দাবানলের ন্যায় পুনঃ পুনঃ সিন্ধু দেশে প্রবেশ করিয়া হত্যা ও লুণ্ঠন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সিন্ধু দেশের প্রায় রমণীই রূপলাবণ্যশালিনী তিনি তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া স্বদেশে লইয়া গিয়া সামান্য মূল্য দুই চারি আনাতে বিক্রয় করিয়াছেন। মথুরা নগর হইতে এইরূপ বহুসঙ্খ্যক রমণীকে ধরিয়া স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

আমাদের মাতামহ দেবের পূর্ব্বপুরুষ কৃষ্ণদেব বক্শী দিল্লীতে ফৌজের বক্শী ছিলেন। তখন ফৌজের বক্শীর পদ একটি উচ্চপদ ছিল। এক্ষণ যেমন কমিসরিয়েটের এজেণ্টের পদ, বোধ করি ফৌজের বক্শীর পদ সেই রূপ ছিল। সম্ভবতঃ তিনি মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গিরের কোন পুত্রের অধীনে ফৌজের বক্শী ছিলেন। তখন শাহজাদাগণ (রাজকুমারগণ) এবং বাদশার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনেরাই রাজকীয় প্রধান পদ—সৈন্যাধ্যক্ষাদির পদ অধিকার করিতেন। সেইরূপ উচ্চ পদ অতি অল্প হিন্দুর ভাগ্যেই ঘটিত। তওয়ারিখ জাহাঙ্গিরী ও তওয়ারিখ আক্বরী ইত্যাদি জাহাঙ্গির ও আক্বর প্রভৃতি মোগল সম্রাট্দিগের জীবনচরিত পাঠ করিয়া দেখ, উচ্চ পদে শতকরা দশ জনের অধিক হিন্দু নিযুক্ত দেখিবে না। রাজা মান-

কোন বন্ধু বলিলেন, ভারতবর্ষে পূর্ব্বতন মোসলমান রাজাদের রাজত্বকালে যে প্রকার অবস্থা ছিল, বর্ত্তমান সময়ে মোসলমান রাজা থাকিলেও কালপ্রভাবে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিত, এ রাজ্যের নানা প্রকার উন্নতি হইত। এ কথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। প্রসিদ্ধ মক্কানগর তুরুস্কের সোল্‌তানের অধিকৃত। সেস্থানে আজও নারী বিক্রয় হয়। একজন মোসলমান বন্ধু বলিয়াছিলেন, "মক্কার ন্যায় প্রধান নগরে একটি মুদ্রাযন্ত্র নাই।" তবে সোলতানের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল ইয়ুরোপীয় সভ্য রাজাদিগের রাজ্যসংলগ্ন। সেখানে কিছু কিছু সভ্যতার আলোক প্রবেশ করিয়াছে। দূরবর্ত্তী পারস্য ও কাবোলরাজ্যের রাজবিচারে আজও চোরের হস্তচ্ছেদন হয়। পারস্য ও কাবোলে কোনরূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ক্রিয়া নাই, সেদেশের রাজা দ্বারা রেলওয়ে টেলিগ্রাফ ইত্যাদি বিস্তার হয় নাই, রাজ্যে সুবিধি সুব্যবস্থা নাই, চোর ডাকাতের দৌরাত্ম্যের সীমা নাই। স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্ববৎ দুর্দ্দশাপন্ন আছে। বিশেষ উন্নতি ও পরিবর্ত্তন কিছুই নাই।

যবনরাজত্বে ভারতমহিলাদিগের জন্য কোনরূপ শিক্ষার পথ মুক্ত ছিল না, তাঁহাদের কোন প্রকার স্বাধীনতা ছিল না। তাঁহারা ঘোরতর অন্ধকারে মহাদুঃখে কাল যাপন করিতেন।

এক্ষণ ইংরাজরাজত্বের কথা বলা যাউক। ইংরাজরাজত্বের সূত্রপাতে সাত শত বৎসরের ঘন অমানিশার অন্ধকারের অবসান, ভারতের পক্ষে সুপ্রভাত হই-

সিংহ প্রভৃতি অল্প কয়েক জন হিন্দুই উচ্চ পদস্থ হইয়াছিলেন। এক্ষণ যেমন স্বজাতিপক্ষপাতিতা বিদ্যমান, তখনও স্বজাতিপক্ষপাতিতা বড় কম ছিল না। উচ্চ পদস্থ হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই বাদশাকে কন্যা দান বা ভগিনী দান করিয়া তাঁহার শ্বশুর বা শ্যালা হইয়াছিলেন। যাহা হউক এক্ষণ মূল কথার অবতারণা করা যাইতেছে। উক্ত কৃষ্ণদেব বক্‌শীর একটী রূপবতী যুবতী কন্যা ছিলেন, তিনি পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল। তিনি পিতাকে সময়ে সময়ে পত্রাদি লিখিতেন। রাজকুমার কোন বন্ধুযোগে এই বিবরণ প্রাপ্ত হন, পিতার নিকটে লিখিত কন্যার পত্রও কোন সুযোগে দেখিতে পান, কৃষ্ণদেব বক্‌শীর নিকটে সেই কন্যাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। বক্‌শী মহাশয় নিরুপায়, সেই ইচ্ছার প্রতিরোধ করেন তাঁহার এরূপ সাধ্য ছিল-না। অগত্যা শাহজাদাকে সঙ্গে করিয়া ঢাকানগরে আগমন করেন। তখন ঢাকানগরের নাম জাহাঙ্গির নগর ছিল। স্বর্ণগ্রামের অন্তর্গত হামছাদি পল্লীতে কৃষ্ণদেব বক্‌শী বাস করিতেন। সেই স্থান জাহাঙ্গির নগর হইতে ২০।২১ মাইল দূরে। সৈন্য সামন্ত ও অনুচরবৃন্দসহ রাজকুমার হামছাদি পল্লীতে উপস্থিত হন। কৃষ্ণদেব বক্‌শী কৌশলপূর্ব্বক নিজের কন্যাকে প্রদর্শন না করিয়া বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা যুবতী দাসীকে প্রদর্শন করেন। শাহজাদা তাহাকে মনোনীত করেন না। বক্‌শী মহাশয় রক্ষা পাইলেন।

য়াছে। ইংরাজরাজত্বে শত বৎসরের মধ্যে ভারতে যুগান্তর উপস্থিত। রাজকার্য্যাদির সুশৃঙ্খলা, নগর উপনগরাদিতে নানা শ্রেণীর উচ্চ নিম্ন বিচারালয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও ডাকের সুব্যবস্থা এবং সর্ব্বত্র রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফবিস্তার, সহস্র সহস্র আরোহী ও নানা জাতীয় পণ্যপুঞ্জ সহ অর্ণবপোত বাষ্পীয় পোত বাষ্পীয় শকটাদির নগর হইতে নগরান্তরে একদেশ হইতে দেশান্তরে বায়ু বগে অবিরাম গতি, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের অসাধারণ উন্নতি। বিশেষ বিশেষ নগরে গ্যাসের আলো, বৈদ্যুতিক আলো ও বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ীর ব্যবস্থা; স্থানে স্থানে চিকিৎসাবিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ঔষধালয় স্থাপন; রুগ্ন প্রজাগণের সুচিকিৎসালাভের সাহায্য উদ্দেশ্যে উপযুক্ত চিকিৎসক নিয়োগ; লোকের গমনাগমনের সুবিধার জন্য পল্লীতে পল্লিতে পর্য্যন্ত প্রশস্ত পথপ্রসারণ; স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা, এবং প্রজাবর্গের সুখ সুবিধার নিমিত্ত মিউনিসিপালটী স্থাপন ও নানা প্রকার অদ্ভুত কল কারখানা ও বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া ও সংবাদপত্রাদির বাহুল্য প্রচলন ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা; রাজা ও রাজপুরুষদিগের কোন দোষ ত্রুটি হইলে একজন হীনাবস্থাপন্ন দরিদ্র প্রজার তাহা লিখায় বা বক্তৃতায় প্রদর্শন করিবার অধিকার; সকল ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মবিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা; হিন্দু মোসলমানাদি সকল সম্প্রদায়ের পুরাতন কীর্ত্তি ও ধর্ম্মমন্দির সকল সযত্নে সংরক্ষণ; সেই সকলের জীর্ণ সংস্কারে রাজকোষ হইতে প্রচুর অর্থব্যয় করা ইত্যাদি ভারতের পক্ষে ইংরাজ রাজত্বের এ সমস্ত অমূল্য দান। ধনী দরিদ্র স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলে এই দান ভোগ করিতেছেন। আজ বিজ্ঞানের উজ্জ্বলালোকে ভারত আলোকিত। এ সকলের জন্য কি ইংরাজ রাজা ও ইংরাজ জাতির প্রতি ভারতীয় প্রজাদের হৃদয়ে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হইবে না? বাস্তবিক রামরাজ্য অপেক্ষা কি ইংরাজরাজ্যে আমরা অধিকতর সুখে বাস করিতেছি না? আমরা কি অকৃতজ্ঞ অবিনীত জাতি বলিয় জগতে পরিচিত হইব?

স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানোন্নতির জন্য রাজকীয় সাহায্যে নানা স্থানে স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা নানা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন, এবং রাজভাণ্ডার হইতে যথোপযুক্ত পুরস্কার পাইতেছেন। সুশাসনে রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি বিস্তার, দস্যুতস্করাদি দুষ্ট লোকের ভয় এক প্রকার বিলুপ্ত। বঙ্গীয় যুবতী কন্যারা পুরুষসাহায্যসম্পর্কশূন্য হইয়া সহস্র সহস্র মাইল নির্ভয়ে নির্ব্বিঘ্নে ভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন, একা ইয়ুরোপ আমেরিকা পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতেন। তাঁহাদের প্রতি অন্যায়াচরণ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। এরূপ ইংরাজ শাসন ও প্রতাপ। তবে কখনও দুর্ঘটনা হয় না ইহা বলা যায় না, কিন্তু তাহা বিরল। কোন অত্যাচার হইলে উপযুক্ত শাসনও হয়। কিছু দিন হইল আমাদের দুইটী আত্মীয়া যুবতী কন্যা তাঁহাদের গর্ভধারিণী সহ পুরুষসহযাত্রী ব্যতিরেকে

সুদূর সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত হায়দ্রাবাদ নগরে চলিয়া গিয়াছেন, এবং তত্রত্য বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ইংরাজরাজা ও রাজপুরুষগণ এদেশীয় মহিলাদিগকে কিরূপ সম্মান করেন, তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে;— একবার ভূত পূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি মহামান্ত লর্ড নর্থব্রুক ঢাকা নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি তত্রত্য স্ত্রীবিদ্যালয় দর্শন করিতে যান। একটী বয়ঃস্থা ছাত্রী অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। তাহা পড়া হইলে রাজপ্রতিনিধি সুমিষ্ট ভাষায় বলিলেন, "তুমি অতি উত্তম পড়িয়াছ, আমি তোমাকে পুরস্কার দিব।" ইহা বলিয়াই হস্ত প্রসারণ করিয়া সেই ছাত্রীর হস্ত হইতে আদরপূর্ব্বক অভিনন্দনপত্র স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। নিয়ম এই যে, সেক্রেটারী গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই ছাত্রীর প্রতি বিশেষ সম্মানপ্রদর্শনের জন্য স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছু দিন হইল, মাননীয় বঙ্গাধিপতি ফ্রেজার সাহেব ভাগলপুরে গিয়াছিলেন; তাঁহার উপস্থিতিউপলক্ষে তত্রত্য কমিশনর সাহেবের বাঙ্গালায় সায়ংসম্মিলন হইয়াছিল। বহু ইংরাজ পুরুষ ও ইংরাজমহিলা গভর্ণর মহোদয়কে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য উক্ত সায়ংসমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। একটী মাত্র বাঙ্গালী মহিলা স্বামিসহ গিয়াছিলেন। তিনি উক্ত সমিতি হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি মহানুভব ফ্রেজার সাহেবের সৌজন্য ও শিষ্টতায়মুগ্ধ হইয়াছি, তাঁহার নিকটে আমি এত আদর যত্ন পাইব কখনও মনে করিতে পারি নাই।"

একবার ভাবা কর্ত্তব্য, আমাদের লেখাপড়া, সভাসমিতি ও বক্তৃতাদি সকল ব্যাপারে ইংরাজজাতি বসিয়া আছেন। সমুদায় তাঁহাদের নিকট হইতে গ্রহণ ও শিক্ষা। স্বদেশের জিনিষের অভাবপক্ষে জার্ম্মণি ও ফ্রান্সের জিনিষ ব্যবহার করিব, ইংলণ্ডের জিনিষ ব্যবহার করিব না, এরূপ চেষ্টা ও প্রতিজ্ঞা করা কি ভাল? তাহাতে যে, দিন দিন ইলণ্ডের সঙ্গে শত্রুতাই বৃদ্ধি পাইবে। মনে করা উচিত, ভারত সর্ব্বোতভাবে ইংলণ্ডের অধীন। তাহার সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য উন্নতি অবনতি ইংলণ্ডের হস্তে। ইংরাজ ও ইংরাজজাতির সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিলেই মঙ্গল। লেখালিখি ও বক্তৃতার প্রণালী দোষে এদেশীয় লোকের ইংরাজজাতির সঙ্গে দিন দিন অসদ্ভাব বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাতে ভারতের অনেক অকল্যাণ হইয়াছে, আরও হইবে। লেখক ও বক্তাদিগের লেখনী ও রসনা কিছু সংযত করা আবশ্যক। কতক গুলি কথা বলিয়া বা লিখিয়া সাধারণ লোককে উত্তেজিত করিয়া ইংরাজবিরোধী করিয়া তোলা সহজ, ইহার পরিণাম অতিশয় মন্দ। যদি কিছু বঙ্গের অমঙ্গল হইয়া থাকে বোধ হয় উহার অধিকাংশ নানা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কলিকাতায় তীব্রভাবে রসনা ও লেখনীচালনার ফল। সময়ে সময়ে অনেক ইংরাজ ও ইংরাজ রাজপুরুষ ক্রুদ্ধ হইয়া বা স্বার্থের জন্য এদেশীয় লোকের প্রতি অন্যায়াচরণ করে, ইহা

স্বীকার করি। সুপ্রণালীমতে তাহার প্রতিবাদ হউক, এবং প্রতীকারের চেষ্টা হউক, ইংরাজরাজপুরুষমাত্রকে ও ইংরাজ-জাতিসাধারণকে তজ্জন্য দোষী করিবে কেন? মহিলারা এ বিষয়ে যেন কোন রূপ হঠকারিতা করিয়া বাল্যচাপল্য প্রকাশ না করেন। বর্ত্তমান ব্যাপারে রাজপ্রতিনিধিই বরং দোষী, ইংরাজজাতি-সাধারণের অপরাধ কি? তাঁহাদের প্রতি রাগ দ্বেশ করা হইবে কেন? ক্রুদ্ধ হইয়া কোন বড় লোকের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পুড়াইয়া ফেলা, ইহা যে বিলাতী জিনিষ, বিলাতী পাপ; এই বিলাতী জিনিষের ও বিলাতী পাপের অনুকরণ হয় কেন? বিলাতী জিনিষ চুরুট সিগারেট অনেক লোক পরিত্যাগ করিয়াছে, কলেজ স্কুলের বহু ছাত্র তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। কতক গুলি লোক নাকি বিলাতী মদ খাইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। মদের বিষয়ে দেশী বিলাতী বিচার না করাই ভাল ছিল। বিলাতী মদের সঙ্গে দেশী মদও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এজন্য গবর্ণমেণ্টের আবকারীব্যবসায়ে বিশেষ ক্ষতি হইলে দুঃখ নাই।

"মোসলমা রাজত্বে এ দেশের টাকা এদেশে থাকিত, এখন এদেশের সমুদায় অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, এদেশ গরিব হইয়া পড়িতেছে।" এরূপ কথা হইয়া থাকে। তখন মোসলমান রাজা ও রাজপুরুষগণ এবং রাজজাতি এদেশী ছিলেন। বিদেশের সঙ্গে এদেশের কোন সম্পর্ক ছিল না। এদেশের অর্থে তাঁহাদের নানা প্রকার ভোগবিলাস আমোদ প্রমোদ চলিত। সেই সময় অর্থোপার্জ্জন ও অর্থাগমের প্রকৃষ্ট উপায় ছিল না; সমগ্র বঙ্গ দেশে কয় জন ধনী বড় লোক ছিলেন? এক্ষণ দেখ কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি রাখে, এরূপ শত শত লোক পাওয়া যাইবে। তখন সমগ্র বঙ্গদেশের জন্য এক জন পুরুষানুক্রমিক গভর্ণর (নবাব), পূর্ব্ব বঙ্গের জন্য একজন ক্ষুদ্র নবাব্ এবং বিশেষ বিশেষ নগরে এক এক জন ফৌদাজরীর বিচারক (কাজী) ছিলেন। এই সকল গভর্ণর ও বিচারকের পদ মোসলমানদের একচেটিয়া ছিল। তাঁহাদের অধীনে ক্ষুদ্র বেতনে অল্প সংখ্যক হিন্দু ও মোসলমান কর্ম্মচারী থাকিত। সাধারণতঃ এক শত টাকা বেতনেই উচ্চ বেতন ছিল। ঘুষের প্রভাবে ১৪ জন বড় মানুষ হইয়াছিলেন। এক্ষণ দেখ এক একটি জিলায় দুই শত চারি শত টাকা বেতনে কত গণ্ডায় ২ নিম্ন শ্রেণীর দেশীয় হাকিম। বহু উকীল বারিষ্টার তো ধন কুবের। সাহেবদের কল কারখানা ও রেলওয়ে ত্যাদিতে কণ্ট্রাক্টের কাজ করিয়া এদেশের বাবুগণ মহাধনী হইয়াছেন। কল কারখান য় লক্ষ লক্ষ দেশীয় শ্রমজীবী সুখে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইতেছে। এক মুসরীর সূতার কলে ৬ হাজার, চটের ৩ হাজার শ্রমজীবী। প্রত্যেকে প্রতিমাসে ২০।২৫ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। বঙ্গের কৃষকেরা পাট বিক্রয় করিয়া বিলাত হইতে ৮ কোটী টাকা প্রাপ্ত হয়। সাহেবেরা কেবল এদেশ হইতে লইয়া যায়, এদেশকে দেয় না, একথা বলা সঙ্গত নয়। গোলযোগ

না করিয়া স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষিগণ স্বদেশে কতকগুলি কল কারখানা স্থাপনপূর্ব্বক কলের সাহেবদিগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিলে স্বদেশের শিল্পোন্নতি ও এক শ্রেণীর লোকের আর্থিক উন্নতি হয়, তাহা করিতে পারিলে বাস্তবিক স্বদেশের কল্যাণ হয়। প্রকৃতপক্ষে কিরূপে স্বদেশী জিনিষের উৎপত্তি এবং সজ্ঘটন হইয়া উঠে সে বিষয়ে উদ্যোগ বড়ই কম। এক্ষণ কার্য্যের প্রয়োজন। স্বদেশীয় লোকের বস্ত্রাদির অভাব পূরণ করিতে হইবে। আর একটী কথা সম্মিলন ও সদ্ভাবস্থাপন যদি লক্ষ্য হয় তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গবাসী বা উড়িষ্যাবাসী কিংবা বিহারনিবাসী কাহারও প্রতি যেন কোনরূপ ঘৃণাসূচক শব্দ প্রয়োগ করা না হয়। তাহা করিলে পরস্পর প্রেম ও সদ্ভাব স্থায়ী হইবে না। স্বদেশী বিদেশী নির্ব্বিশেষে সকলকে প্রেম করা এবার জীবনের ব্রত হউক। বিদেশী সাহেবদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পরস্পর উপকারী ও উপকৃতের সম্বন্ধ। তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অসদ্ভাব ও অপ্রেম যাহাতে প্রকাশ না পায় তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। ইহাই এই প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত মূল মন্ত্র অন্য কিছুই নহে।

আমরা মাননীয় সহযোগী প্রবাসীর "স্বদেশী প্রচেষ্টা" শীর্ষক প্রবন্ধে বিবৃত এই সকল কথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি ;—

"বিদেশীর কোন ধার ধারিব না। এ প্রতিজ্ঞা এক দিনও টিকিতে পারে না, সুতরাং ইহা করা উচিত নয়। তদ্ভিন্ন বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া কোন জিনিষসম্বন্ধেই স্বদেশী প্রতিজ্ঞা করা উচিত নহে। আমরা যে সকল জিনিষ ভারতবর্ষে পাইতে পারি, এবং করিতে পারি স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তৎসমুদায় ব্যবহার করিব। ইহাই আমাদের প্রতিজ্ঞা। তাহাতে যদি বিদেশী লোকের অনিষ্ট হয় তাহা আমাদের অভিপ্রেত নহে।"

কেবল আন্দোলন করিলে স্বদেশীচেষ্টা-প্রতিজ্ঞারূপ গুরুতর ব্যাপার সুসম্পন্ন হইবে না। ইহার সাধন সময়সাপেক্ষ ও অর্থ-সাপেক্ষ। স্বদেশের বিজ্ঞ অভিজ্ঞ লোক সকল সমবেতরূপে ধীর ও শান্ত ভাবে কার্য্য চালাইলে সময়ে অনেকটা সুসম্পন্ন হইতে পারে। প্রথমতঃ এক দল উপযুক্ত যুবাকে বিলাতে পাঠাইয়া বিজ্ঞানের আলোচনা ও কলকারখানার কাজ শিক্ষা করিতে নিযুক্ত করা সমুচিত। স্বদেশে সূত্র ও বস্ত্রাদি-প্রস্তুতির বড় বড় কল স্থাপন করা কর্ত্তব্য। যুবকগণ বিলাতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আসিলে তাঁহাদের উপর সেই সকল যন্ত্র চলাইবার ভারার্পণ করা আবশ্যক। তবে কাজ চলিবে।

ভারতবর্ষে নানা জাতীয় নানা ধর্ম্মাবলম্বী নানা শ্রেণীর ত্রিশ কোটি লোকের বাস। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ, সেই সকলের স্বার্থরক্ষা ও মনস্তুষ্টি-সাধন এক জন ভিন্নদেশীয় ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজ-প্রতিনিধি ও প্রধান শাসনকর্ত্তার পক্ষে কত দূর দুষ্কর কার্য্য অনেকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। খ্রীষ্টানের স্বার্থরক্ষা করিলে হিন্দু প্রজা বিরক্ত হন, হিন্দুর মন রক্ষা

করিলে মোসলমানের বিরাগভাজন হইতে হয়। সকলেই সহজে মতামত প্রকাশ ও বাদ প্রতিবাদ করেন। শাসনকর্ত্তার যে কত দূর দায়িত্ব তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। রাজপ্রতিনিধি মহামতি লর্ড রিপণের ন্যায় লোকও ভারতবাসীদিগের স্বার্থ রক্ষা করিতে যাইয়া ইংরাজজাতির অত্যন্ত বিরাগভাজন হন। পরে তাঁহাদের তাড়নায় পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার একটা স্মৃতিচিহ্নপর্য্যন্ত এদেশে স্থাপিত হইতে পারে নাই। কোন অনুন্নত জাতি ও অনুন্নত প্রদেশকে উন্নত করিবার জন্য Privilege দেওয়া হইয়া থাকে, গভর্ণমেণ্টের এই Policyর বিরুদ্ধে বহু লোক দণ্ডায়মান হয়।

রাজপ্রতিনিধি ও রাজপুরুষগণের দোষ ত্রুটি নাই, তাঁহারা ভ্রম প্রমাদশূন্য, মানবীয় ভাব হইতে মুক্ত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। তাঁহাদের দোষ ত্রুটি ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করিবার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা প্রজাসাধারণের আছে। কিন্তু লিখিবার ও বলিবার প্রণালীর দোষে এবিষয়ে অতিশয় কুফল হইতেছে। দূর দেশে বিস্তীর্ণ রাজ্যশাসনবিষয়ে ইংরাজজাতি যেরূপ সুদক্ষ, ইয়ুরোপীয় কোন সভ্য জাতি সেরূপ নহে। ইহা সুবিজ্ঞ লোকেরা বলিয়া থাকেন। ১৮৫৭ সালে মূর্খতাবশতঃ অকারণে সমুদায় দেশীয় সিপাহী রাজবিদ্রোহী হইয়া অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, এদেশের অনেক রাজা বাদশা তাহাদের নেতা হইয়াছিলেন। সিপাহীদের দৌরাত্ম্যে সমগ্র ভারতবর্ষ টলমল করিতেছিল। কিন্তু অবিলম্বে দুর্জ্জয় ব্রীটিশ সিংহের প্রতাপে তাহারা বায়ুবিক্ষিপ্ত তুষের ন্যায় উড়িয়া গেল।

অধিকাংশ মোসলমান রাজা চরিত্রহীন ভীষণ অত্যাচারী ছিলেন। তথাপি মোসলমান প্রজাদিগের রাজভক্তি কত। তাঁহারা বাদশাকে "জেল্লাল্লাহ" বা "জেল্লসবহানি" অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব বলেন,এবং এমাম (আচার্য্য) প্রতি শুক্রবার মসজেদে সাময়িক বাদশার নামে খোতবা পড়িয়া থাকেন, তাঁহার কল্যাণ প্রার্থনা করেন। নববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্রের রাজভক্তি কি রূপ ছিল, তাঁহার "Philosophy and Madness in Religion বক্তৃতার অন্তর্ভাগে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। এই বক্তৃতা ১৮৭৭ সালের ৩রা মার্চ্চ সম্রান্ত শ্রোতৃ মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ টাউন হলে প্রদত্ত হইয়াছিল। তদানীন্তন মহামান্য রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন এবং বহু উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষ এই বক্তৃতাশ্রবণের জন্য উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতায় শেষাংশ এস্থানে অনুবাদ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে।

রাজভক্তি।

"মহাশয়গণ, আমি যদি আপনাদের ধৈর্য্যকে অতিক্রম করিয়া না থাকি তবে সংক্ষেপে আর একটি গুরুতর বিষয়ে কিছু বলিতে চাই, সে বিষয়টী রাজভক্তি। যেমন আমরা অন্য দুইটি আলোচিত বিষয়ে দেখিয়াছি, সেই প্রকার রাজভক্তিতেও দর্শন শাস্ত্র ও মত্ততা, উভয়েরই প্রয়োজন। দর্শনশাস্ত্র-সম্মত রাজভক্তি হইতে উন্মত্ততা ও উত্তেজনাপূর্ণ রাজভক্তির প্রভেদ সহজেই বুঝা যায়। এস্থানেও

আমি সারসংগ্রহকারী পুনর্মিলনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি। বর্ত্তমান কালের দার্শনিক লোকেরা রাজভক্তিকে আইনের বাধ্যতা ও রাজকীয় কর্ম্মচারীর আনুগত্য ব্যতীত আর কিছুই মনে করেন না। আমরা শুনিয়াছি যে, যাঁহারা দেশের নিয়মকে ও ইহার শাসনকর্ত্তাদিগকে মান্য করে তাহারা পূর্ণ রাজভক্ত প্রজারূপে গণ্য হইতে পারে। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে, দার্শনিকদিগের এই মনঃকল্পিত নিয়ম ও বিচারের তৃপ্তিতে আমার তৃপ্তি হয় না। এক জন শ্রেষ্ঠ হিন্দু হইয়া আমি জ্ঞানের তৃপ্তিতে সন্তুষ্ট না হইয়া আর কিছু আশা করি, যাহাতে অন্তঃকরণের ভাবের চরিতার্থতা হয়। রাজভক্তি একটি মত না একটি গভীর ভাব? বস্তুতঃ ইহা উভয়ই। প্রথমটিতে দর্শনশাস্ত্রের দ্বিতীয়টিতে উন্মত্ততার প্রয়োজন। দর্শনশাস্ত্র রাজভক্তিকে নীচ আনুগত্য ও দাসত্ব হইতে রক্ষা করে। অপর দিকে উন্মত্ততা ইহাকে শুষ্ক জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকিতে দেয় না। অতএব এস আমরা রাজভক্তিতে দর্শনশাস্ত্র ও মত্ততা উভয়কেই মিশ্রিত করি। আমি আইনকে গ্রহণ করিব, বিচারকের—ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রভুত্বকে মান্য করিব। যাহাতে সুশাসন প্রণালী ও সুব্যবস্থা রক্ষা হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিব। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না রাজভক্তি ব্যক্তিগত ভাবে পরিণত হয়, তত ক্ষণ আমার অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইতেছে না। আমরা প্রাচীন হিন্দু জাতির বংশধরগণ, আমাদের পক্ষে সত্যই এই রূপ হওয়া স্বাভাবিক। বহু শতাব্দী হইতে হিন্দুজাতি রাজার প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি দিয়া আসিতেছে। হিন্দুর নিকট রাজভক্তির অর্থ ব্যক্তিগতভাবে রাজাকে ভালবাসা ও শাসনবিভাগের কর্ত্তার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা। হিন্দুসন্তান নিজ রাজাকে প্রগাঢ় আনুগত্যের সহিত ভাল বাসেন। হিন্দুর নিকট রাজাকে বিশ্বাস করার অর্থ রাজভক্তি বা রাজাকে ভালবাসা। হিন্দু গৃহস্থ পিতাকে গৃহকর্ত্তারূপে ভক্তি করেন, এবং ভালবাসার সহিত তাঁহার আজ্ঞা পালন করেন; সেই প্রকার রাজাকে রাজ্যের পিতৃরূপে ভালবাসেন ও আনন্দের সহিত আজ্ঞা পালন করেন। রাজা যে প্রজাসাধারণের পিতৃস্বরূপ, ইহা প্রধানতঃ হিন্দুভাব; হিন্দুশাস্ত্র তাহার সাক্ষ্য দিতেছে, এবং দেশীয় রাজা সকলের উচ্ছ্বসিত রাজভক্তি তাহার জ্বলন্তপ্রমাণ। হিন্দুমতই যথার্থ মত। ইহা স্বভাবের অত্যন্ত উপযোগী। ভ্রান্তমতবাদীরা ইহা অস্বীকার করুক, হৃদয়বিহীন কল্পনার সেবকগণ ইহার বিরুদ্ধে বলুক, তাহাতে কি? আমি তেজের সহিত বলিতেছি, মনুষ্যের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ রাজাকে সাধারণের পিতৃরূপে দর্শন করে। তিনি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ না হইতে পারেন, তাঁহার শাসন প্রণালী দোষশূন্য না হইতে পারে, তথাপি সাধারণ লোকে তাঁহাকে ভক্তি করে, যেমন সন্তান তাহার পিতার দোষ দুর্ব্বলতা বিচার না করিয়া তাঁহাকে ভক্তি করে। রাজ্যের আইন-সঙ্গত অভিভাবকের উপর যে প্রগাঢ় ভক্তি, তাহা অন্তঃকরণ হইতে দূর করিবার পক্ষে কোন কারণই যথেষ্ট নয়। শান্ত স্বাভাবিক

অন্তঃকরণ কখনও রাজনৈতিক কল্পনাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। রাজভক্তি ব্যক্তি-বিহীন ভাব ত্যাগ করে। ইহা একটি ব্যক্তি চায়, সেই ব্যক্তি রাজা কিংবা রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি, নিয়ম ও রাজ্যশাসনব্যবস্থা যাঁহা হইতে হয়। এ বিষয়ে আমার রাজ-বিশ্বস্ততার যথার্থ অর্থ কেবল আইন ও পার্লিমেণ্টকে মান্য করা নয়, কিন্তু ইংলণ্ডের রাজ্ঞী ও ভারতের সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার উপর ব্যক্তিগত অনুরাগ। কেবল সাংসারিক ভাবে রাজভক্তিতে মন এত সরস হয় না, কিন্তু ইহা গভীর ধর্ম্ম-ভাবের ফল। রাজভক্তির অর্থ বিধাতাকে বিশ্বাস করা। এই বিশ্বাসই রাজভক্তির মধ্যে এত পবিত্রতা গভীরতা আনয়ন করিয়াছে, এবং প্রত্যেক লোকের অন্তরে ও সমাজের মধ্যে এই পবিত্র বৃত্তি স্থাপিত করিয়াছে। তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, ইতিহাসের মধ্যে ঈশ্বর বিদ্যমান? সমস্ত জাতির উন্নতির মধ্যে কি ভগবানের বিশেষ বিধান দেখিতে পাও না? নিশ্চয়ই ভারতে ইংরাজশাসন কাল, ইতিহাসের একটি সামান্য অধ্যায় নয়, কিন্তু ইহা একটি ধর্ম্ম-সমাজের ইতিহাস। আমাদের এই সুবিস্তীর্ণ দেশের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উন্নতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ও ইংরাজের পিতার ন্যায় শাসনে সম্পন্ন হই-তেছে। যে পুস্তকে এ কথা লিখিত হয় সত্যই উহা একটি পবিত্র পুস্তক। ইহাতে আমরা পরিষ্কার দেখিতেছি যে, ভগবানই ইংলণ্ডের দ্বারা ভারতবর্ষ শাসন করিতে ছেন। তুমি কি আমাদের রাজার রাজপদবী গ্রহণের দিনে দিল্লির মনোহর দৃশ্যে উপস্থিত ছিলে? কতকগুলি লোক অনুযোগ করিয়াছিলেন যে, এই ব্যাপারে কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখা যায় নাই? সত্যই এ বিষয়ে মতভেদ আছে। যাহাই হউক না কেন, কেহই এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন না যে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি গম্ভীর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ছিল। আমার অতিশয় আনন্দ হইতেছে যে, আমাদের সহৃদয় প্রধান শাসনকর্ত্তার সম্মুখে আমি ইহা বলিতে পারিলাম। সে স্থানে কি কোন ধর্ম্মনিষ্ঠ বিশ্বাসী উপস্থিত ছিলেন? তাঁহার নিকট আমি বলিতেছি, তিনি কি এই রাজকীয় সভাতে নীতি ও ধর্ম্মের প্রাধান্যের দৃশ্য দর্শন করেন নাই? বিশ্বাসীর চক্ষু কি দেখে নাই যে, ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করিয়া ভিক্টোরিয়ার মস্তকে সম্রাটের মুকুট পরাইয়া দিলেন। তিনি কি শুনিতে পান নাই যে, ঈশ্বর রাণীকে বল্‌ছেন, "ন্যায় সত্য করুণা দ্বারা তোমার পরামর্শদাতা-দের নিকট যে আলোক আইসে সেই রূপে শাসন করিও, এবং রাজ্যে পবিত্রতা শান্তি ও উন্নতি স্থাপিত হউক।" তুমি কি এই দৃশ্যকে ও এই বাণীকে স্বপ্ন বলিয়া মনে করিবে? এই দৃশ্যেতে কি কোন সত্য নাই? এই পতিত জাতিকে উত্তোলন করিয়া অন্য জাতির সমান করিবার জন্য ভিক্টোরিয়া ভগবানের হাতের একটি যন্ত্র, কে ইহা অস্বীকার করিবে? সেই গুরুভার অল্পদিন হইল তাঁহার উপর পতিত হইয়াছে। হে শিক্ষিত দেশীয়গণ, তোমরা তোমাদের

স্বর্গের নিয়োজিত রাজাকে ভক্তি করিতে বাধ্য। তুমি যদি ভক্তি না কর, তাহার অর্থ ভয়ানক অকৃতজ্ঞ হওয়া ও ভগবানে অবিশ্বাস করা। যখন তোমাদের দেশ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে অন্তঃসারশূন্যতায় আচ্ছন্ন ছিল, তখন ইংরাজ শাসন ঈশ্বরের দূত হইয়া তোমাদের উদ্ধারার্থ আসিয়াছিল, এবং সেই অবস্থা হইতে তোমাদিগকে বর্তমানাবস্থায় উপস্থিত করিয়াছে, সেই ইংরাজশাসনকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য। এই কাজ মানুষের নয়, কিন্তু ঈশ্বরের, এবং ইংরাজ জাতির দ্বারা তিনিই ইহা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার মনোনীত যন্ত্র জানিয়া তোমরা রাজাকে ও সমস্ত শাসনকর্ত্তাদিগকে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত মান্য কর। আমরা যতই অধিক রাজভক্ত হইব, তত আমরা আমাদের শাসনকর্ত্তাদের সাহায্যে নৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইব, ইহাও ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় যে, ভারতবর্ষ তাহার বর্তমান পতিত অবস্থায় ইংলণ্ডের পদতলে বসিয়া বহুদিন পাশ্চাত্য শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিবে। অপর দিকে দেখ, ইংলণ্ড পক্ককেশ ভারতের পদতলে বসিয়া এ দেশের প্রাচীন সাহিত্য শিক্ষা করিতেছে, এবং বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্যের ভিতর হইতে অপ্রকাশিত অমূল্য রত্ন সকল সংগ্রহ করিবার জন্য সমস্ত ইউরোপ ভারতের প্রাচীন বস্তু গুলির দিকে মনোযোগ দিয়াছেন। এই রূপে আমরা ইংলণ্ডের নিকটে বর্তমান বিজ্ঞান শিক্ষা করিতেছি, অপর দিকে ইংলণ্ড ভারতের নিকট অপর জ্ঞান শিক্ষা করিতেছেন। মহাশয়গণ, ভারতে ইংরাজ জাতির আগমনে বিচ্ছিন্ন ভ্রাতাদের মিলন দেখিতে পাই; অর্থাৎ এই দুই জাতি আর্য্যজাতির দুইটি ভিন্ন পরিবার হইতে সম্ভূত। সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের বিধানে, স্বর্গের সুনিয়মে কতকগুলি মহদুদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য এই ভারতে সেই দুই জাতি মিলিত হইয়াছে। ইংলণ্ড ও ভারত রাজনৈতিক ও সামাজিক নীতিবিষয়ে পরস্পর আদান প্রদান করিয়া যথার্থ উন্নতি ও অক্ষয় গৌরব লাভ করে ভগবানের ইচ্ছা। আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি, রাজকীয় সভাতে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে ও তাঁহার প্রতিনিধিকে এদেশের রাজা মহারাজগণ মিলিত ভাবে সম্মান প্রদান করিয়াছেন। আমরা তখন আরও অধিক আনন্দিত হইব, যখন দেখিব, ভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা ও জন সাধারণ এবং ইংরাজজাতি একটি বৃহৎ মিলিত দলে, সকল রাজার রাজা ও সকল প্রভুর প্রভুর সিংহাসনের সম্মুখে মিলিত হইবে। ইংলণ্ড তাহার পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান যথা সাধ্য দান করিয়া আমাদিগকে সেই সম্পূর্ণতার নিকটবর্ত্তী হইতে সাহায্য করুক। ভারতে ইহাই তাহার (স্বর্গের প্রেরিত) কার্য্য। সে যেন এই কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে পারে। ইংলণ্ড তাহার পরিশ্রম ও শিল্প তাহার কার্য্যকরী বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক দর্শন আমাদিগকে প্রদান করুক, যাহা এদেশের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যে দেশ কুসংস্কার

দ্বারা ভয়ানকরূপে আচ্ছন্ন। কিন্তু আমরা আমাদেরর প্রাচীন ঋষি মুনিদিগের কথা ভুলিয়া যাইব না। হে ভারতের পূজনীয় প্রাচীন যোগিগণ,আমাদিগকে যোগ ভক্তি বৈরাগ্য শিক্ষা দাও। ইংলণ্ড আমাদিগকে অভ্রান্ত দর্শনশাস্ত্রের মতে দীক্ষিত করুক। আর্য্যদিগের এই ভারতের মুনিগণ আমাদিগকে স্বর্গের উন্মত্ততা দান করুন। আধুনিক ইংলণ্ড আমাদিগকে কঠিন বিজ্ঞান শিক্ষা দিক ও প্রাচীন ভারত সুমিষ্ট কাব্য শিক্ষা দিক্। আধুনিক ইংলণ্ড রচনা শিক্ষা দান করুক, এবং এই সুবিস্তৃত পূর্ব্ব দেশ তাহাতে মনোহর বর্ণ দান করুক। এই স্বর্গীয় মত গ্রহণ কর, যাহাতে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, মনোহর, সুমিষ্ট তাহা পাইবে; যাহা দৃঢ় ও গভীর ভিত্তির উপর স্থাপিত, যাহাতে সত্য ও প্রেম মিলিত হইবে। কিন্তু দর্শন বিজ্ঞান শিক্ষিত ও মত্ততা দ্বারা দীক্ষিত কেবল পঞ্চাশ জন যুবককে আমাদের দাও, তাহারা ঈশ্বরের সৈন্য হইয়া চতুর্দ্দিকে গমন করুক, জয় লাভ করুক, এবং পূর্ণ সময়ে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সত্যের পতাকা উড্ডীয়মান করুক।"

পূর্ব্ব ও পশ্চিমের নারীবৃন্দ।

২য়।

কন্যার বাল্যকালে বিবাহ ভারতের পূর্ব্ব প্রদেশে যেরূপ প্রচলিত, পশ্চিম প্রদেশেও সেই রূপ প্রচলিত, "অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্। নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্।" অর্থাৎ পতিমর্য্যাদা ও পতিসেবা অপরিজ্ঞাতা এবং ধর্ম্মশাসনজ্ঞানশূন্যা এমন কন্যাকে পিতা বিবাহ দিবেন না। হিন্দুরা এই শাস্ত্রীয় বচন শাস্ত্রীয় বিধি মান্য না করিয়া শিশু অবোধ বালিকাদিগকে পাত্রস্থা করিতেছেন। তবে পশ্চিম প্রদেশ ও বিহারএবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবে একটি সুনিয়ম আছে যে, বাল্যকালে কন্যার বিবাহ হইলেও যে পর্য্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্তা না হয় পিতা মাতা তাহাকে তাহার স্বামিগৃহে প্রেরণ করে না। বিবাহিতা বয়ঃস্থা কন্যা যে দিন পিত্রালয় হইতে স্বামি-গৃহে প্রথম গমন করে সেই দিন তাহার পিত্রালয়ে ভোজোৎসব হয়, আত্মীয় স্বজনেরা নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করে ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দেয়। এই ব্যাপারকে বিহারী লোকেরা "গহেনা" বলে। পঞ্জাবে শিখ সম্প্রদায়স্থ পিতা মাতা বাল্যকালে পুত্র কন্যার সম্বন্ধ স্থির করে, বাগ্‌দান করিয়া থাকে। সেই বাগ্দান ও অঙ্গীকার কোন কারণে ভঙ্গ হইতে পারে না। পরে পুত্র কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা মাতা তাহাদিগকে বিবাহ দিয়া থাকে। পূর্ব্বাঞ্চল বঙ্গদেশে হিন্দু সমাজে সচরাচর বালিকাদের বিবাহ হয়। পিতামাতা বিবাহের পরই বালিকাকে স্বামীর সঙ্গে একত্র বাস করিতে দেয়। ইহা অতি কুৎসিত নিয়ম। সর্ব্বদা ইহার কুফল ফলিতেছে। ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড ল্যান্‌স ডাউন এদেশের মঙ্গলের জন্য, বিশেষ ভাবে বালিকাদের কল্যাণের জন্য, এই রূপ আইন বিধিবদ্ধ করেন যে,

ন্যূনকল্পে দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ না হইলে কোন বালিকা স্বামীর সঙ্গে বাস করিতে পারিবে না।

পূর্ব্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গে হিন্দু-বিবাহে প্রণালী-গত ও স্ত্রী আচারাদিতে কিছু ভিন্নতা আছে। পূর্ব্ব বঙ্গে বহির্ভবনে সাধারণ লোকের সমক্ষে উদ্বাহানুষ্ঠান হইয়া থাকে, পশ্চিম বঙ্গে বাড়ীর ভিতরে সেই শুভ কার্য্য সম্পাদিত হয়; সাধারণ লোকে বিবাহ সভায় যোগ দান করিতে পারে না। বিহার অঞ্চলে গোপনে বিবাহ হয়, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ বিবাহে যোগ না দিয়া বাহিরে নাচ গান ইত্যাদি আমোদের ব্যাপারে যোগ দান করে। পূর্ব্ববঙ্গে বিবাহাদি সমুদায় শুভানুষ্ঠানে ও দেবার্চ্চনার সময় মহিলারা হুলুধ্বনি করেন, পশ্চিম বঙ্গের মহিলারা শঙ্খ ধ্বনি করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব বঙ্গের মেয়েরা শাঁখ বাজান পুরুষোচিত কার্য্য বলিয়া তদ্বিষয়ে উপেক্ষা করেন। হুলুধ্বনিতে তাঁহারা বিশেষ অনুরাগ ও দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কোন প্রসূতি সন্তান প্রসব করিবামাত্র হুলুধ্বনি হয়। পুত্র সন্তান হইলে অবিরাম পাঁচ বার কন্যা সন্তান হইলে চারি বার উচ্চ হুলুধ্বনি করা হয়। সেই হুলুধ্বনি শুনিয়া সন্নিহিত গ্রামান্তর স্থিত লোকেরা পুত্র হইয়াছে না কন্যা হই-হইয়াছে স্থির করিতে পারে। শ্রীহট্টের জিলাতেই হুলুধ্বনির বিশেষ প্রভাব। কোন নূতন কুটুম্ব গৃহে উপস্থিত হইলে মেয়েরা হুলুধ্বনিপূর্ব্বক তাহাকে বরণ করিয়া লয়, সঙ্গীতও করিয়া থাকে। যখন বালক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার জন্য গমন করে তখন হুলুধ্বনি করিয়া তাহাকে বিদায় দান করিয়াছে, এবং পরীক্ষা দিয়া প্রত্যাগত হইলে মা ভগিনী হুলুধ্বনি করিয়া গ্রহণ করিয়াছে এরূপ দেখা গিয়াছে। হুলুধ্বনিকে পূর্ব্ব বঙ্গের মেয়েরা জোকার (জয়কার) বলে। ইহাকে অনেকে জয়ধ্বনিও বলিয়া থাকে। কাছার ও গৌহাটী অঞ্চলে এক প্রকার পক্ষী আছে, সেই পক্ষী প্রাতঃ সন্ধ্যা ও রাত্রিতে অবিকল হুলুধ্বনির ন্যায় ধ্বনি করিয়া থাকে, সেই ধ্বনি শুনিয়া অনেক সময় মেয়েরা জোকার দিতেছে বলিয়া ভুল হয়। সেই পাখীকে "জোকারে পাখী" বলে। আমাদের মনে হয় পূর্ব্ববাঙ্গলার মেয়েরা সেই জোকারে পাখীর নিকটে জোকার শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা দুই জনে মিলিয়া অতি তারস্বরে হুলুধ্বনি করিয়া থাকেন। পশ্চিম বঙ্গের মহিলারা হুলুধ্বনি করিতে জানেন না বলা যায়। কখন কখন তাঁহারা চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুই হয় না। তাঁহাদের বিকৃত হুলুধ্বনি শুনিয়া হাস্য সংবরণ করা যায় না। পূর্ব্ব বঙ্গের শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা অঞ্চলের মেয়েরা দলবদ্ধ ভাবে গঙ্গাস্নানার্থ বাহির হইয়া বা কাশীপ্রয়াগাদি তীর্থে যাত্রা করিয়া জাহাজে ও রেলগাড়ীতে পুনঃ পুনঃ হুলুধ্বনি করিয়া থাকে। গঙ্গাতীরে তাহাদের সেই হুলুধ্বনি শুনিয়া বাঙ্গাল মেয়েরা আসিয়াছে বলিয়া এদেশের লোকেরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দৌড়িয়া দেখিতে যায়। যাহা হউক জোকারের কথা অনেক দূর গড়াইল, এক্ষণ প্রকৃত পথে আসা যাউক।

পশ্চিম বঙ্গে পাত্রীর পিতৃভবনেই বিবাহ হয়। যথা সময়ে সবান্ধবে বর আসিয়া বিবাহ করিয়া নবপত্নীকে নিজগৃহে লইয়া যান। কন্যাকর্ত্তা অর্থসম্পন্ন হউন বা নির্দ্ধন হউন, তাঁহাকে নিজগৃহে কন্যা সম্প্রদান এবং যেরূপে হউক বিবাহের সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেই হয়। পূর্ব্ব বঙ্গে এরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। কন্যাকর্ত্তা নির্দ্ধন হইলে বরকর্ত্তা লোক জন বাদ্যো-দ্যমসহকারে বিবাহের দুই এক দিন পূর্ব্বে পাত্রীকে নিজগৃহে আনয়ন করিয়া নিজব্যয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করেন। কন্যাকর্ত্তা বরকর্ত্তার ভবনে যাইয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়া যান। এইরূপ বরকর্ত্তার গৃহে সচরাচর উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা এই ব্যাপার শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হন। পূর্ব্ব বঙ্গে বিবাহে মুখচন্দ্রিকা হয়, পশ্চিম বঙ্গে তাহা হয় না। অন্তঃপুর হইতে পাত্র ও পাত্রীকে বিবাহসভায় উপস্থিত করা হইলে, দুই জনকে দুইখানা বড় পীঁড়িতে বসাইয়া চারি জন করিয়া লোক সেই পীঁড়ি ধরিয়া পরস্পর সম্মুখীন ভাবে ঊর্দ্ধে মস্তকের উপর ধারণ করে। কন্যার কোঁছড়ে সুগন্ধি কুসুমপুঞ্জ থাকে। তিনি বরের উপর পুষ্প-বর্ষণ করিতে থাকেন। পুষ্পবর্ষণের সময় কন্যা করতলদ্বয় ও অঙ্গুলিপুঞ্জ আশ্চর্য্য ভঙ্গিতে সঞ্চালন করিয়া থাকেন। কন্যাকে এই পুষ্প বর্ষণ ক্রিয়া পূর্ব্বে শিক্ষা করিতে হয়। ইহাকে "ফুল ছিটান" বলে। বর নিজের প্রতি বর্ষিত পুষ্প আঘ্রাণ করিয়া পাত্রীর প্রতি নিক্ষেপ করেন। তখন উভয়ে পরস্পরের মুখমণ্ডল স্থির দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া থাকেন। এদিকে বাদ্যধ্বনি ও মহিলাদের হুলুধ্বনি ও সঙ্গীত হইতে থাকে। ইহাকে বলে মুখ-চন্দ্রিকা। পাত্র ও পাত্রীর পরস্পর মুখা-বলোকনোদ্দেশ্যে এই ব্যাপার হয় বলিয়া ইহার নাম মুখচন্দ্রিকা হইয়া থাকিবে। মুখচন্দ্রিকার অন্তে পাত্র ও পাত্রীকে সভাতে উপবিষ্ট করা হয়, তখন উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা ও সম্প্রদানাদি হইয়া থাকে।

পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলাতে এবং পশ্চিমাংশ ব্যতীত সমস্ত ঢাকা জিলাতে বিবাহাদি শুভ ক্রিয়া উপলক্ষে ৫।৭ দি পূর্ব্ব হইতে প্রতিদিন অপরাহ্নে অন্তঃপুরস্থ মহিলারা দুই দুই জনে দুই দলে বদ্ধ হইয়া ৩।৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তার স্বরে সঙ্গীত করিয়া থাকে, তাঁহাদের সঙ্গীতে অনেক সময় প্রাণ আকুল হয়, তখন ছুটে পলায়ন করিলে বাঁচা যায়। বিহার অঞ্চলে বিবাহাদি শুভ ক্রিয়া উপলক্ষে অন্তঃপুরস্থ মেয়েরা ঢোলক বাজাইয়া সঙ্গীত করেন। পূর্ব্ব বঙ্গে মহিলা-সঙ্গীতের সঙ্গে কোন বাদ্যের সংস্রব থাকে না।

একবার আমরা কাছাড়ের সবডিভিজন হাইলাকাঁথিতে গিয়াছিলাম। তত্রত্য একজন বন্ধু আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, কিছু দিন হইল এখানে একটি ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রী স্থানীয়, পাত্র বিক্রমপুরনিবাসী। আমরা বরযাত্রী হইয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। বিবাহের পর নব বধূ বরযাত্রীদিগের সন্তোষ

বিধান বা সম্বর্দ্ধনার্থ সভায় নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করিয়াছিলেন। আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই, লজ্জায় সভা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলাম।" এইরূপ নব বধূর নৃত্য পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কোথাও হয় না, অন্য কোন গৃহস্থ মেয়েও নাচে না।

ক্রমশঃ

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

ঝান্‌সি নগর।

আমরা সীতাপুর হইতে লক্ষ্ণৌ নগরে প্রত্যাগমন করিয়া বিগত ২০শে বৈশাখ বুঁদেল খণ্ডের প্রধান নগর ঝান্‌সিতে যাত্রা করি। ঝান্‌সি নগরে আমরা পূর্বে কখনও যাই নাই। তথাকার কাহারও সঙ্গে আমাদের আলাপ পরিচয় ছিল না। আমরা কলিকাতায় অবস্থান কালে ঝান্‌সিতে গিয়াছেন এমন একজন বন্ধুকে বলিয়াছিলাম, এবার ঝান্‌সি নগরে যাওয়া সঙ্কল্প, কিন্তু সেই স্থান সম্পূর্ণ অপরিচিত, তথাকার কাহারও সঙ্গে আলাপ পরিচয় নাই। তিনি এই কথা শুনিয়া ঝান্‌সিস্থিত তাঁহার এক জন আত্মীয়কে আমাদের পরিচয় দান করিয়া আমরা যে তথায় যাইতে ইচ্ছুক জ্ঞাপন করেন। তিনি তদুত্তরে এই মর্ম্মে একখানা পোষ্টকার্ড প্রাপ্ত হন, "আপনার পত্রোল্লিখিত বন্ধু আমাদের বাড়ীতে আসিলে, আমরা সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিব।" সেই পোষ্টকার্ডে "মুনীন" মাত্র স্বাক্ষর ছিল। পূর্ব্বাহ্ণে ভোজনান্তে লক্ষ্ণৌ হইতে মেইল ট্রেণে ঝান্‌সিতে যাত্রা করা হয়। তখন লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে উত্তাপ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, লু চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই সময়ে ঝান্‌সিতে যে লক্ষ্ণৌ অপেক্ষা অনেক বেশী উত্তাপ, আমরা মনে করিতে পারি নাই। বেলা দুইটার সময় ঝান্‌সি ষ্টেশনে পঁহুছান যায়। তখন প্রখর রৌদ্র ও ভীষণ গ্রীষ্ম ছিল, উষ্ণ বায়ু (লু) প্রবল বেগে চলিয়াছিল। ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়াই একখানা টাঙ্গা ভাড়া করা যায়। আমরা ভাবিয়াছিলাম ষ্টেশনের পার্শ্বেই নগর, শকটচালককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, ষ্টেশন হইতে নগর তিন মাইল দূরে, বিস্তীর্ণ মাঠ পার হইয়া যাইতে হইবে। খোলা গাড়ী, এদিকে ভয়ঙ্কর উত্তাপ, ভাবনা হইল। গাড়োয়ানকে বলা গেল, মুনীন্দ্র বাবুর বাড়ীতে চলিয়া যাও। গাড়োয়ান মুনীন্দ্র বাবুকে কিছুই জানে না, জিজ্ঞাসা করিল মুনীন্দ্রবাবু কি কর্ম্ম করেন, তাঁহার পুর্ণ নাম কি, এবং তিনি কোন্ পল্লীতে থাকেন। আমরা মুনীনমাত্র জানি, শকটচালকের প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া বলিলাম, তুমি শহরে যাইয়া কোন বাঙ্গালী বাবুকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিয়া দিতে পারিবেন। তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যেন আগুনের ভিতর দিয়া নগরে পঁহুছান গেল। গাড়োয়ান একজন বাঙ্গালী বাবুর বাসা খুঁজিয়া সেখানে গাড়ী উপস্থিত করিল। তৃষ্ণায় আমাদের ওষ্ঠাগত প্রাণ, বাবুটি বাহিরের বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন। আমরা শকট হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া মুনীন্দ্র বাবুর বাসা

কোথায় জিজ্ঞাসা করিলাম। বাবুটির নাম গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস, তিনি এক জন স্কুল-মাষ্টার। উক্ত বাবু আমাদের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "আপনি স্থির হইয়া এই চেয়ারে বসুন, মুনীন্দ্র বাবুর বাসার পরিচয় পরে পাইবেন।" ইহা বলিয়াই তিনি অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন, এক গ্লাস শরবত ও একগ্লাস ঠাণ্ডা জল আমাদের জন্য লইয়া আসিলেন। আমরা শরবত পান করিলে পর তিনি, কে মুনীন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার বিষয় অনেক প্রশ্ন করিলেন। আমরা প্রশ্নের কোন উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া সঙ্গের সেই পোষ্টকার্ড খানা তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। তাহাতে মুনীন মাত্র স্বাক্ষর ছিল, তিনি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিয়া উঠিলেন, এক্ষণ বুঝিতে পারিলাম, বাবু যদুনাথ চৌধুরীর বালক মুনিন। তখন তিনি গাড়োয়ানকে বলিলেন, "পাঁচ কোওয়ার নিকটে ঝাড়িয়া হাবিলীনামক বাড়ীতে যদুনাথ বাবু বাস করেন, তুমি এই বাবুকে সেখানে লইয়া যাও।" বিশ্বাস মহাশয়ের আবাস হইতে ঝাড়িয়া হাবিলী প্রায় এক মাইল দূরে। সেখানে যাওয়া গেল। গৃহস্বামী যদুনাথ বাবু অন্তঃপুরে ছিলেন, তিনি সংবাদ পাইয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন। আমরা তাঁহাকে পোষ্টকার্ড খানা পড়িতে দিলাম। তিনি তাহা পড়িয়া বলিলেন, "মুনীন আমার পুত্র, সে ওকালতী পরীক্ষায় পাস হইয়া ওকালতী আরম্ভ করিয়াছে, এক্ষণ আফিসে আছে। আপনি আসিয়াছেন, সুখী হইলাম। এই বাড়ী আপনার নিজের বাড়ী বলিয়া মনে করিবেন।" ইহা বলিয়া তিনি আমাদিগকে বহির্ভবনের একটি প্রশস্ত ঘরে লইয়া গিয়া সেখানে অবস্থানের ব্যবস্থা করিলেন, এবং তৃষ্ণা-নিবৃত্তির জন্য শরবত ও ঠাণ্ডা জল আনিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে আফিস হইতে মুনীন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া ও আমাদের পরিচয় পাইয়া বলিলেন, "আপনি এই সময়ে ঝান্সিতে আসিবেন আমি পূর্ব্বে জানিলে আসিতে নিষেধ লিখিতাম। এক্ষণ এখানে বেড়াইবার সময় নয়। উত্তাপের জন্য দিবারাত্রি বড় কষ্ট।"

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চৌধুরী ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব। ইনি একজন পরিণতবয়স্ক Retired Engineer, সাহসী উৎসাহী উপযুক্ত লোক। ইহার যত্ন চেষ্টায় বড় বড় হাসপাতাল স্কুলস্থাপন ও দুর্ভিক্ষ নিবারণাদি হইয়াছে। সৎসাহসের জন্য গভর্ণমেণ্টে ইহার বিশেষ খ্যাতি ও পরিচয় আছে। ইনি বিশুদ্ধ রূপে উর্দ্দু বলিতে পারেন। যদুনাথ বাবু অত্যন্ত আলাপী পুরুষ; ইহার পূর্ব্বনিবাস কলিকাতার নিকটে পল্লীবিশেষে, ইনি কিয়ৎকাল হইতে বঁাদেল-খণ্ডনিবাসী হইয়া পড়িয়াছেন, সপরিবারে ঝান্সিতে বাস করিতেছেন। ইহার দুই পুত্র, এক জামাতা উজ্জয়িনী ও বলন্দ-শহর এবং গোওয়ালিয়রেতে উচ্চ পদে নিযুক্ত আছেন।

চৌধুরী মহাশয়ের গৃহের পার্শ্বেই পাঁচ কুওয়া অর্থাৎ পরস্পর সংলগ্ন পাঁচটি বৃহৎ ইঁদারা। এই উত্তাপের সময়ে সেই ইঁদারা সকল ঝান্সিনিবাসীদিগের এক

প্রকার জীবন রক্ষা করে। একটি ইঁদারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর লোকের জন্য, একটি ডোম চণ্ডালাদি নিম্ন শ্রেণীর লোকের, একটি মোসলমানের জন্য, একটি অপর জাতীয় লোকের জন্য, একটি গো গর্দ্দভাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট। রাত্রি ৪টা হইতে বেলা ৮৷৯ টা পর্য্যন্ত, অপরাহ্ণ ৪।৫ টা হইতে৭।৮টারাত্রিপর্য্যন্তসেই সকল ইঁদারাতে জলপ্রার্থী নগরবাসী সহস্র সহস্র স্ত্রী পুরুষের ভিড় হয়। নগরের প্রায় সমস্ত পল্লার স্ত্রীলোক পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে জলের জন্য সেই পাঁচ কুওয়ায় উপনীত হইয়া থাকে। বহুদূর হইতে তাহাদের কলরব এবং জল উঠাইবার চক্রের ঘর্ঘর শব্দ শ্রুত হওয়া যায়। পাঁচকুওয়ার জল অতি নির্ম্মল, স্বরস এবং বরফ জলের ন্যায় সুশীতল। সেই তীব্র উত্তাপের সময় পাঁচকুওয়া আমাদের জীবন রক্ষা করিয়াছে। দিবা রাত্রি পুনঃ পুনঃ জল পান করিতে হইয়াছিল। অনেক বার জলপূর্ণ সোরাহি শূন্য হইয়া গিয়াছিল। শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত আদাইর পল্লীতে মহিলাবিশেষ হইতে উপহার প্রাপ্ত বীজন আমাদের সঙ্গে ছিল, ঝান্সিতে তাহা বিশেষ উপকারে আসিয়াছিল। কেন না বীজনসঞ্চালনের নিবৃত্তি ছিল না, তৃষ্ণানিবারণার্থ জলপানেরও বড় বিরাম ছিল না। ঝান্সির ন্যায় উত্তপ্ত স্থানে পাঁচকুওয়ার শীতল জল বিধাতার বিশেষ দান। যাহারা এস্থানে বাস করে, চির অভ্যাসবশতঃ আমাদের ন্যায় তাহাদের সেই তীব্র গ্রীষ্ম অসহ্য নয়।

সুস্থ সবল সুগঠিত তনু (অনেকে সালঙ্কারা) ঝান্সির রমণীগণ দুই তিনটি বৃহৎ আধারে দেড় মন দুই মন জল মস্তকে ধারণপূর্ব্বক দলে দলে প্রফুল্ল মনে পরস্পর গল্প করিতে করিতে পাঁচকুওয়া হইতে রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বাঙ্গালী মহিলাদিগের শারীরিক দুরবস্থা ও অবনতি ভাবিতাম, ভাবিয়া মনে বড় ক্লেশানুভব করিতাম। প্রায়ই তাঁহারা স্বাস্থ্য সম্পদ্-বিহীনা চিররুগ্না ক্ষীণাঙ্গী, অনেকে বিংশতি বৎসর বয়সের মধ্যেই বৃদ্ধাকৃতি প্রাপ্তা। কেহ বা দশ বার বৎসর বয়স হইতেই চশমা ধারণ করিয়াছেন, নতুবা দেখিতে পান না। আজ শিরঃপীড়া, আজ অম্ল রোগ, আজ পেটে ব্যথা, আজ জ্বর, তাঁহাদের দেহের সঙ্গে একটা না একটা রোগ সংলগ্ন আছেই। শরীরে স্ফূর্ত্তি নাই, মনেও স্ফূর্ত্তি নাই। অনেকে সুতিকাসংক্রান্ত রোগে চিররুগ্না। জীবন ভারবহ হইয়াছে,তাঁহারা কাজ কর্ম্মের বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। বাঙ্গালী মহিলাদের ন্যায় দৈহিক দুরবস্থা সমগ্র পৃথিবী খুঁজিলেও বোধ হয় কোন দেশের নারীর পাওয়া যায় না। বাল্যবিবাহ, অনুপযুক্ত বয়সে সন্তান প্রসব, অন্তঃপুরে চিরাবরোধ, এবং দেহসঞ্চালনের অভাব, শরীরের প্রতি অযত্ন ও নানা শারীরিক অনিয়মাদি এইরূপ স্বাস্থ্যহানি ও দুর্ব্বলতার এবং অকাল বার্দ্ধক্যের প্রধান কারণ। আবার কলেজস্কুলাদিতে কোমলাঙ্গী বাঙ্গালী নারীর পুরুষোচিত কঠিন শিক্ষা স্বাস্থ্যনাশের কারণ হইয়াছে।

এই ঝান্সি নগরের উপকণ্ঠে ইতস্ততঃ তরুলতিকাদিশূন্য প্রস্তরময় অনুচ্চ

উপশৈল সকল বিদ্যমান। সেই সকল শিলোচ্চয় সূর্য্যোত্তাপে অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। ঝান্‌সিতে উত্তাপ অপর সকল স্থান অপেক্ষাঅধিক হওয়ার ইহাই কারণ। তখন উত্তাপ ১১৫ বা ১২০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হইয়া থাকিবে। ঝান্‌সির লোক সংখ্যা ৬০ হাজার। মোসলমানের সংখ্যা অতিশয় অল্প। এই ভীষণ উত্তাপের মধ্যেও দুইটী বক্তৃতা করা গিয়াছিল। একটী বাঙ্গলাতে একটি উর্দ্দুতে হইয়াছিল। লোক জন অধিক হয় নাই। এস্থানে বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে ৫০।৬০ জন বাঙ্গালী বাস করিতেছেন। এ নগরের বাজার সুবৃহৎ, পণ্যশালা গুলি সুপ্রণালী-মতে শ্রেণীবদ্ধ। অন্যান্য নগরের বাজারে গেলে দেখ যায় মুদি দোকানের পার্শ্বেই মুচির দোকান, মাংসের দোকানের সংলগ্ন ময়রার দোকান, এখানকার বাজারে সেরূপ অব্যবস্থা নাই। বাজারের এক এক স্থানে এক এক শ্রেণীর পণ্যশালা শ্রেণীবদ্ধ। যে স্থানে কাপড়ের দোকান শ্রেণীবদ্ধরূপে আছে, তাহার ভিতরে আর জুতার দোকান বা কসাইয়ের দোকান নাই। মুচির দোকান আর ময়রার দোকান পরস্পর সংলগ্ন নয়। এক স্থানে দৃষ্ট হইল রাস্তার উভয় পার্শ্বে নিরবচ্ছিন্ন শত শত শেখরার দোকান। সেই স্বর্ণকারদের বিপণী শ্রেণীর দুই প্রান্তে দুইটি তোরণ, রাত্রিকালে সেই তোরণ অবরুদ্ধ থাকে। বাহির হইতে চোর আসিয়া যে স্বর্ণ রৌপ্য চুরি করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। ঝান্‌সির শিল্প দ্রব্যের মধ্যে গালিচা প্রসিদ্ধ।

নগরের ভিতরেই পুরাতন বৃহৎ দুর্গ। দুর্গের পার্শ্বেই ঝাড়িয়া হাবিলী; সেখানে আমরা চারি দিন বাস করিয়াছিলাম। ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজ্ঞী লক্ষ্মীবাই এবং তাঁহার স্বামী রাজা গঙ্গাধর রাও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব ছিলেন। গঙ্গাধর রাওয়ের রাজত্বের আয় ১০।১২লক্ষ টাকা ছিল। তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইলে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহিতার সময় রাজ্ঞী লক্ষ্মীবাই বিপন্ন ও নিহত হন। তখন তাঁহার ২৬।২৭ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল, তিনি বিদ্রোহী সিপাহীদিগের সঙ্গে যোগদান করেন নাই, নিজে বিদ্রোহী হন নাই, অন্তরে ইংরাজদের সঙ্গে সদ্ভাব পোষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত প্রদেশের অন্তর্গত পিকমপুরের রাজার সঙ্গে তাঁহার শত্রুতা ছিল। সেই রাজার কৌশল-চক্রে পড়িয়া রাণী মারা যান। বিদ্রোহী বলিয়া ইংরাজ সৈন্য যাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। এইরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, তিনি গবর্ণমেণ্টকে এই ভাবেপত্রলিখিয়াছিলেন,আমার রাজ্যসম্পত্তি এক্ষণ নিরাপদে, তাহার ভার গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করুন, আমি রাজ্য সম্পদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে চাহি না। কাণপুরে তখন গবর্ণমেণ্টসংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। রাণীর পত্রসহ একজন সোওয়ার কাণপুরে যাত্রা করিয়াছিল। পিকমপুরের রাজা তাহা জানিতে পারিয়া পথে সেই পত্রবাহককে বধ করিয়া পত্র ছিন্ন করিয়া ফেলে, এবং পত্রের মর্ম্মের বিপরীত কথা রাজপুরুষের কর্ণগোচর করে। ইতিমধ্যে রাণী গোয়ালিয়ারে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানেই নিহত হন।

ঝান্‌সি নগর হইতে ২৪শে বৈশাখ লক্ষ্ণৌনগরে যাত্রা করা যায়। বেলা ১॥টা বা ২টার সময়ে মেল ট্রেণ, রাত্রিতে বা অন্য কোন সময়ে ট্রেণের সুবিধা ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নকালে ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করি। তখন লু চলিয়াছিল, সেই সময় টাঙ্গা বা অন্য কোনরূপ খোলা গাড়ীতে গেলে বিপদের আশঙ্কা ভাবিয়া চৌধুরী মহাশয় হইতে স্থূল পরদায় আচ্ছাদিত তাঁহার বৃহৎ গো-শকট গ্রহণ করা গিয়াছিল। বিষাক্ত বায়ু লুজনিত সাঙ্ঘাতিক পীড়ার উপক্রম হইলে তৎপ্রতীকারার্থ শরবত প্রস্তুত করিয়া পান করিবার জন্য কতক গুলি দগ্ধ কচি আম ইত্যাদি চৌধুরী মহাশয় সঙ্গে দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার উপদেশমতে উভয় কর্ণ আবৃত করিয়া মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন ও বক্ষঃস্থল আচ্ছাদিত করা গিয়াছিল। কেন না কর্ণ ও বক্ষঃস্থলে লু লাগিলে সচরাচর সর্দ্দি গরমীর পীড়া হয়, এবং তাহাতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কুশলমতে ৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ষ্টেশনে পঁহুছান যায়। আমরা সন্ধ্যার পর লক্ষ্ণৌনগরে প্রত্যাগত হই। ২৬শে বৈশাখ সায়ংকালে লক্ষ্ণৌ হইতে দেরাদুনাভিমুখে যাত্রা করা যায়।

মহিলাদিগের রচনা।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামাজিক শাসন।

এক সময় ছিল যখন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির কেবল স্বাধীনতা কেন, জীবন পর্য্যন্ত সমবেতমণ্ডলীর ক্ষমতার অধীন ছিল। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এপ্রথা এখনও বিদ্যমানআছে। তখন সমাজের নেতার হাতে প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত স্বাধীনতা ন্যস্ত থাকিত। যিনি পিতা ছিলেন, তিনিই পুরোহিত ও রাজা ছিলেন। কাজেই সমাজের সকলের জীবন মরণের উপর সমাজনেতার অবাধ অধিকার ছিল। সামাজিক আদর্শের নিকট ব্যক্তিগত আদর্শ বলিদান দিতে হইত। বিদেশ হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশে ব্রাহ্মসমাজকে বেষ্টন করিয়া যে প্রবল শক্তিশালী হিন্দু সমাজ দণ্ডায়মান, যাহার জীবন বহু শতাব্দী ব্যাপী, তাহার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মাত্রা বড়ই অল্প। সামাজিক নিয়ম হিন্দুদিগের হাত পা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সেই এক বিষম দাসত্বের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আমরা বাঁচিয়াছি।

শৈশবাবস্থায় পিতা মাতার শাসনের অত্যন্ত প্রয়োজন। জ্ঞানহীন বালকেরা নিজের কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বুঝেও না, এবং বুঝিলেও চরিত্রের যথেষ্ট বল না থাকায় যাহা ভাল বলিয়া মনে করে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। অতএব তরুণ বয়সে অভিভাবকের অধীনতার মূল্য আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আবার অত্যধিক অধীনতা অনেক ক্ষতির কারণ হয়। যতদিন পর্য্যন্ত বীজ অঙ্কুরিত না হয় ততদিনই কঠিন আচ্ছাদনের প্রয়োজন থাকে। কিন্তু অঙ্কুরিত হইলে যদি আমরা কোন বৃক্ষকে আচ্ছাদিত করিয়া দিই, তাহার

বুদ্ধি একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। যত দিন পর্য্যন্ত পক্ষিশাবক পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত না হয় ততদিনই ডিম্বের আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু শরীর পূর্ণায়ত ও সবল হইলে সে তাহার অন্ধকারময় কারাগৃহ ভগ্ন করিয়া আহ্লাদে মুক্ত আলোকে প্রবেশ করে, এবং মুক্ত বায়ু সেবন করে। মানবজাতির অপরিণতাবস্থায় সমাজের এত অধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এত অভাব। কিন্তু যতই সভ্যতার বিস্তার হইয়াছে ব্যক্তিগত জীবনের মূল্য তত বাড়িয়াছে। সমাজের অধিকার ও শাসন ততই কমিয়াছে।

আমাদের সকলের মধ্যে মুক্তির জন্য কি এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। জ্ঞানের তৃষ্ণা, ভালবাসার প্রসারের জন্য আকুল ব্যস্ততা, নিজের এবং জগতের উপর আধিপত্যের জন্য অশ্রান্ত চেষ্টা, সবই এই এক বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। প্রত্যেক বীজের অঙ্কুরিত হইবার জন্য, প্রত্যেক মুকুলের বিকশিত হইবার জন্য, প্রত্যেক জীবের আত্মবিকাশের জন্য জ্ঞানে অজ্ঞানে অদম্য ব্যাকুলতা। জগতের যত গতি, যত কার্য্য, যত ব্যস্ততা আত্মপ্রসার জন্য, আপনার সংকীর্ণ জীবন হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য। এই ব্যাকুলতার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না। কারণ ইহাই আমাদের নিয়তি এবং মঙ্গলময় পরম পিতার পবিত্র বিধি। জ্ঞান, পুণ্য ও প্রেমের অকূল সাগরে ভাসিব, অগাধ জলধিতলে ডুবিব, বাধাশূন্য দিগন্তে মুক্ত ভাবে বিচরণ করিব,—হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে এই আকাঙ্ক্ষা উত্থিত হইয়া সমস্ত জীবন, মন, আত্মাকে আচ্ছন্ন করিতেছে। কে তাহাকে বাধা দিবে? নদী যেমন পর্ব্বত ক্রোড় হইতে অবাধ গতিতে, অসীম শক্তিতে, অপার উল্লাসে উপত্যকায় অবতরণ করে, আমাদের স্বভাবও তেমনি ছুটিতেছে মুক্তির জন্য, কোন বাধা মানিবে না। এক দিনে না হয় দুই দিনে, এক বৎসরে না হয় দশ বৎসরে, এ জীবনে না হয় অন্য জীবনে, ইহধামে না হয় দিব্যধামে আত্মা পরিণতি লাভ করিবেই করিবে। যদি সমাজ এ বিষয়ে সহায় হয় ভালই, আর যদি সহায় না হয় সমাজকে অতিক্রম করিয়া আত্মা আপনার নিয়তি অনুসরণ করিবে। প্রত্যেক মানব, কি পুরুষ, কি নারীজাতি, সকলেই প্রকৃতিগত মহাস্বাধীনতার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক দিকে যেমন আমরা অনবরত অবিশ্রাম উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছি, অপর দিকে সেই প্রকার শত শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আমরা নিয়মের অধীন, আমরা নীতির অধীন, আমরা ধর্ম্মের অধীন, আমরা সমাজের অধীন, আমরা মানবমণ্ডলীর অধীন। অনায়াসে হউক বা নাই হউক আমরা এ অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য। ভালবাসা যেমন আমাদের পরিত্রাণের উপায়, এ অধীনতাও আমাদের মুক্তির হেতু। এই অধীনতা আমাদের কত উত্তেজনা, কত অন্যায়, কত বিপথ-গমন, কত স্খলন হইতে দিবানিশি বাধা দিতেছে। এ বাধা অতিক্রম করিলে

মানুষ স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাইত। নিয়ম ও নীতির অধীনতাগুণে মানুষ কি অসীম শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হইয়াছে। ক্রমশঃ

স্থানীয় অঘোর-কামিনী সমিতিতে পঠিত। } শ্রীমতী হামিদা দেবী।

৭ই আগষ্ট ১৯০৫। বাঁকিপুর।

(ভারত দেখিয়া কোন স্বর্গস্থ আত্মার উক্তি *)

সখি, এই কি সেই সোণার ভারত—
এই সেই আমাদের পূর্ব্ব লীল ভূমি॥
উত্তরে হিমাদ্রী দেব প্রশান্ত গম্ভীর—
দক্ষিণে নীরনিধি বহে যায় পদচুমি।
ভাগিরথী বহে স্বচ্ছ করি অঙ্গ যার
সুন্দর শ্যামল শস্য শোভে যার, চারি ধার।
সখি এই কি সেই সোণার ভারত—
যার ঐশ্বর্য্যের ছিলনাক সীমা॥
বিস্ময়ে চাহিত সবে যার পানে?
এবে স্মরি তার সে লুপ্ত গরিমা॥
ঝর ঝর ঝর করি দুনয়ন দিয়া।
টপ্ টপ্ অশ্রু ধারা পড়ে যে বহিয়া॥
সখি, এই কি ভারত মাতা বীর প্রসবিনী,
নিজরক্ত দিয়া যার বীর পুত্রগণ,
অক্লেশে পরমানন্দে স্বাধীনতাতরে
সমর প্রাঙ্গণ মাঝে ত্যেজেছে পরাণ—
জীবন আহুতি দিয়ে ভীষণ সমরে
আনন্দে ত্যেজেছে প্রাণ স্বদেশের তরে॥
সখি, এই কি সেই ভারতজননী—
যাঁর পুত্রগণ প্রতিজ্ঞাপালনে,
আপন তনয়ে দিয়ে বনবাস
সত্যের লাগিয়া ত্যেজেছে জীবন,
পুত্র ও আপন পিতৃসত্য লাগি
গেছে বনবাসে সর্ব্বসুখ ত্যাগী

---

* পূর্ব্ব সংখ্যায় যে বালিকার রচিত পদ্য প্রকাশিত হইয়াছে এই কবিতাও সেই বালিকা কর্ত্তৃক রচিত।

সংবাদ।

ইতিমধ্যে এক দিন নাটোরের রাণী স্বদেশর প্রতি অনুরাগ আকর্ষণ করিবার জন্য মহানগরীস্থ মহিলাদিগকে আহ্বান করিয়া বিরাট সভা করিয়াছিলেন। শ্রুত হইল প্রায় সহস্র মহিলা সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া শূন্যপদে সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাণী অসুস্থতাবশতঃ আসিতে পারেন নাই। তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধ ও অন্য কয়েক জন মহিলার প্রবন্ধ পঠিত হইয়া ছল। বিলাতী ল্যাস ও বিলাতী মূল্যবান্ বস্ত্রাদি এবং অন্যান্য বিদেশীয় জিনিষ পরিত্যাগ করা বিধেয়, এই মর্ম্মে নাকি সেই সকল প্রবন্ধ বা বক্তৃতা লিখিত ছিল। মহিলাদিগের জাঁক জমকের বুট, মুজা, কামিজ, বডি ও শাড়ী ইত্যাদির আড়ম্বর এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্যের ব্যবহার এক্ষণ হইতে কমিয়া গেলে সুখের বিষয় হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সভ্যতার সঙ্গে যোগ ছিন্ন করিয়া কোন সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা সহজ নয়। দুই দিন পরে তাহা কেবল কথাতেই থাকিতে পারে। সত্যভূমির উপর স্বদেশ-প্রেম ও স্বদেশ-হিতৈষণা প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

কলিকাতার আতুরাআশ্রমে এক্ষণ ৩৪টি দুরারোগ্য রোগী আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া সেবিত হইতেছে। উক্ত আশ্রমের সেবক শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ বিশ্বাস ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের কৃতবিদ্য যুবা পুরুষ, তিনি সংসারের সকল প্রকার সুখে জলাঞ্জলি দান

করিয়া দিবা রাত্রি সেই সকল দুশ্চিকিৎস্য রোগীর সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত আছেন। তাহাতেই তাঁহার আনন্দ ও উল্লাস। তিনি ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ধারণ করিয়া দীনহীন বেশে দ্বারে দ্বারে রোগীদের জন্য ভিক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাদ্বারা রোগীদিগের ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করেন। দাতাদিগের নিকট হইতে সাময়িক দানও কিছু কিছু পাইয়া থাকেন। এই রূপ প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়া নিষ্ঠার সহিত সহর্ষে সযত্নে অবিশ্রান্ত রোগীর সেবা করিতে প্রায় কাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সমস্ত প্রায় রোগীই পথে কুড়াইয়া পাওয়া। তিনি তাহাদের পিতৃমাতৃস্থানীয় হইয়া সেবা করেন। আনন্দ নাথ পরম সেবক খ্রীষ্টের আশীর্ব্বাদ ও জীবন্ত সেবার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিছু দিন হইল স্বর্গগত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জন্মদিনোপলক্ষে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী নববিধানপ্রচারাশ্রমের কতিপয় মহিলাকে সঙ্গে করিয়া আতুরাশ্রমে যাইয়া রোগীদিগের জন্য লুচি তরকারী মিষ্টান্নাদি উপহার দিয়া আসিয়াছেন। আতুরাশ্রম দেখিয়া তাঁহারা সকলে অতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রোহিলখণ্ড প্রদেশের অন্তর্গত শাহজাহানপুর একটি ক্ষুদ্র স্থান। সেই স্থাননিবাসীদিগের সমবেত যত্নে এক বৎসরের মধ্যে ১২৫টি বিধবাবিবাহ হইয়াছে। বাঙ্গালী বাবুরা যদি বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন ও বাল্যবিবাহ নিবারণ ইত্যাদি সমাজ সংস্কারকার্য্যে চেষ্টা যত্ন করেন, তাহা হইলে দেশের কল্যাণ হয়। কিন্তু তাঁহারা তাহার বিপরীত চেষ্টা করিয়া থাকেন। ১২ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে কোন বালিকা স্বামীর সঙ্গে বাস করিতে পারিবে না। বিবাহিতা বালিকাদিগের কল্যাণের জন্য এইরূপ রাজবিধি হইতে ছিল, আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্ব দিবস তাহার বিরুদ্ধে বাঙ্গালী বাবুরা দণ্ডায়মান হইয়া ঢেঁড়রা পিটাইয়া বাজারের দোকান পশার বন্ধ করাইয়া লক্ষ লক্ষ লোক সমবেতভাবে তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধির মত-পরিবর্ত্তন করিবার জন্য কালীঘাটে কালীপূজা ও গড়ের মাঠে সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই তো দশা।

মহিলার নিয়মাবলী।

মহিলা পত্রিকা প্রতিমাসের সংক্রান্তি দিবসে প্রকাশিত হয়। ডাক মাশুলসহ ইহার বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ মহিলার মূল্য ও অর্থসম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকটে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক প্রকাশিত হইবে। কাহারও প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া যাইবে না।

অনেকে মহিলা পত্রিকা বৎসরাধিক কাল গ্রহণ করিয়া মূল্য দান করেন না, বড় দুঃখের বিষয়। যাঁহারা মূল্যদানে অসমর্থ তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্রিকা ফেরত পাঠাইয়া দেন, অথবা আমাদিগকে তাহা পাঠাইতে নিষেধ লেখেন। তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া প্রাপ্য মূল্য না পাইলে অনেক সময়ে আমরা সেই মূল্যের জন্য ভি, পিতে মহিলা পাঠাইয়া থাকি।

সূচী।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

কলিকাতা

রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"

কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ও অগ্রহায়ন মুদ্রিত।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা:"

১১শ ভাগ] কার্ত্তিক, ১৩১২; নবেম্বর, ১৯০৫। [৮ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

বালক বালিকারা লোভবশতঃ কিছু চুরি করিয়া খাইলে বা ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর মারামারি করিলে মা ক্রোধ করিয়া তাহাদিগকে প্রহার করেন, কিন্তু সচরাচর তাহাতে তাহারা শাসিত ও সংশোধিত না হইয়া বরং আরও অধিকতর দুশ্চরিত্র ও দুর্দ্দান্ত হইয়া যায়; তাহাদের ক্রোধ বাড়ে, মিথ্যাচরণ ও কপটতার বৃদ্ধি হয়। বালক বালিকার দুর্নীতি ও দুষ্ক্রিয়া দেখিয়া মা বিষাদযুক্ত তেজের ভাব প্রকাশ করিবেন, তদ্রূপ কার্য্য যে অতিশয় গর্হিত ও অন্যায় সন্তানদিগকে বুঝিতে দিবেন।

জননী যদি রাগ করেন ও নিজে লোভের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, এবং মিথ্যা কথা বলেন, তাহা দেখিয়া শিশু সন্তানগণ তাহার অনুকরণ করিবে, ইহা অনিবার্য্য। বালক বালিকারা সর্ব্বাগ্রে মাতৃদৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব শিশু সন্তানদিগের সাক্ষাতে মাকে অতিশয় সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। সন্তানগণকে শাসন করা ও তাহাদের চরিত্র গঠন করা জননীর পক্ষে অতি গুরুতর কার্য্য।

মা চরিত্রে সুনীতির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। তিনি যদি প্রেম ও পুণ্যের দৃষ্টান্ত আপন জীবনে প্রদর্শন করিতে পারেন, দুরন্ত দুর্ব্বিনীত সন্তান অচিরেই সেই দৃষ্টান্তে নীতিপরায়ণ চরিত্রবান্ হইবে। জননীর সুনীতির দৃষ্টান্ত স্বভাবতঃ বালক বালিকার জীবনে অতিশয় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তিনি বালক বালিকাদিগকে গল্পছলে অনেক নীতি শিক্ষা দিতে পারেন। বাধ্য বিনীত ও চরিত্রবান্ বালক বালিকার সদাচরণের কথা তাহাদের নিকটে বলিলে তাহাদের অনেক শিক্ষা হইতে পারে। নীতির উপর তাহাদের চরিত্রগঠন করিতে হইবে। সন্তান নীতিমান্ হইলে, নীতিরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর উচ্চ ধর্ম্মপ্রাসাদ স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। মাতাই সন্তানের প্রথম ও প্রধান শিক্ষয়িত্রী।

ভগিনীর ভাইফোঁটাদান।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে বঙ্গদেশে হিন্দু-জাতির ঘরে ঘরে ভাইফোঁটার উৎসব হয়। বৎসরান্তে উক্ত দিবস নববিধানাচার্য্য শ্রী কেশবচন্দ্র সেন হিন্দু সমাজের এই জাতীয় প্রাচীন প্রথানুসারে নববিধান-সমাজে ভাইফোঁটার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সেই দিন ভগিনী ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়া তাহাকে নব বস্ত্র ও মিষ্টান্নাদি উপহার দান করেন, এবং তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া থাকেন। ইহা হিন্দু সমাজে ভ্রাতার প্রতি ভগিনীর বিশেষ শ্রদ্ধা, প্রেম ও আদরের লক্ষণ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন যে একটী সুমিষ্ট প্রেমপূর্ণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রার্থনা-পুস্তকে তৎকৃত অন্যান্য প্রার্থনাবলীর সঙ্গে লিপিবদ্ধ আছে। নববিধানবাদীদিগের অনেকে সে দিন সেই প্রার্থনাটী পড়িয়া থাকেন।

হিন্দুসমাজে ভগিনী ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান করেন। কেবল ভগিনী যে ভাইফোঁটার দিনে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিবেন তাহা নয়, ভাই ও ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়া তাঁহাকে আদর করিবেন, কেশবচন্দ্রের এই রূপ বিধি। তাঁহার মতে মানবজাতিমাত্র ভাই ভগিনী। আমি কেবল হিন্দু আত্মীয় পুরুষদিগকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব, মোসলমান এবং ইংরাজেরা ভাই নহেন, ইহা হইতে পারে না। সকল দেশের সকল জাতীয় লোক ভাই। কেশবচন্দ্র একজন খ্রীষ্টবাদী সম্ভ্রান্ত বন্ধুর গৃহে প্রতিবৎসর ভাইফোঁটার দিনে মিষ্টান্নাদি পাঠাইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অনুগামী এক জন বিধানপ্রচারক সমবিশ্বাসী অন্য প্রচারক ভ্রাতাদিগকে আদরপূর্ব্বক ভাইফোঁটা দিয়া থাকেন। এবার তিনি ভাইফোঁটার দিবস দার্জ্জিলিং পর্ব্বতে ছিলেন, সেই স্থান হইতে অর্থ প্রেরণপূর্ব্বক তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এক শ্রেণীর ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা এই ভাইফোঁটার ব্যাপারকে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার কার্য্য বলিয়া এ পর্য্যন্ত উপেক্ষা ও উপহাস করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, এবার তাঁহারা ভ্রাতৃ-প্রেমের তুমুল আন্দোলনে পড়িয়া ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান অত্যন্ত উৎসাহসহকারে সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রুত হইল, সে দিন প্রাতঃকালে ভাইফোঁটার সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে এক দল যুবা রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, উক্ত ব্রাহ্ম শ্রেণীর অন্তর্গত পরিবারবিশেষের প্রতিনিধিস্বরূপ একজন যুবা পুরুষ তাঁহাদের গৃহপার্শ্বে উক্ত গায়কদল উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাদের গলে ফুলের মালা, মস্তকে ধান্য দূর্ব্বা প্রদানপূর্ব্বক হিন্দু জাতির প্রচীন রীতি অনুসারে তাঁহাদিগকে সাদরে বরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইঁহাদেরই অনেকে কুসংস্কার বলিয়া ভাইফোঁটার বিষম বিরোধী ছিলেন। ভাইফোঁটা আবার কি, শঙ্খধ্বনি করিলে এবং পুষ্পাবলী দ্বারা উপাসনাবেদী সাজাইলে

তাঁহারা পৌত্তলিকতার বিভীষিকা দর্শন করিতেন। আনন্দের বিষয় এই যে, তাঁহাদের সেই মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

আমরা যদি কেবল স্বদেশী বাঙ্গালীদিগের গলদেশে ফুলের মালা পরাইয়া তাঁহাদিগকে ভাই বলিয়া প্রেমালিঙ্গন দান করি, আর বিদেশী পুরুষগণ আমাদের ভাই নয়, আমাদের পত্নীর ভাই শব্দে বাচ্য, এরূপ মনে করি, তাহা হইলে ভ্রাতৃপ্রেম কিছুই হইল না। আমাদের মতই অভ্রান্ত মত, আমাদিগের মতের সঙ্গে যাঁহাদের অমিল, আমাদের অপেক্ষা তাঁহারা শত গুণে কেন শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত হউন না, তাঁহারা কোন রূপে ভাই-ফোঁটার আদর ও সম্মান পাইতে পারেন না। বরং সেই সকল লোক নানা রূপে অপমানিত হইয়া অনলে দগ্ধ হইবার উপযুক্ত। এদিকে ভাই ফোঁটাতে ভ্রাতৃপ্রেমের মহাঘটা, আবার তাহার একদিন বা দুই দিন পর উৎসাহ ও উল্লাস-সহকারে দলবলে স্বদেশী ভাইয়ের মূর্ত্তিকে পোড়াইয়া ফেলা, ইহার সামঞ্জস্য কোথায় আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

ভ্রাতৃপ্রেম শাস্ত্রে কি স্বদেশী ভাইকে অপমান করার ব্যবস্থা আছে? ইহা কি সদ্ভাব সম্মিলনসাধনের আয়োজন উদ্যোগের অন্তর্গত? এরূপ কার্য্য দ্বারা একতা বৃদ্ধি হইবে, না রক্ষা পাইবে? ভ্রাতৃপ্রেম একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থাকিতে পারে না। প্রকৃত প্রেমিকের ভ্রাতৃপ্রেম বিশ্বব্যাপী। "উদার চরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।" শ্রী কেশবচন্দ্রের প্রশস্ত হৃদয় পৃথিবীস্থ সমুদায় লোককে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিল। তিনি পরম শত্রুকেও নিজে প্রেম দান করিয়াছিলেন। সেই উদারপ্রেমের অনুসরণ করিয়া আমরা যেন ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার উৎসব করিতে পারি, ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে ও আমাদের ভগিনীদিগকে সেই রূপ প্রমুক্ত হৃদয় প্রদান করুন।

মোসলমান কন্যা ও "যবন" শব্দ।

বিগত আশ্বিন মাসের মহিলাতে প্রকাশিত "মোসলমানরাজত্ব ও ইংরাজরাজত্ব এবং ভারতরমণী" শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থানে মোসলমান শব্দের পরিবর্ত্তে যবন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা পড়িয়া মোসলমান কুলোদ্ভবা একটী বিদুষী মহিলা দুঃখিত হইয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "হিন্দু লেখকগণ আমাদিগকে যবন না বলিলে তাঁহাদের লেখা হয় না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ লেখকেরা যবন লিখেন না। অন্ততঃ আমি ভারতী ও মহিলায় কখনও যবন দেখি নাই। এই প্রথম দেখিলাম মহিলায়!"

মোসলমান কন্যাটী এবং অনেক মোসলমান বন্ধু তাঁহাদিগকে যবন বলিলে কেন যে ব্যথিত হন আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যবন শব্দ ঘৃণা বা নিন্দাসূচক শব্দ নহে। যিনি লিখিয়াছেন, তিনি কোনরূপ মন্দ ভাবে লিখেন নাই। উক্ত প্রবন্ধের সর্ব্বত্র মোসলমান শব্দের প্রয়োগ আছে। তিন চারি স্থানে ঐতিহাসিক সংজ্ঞার অনুরোধে "যবনসম্রাট" "যবনরাজ্য" বা "যবন-

রাজত্ব” লেখা হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ হিন্দু সম্প্রদায় ব্যতীত অপর সকল সম্প্রদায়কে যবনাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তদনুসারে প্রাচীন গ্রীক জাতি যবনশব্দে বাচ্য হইয়াছেন। “প্রকৃতিবোধ” নামক প্রসিদ্ধ বঙ্গাভিধানে উক্ত হইয়াছে যে, “উইলসন সাহেব অনুমান করেন বাক্ট্রিয়া হইতে আয়োণা ও গ্রীস পর্য্যন্ত সমগ্র গ্রীক উপনিবেশের অধিবাসী গ্রীকদিগকে হিন্দুরা যবন বলিতেন।” ইংরাজ ও ফরাসী জাতিও যবনশব্দে বাচ্য। যে মূল হইতে যবন শব্দ উৎপন্ন, তাহাতে কোনরূপ ঘৃণা ও নিন্দার ভাব নাই। গত্যর্থ প্রতিপাদক যু ধাতুর উত্তর অন প্রত্যয়যোগে যবন শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহার অর্থ বেগগামী। অপর দুই একটি কল্পিত ঘৃণাসূচক অর্থও অভিধানে উল্লিখিত আছে। তাহার কোন মূল্য নাই; অন্য কয়েকটি অর্থও আছে। হিন্দুসমাজের অপর অনেক সংহিতা শাস্ত্রের “সহিত যবনসংহিতা” সমাদৃত হইয়াছে। তাহাতে জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচিত। “যবন ঘৃণাসূচক” শব্দ হইলে, হিন্দুরা “যবনসংহিতা'কে” আদর করিতেন না। “যবনাচার্য্য” শব্দের আভিধানিক অর্থ জ্যোতিঃশাস্ত্রবেত্তা মুনিবিশেষ। যবন মুনিনামক মুনি হিন্দুদিগের পরম শ্রদ্ধেয় ছিলেন। “যবনগণ ঋষিবৎ পূজ্য।” বরাহমিহির বলেন।

বরং মোসলমান জাতি হইতে ভারতবাসী আর্য্যগণ যে হিন্দু নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা অতিশয় ঘৃণার্হ ও অপমানসূচক। হিন্দু শব্দ পারস্য শব্দ। ভারত জয় করিয়া বিজেতা মোসলমানগণ বিজিত ভারতবাসী আর্য্যদিগকে ঘৃণাপূর্ব্বক “হিন্দু” বলিয়া ডাকিতেন। সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন সাহিত্যাদিতে ও অভিধান গ্রন্থে “হিন্দু” শব্দ পাওয়া যায় না। “প্রকৃতিবোধ” নামক প্রসিদ্ধ বঙ্গাভিধানে হিন্দু “জাতিবিশেষ” মাত্র লিখিত। তখন এদেশের মোসলমানদিগের জাতীয় প্রচলিত ভাষা পারস্য ভাষা ছিল। প্রসিদ্ধ পারস্যাভিধান “গয়াসোল্লোগাতে” হিন্দু শব্দের অর্থ চোর, ডাকাত ও গোলাম লিখিত আছে। ইহা অপেক্ষা ঘৃণা ও অপমানসূচক শব্দ আর কি হইতে পারে? বুঝিয়া হউক বা না বুঝিয়া হউক, এক্ষণ আর্য্যবংশধরগণ আমি “হিন্দু” বলিয়া আত্মগৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন। পণ্ডিতবর সুবিখ্যাত স্বর্গগত দয়ানন্দ সরস্বতী কখনও হিন্দু নামে আপনার পরিচয় দান করিতেন না, আর্য্যনামে পরিচিত হইতেন। তাঁহা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সুবৃহৎ সমাজ “আর্য্যসমাজ” নামে পরিচিত। সিন্ধু (নদ বা দেশ বিশেষের) অপভ্রংশে হিন্দু নাম হইয়াছে, কেহ কেহ এরূপ মনে করেন। হিন্দু শব্দের এ প্রকার ব্যাখ্যা ও ব্যুৎপত্তি কেবল গায়ের জোরে হয়। মোসলমানেরা আবার স্বজাতি ছাড়া অপর জাতিকে বিশেষতঃ হিন্দুদিগকে “কাফের” বলিয়া থাকেন। কাফের আরবী শব্দ, ইহার অর্থ “বেদিন” (ধর্ম্মহীন)। মোসলমানেরা অপর সম্প্রদায় সকলকে ঘৃণাপূর্ব্বক কাফের বলিয়া গালি দিয়া থাকেন। পারস্য ও আরবী পুস্তকাদিতে এই শব্দ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা কি সত্য নহে? আমরা অশিক্ষিত আধুনিক

একটি পারস্য পুস্তকে একেশ্বরবাদী শিখদিগকে লক্ষ্য করিয়া, "কে'ফ্‌ফার ফোজ্জার" শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি। "কোফ্‌ফার ফোজ্জার" শব্দের অর্থ দুরাত্মা ধর্ম্মভ্রষ্টগণ। অনেক আরব্য ও পারস্য প্রাচীন গ্রন্থে একেশ্বরবাদী ইহুদিগণও এইরূপ শব্দে বাচ্য হইয়াছেন।

মহিলায় ৩। ৪ স্থানে যবন শব্দ পাঠ করিয়া মোসলমান কন্যার কোন রূপ দুঃখ করিবার কারণ নাই। বরং মোসলমান জাতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত হিন্দু সংজ্ঞায় হিন্দুদিগের দুঃখিত ও লজ্জিত হওয়া উচিত। আর্য্য শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, ইহা অতিশয় সম্মানার্হ শব্দ। তাহার ঠিক বিপরী ঘৃণা ও অপমানব্যঞ্জক হিন্দু শব্দ। আর্য্যদিগের বাসস্থান আর্য্যাবর্ত্ত বা আর্য্যস্থান মোসলমানগণ কর্ত্তৃক হিন্দুস্থান নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কন্যা জানিবেন সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া মহিলা সকল শ্রেণীর ও সকল জাতির সঙ্গে সদ্ভাব ও সম্মিলন স্থাপনে যেরূপ প্রার্থিনী, সেরূপ অন্য কেহই নহে। সকল সম্প্রদায় ও সকল জাতির লোককে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান দান করিতে মহিলা সর্ব্বান্ত করণে প্রস্তুত। মোসলমান কন্যা আমাদের কোনরূপ ঘৃণার পাত্রী নহেন, বরং বিশেষ আদর ও শ্রদ্ধার পাত্রী। আমরা জানি তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত ও সম্মিলনাকাঙ্ক্ষী। আশা করি মহিলায় কয়েক স্থানে যবন শব্দ প্রয়োগে সদ্ভাব ও সম্মিলনের ব্যাঘাত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে আর কোন ক্ষোভ থাকিবে না।

জননীর শিশু-সেবা।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইব মাত্র জননীর শিশু-সেবা আরম্ভ হয়। তিনি তাহাকে দুগ্ধপান করান, এবং নানা উপায়ে তাহাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে যত্নবতী হন। কিন্তু তাহার মঙ্গলোদ্দেশ্যে অজ্ঞানতাবশতঃ তিনি অনেক সময় এমন সকল কাজ করেন যে, তাহাতে তাহার মঙ্গল না হইয়া বরং অমঙ্গল হয়, কষ্টবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে হউক বা বিলাসবাসনার তৃপ্তিসাধনোদ্দেশ্যেই হউক নব্য শ্রেণীর জননী উল সিল্ক ও ফ্লানেল ইত্যাদি উষ্ণ বস্ত্রে শিশুর কোমলাঙ্গ আপাদ মস্তকপর্য্যন্ত জড়াইয়া ঢাকিয়া রাখেন। ইহা অনেক ডাক্তারের মত-বিরুদ্ধ কার্য্য। এই উষ্ণপ্রধান দেশে তাহাতে শিশুর বিষম ক্লেশ হয়, শিশু অচিরে গুরুতর ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া থাকে। শীতপ্রধান ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে এই রূপ উষ্ণ বস্ত্র শিশুর সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া রাখার ব্যবস্থা অসঙ্গত না হইতে পারে। এই উষ্ণপ্রধান দেশে একার্য্য করিলে যে নিতান্ত অস্বাভাবিক হয়। প্রাচীন শ্রেণীর মাতা গ্রীষ্মকালে শিশু বালক বালিকাদিগের সর্ব্বাঙ্গ অনাবৃত রাখেন। তাহাতে তাহাদের শরীর মনের স্ফূর্ত্তি হয়। একখানা পারস্য নীতিপুস্তকে জননীর শিশুপালনবিষয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আছে। তাহাতে এরূপ লিখিত আছে যে, বিলাস ভোগ্য সামগ্রীতে শিশুদিগের যাহাতে প্রবৃত্তি না জন্মে, মাতা তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন। তাহাদের

ভাল খাওয়া ও ভাল পরার অভ্যাস হওয়া ভাল নয়। মাতা সময়ে সময়ে তাহাদিগকে ব্যঞ্জনাদি উপকরণশূন্য অন্ন খাইতে দিবেন। শিশু পুত্রসন্তানদিগকে কোমল শয্যায় শয়ন করাইবেন না এবং কোমল বস্ত্রে তাহার দেহ আচ্ছাদিত করিবেন না, তাহা করিলে তাহার শরীর দৃঢ় ও কর্ম্মক্ষম হইবে না।" একটি হিন্দুস্থানী শ্রমজীবি শ্রেণীর মাতাকে দেখা গিয়াছে যে, নব কুমারকে কষ্ট সহিষ্ণু ও দৃঢ়কায় করিবার জন্য সর্ষপ বাটা তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিলেপন করিয়াছে, এবং তাহাকে রৌদ্রে শোওয়াইয়া রাখিয়াছে, জ্বালা ও উত্তাপে সুকুমার শিশু অবিশ্রান্ত রোদন করিতেছে, মাতার তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। ইহা অতি নিষ্ঠুর কার্য্য। মহারাষ্ট্রীয় লোকেরা পেট জলিয়া যাইবে ও ফোস্কা পড়িবে ভাবিয়া সর্ষপ তৈল কোন খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে যোগ করেন না। ডাক্তারেরা এক শ্রেণীর সর্ষপচূর্ণ দ্বারা ব্লিষ্টার প্রস্তুত করিয়া থাকেন. তাহা শরীরে সংলগ্ন করিলে ফোস্কা পড়িয়া থাকে। কোমলাঙ্গ শিশুকে শক্ত ও সবল করিবার জন্য সর্ষপ বাটা মা তাহার অঙ্গে মাখিয়া দেন. নবশিশু এইরূপ মাতৃসেবায় ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করে। খিদিরপুরে একটি শ্রমজীবিনী মাতা ক্ষুদ্র বালকের সর্ব্বাঙ্গে তৈল ম্রক্ষণ করিয়া পথপ্রান্তে রৌদ্রে শোওয়াইয়া রাখিয়াছিল। একজন সাহেব সেই পথ দিয়া যাইতে তাহা দেখিয়া বালকের পিতার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হন, এবং তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া এই নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্য ভৎর্সনা করেন। তাহাতে সে বলে, "সাহেব, এ যে আপনাদের বিলসরকার হইয়া বিলের টাকা আদায় করিবার জন্য রৌদ্রে রৌদ্রে ঘুরিয়া বাড়ী বাড়ী যাইবে। এক্ষণ হইতে রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করিয়া তাহার প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।"

দাদামহাশয় ও নাতনী।

ভূগর্ভ।

দাদামহাশয়। দিদিমণি, তুমি যে তোমার চপলা দিদীর ছেলের নামকরণের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলে কেমন খেলে দেলে কি গান হইল বল দেখি।

সরলা। খুব ধূম ধাম হইয়াছিল, এবং "দীন দয়াল ও করুণার সাগর এমন কেবা আছে?" এই গানটি মেয়েরা গেয়েছিলেন।

দীনদয়াল ও করুণার সাগর এমন কেবা আছে।

তুমি মনোবাঞ্ছা কল্পতরু; এমন কেবা আছে।

রেতে ঘুমালে হে! হৃদয়বিহারী তুমি আপনি কর চৌকিদারী। (দিবানিশি জেগে থেকে হে) (চৈতন্যরূপে) প্রভু না হ'তে ভূমিষ্ঠ দেহ, তুমি দিয়েছ অপত্য স্নেহ। (পিতা মাতার মনে) শিশুর কোমল দেহ পোষণের জন্যে, দুগ্ধ দিয়েছ জননীর স্তনে। (কণ্ঠ শুকাবে ব'লে হে—শিশুর কোমল কণ্ঠ)।

দাদা। বেশ গানটি বেশ। আহা! বিধাতার কেমন করুণা, মানুষের জন্মাইবার পূর্ব্বেই তিনি তাহার সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য কতই আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন।

আচ্ছা দিদিমণি, বল দেখি মানুষের এই পৃথিবীতে আসবার পূর্ব্বে বিধাতা কত আয়োজন করে রেখেছেন?

সরলা। আমি ভাল বলিতে পারিব না, তবে বলিতে একটু চেষ্টা করি। শিশু জন্মিবা মাত্র যার কোলে স্থান পায়। পিতা মাতা ভাই বোন আত্মীয় স্বজনের আদর যত্নে পালিত হয়। তিনি মা বাপের মনে এমন ভালবাসা দিয়াছেন যে, তাহারা আপনারা কত কষ্ট করেন, কিন্তু সাধ্যমত শিশুকে কষ্ট দেন না।

দাদা। বেশ বলেছ, কিন্তু আরও অনেক বলিবার আছে! এ বিষয়ে এত বলিবার আছে যে, সমস্ত কথা বলিলে মস্ত একখান বই লেখা হয়।

সরলা। আচ্ছা কিছু আমায় বলুন না?

দাদা। আচ্ছা বলি,কিন্তু আমি কতই বা জানি আর যা জানি এখন তোমাকে তার অতি অল্পই বলিব। মানুষ আসিবার পূর্ব্বে ঈশ্বর তাহার জন্য কত আয়োজন করেছেন, তাহা বুঝিতে হইলে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ যে সমস্ত বিষয় ঐকান্তিক পরিশ্রম যত্ন ও গবেষণা এবং স্বার্থত্যাগ দ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার মোটা মুটি একটু জানা চাই। এই মোটা মুটি জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও Geology (ভূতত্ত্ব) বিষয়ক পুস্তক পড়া চাই, তুমি যখন খুব ইংরাজি শিখিবে তখন সে সমস্ত বিষয় পড়িবে। ইংরাজি ভাল না জানিলে এ সব বিষয় পড়া যায় না, আর বঙ্গালায় এ বিষয়ে কোন বই আছে কি না আমি জানি না।

সরলা। তাই বুঝি আপনি আমাকে ভাল করে ইংরাজি পড়িতে এত করে বলেন। এবার থেকে খুব মন দিয়া ইংরাজি পড়িব।

দাদা। বেশ তাই করিও। এখন পৃথিবীর যে অবস্থা দেখিতেছ, এ অবস্থা প্রথম হইতে ছিল না। কত হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ভূপৃষ্ঠ গঠিত হইতেছে। পৃথিবীর অভ্যন্তর গলিত পদার্থে পূর্ণ; এই পদার্থের উপর মোচার খোলার মত স্তরের পর স্তর আছে। এক একটি স্তর গঠিত হইতে কত হাজার বৎসর লাগিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্তরে কত প্রকারের উদ্ভিদ ও জীব জন্মিয়াছে ও মরিয়া গিয়াছে, এবং তাহাদের মৃত দেহের আবার কত প্রকার স্তর জন্মিয়াছে। এই রূপ নানা জাতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্ম মৃত্যু ও স্তরের পর স্তর হইলে এই পৃথিবী বর্ত্তমান উদ্ভিদ, জন্তু ও মানুষের বাসোপযোগী হইয়াছে।

সরলা। এত ব্যাপার হয়ে গেছে!

দাদা। আরো শুন। তোমরা আগ্নেয় গিরির কথা পড়িয়াছ,তাহার উদ্গারের কথা শুনিয়াছ। কোন কারণে ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া যখন ভূগর্ভস্থ গলিত পদার্থ বাহিরে আসে, তখন আগ্নেয় গিরির উদ্গিরণ হয়। বহু প্রাচীন কালে সর্ব্বদা উদ্গিরণ হইত,এবং তাহা দ্বারা ভূপৃষ্ঠের স্তর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া উপকরণ সকল স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িত। নীচের স্তরের পদার্থ উপর স্তরে উঠিত, এবং উপর স্তরের পদার্থ নীচের স্তরে যাইত। এমনি করিয়া অনেক ভাঙ্গা গড়ার পর পৃথিবী বর্ত্তমান অবস্থায়

আসিয়াছে। মানুষকে ঈশ্বর এতই ভাল বাসেন যে, তাহার আসিবার পূর্ব্বে এই পৃথিবীকে "ধন ধান্য ভরা রমণীয় ধরা" করেছেন। ঐ গানটী একবার গাও তো দিদিমণি, "তুমি আত্মীয় হতে"—সরলা গাইল —

তুমি আত্মীয় হতে পরমাত্মীয় আছে তোমা হতে কে সংসারে।

পিতা মাতা জায়া, তনয় তনয়া, আর এত দয়া কে করিতে পারে।

করুণার নিধান বিভু তুমি হে, কত না করুণা করিলে পাপীরে।

সুখসাধন এই শরীর মন, করুণার নিদর্শন নাথ তব।

গ্রহতারকমণ্ডিত নীল নভঃ ধন ধান্য ভরা রমণীয় ধরা; সুগভীর তরঙ্গিত নীরনিধি, হিম-রঞ্জিত শোভন তুঙ্গ গিরি; সকলে পুলকে সম তান ধরি,করিছে করুণা স্তব কীর্ত্তন হে।

"তুমি আত্মীয় হতে পরমাত্মীয় হে।" আহা কি মধুর সঙ্গীত, আর তোমার গলা যেন কোকিলকলকণ্ঠ!

সরলা। দাদা মশাই! আপনি বড় আমায় তামাসা করেন, আমি আবার কি গান গাইতে জানি? আমার চেয়ে কত মেয়ের গলা ভাল। আচ্ছা দাদামশাই আপনি যা বলিলেন, তা সাহেবরা কি করিয়া জানিলেন?

দাদা। ভূতত্ত্ববিদ্‌দের কথা কি বলিব? তাঁহারা এমনি সুকৌশল বাহির করেছেন, যদ্দারা আমাদের মত সাধারণ লোকেরাও মোটা মুটি এই তত্ত্ব জানিতে পারেন। যেমন বর্ণমালা দ্বারা ভাষা বোধ হয়, এবং ভাষা বোধ হইলে নানা শাস্ত্রে লিখিত বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়, সেই রূপ তাঁহারাও ভূতত্ত্বের একটী বর্ণমালা প্রস্তুত করেছেন। এই বর্ণমালার সাহায্যে ভূবিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বুঝা যায়! তাঁহারা আবার এমন সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ করেছেন যদ্দারা ভূগর্ভের তাপ মাপ করা যায়। এমন সকল কৌশল বাহির করিয়াছেন, যাহাতে ভূগর্ভস্থিত নানা রত্ন এবং আমাদের সুখ সুবিধাবৃদ্ধি করিবার উপযোগী নানা পদার্থ বাহির করা যায়। লোহা, সোণা, রূপা, অভ্র খড়ি ও কয়লা আর কত কি ভূগর্ভ হইতে বাহির করিয়া মানুষ বর্ত্তমান জনসমাজের কত সুখ সুবিধা বৃদ্ধি করিয়াছে, এবং করিতেছে। আহা করুণাময় বিধাতা এই ভূগর্ভে আমাদের জন্য কত রত্নের খনি রাখিয়াছেন। তাহার বিষয় এখন মানুষের জানিতে অনেক বাকি আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এ বিষয়ে লেগেই আছেন। আর সেই জন্যই তাঁহারা এত বড় হয়ে গেছেন; আর আমাদের এসমস্ত বিষয়ে অজ্ঞতা এবং আলস্য বা গর্ব্ববশতঃই আমরা এত ছোট হয়ে গিয়েছি, এবং আরো ছোট হয়ে যাব। এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি না পড়িলে আর রক্ষা নাই। করুণাময়ের কৃপায় সম্প্রতি কতকগুলি দেশহিতৈষী কৃতবিদ্য লোক মিলিত হইয়া একটী সভা করিয়াছেন, যদ্দারা এ অভাব কালে মোচন হইতে পারে। তাঁহাদের মস্তকে স্বর্গ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হউক।

সরলা। দাদামহাশয়, সেই বর্ণমালা আমাকে একখানা দিন না।

দাদা। ঐ তো দিদি, তোমার চোখের সামনে আমার গ্লাস কেশে বর্ণমালা রহিয়াছে।

সরলা। কৈ বই তো নেই, কতক গুলি পাথরের নুড়ি রয়েছে।

দাদা। ঐ পাথর খণ্ড গুলিই বর্ণমালা, এই বর্ণমালা গুলি তুমি পড়িতে শিখিলে অতি সহজে পৃথিবীর উপরে এবং ভিতরে কি হইতেছে বুঝিতে পারিবে। কিন্তু ঠানদিদীর কাছে কেদেরা ঠেসান দিয়ে বসে ও বর্ণমালা পড়া হয় না। ও পাথর গুলি হাতে নিয়ে নদীর ধারে, সমুদ্রের তটে, পাহাড়ে মাঠে ও নানা স্থানে বেড়াতে হয়। সে যাহা হউক আমি তোমাকে যত দূর পারি ঐ পাথর গুলি চিনাইয়া দিব। আজ কিন্তু হবে না। তোমায় একটা পরামর্শ বলিয়া দিই। তোমাদের ভিক্টোরিয়া কলেজে যখন মিষ্টার পি এন দত্ত বক্তৃতা করিতে আসিবেন, তাঁহাকে ঐ সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিও, তিনি বেশ করে বুঝাইয়া দিবেন।

তিনি বিলাতে গিয়া এই বিদ্যা শিখিয়া আসিয়া Geolgical Deparment এ (ভূতত্ত্ব বিভাগে) দীর্ঘ কাল কর্ম্ম করিয়াছেন। দেখ, তোমাদের উন্নত করিবার জন্য কত ভাল ভাল লোক তোমাদের জন্য ব্যস্ত, কিন্তু বলিতে কি তোমরা সকলে তাঁদের মত ব্যস্ত নও। তোমরা অনেক সময়ে বক্তৃতার বিষয় সভাস্থলেই রাখিয়া এস। এরূপ করিলে যে কেবল শিক্ষা হয় না তাহা নয় কিন্তু ঈশ্বরের দানের প্রতি অপব্যবহার ও অযত্ন করাতে বিষম অপরাধী হও। এই ভারতে তো অনেক মেয়ে আছে, কিন্তু উন্নতি করিবার সুবিধা কয় জন পাইয়াছে, ইহা কি তোমাদের পক্ষে বিধাতার বিশেষ দান নয়?
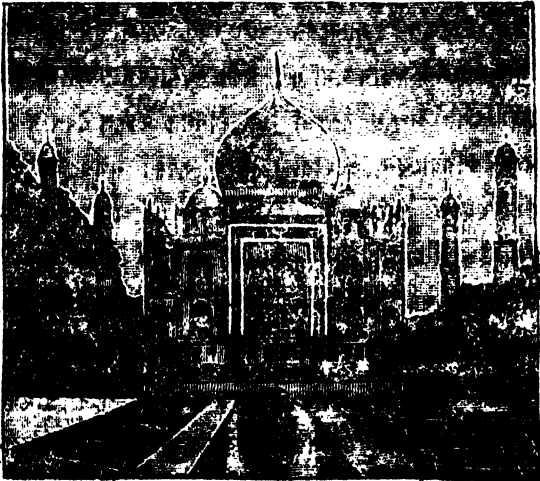
তাজমহল।

যমুনাতীরে আগরা অতি সুন্দর নগর, ইহা মহানগরী কলিকাতা হইতে ৮৪১ মাইল দূরবর্ত্তী। ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাদশা আগ্রানগর স্থাপন করেন। পৃথি-

ধীর সপ্ত পরমাশ্চর্য্যজনক বস্তুর মধ্যে সুবিখ্যাত তাজমহল একতর। এই তাজমহল আগরা নগরাকে পরিশোভিত করিয়া রহিয়াছে। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লির বাদশা শাজাহান তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী মমতাজমহলের সমাধিমন্দিরস্বরূপ তাজমহল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়, এবং ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পারসমাপ্ত হয়. স্থাপত্যবিদ্যার পরাকাষ্ঠা এই মন্দিরে পরিদৃষ্ট হয়। জয়পুরের শ্বেত প্রস্তরে সমগ্র মন্দির নির্ম্মিত। রক্ত পীত হরিতাদি বিচিত্র বর্ণের মূল বান্ প্রস্তর দ্বারা নানা বিধ পুষ্প লতা পত্র সকল মন্দিরের প্রাচারে অঙ্কিত। মন্দিরের ভিতর বাহির অপূর্ব্ব কারু কার্য্যে পূর্ণ। ইহার সৌন্দর্য্য অতুল, পৃথিবীতে এমন সুন্দর মন্দির আর নাই। চতুর্দ্দিকে মনোহর উদ্যান। চারি কোণে চারটি মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত উচ্চ মিনার বা স্তম্ভ শোভা পাইতেছে। মন্দিরের মধ্যভাগে সম্রাট্ শাজাহানের পত্নীর সমাধি প্রতিষ্ঠিত। তাজমহলের অপূর্ব্ব শোভা একবার যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা আর তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন না। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে নানা প্রকার মূল্যবান্ প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া তাজমহল নির্ম্মাণার্থ আয়োজন উদ্যোগ করিতে প্রায় দশ বৎসর অতীত হইয়াছিল, ভারত পারস্য ও তুরস্ক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের দুই সহস্র স্থপতি ও শ্রমজীবী ৮।৯ বৎসর পরিশ্রম করিয়া নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিয়াছিল। তাহা নির্ম্মাণে দুই কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তাজমহলের অভ্যন্তরে একজন লোক শব্দ করিলে শত জনের শব্দের ন্যায় গম্ভীর প্রতিধ্বনি হইয়া থাকে।

আমাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

দেরাদুনউপত্যকা।

আমরা ঝান্সী নগরে তীব্র উত্তাপ ভোগ করিয়া লক্ষ্ণৌতে ফিরিয়া আসিয়া সুস্থ থাকিতে পারি নাই। সে স্থানেও উষ্ণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। বিশেষতঃ আমরা যে বাড়ীতে বাস করিতে ছিলাম সেই বাড়ী বাজারের বড় রাস্তার উপর। সে রাস্তায় নিশাকালে ৩ ঘণ্টামাত্র লোকের কোলাহল ও গাড়ীর শব্দের নিবৃত্তি হয়, অবিরাম কলরব ও ঘর্ঘর শব্দে এবং নিদারুণ নিদাঘোত্তাপে নিদ্রার অত্যন্ত ব্যাঘাত হইতে লাগিল। হিমালয়ের রমণীয় উপত্যকা ভূমি নাতিশীতোষ্ণ দেরাদুন নগরে যাইয়া কয়েক দিন স্থিতি করা আমাদের সঙ্কল্প হইল।

বিগত ২৬শে বৈশাখ সায়ংকালে মেল ট্রেণে লক্ষ্ণৌ নগর হইতে দেরাদুনে যাত্রা করা যায়। অযোধ্যা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন রায়ের আবাসে আতিথ্যগ্রহণপূর্ব্বক কয়েক দিন লক্ষ্ণৌ নগরে বাস করা গিয়াছিল, গৃহস্বামী ষ্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইয়া আমাদিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। দেরাদুনে আমাদের একটি স্নেহের কন্যা অনেক বৎসর যাবৎ স্বামী সহ স্থিতি করিতেছেন। জামাতা তথায় বিষয় কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

কন্যা অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, কখনও পশ্চিমাঞ্চলে গেলে দেরাদুনে যাইয়া যেন আমরা তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করি। এবার তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করার সুযোগ হইল। আমরা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একবার দেরাদুনে যাইয়া ২২।২৩ দিন স্থিতি করিয়াছিলাম। তখন দেরাদুন পর্য্যন্ত ট্রেণ হয় নাই। শাহারণপুর ষ্টেশন হইতে একাারোহণে ৪২ মাইল উচ্চাবচ পার্ব্বত্য পথ অতি কষ্টে ১২ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া তথায় পঁহুছান গিয়াছিল। সেবার আমরা প্রথম একাারোহণ করিয়া তদ্রূপ দীর্ঘ দুর্গম পথ চলাতে আমাদের ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়াছিল। এক্ষণ দেরাদুনে গমনাগমনে কষ্ট নাই, হরিদ্বার হইয়া দেরাদুন পর্য্যন্ত রেলওয়ে বিস্তার হইয়াছে। ২৭শে পর্য্যন্তে হরিদ্বারে পঁহুছান যায়। হরিদ্বার ও দেরাদুনের মধ্যস্থলে ৩৫ মাইল ব্যাপী সোবক্ষর অরণ্য। সেবার দেরাদুন হইতে সেই ভীষণ নিবিড় কানন পদব্রজে অতিক্রম করিয়া আমরা হরিদ্বার তীর্থে গিয়াছিলাম। তথায় যাইয়া অর্থগৃধ্নু পাণ্ডাদের দৌরাত্ম্যে সুস্থির থাকিতে পারা যায় নাই। এক রাত্রি যাপনপূর্ব্বক নিশান্তভাগে পদব্রজে যাত্রা করিয়া ১৫ মাইল দূরে রুর্কি নগরে গিয়াছিলাম। আমরা তথা হইতে গোযানারোহণে শাহারাণপুরে গমন করি। রেলওয়ে হওয়াতে এক্ষণ আর গমনাগমনে কষ্ট নাই।

২৭শে মধ্যাহ্নে দেরাদুন ষ্টেশনে পঁহুছান যায়। আমরা যে সে দিন সেই ট্রেণে দেরাদুনে পঁহুছিব, পূর্ব্বেই এ বিষয়ে জামাতাকে পত্র লিখা হইয়াছিল। তিনি তখন পর্য্যন্ত আমাদের পত্র প্রাপ্ত হন নাই। পরদিন পত্র পঁহুছে। ষ্টেশন হইতে একখানা টাঙ্গা ভাড়া করিয়া জামাতার আবাসাভিমুখে যাত্রা করা যায়। শকটারোহণে নগরের ইতস্ততঃ ঘুরিয়া অনেক বিলম্বে বাসা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তখন জামাতা আফিসে ছিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি কন্যা সূতিকাগারে আছেন। অল্প দিন হইল তাঁহার একটী কন্যা সন্তান হইয়াছে। আমরা এই অবস্থায় যাইয়া তাঁহাদিগকে বিব্রত করিয়াছিলাম। কন্যা লোক পাঠাইয়া জামাতাকে আমাদের আগমন জ্ঞাপন করিলেন। তখনই রন্ধনাদির ব্যবস্থা হইল। সেই গৃহে একটী পাহাড়ী যবা পাচকের কাজ ও চাকরের কাজ করিয়া থাকে। সেই পাহাড়ীই রন্ধন পরিবেশন করিয়া খাওয়াইল। তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার স্বহস্তপ্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন গলাধঃকরণ করা দুষ্কর। একটি গল্প মনে হইল, একজন বৃদ্ধ মোসলমান পুরুষ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "এই ওমরে (জীবনে) কয় বার গোছল (স্নান) করেছিস।" ভ্রাতুষ্পুত্র বলে, "চাচা, বছরে দুইটা ইদ্ হয়, আমি প্রত্যেক ইদের দিন নেয়ে থাকি। তাহা হইলে বছরে দুই বার নাই।" ইহা শুনিয়া চাচা বলিল, "ব্যাটা তুই বছরে দুইবার নেয়ে থাকিস্, তাই যে, পানকৌড় *।

* পানকউড় অর্থাৎ পানিকৌড়ী। মৎস্যাশী জলচর পক্ষী বিশেষ; নদী ও সরোবরের জলে নিমগ্ন হইয়া মৎস্য শিকার

তখন ভ্রাতুষ্পুত্র প্রশ্ন করিল, "চাচা, তুমি তোমার উমরে কয় বার গোছল করেছ। বৃদ্ধ পুরুষ বলিল, আমি যখন জন্মে ছিলাম শুনেছি তখন আমার মা আমাকে নাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। আর আমার যখন শাদি হয়েছিল সেদিন নেয়ে ছিলাম। আমার উমরে এই দুই বারমাত্র গোছল হয়েছে।" সেই পাহাড়ী পাচকটি জীবনে একবারও স্নান করিয়াছে কিনা বলিতে পারি না। তাহার পরিধানের জীর্ণ মলিন কাপড়খানা দেখিয়া বোধ হইল তাহাকে কখনও জল স্পর্শ হয় নাই। পরিষ্কার কাপড় পরিতে দিলেও সে তাহা পরে না, রাখিয়া দেয়। গৃহস্বামীকে বলিয়া একখানা ধবধবে কাপড় তাহাকে দেওয়া গিয়াছিল, যেন সে তাহা পরিয়া রন্ধন পরিবেশন করে। একবেলা পরিবেশনের সময় সেই বস্ত্র খানা তাহার পরিধানে দৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর আর নয়। শাবান দ্বারা কাপড় কাচিবার জন্য পয়সা দেওয়া গিয়াছে, শাবান কেনা হয় নাই। এই কথা নোংরা স্বভাব আর কখনও দেখা যায় নাই। কাছাড় বাগানের পর চা বাগিচার ম্যানেজার বাবু দীননাথ দত্ত, একটি পাহাড়ী যোবকের ফাসল্লা বিবস্ত্র নাগাকে এক সময় বলিয়াছিলেন, "তোরা কাপড় পরিসনে কেন?" তদুত্তরে সে বলিয়াছিল, "কর্ত্তা কাপড় পিন্‌তে শরম লাগে।" সেই পাহাড়ী যুবারও বোধ করি ধবধবে কাপড় পরিতে শরম লাগে। ডাইল আর ভুজ্জি (তরকারির ঘণ্টবিশেষ) উক্ত পাচকটির রাঁধিবার ক্ষমতা আছে। তদ্ভিন্ন কিছুই সে রাঁধিতে শিখে নাই।

আমরা এবার দেরাদুনে যাইয়া যে কয়েক দিন ছিলাম, গৃহবাসী হইয়াই ছিলাম। তথাকার যে সকল মনোহর দৃশ্য আছে তাহার কিছুই দর্শন করা হয় নাই। কেন না প্রথম বারে তথায় যাইয়া সমুদায় দেখা গিয়াছিল। পুনর্ব্বার দেখিতে কৌতূহল হয় নাই। দেরাদুন হইতে ৮ মাইল দূরে সুগম্ভীর সুরমা দৃশ্য সমাচ্ছ বৃক্ষরাজিসমাচ্ছন্ন ভূতলে নন্দন-কাননসদৃশ হিমালয়ের পাদদেশ। সে স্থান হইতে ঝাঁপানে চড়িয়া বা অশ্বা-রোহণে হিমালয়ের শৃঙ্গে আরোহণ করিতে হয়। উক্ত নগর দেশকে রাজপুর বলে, তদুচ্চ হিমাচল শিখরকে মসুরি বলিয়া থাকে। মসুরিতে পেনসন প্রাপ্ত বহু ইংরাজ রাজপুরুষ বাস করেন, উহা বিশাল নগরে পরিণত। সেবার আমরা রাজপুর হইতে অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া ৬৭ হাজার ফুট উচ্চ মসুরি শৈলে আরোহণ করিয়াছিলাম, এবং তথা হইতে পদব্রজে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ লেণ্ডোরে উঠিয়া হিমানীরঞ্জিত রজতনিভ ধবল গিরির অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়াছিলাম। লোকে তাহাকে বৃষভবাহন ভূতনাথের বিহারভূমি কৈলাস গিরি বলিয়া থাকে। তখন আমরা গিরিকন্দরে সহস্র ঝর্ণা ও শুভ্র পানি ও অন্যান্য নানাবিধ চিত্তমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়াছিলাম। এবার নানা কারণে অসুবিধা বোধ হওয়াতে সে সকল দর্শনে বিরত থাকা গিয়াছিল।

করিয়া থাকে। সেই পক্ষী এক একবার ডুব দিয়া দশ বার মিনিট জলের ভিতর থাকিতে পারে।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে দেরাদুনকে একটি গণ্ড গ্রাম সদৃশ বোধ হইয়াছিল, এক্ষণ দেরাদুন বিস্তীর্ণ স্থানব্যাপী বৃহৎ নগরে পরিণত। বোধ হয় এক্ষণ পূর্ব্বাপেক্ষা দশ গুণেরও অধিক লোকের বসতি হইয়াছে। শত২ ইংরাজের উদ্যান সম্বলিত বড়২ বাসভবন রাজপথের উভয় পার্শ্বে সারি সারি শোভা পাইতেছে; পণ্যশালাশ্রেণী বহু বিস্তৃত হইয়াছে। রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে প্রশস্ত পয়ঃপ্রণালী; কল কল ধ্বনি করিয়া দ্রুত বেগে নির্ম্মল নির্ঝরবারি সেই সকল প্রণালী যোগে দিবা রাত্রি প্রবাহিত হইতেছে। এত গোলাপফুলের গাছ কোথাও দৃষ্ট হয় না। প্রস্ফুটিত গোলাপ কুসুমপুঞ্জ ইতস্ততঃ পর্ব্বত ও কানন আলো করিয়া রহিয়াছে। পাহাড়ে স্বভাবজাত ও যত্নবর্দ্ধিত বড় বড় গোলাপ তরু দেখিতে পাওয়া যায়। রাজচ্যুত কাবুলাধিপতি ইয়াকুব খাঁ সপরিবারে বন্দিভাবে দেরাদুনে স্থিতি করিতেছেন। এখানকার জি টি আফিস ও ফরেষ্ট আফিস ও ফরেষ্ট সংক্রান্ত কলেজ প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি দেরাদুন নগরের পার্শ্বে বৃহৎ সেনানিবেশ স্থাপিত হইতেছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যাইয়া যে সকল বাঙ্গালী বন্ধুকে সেখানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, এবার আমরা তাঁহাদের মধ্যে এক জনকে মাত্র দেখিতে পাইয়াছি। অনেকে পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, কতক লোক স্থানান্তরে আছেন।

প্রতি দিন স্নানান্তে সূতিকাগারসংলগ্ন প্রকোষ্ঠের দ্বারের সম্মুখে বসিয়া জামাতা দেব পূজা করা গিয়াছে, গৃহস্বামী জামাতা তাহাতে যোগ দিয়াছেন, আতুরঘর হইতে কন্যাও যোগ দান করিয়াছেন। বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ বেলা ৩টার ট্রেণে শিমলা শৈলাভিমুখে যাত্রা করা যায়। সেই দিন মধ্যাহ্নে পাহাড়ী পাচক রন্ধন করে নাই জামাতা স্বয়ং রন্ধন করিয়াছিলেন। নানা ব্যঞ্জনের আয়োজন উদ্যোগ হইয়াছিল। সূতিকাগারের দ্বারের সম্মুখে তোলা উনন স্থাপন করিয়া তিনি রাঁধিতে বসিয়াছিলেন, কন্যাটী বলিয়া দিতেছিলেন, এক্ষণ তরকারি গুলকে নাড়িয়া দিতে হইবে, এক্ষণ জিরে তেজপাতের ফোড়ন দাও ইত্যাদি। তাঁহার ইঙ্গিত মতে জামাতা ধোকা প্রভৃতি নানা ব্যঞ্জন হইতে আরম্ভ করিয়া পায়স পর্য্যন্ত উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের রন্ধনপটুতা তাদৃশ আছে সে রূপ বোধ হইল না। একবার আমরা প্রায় মাসাবধি কাল নৌকাতে ছিলাম। দুই বেলা স্বহস্তে রন্ধন করা গিয়াছে, কিরূপে রাঁধিতে হইবে, কাহার ও উপদেশ গ্রহণ করিতে হয় নাই, কেহ দেখাইয়া বা বলিয়া দেয় নাই। তথাপ ব্যঞ্জনাদি সুস্বাদ হইয়াছে। এক্ষণ স্কুলের এরূপ অনেক ছাত্র আছেন যে, এক জনের ভাত রাঁধিতে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখেন, কেন গালিতে হাত পুড়িয়া বসেন। যাহা হউক সে দিন ভোজনান্তে বেলা প্রায় ২টার সময় ষ্টেশনে যাত্রা করা যায়। গৃহস্বামী ষ্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়াছিলেন।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমের নারীবৃন্দ।

পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বিবাহ-প্রণালী বিষয়ে পরস্পর যে সকল পার্থক্য লিখিত হইয়াছে, আমরা সে বিষয়ে আর অধিক লিখিতে চাহি না। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে শ্বশ্রূমাতা ও পুত্রবধূর পরস্পর যেরূপ ব্যবহার এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বধূদিগের যে প্রকার অবস্থা তদ্বিষয়ে কিছু লিখা যাইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে বধূর নিতান্ত দুঃখের অবস্থা। অনেক প্রাচীন শ্রেণীর মহিলা পুত্রকে উদ্বাহ-সূত্রে বদ্ধ করিয়া ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের আদরের কন্যাকে নববধূরূপে গৃহে আনিয়া তাঁহার প্রতি আদর স্নেহ করিবেন দূরে থাকুক তৎপ্রতি অতিশয় নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া থাকেন। ঢাকা জিলার দক্ষিণাংশে শাশুড়ী বধূকে "বউল, তুই আমার কাছে আয় না" এইরূপ কুৎসিত সম্ভাষণ করেন। একটী চাকরাণী গৃহকর্ত্রীর যতটা ভাল ব্যবহার পাইয়া থাকে, বধূ শাশুড়ী হইতে সেরূপ ব্যবহারও প্রাপ্ত হন না। পুত্রবধূ প্রাপ্ত হইলে শাশুড়ী সংসারের প্রায় কোন কাজ করেন না, তিনি কর্ত্রীঠাকুরাণী হইয়া বধূর প্রতি কেবল হুকুম করেন, বধূকে সমস্ত দিন খাটিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। তথাপি শ্বশ্রূমাতার প্রসন্নতা ও মিষ্ট বচন তাঁহার ভাগ্যে বড় ঘটে না। শ্বশুর শাশুড়ী ও ভাশুর দেবর প্রভৃতির নানা প্রকার সেবা, ঘরে উঠনে এমন কি পায়খানা পর্য্যন্ত ঝাঁট দেওয়া বাসন মাজা ও কাপড় কাচা ইত্যাদি কাজ পর্য্যন্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বধূকে স্বহস্তে করিতে হয়। কোন কাজে ত্রুটি হইলে নিন্দা ও গঞ্জনার সীমা থাকে না। বধূর সন্তান-সম্ভাবনা হইলে বাড়ীর এক প্রান্তে একটি কুড়ে ঘর নির্ম্মিত হয়। সেই ঘরে তিনি সন্তান প্রসব করেন; সেই অবস্থায় শ্বশ্রূ ননদ ও অপর আত্মীয় নারীদিগের সেবা শুশ্রূষা প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা সেই গৃহে প্রবেশ করিবেন দূরে থাকুক উহা অপবিত্র বলিয়া স্পর্শও করেন না, স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া থাকেন। বধূ সেই গৃহে একটা দরমা শয্যা আশ্রয় করিয়া মাসাবধিকাল মহাক্লেশে যাপন করেন। অনেকে সেখানেই উৎকট সূতিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া চির জীবন ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন, কাহারও বা অচিরে প্রাণ-বিয়োগ হয়। নানা অযত্ন ও অনিয়মে কেহ কেহ প্রসূত সন্তান সহ সূতিকাগারেই দেহ ত্যাগ করেন। প্রায় সকলেই যমাগারস্বরূপ সূতিকাগার হইতে অসুস্থ শরীরে বহির্গত হন। প্রসূতি আতুর ঘর পরিত্যাগ করিবামাত্র অপবিত্র বলিয়া গৃহটি পুড়িয়া ফেলা হয়। এইরূপ ব্যাপার সাধারণতঃ ঢাকা জিলার দক্ষিণ অঞ্চলে ঘটিয়া থাকে।

পূর্ব্ব বঙ্গের হিন্দু পরিবারের সকল স্থানে যে বধূর প্রতি শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনের এই রূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার হয় তাহা নহে, অনেক স্থানে সদ্ব্যবহার হইয়া থাকে, আদর যত্ন হয়। কিন্তু শ্বশ্রূ মাতা কন্যা-নির্ব্বিশেষে বধূকে যে স্নেহ আদর করেন এরূপ বিরল। বধূ কাজ কর্ম্মে ত্রুটি

করিলে তাঁহাকে অবগুণ্ঠনাবৃত বদনে নীরবে শাশুড়ীর গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। শ্বশ্রূ মাতার কোন অন্যায়োক্তির প্রতিবাদ করিতে তাঁহার সাধ্য নাই। পশ্চিম বঙ্গে শ্বশ্রূ বধূর পরস্পর সম্বন্ধ ঠিক সে রূপ নহে। শুনিয়াছি, অনেক পরিবারে তদ্বিপরীত। এরূপও শুনা গিয়াছে যে, শাশুড়ী গৃহের সকল কাজ কর্ম্ম করেন, যুবতী বধূমাতা কর্ত্রী ঠাকুরাণীর ন্যায় বসিয়া থাকেন। বৃদ্ধা শাশুড়া রন্ধন করিয়া বধূকে অন্ন পরিবেশনপূর্ব্বক ভোজন করান। বধূ দুই চারি জন সখীর সঙ্গে গল্প করেন, বা তাস খেলেন, কিংবা কাব্য নাটক পড়েন। তবে সকল পরিবারের বধূ এই রূপ নহে। বধূ শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিবেন, শাশুড়ীর সেবা করিবেন ও তাঁহার বাধ্য হইয়া চলিবেন, এবং শাশুড়ী স্বীয় কন্যার ন্যায় বধূকে স্নেহ করিবেন, সাদরে সম্ভাষণ করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। পশ্চিম বঙ্গে প্রায় সকল শাশুড়ীই পুত্রবধূকে "বউমা" বলিয়া সাদরে সম্ভাষণ করেন। শ্বশ্রূ মাতা বধূর প্রতি কটূক্তি ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলে তিনি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারেন না। যে সকল নব্য বধূর স্বামী বিলাত ফেরত ধনবান্, বিলাতী ধরণে যাহারা জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের ভাব গতি চাল চলন অন্য প্রকার। শাশুড়ীর সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধও অন্য বিধ। আমরা সে বিষয়ের আর উল্লেখ করিতে চাহি না।

এক্ষণে ধর্ম্ম কর্ম্ম পূজার্চ্চনার কথা বলা যাইতেছে;—পূর্ব্ব বঙ্গে আমাদের অল্প। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, প্রাচীনা মহিলারা পুষ্প বিল্বপত্র অর্ঘ্য চন্দনাদি যোগে নিত্য পূজা করিতেন, বধূ শ্বশ্রূমাতার পূজার আয়োজন করিয়া দিতেন প্রত্যেক পরিবারে নানা প্রকার ব্রত নিয়ম পালন হইত। প্রায় ২।৪ দিন পরেই মহিলাদিগকে দুই একটি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে দেখা গিয়াছে; ললিতা সপ্তমী ব্রত, পঞ্চমী ব্রত, সূর্য্যের ব্রত, ইয়ত্রাইলের ব্রত, ঝলকাঝলকীর ব্রত, ক্ষেত্রপালের ব্রত, ষষ্ঠীব্রত, মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, কার্ত্তিকব্রতপ্রভৃতি নানা ব্রতের অনুষ্ঠান হইত। বালিকারা যমপুকুর ব্রত, তারা ব্রত, সমগ্র মাঘ মাস ব্যাপিয়া মাঘমণ্ডল ব্রত করিত। কোন কোন ব্রত অতিশয় কঠোর, ব্রতধারিণীকে সমস্ত দিন উপবাস থাকিতে হইয়াছে। মাঘ মাসে এক প্রকার ব্রতের অনুষ্ঠান হইত, বোধ হয় তাহার নাম সূর্য্যের ব্রত; ব্রতধারিণীগণ ধূপাচি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কাল হইতে সূর্য্যোস্ত গমন কাল পর্য্যন্ত সূর্য্যাভিমুখীন হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন। এই ব্রতানুষ্ঠানের দিন, সায়ংকালে দুই জন ব্রতধারিণীর উচ্চৈঃস্বরে পরস্পর এইরূপ কথোপকথন হইত। "ও বর্ত্তী বউ বর্ত্তান কর্চ্চ, বর নি পাইছ, পাইছি, আমার কালাচাঁদের ব্যামো ভাল অউক, অউক।" পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েরা ব্রতকে বর্ত্ত, ব্রতচারিণীকে বর্ত্তী বলিয়া থাকে। অনেক ব্রতেই পিষ্টক পায়স দৈ খৈ ইত্যাদি ভোজনের ঘটা আছে, তখন আমরাও কিছু২ প্রসাদ পাইতাম। এক এক ব্রতের দেবতা আবার ভয়ঙ্কর।

যথা উল্লিখিত ক্ষেত্রপাল দেবতাকে পুরোহিত ঠাকুর এই প্রকার মন্ত্রে ধ্যান করিতেন। "পিঙ্গাক্ষং পিঙ্গকেশং ভ্রূকুটিত বদনং ভীমবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্" ইত্যাদি। অর্থাৎ পিঙ্গল বর্ণ চক্ষু, পিঙ্গল বর্ণ কেশ; বিকটাকার ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডল ত্রিনেত্র। যাহা হউক এক্ষণ আর সেই সকল ব্রত প্রায় কোন পরিবারে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় না। নব্য মহিলারা সেই রূপ ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিবেন দূরে থাকুক প্রায় তাঁহারা নিত্য ইষ্ট পূজার মন্ত্র গ্রহণে বাধ্য হন না। প্রায় কোন গৃহেই নব্য মহিলাকে পূজার্চ্চনায় রত দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা এক্ষণ সে সকলকে কুসংস্কার বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেছেন। কেবল অনেক বৃদ্ধাই সেই কুসংস্কার ছাড়িতে পারেন না। স্বামী যেরূপ স্ত্রী তদনুরূপ হইয়া থাকেন বর্ত্তমান যুগের নব্য যুবকেরা ভোজন পানই মানেন; পূজার্চ্চনা মানেন না। সচরাচর তাঁহাদের স্ত্রীগণও সেই প্রকৃতি-বিশিষ্টা হইবেন, আশ্চর্য্য নহে। এক্ষণ গুরুভক্তি দেবভক্তি যুবক যুবতীগণের অন্তর হইতে পলায়ন করিয়াছে। গুরু পুরোহিতগণ শিষ্য শিষ্যাগণের নিকটে দক্ষিণা পার্ব্বণাদি প্রায় প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা গুরুতা ও পৌরোহিত্যে এখন আর জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না বলিয়া চাকুরী ও নানা ব্যবসায় অবলম্বনে বাধ্য হইতেছেন। কোন কোন শিষ্য এরূপ মণ্ডামার্ক মাতাল যে, গুরুদেবকে ভক্তি করিবে দূরে থাকুক তাঁহাকে প্রহার করিতে সঙ্কুচিত হয় না। এ বিষয়ে একটি গল্প বলা যাইতেছে; এক মাতার একটি মাত্র পুত্র, কুসঙ্গে পড়িয়া ঘোরতর মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল। সে নিত্য মদ্যপান করিয়া মাকে জ্বালাতন করিত; সুরাপানে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতেছিল। মা তজ্জন্য সর্ব্বদা দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া একদিন তাঁহার একটী প্রতিবেশিনী আসিয়া তাঁহাকে এই পরামর্শ দান করিল যে, তুমি গুরুঠাকুরকে ডাকিয়া আনিয়া পুত্রকে দীক্ষিত কর, সে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলে তাহার এই কু অভ্যাস আর থাকিবে না। গৃহিণীর মনে ইহা ঠিক বোধ হইল, তিনি দীক্ষার দিন স্থির করিয়া গুরুঠাকুরকে সংবাদ দিলেন; ঠাকুরও পদার্পণ করিলেন। এদিকে মন্ত্রগ্রহণের দিনও কুলাঙ্গার পুত্র মদ্যপানে মত্ত হইল। মা তাহার অবস্থা দেখিয়া দুঃখের সহিত তাহাকে বলিলেন, "আরে অভাগা, আজও তুই মদ না খাইয়া থাকিতে পারিলি না। গুরু ঠাকুর আজ তোকে মন্ত্র দিতে আসিয়াছেন, তোর এই অবস্থা দেখিয়া তোকে তো আর মন্ত্র দিবেন না।" মদ্যপানে বিহ্বল কুলপাবন পুত্র বলিল; "মা, সে আবার মন্ত্র দিবে না, ব্যাটা যাবে কোথা? সে যে কুলগুরু, জুত মেরে মন্ত্র আদায় করিব।" মা এই কথা শুনিয়া ও ছেলের গুরুভক্তি দেখিয়া অবাক্।

ইংরাজি ধরণে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া কুসংস্কারমুক্ত হইয়াছেন; এরূপ হিন্দু মহিলা মাত্রেরই গুরুভক্তি নাই গু

পূজার্চ্চনার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নাই। তবে উক্ত বণ্ডামার্ক যুবার ন্যায় কোন মহিলা আছেন, এ প্রকার বিশ্বাস হয় না। প্রাচীন-শ্রেণীর মহিলাদিগকে দেখা গিয়াছে, ধর্ম্মার্থ দানে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। আতিথ্যসৎকার, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাদি-ভোজন, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ ও তীর্থপর্য্যটনে তাঁহারা অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, গৃহে ধর্ম্মকে তাঁহারাই প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন; নিজেরা ভোগ বিলাস-বর্জ্জিত হইয়া দীনভাবে দিনযাপন করিয়াছেন। এক্ষণ নব্য সম্প্রদায়ের মহিলাদিগের ধর্ম্মার্থদান, ধর্ম্ম কর্ম্মে শ্রদ্ধা বড়ই বিরল। সাধারণতঃ পোমেটম, এসেন্‌স্‌, সুগন্ধি সাবান, ল্যাস, জুতা, মোজা ইত্যাদিতে তাঁহাদের অনেকের প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়। যাঁহারা সম্পন্ন পরিবারের মহিলা তাঁহাদের দার্জ্জিলিংই পরম তীর্থ, প্রায় সংবৎসরে একবার দার্জিলিং তীর্থপর্য্যটন হয়, বিপুল অর্থ ব্যয়ে সেখানে দুই তিন মাসবাস ও পুণ্যসঞ্চয় করা হইয়া থাকে। এ সকল বিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ প্রভেদ না থাকিতে পারে। তবে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু পরিবারের অবস্থা আমরা তাদৃশ জ্ঞাত নাই। পশ্চিম বঙ্গে দীর্ঘকাল জীবন যাপন করিলেও হিন্দু পরিবারে বাস করা হয় নাই। সুতরাং আমরা বিশেষ অবগত নাই, আমাদের ভুলভ্রান্তি হইতে পারে।

বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রাচীন শ্রেণীর ও নবীন শ্রেণীর মেয়েদের প্রায় একই অবস্থা, নবযুগের প্রভাব তাঁহাদের মধ্যে সংক্রামিত হয় নাই। তাঁহারা বঙ্গ দেশের মহিলাদিগের ন্যায় কুম্ভকারের হস্তে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া আনিয়া পূজা করেন না, বাঙ্গালী হিন্দু মেয়েদের ন্যায় তাঁহাদের ব্রতানুষ্ঠানও নাই। মন্দিরে স্থাপিত রাম সীতা বা হনুমানের মূর্ত্তি দর্শন ও প্রণাম এবং গঙ্গাস্নানাদি করা তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্ম কর্ম্ম। বধূ স্বামি-গৃহে যাইয়া বাস করিলে পিত্রালয়ে আর প্রায় যান না, অন্তঃপুরে বদ্ধ হইয়া থাকেন। স্বামী বিদেশে বিষয় কর্ম্ম করিলে পরিবার সঙ্গে রাখিবার নিয়ম নাই। বিদেশে সপরিবারে বাস করিলে নিন্দা হয়। মেয়েদের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চ্চা বিরল, তাঁহাদের কুসংস্কার প্রবল। তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ অন্য প্রকার। প্রাচীন শ্রেণীর বাঙ্গালী মেয়েরা মোসলমানকে যে রূপ ঘৃণা করেন, তাঁহারা সেরূপ ঘৃণা করেন না। কিন্তু শহরে হিন্দু পরিবারভুক্ত এরূপ বাঙ্গালী নব্যা-মহিলা আছেন যে, মোসলমানের দোকান হইতে কুক্কুট ও বক্‌রীর রাঁধা মাংস খাঁ, চাক্‌রাণীর যোগে আনাইয়া ভোজন করেন; কিংবা সেই সকল হিন্দুর অখাদ্য মাংস আনাইয়া গোপনে রন্ধনশালায় রন্ধন করিয়া লুক্কায়িত ভাবে স্বামীর সঙ্গে ভোজনপূর্ব্বক হিন্দুয়ানীর শ্রাদ্ধ করেন।

বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামস্থ হিন্দু পরিবারের প্রাচীনশ্রেণীর মহিলারা ছেলে মেয়ের কঠিন পীড়া হইলে ডাক্তার কবিরাজ দ্বারা সমুচিত চিকিৎসা করান অপেক্ষা রোগীকে ওঝা দ্বারা ঝাড়ান, জলপড়া পান করান

এবং দেবতা প্রসন্ন হইয়া সত্বর আরোগ্য দান করিবেন ভাবিয়া কালা দুর্গাকে পাঁটা মহিষ মানত করা, লক্ষ্মী নারায়ণকে ভোগ নৈবেদ্যাদি দান করা, এবং হরির লুট দেওয়া, গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ রোগ হইয়াছে ভাবিয়া গ্রহাচার্য্যযোগে নবগ্রহের পূজাদান ইত্যাদি ব্যাপারের উপর রোগীর আরোগ্য বিষয়ে অধিকতর নির্ভর করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের দেবতা অসংখ্য; গোদেবতা সর্পদেবতা বৃক্ষদেবতা নদীদেবতা প্রভৃতি কত দেবতা আছেন; তন্মধ্যে মোসলমানদের দেবতা পীরও আসিয়া যুক্ত হইয়াছেন। বাল্য কালে দেখা গিয়াছে যে, বিশেষ২ রোগে বিশেষ২ দেবতাকে মা মানত করিতেন। একবার শৈশব কালে আমাদের রোগবিশেষে গোদেবতাকে সেবা দেওয়া মানত হইয়াছিল। আমাদের পল্লীতে একটি প্রমুক্ত বৃষভ ছিল, তাহাকে সূর্য্যের ষাঁড় বলা হইত, সেই ষণ্ডটি কাহারও অধিকারে ছিল না, সে পাড়ার বাড়ী বাড়ী রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত। লোকে আদর করিয়া তাহাকে খাইতে দিত। সেই ষাঁড়টি গ্রাম্য গোদেবতাস্বরূপ ছিলেন, তিনি প্রসন্ন হইয়া আরোগ্য দান করিবেন ভাবিয়া তাঁহাকে ভোগবিশেষ উৎসর্গ করা হইত। বাল্যকালে একবার পদ্মানদী পার হইবার সময় ঝড়ে নৌকা মগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নদীদেবতা পদ্মাকে এক সের চিনি মানত করা গিয়াছিল; পুনর্ব্বার পদ্মা পার হইবার সময় তাহার তরঙ্গমুখে শর্করা অর্পণ করা হইয়াছিল। পেট ব্যথায় অস্থির হইলে পর সর্প দেবতা বিষহরীকে ভোগদান করা হইয়াছে। শৈশব কালে জ্বর রোগে সঙ্কটাপন্ন হওয়া গিয়াছিল, তখন জ্বরাসুরের পূজা মানত হইয়াছিল। উদ্বাহবন্ধনের এক দিন বা দুই দিন পূর্ব্বে তিনটি পাটা বলিদানে জ্বরদেবতা মৃন্ময় জ্বরাসুরের পূজা হইয়াছিল। সেই জ্বর দেবতারূপ জ্বরাসুর মূর্ত্তি কৃষ্ণ বর্ণ ত্রিপাদ, ষট্‌হস্ত ত্রিমুণ্ড। প্রত্যেক মুণ্ডে তিন তিনটি নেত্র। গলায় দাঁড় ধারিয়া বলিদানের জন্য তিনটি ছাগপশু উক্ত দেবমূর্ত্তির সম্মুখে আমাদিগকে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। কোন যুবতীর হিষ্টিরিয়া রোগ হইলে পর তাহাকে ভূতে পাইয়াছে ভাবিয়া ওঝা দ্বারা নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়া তাহার চিকিৎসা করান হইত। লোকের কথঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হওয়াতে বঙ্গদেশে ভদ্র পরিবারে এই সকল অস্বাভাবিক বীভৎস চিকিৎসা অনেক কমিয়াছে, প্রকৃত চিকিৎসা হইতেছে। বিহার প্রদেশের পল্লীবাসিগণ পল্লীস্থিত কোন বৃদ্ধা নারীকে ডাইন বলিয়া নির্দ্দেশ করে। পল্লীতে কোনরূপ অমঙ্গল হইলে তাহাকে সেই অমঙ্গলের কারণ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। গ্রামে মরক আরম্ভ হইলে গ্রামবাসিগণ সেই নারীরূপিণী ডাইনকে নানা যন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলে।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র ছেলে মেয়েদের মনে ভূত, প্রেত, ডাইন, ব্রহ্মদৈত্যাদি কাল্পিত অপদেবতার ভয় অতিশয় প্রবল ছিল।

অনেকে চম্পকতরুতে ও অশ্বত্থ বৃক্ষে ভূত ঝুলিতেছে দেখিয়াছে, এবং পুরাতন মন্দিরে বিকটাকার ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্যাদি দর্শন করিয়াছে, এরূপ প্রচার করিয়াছে; তাহা শুনিয়া লোকে ভয়ে কম্পিত হইয়াছে। এক্ষণ আর মেয়েদের মধ্যে ভূতের গল্প বড় শুনিতে পাওয়া যায় না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কন্যার বিবাহে ব্যয় বাহুল্য হইত বলিয়া দরিদ্র পরিবারের কন্যার মাতা স্তনে আফিং লেপন করিয়া সেই স্তনদুগ্ধ পান করিতে দিয়া শিশু কন্যাগণকে বধ করিত। গবর্ণমেণ্টের তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়ে, এবং সে দেশের হিতৈষী লোকেরা সভা সমিতি করিয়া তুমুল আন্দোলনপূর্ব্বক কন্যাদিগের বিবাহের ব্যয় হ্রাস করেন। তাহাতে কন্যাহত্যা অনেক নিবারিত হইয়াছে। এদেশে হিন্দুসমাজে যেরূপ বরপণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কন্যাভারগ্রস্ত পিতা মাতা বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এক একটী কন্যার বিবাহে বরকর্ত্তাদের অত্যাচারে এক একটি পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। অচিরে ইহার কোন উপায় বিধান হওয়া আবশ্যক।

মহিলাদিগের রচনা।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামাজিক শাসন।

(৮১ পৃষ্ঠার পর।)

মানুষ যখন অল্পদর্শী থাকে, মানুষ যখন অজ্ঞান থাকে, তখন তাহার ভাল মন্দ ন্যায়ান্যায় বুঝিবার ক্ষমতা কোথায়? কিন্তু কি করিয়া তাহারা এই জ্ঞানের অতীত বুদ্ধির অতীত রহস্যময় জগতে নিরাপদে বিচরণ করিতে পারে? তাহাদের সঙ্গী কে? কে তাহাদের অন্যায়ে বাধা ন্যায়ে উৎসাহ দান করে? শিশু জানে না তাহাদের অজ্ঞাতসারে কোন অধীনতার আশ্রয় দিন রাত পক্ষ-পুটের ন্যায় তাহাকে নিরাপদ করিতেছে। দয়াময় শ্রীহরি এত স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়াও কেন সুদৃঢ় নিগড়ে আমাদিগের হস্ত পদ আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ভগবানের সুতীব্র দৃষ্টি ও শাসনে আমরা তাঁহার চির অধীনতা ও দাসত্ব গ্রহণ করিলাম। অন্যায় কার্য্যের জন্য তাঁহার শাসন দণ্ড যেমন অনিবার্য্য তেমনি তাঁহার ন্যায় স্নেহ, তাঁহার ন্যায় দয়া আমাদিগকে আর কে করিতে পারে? তাঁহার ন্যায় সহানুভূতি ও আশ্বাস আর কোথায় পাইব? তিনি ভালবাসা ও শাসনের সামঞ্জস্যে আমাদিগকে অধীনতা স্বীকার করাইয়া লইলেন। সন্তান পিতা মাতার অনুগত ও অধীন কিসের জন্য? পিতা মাতার ন্যায় সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, এমন নিঃস্বার্থ স্নেহপ্রবণ জগতে কয় জন যে সেই স্থান পূর্ণ করিতে পারে? আবার পিতা মাতার প্রতি সন্তান সন্ততির যে আকর্ষণ, যে ভক্তি অনুরাগের উচ্ছ্বাস, তাহা আর কাহার জন্য হইতে পারে? তেমনি আমরা আমাদিগের ভাই ও ভগিনীর সহিত অচ্ছেদ্য অভিন্ন ভালবাসায় গ্রথিত। পিতা মাতার অপত্যস্নেহে সন্তান তাহাদিগের সম্পূর্ণ অধীনতা গ্রহণ করিল, সন্তানের ভক্তি

ও ভালবাসায় পিতা মাতা কোন ক্রমেই সন্তানদিগকে অতিক্রম বা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। ভাইয়ের সহিত ভগিনী, ভগিনীর সহিত ভাই কি অপার্থিব স্নেহে অধীনতা ও চির আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। সেই রূপ পরিবারে সংসৃষ্ট প্রত্যেক আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত আমরা স্নেহ ভালবাসায় এমনি আবদ্ধ হইয়াছি যে, তাঁহারা দূরে থাকুন কি নিকটেই থাকুন, ইহলোকেই থাকুন, কি লোকান্তরেই থাকুন, দৃষ্টির অন্তরাল বলিয়া কোন দিন কোন সময়ে সে বন্ধন টুটিবে বিশ্বাস করি না। ভাল বাসিলে কিংবা ভালবাসা পাইলে পরস্পরের জন্য নিঃস্বার্থ সত্য করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়, ইহাই ভগবানের বিধি। ইহারই নাম চির আনুগত্য, ইহারই নাম প্রকৃত স্বর্গীয় অধীনতা।

প্রত্যেক পত্র, পুষ্প, শাখা ও ফল মূলের যে গভীর সম্বন্ধ বৃক্ষের সঙ্গে, আমাদের সমাজের সহিত সেই প্রকার গভীর সম্বন্ধ। সমাজের প্রেমস্তন্যপানে আমরা লালিত পালিত, সমাজের সুব্যবস্থায় আমরা রক্ষিত, এবং সমাজের সুশিক্ষা ও সুশাসনে আমাদিগের চরিত্র গঠিত। অজ্ঞাতসারে সমাজের জ্ঞান ও চরিত্রের আদর্শ আমাদিগের ভিতরে সঞ্চারিত হইল, প্রেম ও পুণ্যের অঙ্কুর প্রকাশিত হইল। কত শতাব্দীর জ্ঞানের সম্ভার লইয়া আজ সমাজ আমাদিগের নিকট উপস্থিত। কত সাধনের, তপস্যার ফল সংগ্রহ করিয়া সমাজ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে অজস্র আশীর্ব্বাদ দান করিতেছেন। সমাজের নিকট হইতে সজ্ঞানে যাহা লাভ করি, তাহার তুলনায় যাহা না জানিয়া পাই তাহা অপরিমেয়। এমন ঋণে সমাজের নিকট আমরা ঋণী যে, স্বচ্ছন্দ চিত্তে তাহার অধীনতা স্বীকার করি, তাহাকে সম্মান করি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি। যত দিন সামাজিক আদর্শ জীবন্ত এবং উন্নতিশীল থাকিবে তত দিন সমাজ হইতে জীবন-স্রোত আমাদিগের প্রত্যেকের মধ্যে প্রবাহিত হইবে। আমরা একদিকে যেমন সমাজের অধীন হইয়া চলিব তেমনি অন্যদিকে যাহাতে সমাজ জ্ঞানের পথে, পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহার জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিব। যে সমাজে শাসন ও শৃঙ্খলা নাই, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, অরাজক রাজ্যের ন্যায় অনেক দুর্নীতি ও পাপ তাহাতে স্থান পায়। যদি আমাদের শরীরের মধ্যস্থিত যন্ত্রগুলি স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন হইয়া দাঁড়ায়, আমাদিগকে অচিরে মানবলীলা সংবরণ করিতে হয়। কিন্তু এই শরীরের মধ্যে এমনি সুশৃঙ্খলা, নিয়ম ও শাসন আছে যে, কোন অঙ্গের ব্যতিক্রম ঘটিলে সমস্ত শরীর তাহার ব্যাধি দূর করিবার জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করে। যাহা শরীরের পক্ষে সত্য তাহা সমাজের পক্ষেও সত্য। যেমন শরীর, তেমনি সমাজেও নিয়ম শৃঙ্খলা এবং পরস্পরের অধীনতার প্রয়োজন। যদি চিরদিনই অধীন থাকিলাম স্বাধীনতার জন্য যে গভীর আকাঙ্ক্ষা তাহা কি মিটিবে

না? যেদিন আদর্শ সমাজে আদর্শ জীবন লাভ করিব সেই দিন মিটিবে? যেদিন সমাজে ভগবানের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং আমাদের জীবনও উন্নতির সোপান হইতে সোপানান্তরে আরোহণ করিয়া সেই আদর্শকে স্পর্শ করিবে, এবং তাহার সঙ্গে এক হইবে, সেই আনন্দের দিনে, সেই মিলনপূর্ণ উচ্ছ্বাসে স্বাধীনতা ও অধীনতার মধ্যে স্থিত ক্ষীণ সূক্ষ্ম রেখা বিলীন হইয়া যাইবে; জীবন সফল হইবে, আমরা ইহধামে থাকিয়া স্বর্গধামবাসী হইব। এবং শরীরও সংসারের নানা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিলেও মুক্তির উজ্জ্বল আলোকে আমাদিগের জীবন উদ্ভাসিত হইবে।

স্থানীয় "অঘোরনারী-সমিতিতে" পঠিত।
৭ই আগষ্ট ১৯০৫,
বাঁকিপুর।

শ্রীহামিদা দেবী।

স্বদেশ-প্রেম।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের সর্ব্বত্রই স্বদেশ-প্রেম জাগিয়া উঠিয়াছে। জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, দুঃখী, হিন্দু, মুসলমানে ভেদ নাই, সকলেরই প্রাণ জন্মভূমির দুঃখে ম্রিয়মাণ। বহুকালের পর সকলের প্রাণ জাগিয়াছে, বহুকালের পর আমা দর মনে হইয়াছে, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা আশীর্ব্বাদ করুন, যে মৃত প্রাণ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা আরও ভালরূপে জাগুক, চির দিন তরে জাগুক্।

এই মহা আন্দোলনের দিনে আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে ক্ষুদ্র ভাব উথলিয়া উঠিয়াছে, ভগিনীমণ্ডলীর সাক্ষাতে হৃদয়ের সেই ভাবটি ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার এই ভাবের মধ্যে যদি আমার কোন দোষ দেখিতে পান, মার্জ্জনা করিবেন।

ভারতের উন্নতির জন্য ভারত-সন্তান বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন, ভারত-মাতার দুঃখে কত দিনে ভারতসন্তানের প্রাণ কাঁদিয়াছে, আরও কাঁদুক, সেই অশ্রুজলে ভারতমাতার দগ্ধ বক্ষ শীতল হউক। মাতার শীতল বক্ষে আমাদের দুর্ব্বল নীরস প্রাণ রেখে কৃতার্থ হই, ধন্য হই। সন্তানের কাছে মায়ের কোল যেমন মিষ্ট, আরাম ও শান্তিপ্রদ জগতে তেমন আর কি আছে?

যেমন ঘুমন্ত শিশু, ঘুমের পর জাগিয়া উঠে, মায়ের স্তন্য-সুধা পান করিবার জন্য কাঁদে তেমনি ভগিনি! তুমি আমিও কাঁদি, মায়ের স্তন্য-সুধা পান করিয়া প্রাণের ক্ষুধা নিবারণ করি। সেই স্তন্য সুধা কি? সেই স্তন্য-সুধা "স্বদেশ-প্রেম।" স্বদেশ-প্রেমের অর্থ দেশের সন্তানকে দুঃখী, ধনী নির্ব্বিশেষে প্রেম করা। সেই প্রেমের বীজ প্রাণে প্রাণে নিহিত হইয়াছে। এস ভগিনি! দেহ, মন, প্রাণ অর্পণ করি, সেই প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হউক,—পত্র, ফল, পুষ্পে সুশোভিত হউক্।

আজ যেমন পুরুষেরা বিদেশী দ্রব্য

পরিত্যাগ করিয়াছেন, দেশের দীনহীন মুচি, তাঁতি, কামার ভাইদের দুঃখে প্রাণ গলিয়াছে, দেশের উপকারের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, তাই তাঁহারা বক্তৃতা করিয়া, কল কারখানা স্থাপন করিয়া, নানা প্রকার স্বদেশজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া স্বদেশ-প্রেমিক হইতেছেন। ভগিনি! আমরা দুর্ব্বল, পরাধীন, নিজ-নিজ সংসারক্ষেত্রে নিরন্তর আবদ্ধ, তাই বলিয়া কি আমাদের কিছু করিবার নাই? কবি যে গাহিয়াছেন "না জাগিলে সব ভারতললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না" ইহা কি কেবল কবির কল্পনা-মাত্র? ইহার কি কোন অর্থ নাই? না, না, ইহার মূলে গভীর অর্থ আছে, ইহা আমাদের চিন্তনীয় বিষয়। আমরা দুর্ব্বল, পরাধীন হইলেও বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমরা কেবল আপনাকে লইয়া বিব্রত থকিতে আসি নাই। ইহার অর্থে এরূপ বুঝায় না যে, নিজপরিবারের প্রতি যে সমুদায় কর্ত্তব্য কার্য্য আছে, সে সব না করিয়া সমস্ত অপরের জন্য করা। যদি কেহ সেরূপ করে তাহা বিধিনির্দ্দিষ্ট হয় না; কারণ যিনি আমাদিগকে স্বামী, পুত্র, কন্যাপ্রভৃতি দিয়াছেন, তিনিই জগৎকে সম্মুখে রাখিয়া জগতের সেবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। যিনি আমাদিগের জন্য এই রূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁর পদানুসরণ করিলে, তাঁর শরণাপন্ন হইলে, তিনি শরণাগত জনকে পথ দেখাইবেন।

পরিবারের জন্য হউক, বা দেশের জন্যই হউক, কার্য্য করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে আমাদের জীবন সেই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া না থাকিলে কিরূপে কার্য্য ক্ষম হইবে? যেরূপ মাতা হইতে হইলে তাহার অনুরূপ বয়স ও শিক্ষা চাই, সব কাজেই সেই রূপ।

ভগিনীগণ! আমি অজ্ঞানী অশিক্ষিত, এ বিষয়ে আমার বিশেষ জ্ঞান নাই বলা বাহুল্য; তবে প্রাণের আবেগে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করে, তাই সাহস করিয়া বলিতেছি। আমরা যে কোন কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিতে চাই, তাহার মূলে কি থাকে? তাহার মূলে থাকে "প্রেম" "প্রেম" এই অমূল্য রত্ন কাহারও প্রতি অর্পিত না হইলে আমরা কাহারও জন্য কিছুই করিতে পারি না। এই প্রেমের অভাবেই আমাদের জীবন নীরস ও কর্ত্তব্যশূন্য হইয়া পড়ে। এই প্রেম ব্যতীত আমরা সুমাতা, সুপত্নী, সুকন্যা, সুভগিনী কিংবা স্বদেশপ্রেমিক কিছুই হইতে পারি না।

প্রেম অতি উচ্চ জিনিষ, স্বর্গীয় পবিত্রতার সৌরভে পরিপূর্ণ। ইহা সংসারের ক্ষুদ্র কামনা বাসনা পরিপূর্ণ কোন জিনিষ নহে, ইহা যাঁহার হৃদয়ে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাঁহার জীবন সুন্দর মধুময় হইয়া গিয়াছে। এই প্রেমের পরিণতি ও পূর্ণতা লাভ অনন্ত প্রেমময়ের মধ্যে।

যিনি অনন্ত প্রেমের জলধি, তিনি করুণাময় তিনি মঙ্গলময়; তিনি যে, সর্ব্ব-শুভদাতা ইহা উল্লেখ করা বাহুল্য। স্বদেশপ্রেমের এই বিরাট আন্দোলনের সময়ে আমরা দুর্ব্বল ভগিনীগণ সর্ব্বাগ্রে

অনন্ত প্রেমময়ের চরণে প্রেম ভিক্ষা করিয়া প্রত্যেক হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেম-বীজ রোপণ করি। প্রেমময় আশীর্ব্বাদ করুন, পরস্পর পরস্পরের মুখে স্বর্গীয় প্রেমের জ্যোতি দেখিয়া মুগ্ধ হই, পরস্পর পরস্পরের জন্য দেহ, মন, প্রাণ অর্পণ করি, তাহা হইলেই আমাদের ভারত-জননীর হাসি দেখা দিবে, আমাদের সকল ভাই ভগিনীর মুখ আনন্দ ও শান্তিতে দীপ্তিযুক্ত হইবে। প্রেমময় পরম দেবতা আমাদের দুর্ব্বল মস্তকে আশীর্ব্বাদ করুন; আমাদের হৃদয় তাঁর স্বর্গীয় প্রেমে অনুরঞ্জিত হউক।

কটক। শ্রী রে—

সংবাদ।

বিগত ৯ই নবেম্বর আমাদের ভাবী সম্রাট্ অশেষ গৌরবাস্পদ যুবরাজ প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্স্ এবং মহামান্যা যুবরাজ-পত্নী বম্বে নগরে পদার্পণ করিয়াছেন। পরম সম্মানভাজন রাজপ্রতিনিধি লর্ডকর্জ্জন শিম্‌লা শৈল হইতে উক্ত নগরে যাইয়া তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বম্বেনিবাসিগণ যুবরাজ ও যুবরাজপত্নীকে হৃদয়ের গভীর প্রেম ও অনুরাগ সহকারে মহোৎসব করিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তাঁহারা যে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছিলেন, যুবরাজ অত্যন্ত প্রীতি-মধুর বচনে তাহার উত্তর দিয়াছেন। অভিনন্দনপত্রের উত্তরে তাঁহার হৃদয়ের সুমিষ্ট ভাবের পরিচয় পাইয়া সকল লোক বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। যুবরাজ ও যুবরাজপত্নী এই সুবিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্যে চারি পাঁচ মাস কাল ভ্রমণ করিয়া অত্রত্য দর্শনীয় প্রধান প্রধান স্থান সকল দর্শন করিবেন, এবং রাজা মহারাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকের সঙ্গে পরিচিত হইবেন, এরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আগামী ১৯শে ডিসেম্বর রাজধানী কলিকাতায় ইঁহাদের পদার্পণ করা নির্দ্ধারিত। কিন্তু রাজধানীর যেরূপ দুঃখের অবস্থা, এস্থানে রাজা প্রজায় যেরূপ অবিশ্বাস ও অসদ্ভাব জন্মিয়াছে ইঁহারা যে কত দূর শ্রদ্ধা প্রেম ও অনুরাগের সহিত গৃহীত হইবেন, জানি না। আমরা পৃথিবীর মধ্যে প্রধান রাজভক্ত প্রজা বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করি না। আমাদের দোষে বালকগণ পর্য্যন্ত বিরোধী হইয়া নিজেদের ভাবী কল্যাণ ও উন্নতির পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিতেছে অনেক মেয়ের মনও বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। অবিনয় ও অকৃতজ্ঞতার বিষময় ফল যতদূর হইতে পারে হইতে চলিয়াছে। এই দেশের পরিণাম যে কিরূপ হইবে বিধাতা জানেন।

সুদূর পল্লীগ্রামনিবাসিনী অন্তঃপুরস্থ একটী বধূ স্বদেশী আন্দোলনের পোষকতা করিয়া তদ্বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া মহিলায় প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছিলেন। তিনি কোণের বউ, ঘোর লজ্জাবতী, এক প্রকার শয্যাগতা। এই অবস্থাতেও তাঁহার স্বদেশী প্রবন্ধ লিখিতে উৎসাহ

হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, স্বদেশী-আন্দোলন কত দূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু পর দিনই তাঁহার এই মর্ম্মে এক পত্র পাওয়া যায়, "প্রেরিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিবেন না। অনেকে তাহা প্রকাশ করিতে বারণ করিতেছে।"

আমরা বহু গ্রাহক গ্রাহিকার নিষ্ঠুর ব্যবহারে অতিশয় দুঃখিত ও আশ্চর্য্যান্বিত। গত আষাঢ় মাসে মহিলার ১০ম বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। অনেকেই গত বৎসরের মূল্য এমন কি তাহার পূর্ব্ব বৎসরের বাকি মূল্য প্রদান করিতেছেন না। ক্রমে তিন চারি বার পত্র লিখা গিয়াছে, কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। কয়েক জনের নিকট ভি, পি, করা গিয়াছিল, অনেকে ভি, পি, ফেরত পাঠাইয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা অর্থসম্বন্ধায় কিরূপ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। পত্রিকাদির ঋণ পরিশোধে এরূপ উপেক্ষা বড় দুঃখের বিষয়।

বর্ত্তমান মাসের মহিলার কম্পোজ কার্য্য প্রায় সমাপ্ত হইলে বারুকপুর হইতে ভাইফোঁটাবিষয়ক কতক গুলি পদ্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সমুদায় পদ্যই পুরুষের লেখা। আগামীতে তাহার কোনটা প্রকাশ করা যাইতে পারিবে কি না বিবেচ্য। মহিলার রচনাস্থলে উক্ত পদ্য সকল প্রকাশ করা যাইতে পারে না। ভাইফোঁটাসম্বন্ধে এবার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল।

ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন পদত্যাগ করিয়াছেন, পাঠিকাগণ তাহা অবগত আছেন। তিনি সপত্নীক ভারত ত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিয়াছেন। নূতন রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো গত কল্য বম্বে নগরে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি আগামী ৩রা অগ্রহায়ণ বেলা ৯টার সময় রাজধানী কলিকাতায় উপনীত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন।

মহিলার নিয়মাবলী।

মহিলা পত্রিকা প্রতিমাসে সংক্রান্তি দিবসে প্রকাশিত হয়। ডাক মাশুলসহ ইহার বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ মহিলার মূল্য ও অর্থসম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকটে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক প্রকাশিত হইবে। কাহারও প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া যাইবে না।

অনেকে মহিলা পত্রিকা বৎসরাধিক কাল গ্রহণ করিয়া মূল্য দান করেন না, বড় দুঃখের বিষয়। যাঁহারা মূল্যদানে অসমর্থ তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্রিকা ফেরত পাঠাইয়া দেন, অথবা আমাদিগকে তাহা পাঠাইতে নিষেধ লেখেন। তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া প্রাপ্য মূল্য না পাইলে অনেক সময়ে আমরা সেই মূল্যের জন্য ভি, পিতে মহিলা পাঠাইয়া থাকি।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

ইচ্ছাশক্তি *।

আমি সেদিন আপনাদের নিকটে বস্তুবিজ্ঞানসম্বন্ধে বলিয়াছি; আজ ইচ্ছাশক্তির বিষয় বলিব। ইচ্ছাশক্তি কাহাকে বলে? কোন একটা জিনিষ জানিতে হইলে প্রথমে জানা দরকার জিনিষটা কি? তার পর আমাদের তিনটী শক্তির প্রয়োজন। ১ম ইন্দ্রিয়শক্তি, ২য় স্মৃতি, ৩য় বুদ্ধি। ইন্দ্রিয়শক্তির দ্বারা আমরা বাহিরের কোন্ বস্তুর কি রকম শক্তি তাহা জানিতে পারি। স্মৃতি জানিতে হইলে জ্ঞানের দরকার। স্মৃতির অপেক্ষা তাহার অন্তরালে যে বস্তুবিশেষ কাজ করে তাহাই আত্মজ্ঞান। আজ আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলিব। মনোবিজ্ঞানসম্বন্ধে জানিতে গেলে আত্মজ্ঞান দরকার। আপাততঃ আমাদের ইচ্ছা যে কি জিনিষ তাহাই জানা প্রয়োজন। মানুষের মনে সদাসর্ব্বদা কোন বিষয় জানিবার একটি ইচ্ছা হয়, এবং সেই ইচ্ছার সঙ্গে প্রবৃত্তি বলিয়া একটা জিনিষ থাকে। ইচ্ছাপ্রকৃত জিনিষটা কি এবং প্রবৃত্তিই বা কি? প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা এদুটী বিভিন্ন পদার্থ। কোন কোন সময় মানুষের মনে ইচ্ছা হয়, কিন্তু প্রবৃত্তি হয় না, আবার কখন কখন প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু ইচ্ছা হয় না। আমাদের প্রবৃত্তি সকল সময় ঠিক থাকে না, আমাদের মন সব সময় চঞ্চল। দিনের মধ্যে কত বার যে বদলাইয়া যায় তাহার ঠিক নাই। এমন কি কত সাধু মহাজনদিগেরও মন চঞ্চল হইতে দেখা যায়, অচঞ্চল মন খুব কমই দেখা যায়। চঞ্চল বলিয়া যে জিনিষ আমাদের মনের ভিতর আছে, প্রবৃত্তিও সেইরূপ। প্রবৃত্তি জিনিষটা ভাবমূলক। আমাদের ভিতরে দয়া বলিয়া যে সুকোমল ভাব আছে, সেইরূপ স্বার্থের ভাবও আছে। প্রবৃত্তি আমাদের মনের একটা চঞ্চল ভাব। কোন সময় আসে আবার কোন কোন সময় থাকে না। যখন চঞ্চল ভাব না থাকে তখন মনটা শুষ্ক বোধ হয়। মানুষের মনের উপর কখন কখন ভাব নির্ভর করে। যখন প্রবৃত্তি শুষ্ক হইয়া যায় তখন কোন কাজ করা যায় না। মানুষের মনে প্রবৃত্তি এইরূপ কখনও স্থায়ী থাকে না। সাধুদেরও সৎপ্রবৃত্তি অনবরত ভাবে স্থির থাকে না। প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার মূলে কর্ত্তব্য বলিয়া একটি জিনিষ আছে। কর্ত্তব্য জিনিষটা সমস্ত কাজে এক ভাবে থাকে। পূর্ব্বে লোকদের মধ্যে ধারণা ছিল যে পৃথিবী গোল। অবশ্য সকলের মধ্যে নয়। স্পেনদেশের লোকের মধ্যে অতি অল্প লোকই জানিত যে, বাস্তবিক পৃথিবী গোল নয়। কলম্বস্ নামে একজন লোক ছিলেন, তিনি খুব ধর্ম্মভীরু ছিলেন। তাঁর জানিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়া

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মোহিতচন্দ্র সেন ১৯০১ সালে ১৩ই ডিসেম্বর যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন, তন্মূলক।

যে, পৃথিবীটা গোল কি না, এবং তাঁর এই ইচ্ছা হইল যে, ঈশ্বর এই বিশাল জলরাশি কি বৃথা সৃষ্টি করিয়াছেন? না অবশ্য ইহার পারে কোন জীব জন্তুর আবাস ভূমি আছে। এই বিষয় জানিবার জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। তাহার পর তিনি সেই দেশের রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, তথাকার পোপের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সাহায্য করা দূরে থাকুক সকলেই তাঁহাকে উপহাস করিয়া ইহা অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। শেষে নিরুপায় হইয়া স্পেনের রাজার নিকট সাহায্য পাইলেন। তিনি খালি জাহাজ পাইলেন বটে, কিন্তু কেহই তাঁর সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল না। অবশেষে নিকটবর্ত্তী একটা দ্বীপে যাইবার ছলনায় জন কয়েককে হাত করিলেন, এবং জাহাজে করিয়া চলিলেন। তার পর দ্বীপ পার হইবামাত্র কেহই যাইতে সম্মত হইল না। সকলেই তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইল। তিনি তাহাদিগকে সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন, আর এক দিন চল। এই রূপে কয়েক দিন যাইয়া এক স্থানে কত গুলি লতান গাছ দেখিতে পাইলেন। তখন সকলেই মনে করিতে লাগিল যে, ইহা শয়তানের জাল। এই মনে করিয়া সকলেই তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল, এবং ভয়ানক বিদ্রোহাচরণ করিতে লাগিল। তার পর একটা পাখী দেখিতে পাইলেন, পাখী দেখিয়া তাঁর মনে হইতে লাগিল যে, উহা কখনই সামুদ্রিক পাখী নয়। এ পাখী অবশ্যই স্থলচর। তার পর তিনি সকলকে সেই পাখী দেখাইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, ঐ পাখী নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে আসিয়াছে। শেষে ঐ পাখী দেখিয়া সকলেরই মনে একটা আশা জন্মিল। যদি তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তি না থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনই আমেরিকা আবিষ্কৃত করিতে পারিতেন না। তিনি প্রবৃত্তির ও ইচ্ছাশক্তির ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যের মধ্যে ইচ্ছাকে স্থির রাখিলে জ্ঞানের একটা নির্ভর ভাব আসে। কর্ত্তব্য জানিতে অনেক সময় শাস্ত্র কিম্বা গুরুজনদিগের কথা দ্বারা জানিতে পারা যায়। গুরুজনদিগের শিক্ষা দ্বারা শিশুরা যে শিক্ষা লাভ করে, তাহা তাহাদের কর্ত্তব্যের মধ্য দিয়া হয়। যখন তাদের মনের সহিত কর্ত্তব্যের মেলে না, তখন তাহারা কিছুই করিতে চায় না। মনের ভিতর হইতে বিবেকের যে বাণী আসে, তাহাতেই মনুষ্যের কর্ত্তব্য জাগিয়া উঠে। হৃদয়ের অন্তরস্থ বাণীই বিবেক। আমরা যখন আমাদের মনকে কোন সৎকার্য্যে নিয়োগ করি, তখন বিবেকের বাণী শুনিতে পাই। কিন্তু আবার কখন কখন বিবেকের বাণী ভুল করি, যখন দেখি মনের সহিত আমাদের ন্যায়বুদ্ধির সহিত মিলছে না, তখন একা মনের কথা শুনিতে হইবে। মিথ্যা জিনিষটা কিছুই নয়। সত্য বলিয়া যে জিনিষটী আছে' তাহাকে উন্নত করিতে হইবে। যখন আমার মন শুদ্ধ হচ্ছে, হৃদয় গভীর হচ্ছে তখন সেখানে সত্য বলিয়া যে জিনিষটী আছে, তাহাকেই বাণী বলি। সত্য, ইচ্ছাই হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছা।

ইচ্ছা কর্ত্তব্যমূলক। মানুষের ইচ্ছাকে ভগবানের ইচ্ছার সহিত মিলাইতে হইবে। যখন ভগবানের ইচ্ছা আপনাদের মধ্যে জাত হইবে, যতই সেই ইচ্ছাকে ভগবানের দিকে চালাইবে, ততই যথার্থ নিজেকে জানিতে পারিবে। আমি যে কি বস্তু তাহা অনেকেই জানে না, জানে না বলিয়া অনেক ভাল জিনিষ জানিতে পারে না। আমাদের জীবন কত ভাল হইতে পারে, বা কত মন্দ হইতে পারে তাহা জানা যায় না। সেই রকম শিশুদের জীবনও ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, জানিতে হইলে যত্ন চাই। এই জীবনের ভিতর কত ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, কত আশীর্ব্বাদ আছে তাহা জানা যায় না। শিশুকে ভাল করিয়া জানিতে ইহা সকলে পারে না। প্রত্যেক ছেলের সম্বন্ধে একটা অকূল ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, যদিও আমাদের ভিতর ও শিশুদের ভিতর কি আছে, তাহা আমরা ভাল জানি না। আত্মজ্ঞান মানে নিজের ভিতরে থাকিয়া নিজেকে জানা। খালি ভগবানের ঐ ইচ্ছা ধরিয়া যত উঠিবে, ততই আপনাকে জানিতে পারিবে। আমি কি, কিছুই জানি না, নিজেকে জানিতে হইলে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা জানিতে পারা যায়। আত্মজ্ঞানের মূলে ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি কি? এবং কর্ত্তব্য জিনিষটা কি? অন্তরের কথা দ্বারা জানিতে পারা যায়, এবং যখন সেই ইচ্ছায় ইচ্ছা যোগ হয়, তখন যথার্থ নিজেকে জানিতে পারি। ইচ্ছার স্বাধীনতা, প্রবৃত্তির উপর ইচ্ছা জিনিষটার জয় করা দরকার হয়। সে নিজে চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে, সে কখনও প্রবৃত্তি জয় করিতে পারে না। আমরা নিজে যে চিন্তা ও ভাব উপার্জ্জন করি, তাহা চারিদিকের অবস্থার উপর নির্ভর করে। যথার্থ আমিই কি আমার ইচ্ছা? ছোট ছেলেদের ইচ্ছার দিকে নজর রাখিলে দেখিতে পাওয়া যায় কি করিয়া তাহাদের ইচ্ছাশক্তি হয়। প্রথম হইতে ছেলেদের মন ইচ্ছা, শক্তি, জ্ঞান এবং ভাল ভাল জিনিষের দ্বারা আবৃত থাকে ইচ্ছা অবস্থার অধীন নয়। অবস্থা ধনী ও দরিদ্রের উপর নির্ভর করে। ভগবান আমাদের অবস্থানুযায়ী ধন দিয়াছেন, তাঁহার ভিতর থাকিয়া তাঁর উপর নির্ভর করিবার ক্ষমতা ও তিনি দিয়াছেন, এবং এই রকম ভাবে যে চলে সে নিজেকে নিজে ভাল করিতে পারে। অনেকে টাকার সদ্ব্যবহার করিতে পারে না, তার প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু পারে না। আমাদের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য অবস্থার উপর জয় করে। ইচ্ছা আমাদের একটা স্বভাব। স্বভাব জিনিষটা যে কি তাহা আমরা নিজে জানি না। স্বভাব হইল কোথা হইতে? বাপমার নিকট হইতেও হয়, কিম্বা কখন কখন বাহিরের জিনিষের দ্বারাও হয়। নিজের ইচ্ছা দ্বারা যদি স্বভাবকে চালনা করা যায়, প্রায় অনেক সময় নিজেকেই কষ্ট পাইতে হয়। এই যে স্বাধীন ইচ্ছা ইহা অবস্থা হইতেও হয় এবং স্বভাব হইতেও হয়। অবস্থার দাস হওয়া ভাল, কিন্তু স্বভাবের দাস হওয়া ভাল নয়। এই যে আমার ইচ্ছা, এই টুকুও যে আমারই, তাহাও বলা যায় না।

সাধুপল *।

আজ আপনাদিগকে যে সাধু পুরুষের কথা বলিব, তাঁহাকে বাস্তবিক ঐ নামে অভিহিত করা যায় কি না অর্থাৎ তিনি বাস্তবিক সাধু ছিলেন কি না, তাহা দেখিতে হইবে।

কি কি গুণ থাকিলে মানুষকে সাধু বলা যায়? সাধুতো অনেকই আছেন, কিন্তু কি কি গুণ থাকিলে মানুষকে সাধু পুরুষ বলা হয় পূর্ব্বে অনেক সাধু পুরুষের কথা আপনাদের বলিয়াছি। লুথারকে অনেকে সাধু বলেন, পলকে দেখিয়া অনেকে বলেন যে, তাঁহার সহিত আর লুথারের সহিত অনেকটা মিলে। ক্যাথলিক ধর্ম্ম যে সময় প্রচার করা হয় সে সময়ের অনেক সাধুপুরুষের নাম আছে। যীশু খ্রীষ্টের সময়ে যাঁহারা ছিলেন তিনি সে দলের লোক নন, বরং খ্রীষ্টের শিষ্যের প্রতি মন্দ ব্যবহারই করিতেন। তিনি যীশু খ্রীষ্টকে দেখেন নাই, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার শিষ্যদিগকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেন, যীশু খ্রীষ্টের প্রশংসা শুনিতে পারিতেন না, যাঁহারা খ্রীষ্টের প্রশংসা করিতেন, তাঁহাদিগের প্রতি মন্দ ব্যবহার করিতেন, তিনি তাঁহাদের একজন ছিলেন। ষ্টীফেন নামক একজন বিশ্বাসী লোক ছিলেন। পলের কতকগুলি সঙ্গী তাঁহাকে মারিয়া ফেলে। পল নিজ হস্তে তাঁহাকে নিহত করেন নাই, কিন্তু তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাকে নিহত করিবার সময়ে তিনি কিছুই বলেন নাই। পলের নাম আগে পল ছিল না, সল ছিল। যখন ষ্টীফেনকে পাথর ছুড়িয়া মারিতে লাগিল সে সময়ে তিনি তাহাদিগকে কিছুই বলেন নাই, কেবল ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"হে প্রভু, ইহাদিগকে ক্ষমা কর।" সাধুপল তাঁহার আশ্চর্য্য ভাব দেখিলেন। যাঁহারা সাধুপলের জীবনী লিখেছেন তাঁহারা বলেন যে, এই ঘটনা ঘটিবার পর হইতে সাধুপলের পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তিনি বলিতেন, 'শত্রুকে ক্ষমা করিতে হইবে'। যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে ষ্টীফেনের মৃত্যুতে তাঁহার হৃদয়ে খুব আঘাত লাগিয়াছিল। জেরুজালেম হইতে যখন দমস্কসে যান সেই সময়ে যাইতে যাইতে পথের মাঝখানে এমন একটা আলোক দেখিতে পাইলেন যে, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তার পর অনেক ক্ষণ পরে, তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে তিনি দেখেন তাঁহার চক্ষু কেমন ভার ভার। চক্ষু খুলিতে চেষ্টা করিলেন চক্ষু খুলিল বটে, কিন্তু চক্ষুতে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তিনি তখন বুঝিলেন যে, তাঁহার চক্ষু কাণা হইয়া গিয়াছে। তিনি তিন দিন চক্ষু খোলেন নি কিংবা খান্‌নি, কেবল কাঁদিয়াছিলেন। তিন দিন পরে এক দিন স্বপ্নে দেখিলেন যে একজন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন; তুমি অমুক স্থানে যাও,

* ১৯শে ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত প্রমথলাল সেন যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন তন্মূলক।

সে স্থানে একজন মহাত্মা ধ্যানে রত আছেন, তুমি সেখানে যাও, তাহা হইলে চক্ষু ভাল হইবে। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিদ্রাও ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি শরীরে যেন অনেক বল পাইলেন। তখনই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখিলেন, একটি সাধু পুরুষ প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি সেই স্থানে গিয়া দাঁড়াইলে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল, সেই সাধু পলকে বলিলেন 'চোখ খোল' তার পর তিনি চক্ষু খুলিলেন, খুলিয়া বেশ পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। চক্ষুর সমুদায় দোষ কাটিয়া গেল। আর এক স্থানে আছে, সাধুপল যেন বলছেন যে, দুপুর বেলা দেখিলাম সূর্য্যের অপেক্ষা জ্যোতিষ্কর একটা আলোক আমার সম্মুখে লাগিল। আর শূন্য হইতে আমাকে যেন কেহ কিছু বলিতেছেন; ইহা বেশ পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিলাম। আমার সঙ্গে যে সমস্ত লোক ছিলেন, তাঁহারা কিছুই শুনিতে পাইলেন না, কিংবা কিছুই দেখিতে পাইলেন না, আমি ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম।' এই সমস্ত কারণে তাঁহার দয়া ভক্তি যেন দিন দিন বাড়িতে লাগিল। পূর্ব্বে তাঁহার দয়া ভক্তি থাকিলেও যীশুকে মোটেই দেখিতে পারিতেন না, যিশুর কথা একেবারেই শুনিতে পারিতেন না। কিন্তু শেষে তাঁহার আর এ ভাব ছিল না। উপরি উক্ত ও শেষোক্ত কতকগুলি ঘটনায় যীশু খ্রীষ্টের প্রতি মন্দ ভাব যাহা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন সে সমুদয়ে মন হইতে সরাইয়া ফেলিলেন। শেষে তিনি যীশু ভক্ত হইয়াছিলেন তাঁহা দ্বারাই খ্রীষ্টের ধর্ম্ম অনেক প্রচার হইয়াছিল। ফ্রান্সিস অব য্যাসিস্ খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অনেক প্রচার করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার মধ্যে ভালবাসার ভাব খুব অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত, তিনি সমুদায় লোককে তাঁহার ভালবাসার দ্বারা মুগ্ধ করিতেন। সাধুপলও বলিতেন, সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমই মহামূল্য বস্তু। আজ পর্য্যন্ত সাধুপলের নামে সমুদায় জগৎ সমাচ্ছন্ন। সকলেই পলকে সাধুপল বলিয়া ভক্তি করেন, এবং ভাল বাসেন। যাঁহারা সাধুপলকে সাধু বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারাও বলেন, এবং নিশ্চয় স্বীকার করেন যে, তিনি সাধু না হইলেও কতকটা সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার মধ্যেও এক দিকে কোমলতা ও এক দিকে কঠোরতা দৃষ্ট হইত। গীতায় আছে, একজন লোকের যদি আচার ব্যবহার ভাল না হয়, কিন্তু সে যদি কখনো ঈশ্বরের ভজনা করে, তাহা হইলে সে মনে এক দিন না এক দিন শান্তি পাইবেই। তাহার সমুদায় রিপু এবং মানসিক সৎপ্রবৃত্তিসমূহ একেবারে বিনষ্ট হয় না। যখন তাহার জীবনের পরিবর্ত্তন দেখা যাবে, তখন তাহাকে সাধু বলা যাইতে পারে। ডেভীস্ ভয়ানক ভয়ানক পাপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি খুব সাধু ছিলেন। জর্জ্জমুলারসম্বন্ধেও ঐরূপ শুনা যায়। সাধুপলের সম্বন্ধেও শুনা যায়, তিনি খুব বিদ্বান্ ছিলেন, অন্যান্য আরো অনেক গুণ তাঁহার মধ্যে ছিল। তাঁহার মুখের ভাব দেখিলে মনে হইত তাঁহার

মধ্যে প্রতিহিংসার ভাব মোটেই ছিল না। তাঁহার মূর্ত্তি অতি সুন্দর এবং গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। কবিদের সম্বন্ধে যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ধারণা করিয়া লোকদের নিকটে তাঁহাদের (কবিদের) গুণাগুণ বর্ণনা করেন, একজন হয়তো বলিবেন পদের ভাব যাঁহার সুন্দর তিনিই যথার্থ কবি। আর একজন বলিবেন শুধু ভাব দেখিলে হইবে না, যাঁহার ভাষা এবং ভাব দুই আছে তিনিই যথার্থ কবি। এইরূপ সাধুদের সম্বন্ধেও নানা লোকে নানা ভাব পোষণ করেন। কেহ বলেন, যীশু খ্রীষ্ট যথার্থ সাধু পুরুষ ছিলেন। কেহ বলেন যে, ফ্রান্সিস্ অব য়্যাসিস যথার্থ সাধু ছিলেন। আবার কেহ বলেন, পলই সাধু পুরুষের অগ্রণী ছিলেন, ইত্যাদি। এখন কথা হচ্ছে এই যে, সাধু বলিতে আমরা কি বুঝি? সাধু বলিতে যদি আমরা এই বুঝি যে, অসৎ ভাবগুলি সমুদায় চলিয়া গেল, যে স্থান অসৎ ভাবে পূর্ণ ছিল সেস্থান সদ্ভাবে পূর্ণ হইয়াছে। যথার্থই তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন দেখা গেল এই ভাব যখন দেখিব তখন তাঁহাকে সাধু বলিব, তবে—আমরা ঠিক বুঝিয়াছি। এক জনের জীবন যে একেবারেই ভাল হইবে, তাঁহার জীবনে যে কোন দিন দোষ দুর্ব্বলতা দেখা যাবে না, ইহা একরূপ অসম্ভব। মানুষমাত্রেরই দোষ দুর্ব্বলতা আছে, কিন্তু সেইগুলি সরাইয়া ফেলিয়া যদি সেই স্থান সদ্ভাবে পূর্ণ হয়, তবে তাঁহাকে সাধু বলিব। সাধু পল যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু নিজ হাতে অধিক কিছু লেখেন নাই, অন্য দ্বারা লেখাইতেন। নিজের সম্বন্ধে অনেক লিখেছেন, তাঁহার নিজের লেখায় তিনি নিজে পরিচিত হইয়াছেন। নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা উল্টপাল্টে লিখিয়াছেন। তাঁহার সেই লেখার মধ্যে আরম্ভ এবং শেষ, অর্থাৎ কি ভাবে আরম্ভ করিতেন এবং শেষে কি লিখিয়া শেষ করিতেন তাহাই দেখা উচিত।

তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—আমি যীশু খ্রীষ্টকে দেখি নাই, তাঁহাকে পূর্ব্বে বিশ্বাসও করিতাম না, যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহাদিগকে ব্যাকরসন্ বলিতে দিতেন না। তিনি আরো লিখিয়াছেন মানুষ আমাকে ভাল করে নি, ঈশ্বর স্বয়ং আমাকে ভাল করিয়াছেন। ঈশ্বর নিজে ভাল করিয়াছেন, যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়া। যদি আমরা যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মের কথা শুনিতে চাই, তবে পলের লিখিত পুস্তক পড়িলেই সমুদায় পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারি। যীশু খ্রীষ্টকে তিনি 'প্রভু যীশু খ্রীষ্ট' বলিতেন। খ্রীষ্টকে প্রভু বলিতেন বলিয়া অনেকে মনে করেন বুঝি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতেন। কিন্তু তাহা নহে, তিনি ঈশ্বর বলিয়া যীশু খ্রীষ্টকে মানিতেন না। ঈশ্বর ও যীশু খ্রীষ্টকে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া ভক্তি ও পূজা করিতেন। গ্রীক্ ভাষাতে এ সম্বন্ধে অনেক লেখা থাকিলেও তাঁহারা সমুদায় ঠিক্ দেখেন নি, যে ভাষা হইতে ইহা অনুবাদ করা হয়েছে তাঁহারা ভালরূপে

এ ভাষা জানিতেন না। তাঁহারা বলেন পল যীশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতেন, কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি বলিতেন, যীশু খ্রীষ্টের কৃপা, তাঁর মধ্য দিয়া ভগবানের কৃপা। তিনি বলিতেন—আমি যীশু খ্রীষ্ট হইতে যে কৃপা পাইয়াছি তাহা ভগবানের মধ্য দিয়া। তাঁহার মধ্যে এই তিনটি ভাব ছিল।

১। ভগবানের প্রেম।

২। যীশু খ্রীষ্টের কৃপা।

৩। পবিত্রাত্মার সহবাস।

তিনি যীশুর কৃপাকে অনন্ত মনে করিতেন, ঈশ্বর ও যীশু খ্রীষ্ট দুই জনই আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেছেন। তিনি চিঠিতে লিখেছেন 'ঈশ্বরের যে দয়া ইহা যেন তোমাদের মধ্যে থাকে। পবিত্রাত্মা লইয়াই যেন তোমরা থাক।' তাঁহার মধ্যে যে রাগ ছিল না, কিংবা অন্যান্য রিপু উত্তেজিত ছিল না, তাহা নহে; সমুদায় থাকিলেও তিনি সে সমুদায়কে জয় করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন, তাই তিনি সাধু বলিয়া পরিচিত। প্রথম শতাব্দীতে তাঁহার কথা লোকে অত বিশ্বাস করিত না। দুই তিন শতাব্দী পরে তাঁহার বিষয় লোকে বিশেষ রূপে জানিতে পারিল। পরে আবার লুথার আসিলে তাঁহার আদর আরও বাড়িয়া গেল। লুথার আসিয়া তাঁহার আদর আরও বাড়াইয়া দিলেন। লুথার তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আরো উচ্চ ভাব সকল দেখা যায়।

মূল্য প্রাপ্তি।

৯ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাস,	বগুড়া	২৲
„ চন্দ্রভূষণ মালিক,	গণ্ডা	২৲
„ নিশীকান্ত সেন,	গয়া	১৲
„ পূর্ণচন্দ্র মজুমদার,	মুর্শিদাবাদ	১৲
„ প্রসন্ন কুমার দত্ত,	জাপালা	২৲
রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর,	সেরপুর	২৲
শ্রীমতী সুরবালা গুপ্ত,	পাঁচকুড়া	২৲

১০ম বৎসর।

শ্রীমতী কুসুম কুমারী পাল,	ঢাকা	১৲
„ ব্রহ্মময়ী দাসী,	সিংরৈল	১৲

শ্রীমতী সুরবালা গুপ্ত,	পাঁচকুড়া	২৲
„ সুদক্ষিণা সেন,	ভবানীপুর	২৲
„ নলিনী দেবী,	কুয়স্বাকুম	২৲
„ সরোজিনী দেবী,	বাঁকা	২৲
শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন কান্তগিরি	বালেশ্বর	২৲
„ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ,	আরা	২৲
„ অবিনাশচন্দ্র সেন,	চাঁদপুর	২৲
„ চন্দ্রভূষণ মালিক,	গণ্ডা	২৲
„ অবিনাশচন্দ্র রায়,	ফতেপুর	২৲
„ সিদ্ধেশ্বর মিত্র,	অমরপুর	২৲
„ নিশাকান্ত সেন,	গণ্ডা	২৲
„ পূর্ণচন্দ্র মজুমদার,	মুর্শিদাবাদ	২৲
„ হেমন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়,	নারায়ণগঞ্জ	২৲
„ যাদব লাল সেন,	কুচবিহার	২৲
„ প্রসন্নকুমার দত্ত,	জাপলা	২৲
„ আমানতোল্লা আহমদ,	বড়মরিচা	২৲
„ জয়চন্দ্র দাস,	বালেশ্বর	২৲
„ মাধবচন্দ্র ঘটক,	টাঙ্গাইল	২৲
„ জগচ্চন্দ্র রায়,	মুন্সিগঞ্জ	২৲
রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর,	সেরপুর	২৲

১১শ বৎসর।

শ্রীমতী সুনীতি দেব,	সম্ভার	২৲
„ ইন্দুমতী দাস,	ঢাকা	২৲
„ নলিনী দেবী,	কুয়স্বাকুম	১৲
শ্রীযুক্ত হাজারী লাল,	পূর্ণিয়া	॥০
„ কালী গোপাল রুদ্র,	শ্রীহট্ট	২৲
„ মহিমচন্দ্র সেন,	টাঙ্গাইল	১৲
„ মৃণালা দেবী,	জামালপুর	২৲
„ সত্যরঞ্জন কান্তগিরি,		॥৵০

সূচী।

গভর্ণমেণ্টমেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজের

কেশরঞ্জন তৈল।

উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিদিগের পত্র।

বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অতিরিক্ত সব্ জজ (পাটনা),—"ইহা ব্যবহার করিয়া বড়ই উপকার পাইয়াছি।"

বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত সব্ জজ, (কলিকাতা)—"ইহার সৌরভ অতি উৎকৃষ্ট ইহা চটচটে নহে; মাথা ঠাণ্ডা করে এবং কেশের ঔজ্জ্বল্য সাধন করিয়া থাকে।"

বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল, সব্ জজ, (মুঙ্গের দুর্গ),—"কেশরঞ্জন মাথা ঠাণ্ডা করে এবং কেশদাম চাঁচর চিকুরবৎ সুন্দর রাখে।"

বাবু দ্বারকনাথ ঘোষ সবজজ (যশোহর),—"মাথা ঠাণ্ডা করে এবং ইহার মনোহর সুগন্ধ আছে।"

বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ, সবজজ (হুগলি),—"এই প্রকার কেশতৈলের মধ্যে এইটী উৎকৃষ্ট।

জাল ধরিতে পারিলে পুরস্কার।

বাজারে প্রচারিত, সর্ব্ববিধ কেশতৈলের মধ্যে কেশরঞ্জন তৈল, নিজ গুণে, সুগন্ধে ও উপকারিতায় সকল গুলির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কেশরঞ্জনের বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া, অসৎ লোকের চোখ্ টাটাইতেছে। তাহারা উপায়ন্তর না দেখিয়া "কেশরঞ্জনের" জঘন্য জাল প্রস্তুত করিয়া বাজারে খরিদদারকে ঠকাইতেছে। প্রত্যেক ক্রেতাকে আমার সবিনয় অনুরোধ, যেন তাঁহারা কেশরঞ্জনের চতুষ্কোণ মোড়কটী বেশ ভাল রূপে পরীক্ষা করিয়া লয়েন উপরে আমার প্রতিকৃতি দেখিয়া লইলে, ভবিষ্যতে আর তাঁহাদের অনুতাপ করিতে হইবে না। ন্যায্য মূল্য দিলাম—অথচ তাহার পরিবর্ত্তে আসল জিনিসটী না পাইয়া একটী জঘন্য জাল জিনিস কিনিয়া প্রতারিত হইলাম—ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কিছুই নাই। যাঁহারা "জাল কেশরঞ্জন" ধরিয়া দিতে পারিবেন—আমরা বিবেচনামত তাঁহাদের পুরস্কৃত করিতে পারি।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১৲ টাকা।
ডাকমাশুলাদি	...	।/০ আনা।

১৮।১নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটি বাজার, কলিকাতা।

কলিকাতা

রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"

কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ৩রা পৌষ মুদ্রিত।

মাসিক পত্রিকা।
"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১১শ ভাগ] অগ্রহায়ণ, ১৩১২ ; ডিসেম্বর, ১৯০৫। [৫ম সংখ্যা।

স্ত্রী-নীতিসার।

জননী স্বীয় বালক বালিকাদিগকে নীতি শিক্ষা দিবেন। সুনীতিবিষয়ে তাঁহার উপদেশ ও জীবনের দৃষ্টান্ত শত নীতপুস্তকপাঠ অপেক্ষা তাহাদের সম্বন্ধে অধিকতর ফলপ্রদ হয়। বর্ত্তমান যুগে বালক বালিকাদিগের চরিত্রে নীতি ও বিনয়ের নিতান্ত শিথিলতা দৃষ্ট হইতেছে। তাহারা অনেকে কথায় ও ব্যবহারে জ্যেষ্ঠ গুরুজনকে সমুচিত সম্মান করিতে প্রস্তত নহে। কোন বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজন তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলে অনেকেই আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হয় না, মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করে না, গুরুজনের নিকটে পত্রাদি লিখিতে সকলে তাদৃশ বিনয় ও সম্মান প্রদর্শন করে না।

য়ুরোপীয় সমাজে পিতামাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতির প্রতি সন্তান ও কনিষ্ঠের ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনে বড়ই অল্পতা। করমর্দ্দন, মুখচুম্বন ও আমার প্রিয় বলিয়া সম্বোধন পিতামাতা ও জ্যেষ্ঠের প্রতি এবং কনিষ্ঠের প্রতি তুল্য ভাবে ব্যবহৃত হয়। আমরা ইহাকে নিতান্ত অস্বাভাবিক বিসদৃশ ব্যবহার মনে করি। পত্রাদিতে My dear mother এবং My dear father, শব্দের প্রয়োগ হইলে এবং পূজ-নীয় ও ভক্তির পাত্র লোকদিগের নামের পূর্ব্বে বা পশ্চাতে কোন প্রকার শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মানসূচক শব্দের প্রয়োগ না হইলে আমরা অহঙ্কার ও অবিনয়ের আভাস প্রাপ্ত হই। আবার মোসলমান সমাজের শ্রদ্ধা বিনয় অত্যন্ত অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের কথায় কথায়, উঠিতে বসিতে সেলাম ও আদব কায়দা হয়, মান্যজনকে পত্র লিখিতে তাঁহার নামের পূর্ব্বে ৫।৭ ছত্র ভক্তি ও সম্মানসূচক বিশেষণ লেখা হইয়া থাকে।

উভয় দিকের অতিরিক্ত ও অস্বাভা-বিক পথ পরিত্যাগ করিয়া বিনয় ভক্তির স্বাভাবিক মধ্যপথ অবলম্বন করিবার জন্য তুমি সন্তান দিগকে শিক্ষাদান করিও।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গমহিলাদের কি কর্ত্তব্য?

নব্য বঙ্গ মহিলাদিগের প্রায় সকলেই অল্লাধিক লেখা পড়ার চর্চ্চা করিয়া থাকেন। অনেকে কলেজ স্কুলে বা গৃহে নিজ নিজ যত্নে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই ইংরাজি বা বাঙ্গলাসংবাদ পত্র নিয়মিতরূপে পাঠ করেন; নানা সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের মতামত আলোচনা করিয়া একটা সিদ্ধান্তের ভূমিতে উপস্থিত হন; অনেক সংবাদপত্র সম্পাদক বিশেষ বিশেষ বিষয়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া উত্তেজিত ভাবে দেশে অতিশয় আন্দোলন উপস্থিত করেন, সেই অবস্থায় পাঠিকাদিগের অত্যন্ত সাবধান হইয়া মতামত স্থির করা কর্ত্তব্য। কেবল সম্পাদকদিগের কথায় পরিচালিত হইলে গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়া তাঁহারা জীবনের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন। কোনরূপ হুজুকে না চলিয়া বিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবেন, এবং অন্তর্দৃষ্টিযোগে বিবেকের আলোকে ন্যায়ান্যায় সত্যাসত্য অবধারণপূর্ব্বক চলিবেন, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে।

ইংরাজাধিকৃত হইবার পূর্ব্বে আমাদের দেশে সংবাদপত্র ছিল না, সভাসমিতি Public opinion বক্তৃতাদি কিছুই ছিল না। এ সকল ইংরাজ জাতির নিকটে শিক্ষা এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদেরই অনুকরণ। সভ্য ইউরোপ রাজ্যে রাজা হইতে সামান্য প্রজাপর্য্যন্ত সমুদায় লোক সাময়িক সংবাদপত্র সকলকে অতিশয় আদর করিয়া থাকেন। এক ইংলণ্ডে এক এক পত্রিকার লক্ষ দেড়লক্ষ গ্রাহক। ডবল বড় দৈনিক পত্রতো কত আছে। কোন কোন পত্রিকা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিন বার করিয়া প্রত্যহ প্রকাশিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীর স্বার্থ, স্বত্ব ও পক্ষসমর্থন করে, এরূপ ভিন্ন ভিন্ন সংবাদপত্র সকল আছে সম্পাদকগণ সেই সকল সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ীদের অনুমোদিত। প্রত্যেক সম্প্রদায় ও ব্যবসায়িদল নিজেদের সংবাদপত্রের উন্নতিবিষয়ে যত্ন করিয়া থাকেন। বিলাতে ধোপা নাপিত গাড়োয়ান মুদি মুচি প্রভৃতি সকলেই প্রত্যহ সংবাদপত্র পাঠ করে। রাজনীতিকুশল, জনহিতৈষী উচ্চ প্রকৃতি ধার্ম্মিক সম্পাদকগণ রাজকার্য্যে রাজার সহায়তা করিয়া থাকেন, রাজা ও রাজপুরুষদিগের ভুল ভ্রান্তি ও দোষ ত্রুটি সম্ভবে প্রদর্শন করিয়া রাজ্যে শান্তি কল্যাণ বিস্তার করেন, সকল লোককে সুশিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহাদের দ্বারা দেশের অশেষ মঙ্গল হয়। তাঁহাদিগের জীবনের গুরুতর দায়িত্ব। আবার এমন অনেক হীনমতি নীচাশয় অনুপযুক্ত সম্পাদক আছেন, যাঁহারা সাধারণ লোকদিগকে কুশিক্ষা দান করেন, এবং রাজ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়া থাকেন। বিলাতে যে এরূপ কর্ত্তব্যবিমূঢ় অযোগ্য পত্রিকা সম্পাদক নাই তাহা বলা যায় না।

১৮৫৭ সালে ভারতে যখন ভয়ঙ্কর সিপাহী বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া

উঠিয়াছিল, বিদ্রোহী সিপাহীদিগের নিষ্ঠুর অস্ত্রাঘাতে কাণপুরপ্রভৃতি নগরে শত শত নির্দ্দোষ ইংরাজ রমণী ও বালক বালিকার দেহ খণ্ড বিখণ্ড হইয়াছিল, সেই লোমহর্ষণ ভীষণ হত্যাকাণ্ডে সমুদায় ইংরাজ সমুত্তেজিত হইয়া ভারতবর্ষকে শোণিতস্রোতে প্লাবিত ও উৎসন্ন করিবার জন্য সমুদ্যত হইয়াছিলেন। তখন হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য সম্পাদক চিরস্মরণীয় বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এদেশ রক্ষার প্রধান উপায় হন। যাহাতে ভারত সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, নিরপরাধী প্রজাবর্গের জীবনরক্ষা পায়, বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ প্রাপ্ত, এবং ইংরাজ জাতির ক্রোধ প্রশমিত হয়, হরিশ বাবু তাহার নানা সদুপায় প্রদর্শনপূর্ব্বক অতিশয় হিতৈষণা ও যোগ্যতাসহকারে প্রবন্ধাদি লিখিয়া আমাদের প্রিয় জন্মভূমি ভারতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন ভারতহিতৈষী মহামতি লর্ড ক্যানিং প্রধান শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি হিন্দু পেট্রিয়টের পরামর্শকে অতিশয় মান্য করিতে লাগিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট তাঁহা কর্ত্তৃক বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। একদিন তাহা তাঁহার হস্তগত হইতে বিলম্ব হইলে তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। আর এক্ষণ দুঃখের বিষয় এই যে বঙ্গ দেশের কয়েক খানা বড় বড় দৈনিক পত্রিকা গবর্ণমেণ্টের এরূপ বিরাগভাজন হইয়াছে যে, যাহাতে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের নিকটে সেই সকল পত্রিকা পঁহুছিতে না পারে এই প্রকার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান আন্দোলনের মূলে প্রধানতঃ কয়েক জন পত্রিকা সম্পাদকের ভাব বিদ্যমান। তাঁহাদের জন্য বাঙ্গালি জাতি গবর্ণমেণ্টের অপ্রিয় ও অবিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিয়াছে। বলিতে কি দুগ্ধপোষ্য বালকগণপর্য্যন্ত এই আন্দোলনে দিবারাত্রি প্রমত্ত। স্কুল কলেজের ছাত্রবৃন্দ ছাত্র জীবনের কর্ত্তব্য বিদ্যাচর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের অনধিকারচর্চ্চা—রাজনীতির চর্চ্চা করিতেছে, এক এক জন ক্ষুদ্র বালক ঘোরতর রাজনীতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। রাজার বিরুদ্ধে বড় বড় লোকের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া ও নানা কার্য্য করিয়া ছাত্রগণ অসাধারণ স্বদেশহিতৈষিতার পরিচয়দান করিতেছে, অস্বাভাবিক ভাব ও অবিনয়ের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। অনেক ছাত্র উচ্ছৃঙ্খল হইয়া শিক্ষক মহাশয় দিগের শাসন ও বিদ্যালয়ের নিয়মবিধি অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেছে, এমন কি এরূপও হইয়াছে যে, কোন কোন ছাত্র সম্মানিত সাহেব প্রফেসরকে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছে। অনেক সংবাদপত্রের সম্পাদক এ সকল অত্যাচার ও অনৈতিক ব্যাপারের পুষ্টিপোষক হইয়াছেন। ভারতবর্ষে এরূপ বিসদৃশ কাণ্ড আর কখনও হয় নাই। ইহা বিলাতী সভ্যতার নকল তাহাতে সন্দেহ নাই।

বড় লোকের নিন্দা ও গবর্ণমেণ্টের নিন্দা এবং সম্মানিত উচ্চপদস্থ লোকদিগকে সাধারণ লোকের নিকটে অপদস্থ, অবমানিত ও ঘৃণিত করিবার জন্যই যেন

বাঙ্গলার কোন ২ সংবাদপত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এ দেশের সাধারণ লোকের রুচি প্রবৃত্তি এরূপ হইয়াছে যে,বড়লোকের কুৎসা ও নিন্দা পড়িতেই ভাল বাসে। যে সকল পত্রিকাতে নিন্দা চর্চ্চা ও গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নানা কথা বাহুল্য রূপে লিখিত হয়, সেই সকল পত্রিকাই গোলজার, এ দেশে সে সকলেরই পাঠকের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অনেক পত্রিকাসম্পাদক কেবল গবর্ণমেণ্টের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ান, তিলকে তাল করিয়া তোলেন। তাঁহাদের প্রচারিত অনেক কথার মূল পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাহার কাহারও এরূপ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ যে, কথায় কথায় সেই ব্যক্তিকে আক্রমণ করেন, তাঁহারা সেই ব্যক্তির গুণ কিছুই দেখিতে পান না। এক সময় শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডাইরেকটর এট্‌কিন্‌সন্‌ সাহেব পত্রিকাসম্পাদকবিশেষের এরূপ বিষম বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পত্রিকার এমন সংখ্যা ছিল না যে সেই সংখ্যায় সেই ডাইরেক্টর সাহেবের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ ও তাঁহার নিন্দা হয় নাই। কোন কোন সুলভ মূল্যের বাঙ্গলা সংবাদপত্র দ্বারা সাধারণ লোকের বিশেষতঃ পল্লীগ্রামস্থ পাঠশালার ছাত্রবৃন্দেরবিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। অমুকস্থানের অমুক স্কুলের একটি ছাত্র বিলাতী কাপড় পরিয়া স্কুলে যাইতেছিল অপর কয়েক জন ছাত্র তাহাকে প্রহার করিয়াছে, স্কুল গৃহে প্রবিষ্ট হইতে দেয় নাই। ঈদৃশ ভূরি ভূরি সংবাদ প্রচার করিয়া এই প্রকার দুষ্ক্রিয়াতে উচ্ছৃঙ্খল উদ্ধত ছাত্রদিগকে উৎসাহ দান করা হইয়া থাকে। আজ কাল সেই সকল পত্রিকাতে অন্য কোন কথা প্রায় পড়িতে পাওয়া যায় না।

কুচবিহারবিবাহের তুমুল আন্দোলন যেমন এক দিনে হয় নাই, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে বহুকাল লেখা লেখি ও আন্দোলন হওয়ার পর হইয়াছে। কেশবচন্দ্রকে সাধারণ লোকের নিকটে ঘৃণিত, নিন্দিত ও অপদস্থ করিবার জন্য কুচবিহারবিবাহ একটি সুযোগ ও উপলক্ষমাত্র ছিল, সেইরূপ রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জনের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান আন্দোলন এক দিনে হয় নাই, তাহার সূত্রপাত বহুদিন পূর্ব্ব হইতে হইয়াছে। সেই আন্দোলনের ভীষণাকার ধারণ তৎকৃত বঙ্গবিভাগ একটি সুযোগ ও উপলক্ষ মাত্র। অনেক পত্রিকাসম্পাদক সম্পাদকীয় লেখনী ধারণ করিয়া যেন বাদশা হইয়া বসেন, যাহা মনে উদয় হয় তাহাই লিখেন, যাহার প্রতি অপ্রসন্ন তাহাকে কাটেন ও মারেন। তাঁহারা সম্পাদকীয় আসনে বসিয়া যেন আপনাদিগকে সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ মনে করেন। রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি সমাজনীতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাঁহাদের পূর্ণ পারদর্শিতা, অপর সকলের বহু ভুল ভ্রান্তি, তাঁহাদের ভুল ভ্রান্তি কিছুই নাই, তাঁহারা যেন ইহা মনে করিয়া থাকেন। চিরজীবন যাঁহারা রাজনৈতিক চর্চ্চা করিয়া, মহা রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া যশস্বী, পত্রিকার সম্পাদক গর্ব্বিত ভাবে তাঁহাদিগকেও শিক্ষা দান করিতে

প্রবৃত্ত হন। কেহ নিজের যশ খ্যাতির জন্য, কেহ বা অর্থোপার্জ্জনের জন্য, কেহ কুৎসা রটনা করিয়া লোকদিগকে অপদস্থ করিবার জন্য নিজ হইতে সম্পাদকীয় পদ গ্রহণপূর্ব্বক যথেচ্ছরূপে লেখনী চালনা করিয়া মনে করেন তিনি বড় স্বদেশ-হিতৈষী হইয়া পড়িয়াছেন, দেশের কল্যাণের জন্য প্রাণ বড়ই আকুল। এদিকে যে নিজেদের স্বভাব দোষে স্বদেশের কত অকল্যাণ করিতেছেন, ভাবিয়া দেখেন না। আজ কাল স্বদেশ-হিতৈষণায় স্বদেশের শিল্প দ্রব্যাদির উন্নতি ও প্রচলন বিষয়ে অনেকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, ইহা যে আনন্দের বিষয়, তাহাতে কে সন্দেহ করিতে পারে? কিন্তু ইহার সঙ্গে বিদ্বেষের দুর্গন্ধ না থাকে, জোর জবরদস্তি না চলে, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। যে ভিত্তির উপর স্বদেশী প্রচেষ্টা স্থাপিত হইয়াছে, সেই ভিত্তি উৎকৃষ্ট নয়। গবর্ণমেণ্ট কৃপা করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিয়াছেন, সেই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার হয়, আমরা রাজবিরোধী অবিনীত অকৃতজ্ঞ প্রজা বলিয়া জগতে নিন্দনীয় না হই, পত্রিকা সম্পাদকদিগের এবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ইহা মনে করা উচিত যে, ইচ্ছা করিলেই গবর্ণমেণ্ট এই অমূল্য অধিকার এখনই কাড়িয়া লইতে পারেন। ইংরাজ রাজা ও ইংরাজ জাতির নিকটে আমরা অশেষ বিষয়ে ঋণী।

এদেশে বাদসা নবাব রাজগণ এরূপ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, প্রজা শাসন ও রাজ্যের ব্যবস্থা এবং বিচার কার্য্যে তাঁহাদের হুকুমের উপর কাহারও আর কোন কথা চলিত না। ইংরাজরাজা সেরূপ স্বেচ্ছাচারী নহেন। এক জন বিচারকের বিচারকে সুবিচার মনে না করিলে তাঁহার উপর পাঁচ জন বিচারক আছেন, তুমি অধস্তন বিচারকের বিচার অগ্রাহ্য করিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধতন বিচারকদিগের নিকটে বিচারপ্রার্থী হইতে পার। এদেশে বিচারের এমন সুপ্রণালী কবে ছিল? রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে কোন নূতন ব্যবস্থা করিতে হইলে তাহার বহুদিন পূর্ব্ব হইতে প্রজা-সাধারণের অবগতির জন্য রাজকীয় গেজেটে উহার আমূল তত্ত্ব প্রচার করা হয়। তদ্বিষয়ে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করিবার জন্য প্রজাদিগকে অধিকার দেওয়া হইয়া থাকে। সকলে মতামত প্রকাশ করিলে পর মন্ত্রিসভায় তাহার আলোচনা হয়। সভাপতি রাজপ্রতিনিধি মন্ত্রিমণ্ডলীর সর্ব্ব সম্মতিতে বা অধিকাংশের মতে সেই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন। তিনি স্বেচ্ছাচারী হইয়া কেবল নিজের মতে শাসন কার্য্য সম্বন্ধীয় কোন ব্যবস্থা করেন না। মন্ত্রি-সভার ব্যবস্থা অর্থাৎ আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গেলে পর তদ্বিরুদ্ধে কিছু বলিবার ও করিবার ন্যায়তঃ প্রজাদের অধিকার নাই। তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে রাজ-বিধিকে ও রাজাকে অমান্য করা হয়। তাহা প্রজার পক্ষে বিষম অপরাধ। ভারতসম্রাটের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় সেক্রেটরীর অনুমোদনক্রমে, সুতরাং ভারত সম্রাটের অনুমোদনে বঙ্গশাসনের নূতন

ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। প্রজাবর্গ গবর্ণমেণ্টের আদেশ ও আইন মান্য করিয়া রাজ্যে শান্তি রক্ষা সুশাসন যাহাতে হয় তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিবেন। রাজকীয় ব্যবস্থা কোনরূপে অমান্য করিয়া চলা প্রজাদের অনধিকার। রাজপ্রতিনিধি লর্ডকার্জ্জন বঙ্গবিভাগকার্য্যের ব্যবস্থা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া একা করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রধান শাসন কর্ত্তার কর্তৃত্ব কাল হইতে বঙ্গরাজ্যের সুশাসন জন্য প্রয়োজন বলিয়া এই বিভাগকার্য্যে উদ্যোগ ও আলোচনা চলিয়াছিল। পূর্ব্ব বঙ্গ একজন চীফ কমিশনরের শাসনাধীন হইবে, পূর্ব্বে এরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা না হইয়া যে একজন লেপ্টনাণ্ট গভর্ণরের শাসনাধীন হইয়াছে বহু ভাগ্য। আমাদের ন্যায় কতক গুলি প্রজার ইচ্ছা মত শাসনকর্ত্তা শাসনকার্য্যের ব্যবস্থা করিবেন, কোন কথাই নয়। আমরা জানি এই ব্যবস্থায় পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে পূর্ব্ব বঙ্গের বিচ্ছেদ ঘটিল, উভয় দেশের প্রজাদিগের পরস্পর সম্মিলনের ব্যাঘাত হইল বলিয়া বহু প্রজার এই বিধির বিরুদ্ধে আপত্তি উপস্থিত, তজ্জনিত বর্ত্তমান ঘোরতর আন্দোলন। আবার অনেক গুলি প্রজা আছেন যে, তাঁহারা এই ব্যবস্থাকে কল্যাণজনক ও প্রার্থনীয় মনে করেন। এই ব্যবস্থাতে অনুন্নত পূর্ব্ববঙ্গ সময়ে উন্নত হইবে, পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ নানা বিষয়ে উন্নতি ও উপকার লাভ করিবে, তাঁহাদের এই বিশ্বাস। Majority তে তাঁহারা অধিক সংখ্যক না হইতে পারেন। তাঁহারা উভয় দেশের পরস্পর অসম্মিলনের কোন আশঙ্কা দেখেন না।

নববিধানমণ্ডলীর মূল ধর্ম্মমত ও বিশ্বাসের অন্তর্গত রাজভক্তি। নববিধানবাদী ব্রাহ্ম রাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারেন না। নববিধানের প্রবর্ত্তক আচার্য্য কেশবচন্দ্র রাজাকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার বলেন নাই। কিন্তু রাজা ঈশ্বরকর্তৃক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত, এরূপ বলিয়াছেন, এবং তিনি এ প্রকার বিশ্বাস করিতেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র রাজভক্তিবিষয়ে টাউন হলে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার বঙ্গানুবাদ আমরা বিগত আশ্বিন মাসের মহিলাতে "মোসলমানরাজত্ব ও ইংরাজরাজত্ব এবং ভারতরমণী" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষ ভাগে প্রকাশ করিয়াছি। রাজভক্তিবিষয়ে যে তাঁহার কিরূপ উচ্চভাব ছিল, পাঠিকাগণ তাহা পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকিবেন। তাহা হইতে কয়েক পংক্তি এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"দর্শনশাস্ত্র রাজভক্তিকে নীচ আনুগত্য ও দাসত্ব হইতে রক্ষা করে। অপর দিকে মত্ততা ইহাকে শুষ্ক জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকিতে দেয় না। অতএব এস, আমরা রাজভক্তিতে দর্শনশাস্ত্র ও মত্ততা উভয়কে মিলিত করি। আমি আইনকে গ্রহণ করিব, বিচারকের—মাজিষ্ট্রেটের প্রভুত্বকে মান্য করিব। যাহাতে সুশাসনপ্রণালী ও সুব্যবস্থা রক্ষা পায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।" বক্তা স্বীয় বক্তৃ-

তায় ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজকীয় ব্যবস্থা ও রাজশক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিলে নিজেদের অকল্যাণ ও রাজ্য-বিপ্লব ঘটে।

স্বর্গগত ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কর্তৃক শেষ জীবনে রচিত "আশীষ" নামক পুস্তকে ইংরাজ-শাসন বিষয়ে তাঁহার এরূপ অভিমত ব্যক্ত ;—

"ইংরাজশাসন,—ইংরাজদিগের ভারত অধিকারকে পরম আশীর্ব্বাদ মনে করি। তাঁহারা এদেশে বহুকাল রাজত্ব করুন, ইহা কামনা করি। হে রাজাধিরাজ, হে প্রজাপতি, তোমাকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বীকার করি যে, তুমি আমাদের ভাবী উন্নতি উদ্দেশ্যে আমাদিগকে পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন করিলে। এই সৌভাগ্যশালী সর্ব্বত্র জয়ী জাতির নিকট এত জ্ঞান, সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ শিখিলাম, যাহা পূর্ব্বে কখনও জানি নাই, ভাবি নাই। ইহা স্বীকার করিতে পারি না যে, ইঁহাদের শাসনপ্রণালী যথোচিত পরিমাণে নিঃস্বার্থ কি দোষশূন্য, এবং ইহাও স্বীকার করি না যে, রাজনীতি, লোকহিতৈষণা, ন্যায়, যথার্থ্য, সাম্য বিষয়ে শাসনকর্ত্তাদিগের মহাত্রুটি সময়ে সময়ে লক্ষিত হয় না। এ সকল ত্রুটির ফল-ভোগে আমরা পুনঃ পুনঃ আহত ও অবসন্ন হই। কিন্তু ইহা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করি যে, এই ইংরাজ জাতির সঙ্গে মিলনে আমাদের ধর্ম্মের আদর্শ উচ্চ হইল, নীতি চরিত্র উচ্চ হইল, সভ্যতা সদ্‌গুণ বৃদ্ধি হইল, সামাজিক উন্নতি, বিশেষতঃ স্ত্রী জাতিবিষয়ক উন্নতি আরম্ভ হইল। পূর্ব্ব পশ্চিমের এরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হইল যাহাতে ভবিষ্যতে, কত দিন পরে জানি না, সমুদায় মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ঐক্য সম্পন্ন হইবে। আমরা যদি এই ইংরাজ জাতির সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলি, যদি তীব্র কুটীল দৃষ্টিতে ক্রমাগত তাঁহাদের দোষানুসন্ধান না করি; তাঁহারা যদি আমাদের সঙ্গে সম্মিলনবিষয়ে উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করেন, যদি তাঁহারা ন্যায়পর ও সাত্ত্বিক ভাবে আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন, তবেইত এই মহাবিধান সার্থক হয়। সম্রাট্‌কে তাঁর মহিষীকে, তাঁর মন্ত্রীদিগকে সর্ব্ব প্রকারে রক্ষা কর; এদেশনিবাসী নানা রাজকীয় কর্ম্মচারী ইংরাজদিগকে ধর্ম্মবুদ্ধি ও লোকসহানুভূতি দাও। এই সাম্রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি দান কর।"

ব্রাহ্ম বিবাহ বিল বিধিবদ্ধ করিতে যাইয়া স্বর্গগত রাজপ্রতিনিধি মহামতি লর্ড মেও মন্ত্রিসভায় যে উচ্চ মত ও উদার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, উক্ত মন্ত্রিসভায় উপস্থিত ছিলেন, কলিকাতাস্থ বিধানবিশ্বাসী আমাদের একজন শ্রদ্ধাস্পদ বৃদ্ধ বন্ধু তাহা আমাদিগকে লিখিয়া দিয়াছেন, এস্থানে উহা প্রকাশ করা গেল ;—

"ব্রাহ্মবিবাহের আইন লইয়া যখন ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা হয়, তখন হিন্দু ব্রাহ্ম এবং প্রচলিত কোন ধর্ম্মমত

মানে না এমন সকল লোক সেই আইনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে। এই কারণে আইন পাস হইবার পক্ষে বিষম বাধা উপস্থিত হয়। সভাতে পুনঃ পুনঃ আলোচনা হইয়াও উহা পাকা হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। পরে এত বিলম্ব হইতে লাগিল যে, উহা পাস হইবে না এরূপ মনে হইল।

"গবর্ণর জেনারল লর্ড মেও এইরূপ অসম্ভব বিলম্ব দেখিয়া স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকে বলিলেন, যাহাতে আর বিলম্ব না হয় তাহা আমি করিব। আপনি কাউন্সিলের সভার দিন সবান্ধবে উপস্থিত হইবেন। যাহাতে ঐ দিন বিল পাস হয়, তজ্জন্য আমি বিশেষরূপে চেষ্টা করিব।

"মহাত্মা কেশবচন্দ্র সবান্ধবে সেই দিন সভায় উপস্থিত হন। সভাপতি, সভ্যগণ এবং দর্শকবৃন্দ যথাস্থানে আসন গ্রহণ করিলে পর যথারীতি সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ এক জন সভ্য দণ্ডায়মান হইয়া উপস্থিত আইনের একটি সুবিস্তীর্ণ বিবরণ পাঠ করিলেন। তাঁহার পাঠ শেষ হইলে সভাপতি লর্ড মেও বলিলেন ;— যাহা পঠিত হইল তাহাতে সমস্ত বিবরণ আপনারা অবগত হইলেন। আর কোন আপত্তি উত্থাপন করিয়া বিল পাস করিতে কাল বিলম্ব করা সঙ্গত নয়। বহুদিন হইতে এই বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে, যথেষ্ট আপত্তি শ্রবণ ও খণ্ডন হইয়াছে। পরে সভ্যেরা এক এক করিয়া আপন আপন অভিমত কেহ কেহ একটু একটু কাগজে লিখিয়া জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ দাঁড়াইয়া মুখে বলিতে লাগিলেন। সেই সকল মত জ্ঞাত হইয়া সভাপতি সভ্যদিগের আপত্তি খণ্ডন করিতে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। সে সকল কথা আমার স্মরণ নাই। শেষে যে কয়টী কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে মন এত আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাহা আর ভুলিতে পারি নাই।

"লর্ড মেও বলিলেন,'আমার সহকারী বন্ধুগণকে আমি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি, আজ আর আমার চেষ্টা আপনারা ব্যর্থ করিবেন না। আমি নিয়মে বাধ্য, আপনারা বাধা দিলে আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। আজ আমি মিষ্টার সেনকে আশা দিয়া বলিয়াছি (প্রমিস করিয়াছি) বিল পাস হইবে। তিনি আশা করিয়া সবান্ধবে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি দুঃখিত হইতেছি যে আপনারা আর কিছুদিন অপেক্ষা করিতে বলিতেছেন। যত অপেক্ষা করিয়া আমরা আপত্তি শুনিতে চাহিব, ততই নূতন নূতন আরো আপত্তি আসিবে। যাঁহারা আইনের জন্য প্রার্থী তাঁহারা হিন্দু সমাজের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোক ইহা সত্য। কিন্তু যাঁহারা বিবেকানুসারে চলিবার জন্য আইনের সাহায্য চাহিতেছেন, আমরা কি তাহাদিগের বিবেকের পথের বিঘ্ন দূর করিয়া দিতে দায়ী নহি? যদি ইংরাজরাজ্যে কোন ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ও স্বাধীন ভাবে বিবেকের পথে নির্ব্বিঘ্নে চলিতে না পারে, তবে

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহা কলঙ্ক (Disgrace)। ইংরাজরাজ্যের স্থায়িত্ব সৈন্য সামন্ত ও বাহ্যিক শক্তির উপর নির্ভর করে না, ন্যায় বিচার (Justice) যত দিন থাকিবে, তত দিন ইংরাজরাজ্য ভারতে সুদৃঢ় থাকিবেন।"

রাজপ্রতিনিধি মহামতি লর্ড মেও বহু যত্ন চেষ্টা করিয়াও তুমুল প্রতিবাদের জন্য ব্রাহ্মবিবাহ বিল বিধিবদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। কিয়দ্দিন পরেই তিনি এণ্ডা মান দ্বীপ দর্শন করিতে যাইয়া এক দুরাত্মার হস্তে নিহত হন। তখন মান্দ্রাজের গভর্ণর লর্ড নেপিয়র সাহেব তাঁহার পদে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি সহজেই উক্ত বিবাহবিল বিধিবদ্ধ করেন। কিন্তু আদি সমাজ ও অপর কোন সম্প্রদায়ের দৃঢ়তর আপত্তির জন্য ব্রাহ্মবিবাহ আইন তন্নাম হইতে পারে নাই। আইনের মর্ম্ম ঠিক রাখিয়া সিভিল বিবাহ আইন তাহার নামকরণ করা হয়। এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইলেও কেশবচন্দ্রের আনন্দের সীমা থাকে না। তিনি ব্যবস্থাপক সভা হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়াই মফস্বলের প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজকে তারযোগে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করেন। ১৮৭২ সালে ১৯শে মার্চ্চ বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়।

শ্রুত হইল বরিশালের জিলাতে বিলাতী লবণ বোঝাই একখানা নৌকা জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে, দুইটী নৌকার জিনিষ বিলাতী বলিয়া ডাঙ্গায় তুলিতে দেওয়া হয় নাই, এক স্থানে কতক গুলি স্কুলের বালক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পশ্চাতে উচ্চৈঃস্বরে "বন্দে মাতরম্" বলিয়া দৌড়িয়াগিয়া তাঁহার প্রতি ঢিল ছুড়িয়াছে। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বরিশালনগরে উপস্থিত হইয়া অসম্মানিত হইয়াছেন। এই সকল অত্যাচারনিবারণের জন্য তিনি কতক গুলি গোর্খা সিপাহী বরিশালনগরে রাখিয়া দিয়াছেন। এই প্রকার অন্যায় স্বদেশীচর্চ্চা যাহাতে না হয় তাহার উপায়বিধান করিয়াছেন। গবর্ণর সাহেব এই সকল কার্য্যের মূল অধিনায়ক ও উদ্যোগী বলিয়া তত্রত্য কোন কোন ভদ্রলোকের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিয়াছেন। সিপাহীরা দুষ্টদমনের জন্য কোন স্থানে গেলে যেরূপ অত্যাচার করিয়া থাকে তথায় সেরূপ করিতেছে, ভদ্র লোকের উপর মারপিট পর্য্যন্ত হইয়াছে। এই আন্দোলনের ব্যাপারে উত্তেজনায় বা বুদ্ধির ত্রুটিতে কোন কোন রাজপুরুষ যে অন্যায় ব্যবহার করেন নাই ইহা আমরা বলিতেছি না। ঢাকানগরেও উক্ত নগরনিবাসী অনেক লোকের এবং স্কুলের ছাত্রদিগের দুর্ব্যবহার সামান্য হয় নাই। ময়মনসিংহ নগরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন কতকগুলি ক্ষুদ্র বালক "বন্দে মাতরং" বলিয়া চেঁচাইয়া, তাঁহার প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিল। তিনি দৌড়িয়া যাইয়া একটি বালককে ধরিয়া কিছু উত্তম মধ্যম প্রদান করিয়াছিলেন। গবর্ণর সাহেব পূর্ব্ববঙ্গস্থ আন্দোলনকারী কোন ভদ্র লোককে ধমকাইয়া

বলিয়াছেন, এদেশের হিন্দুগণই এই বিষম কাণ্ডে অগ্রবর্ত্তী তাঁহারা জানেন, সরকারী রাজকর্ম্ম পাইতে তাঁহাদের জন্য এক শত বৎসর পেছিয়া গেল। শ্রুত হইলাম, কতকগুলি পুলিশ ইনস্পেক্টর ও সবইনস্পেক্টর নূতন নিযুক্ত হইবে। সেই কার্য্যের জন্য কেবল মোসলমান মনোনীত হইতেছেন।

"বিগত ১৯শে নবেম্বর পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে একজন উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত বিধান-বিশ্বাসী লোক রাজনৈতিক আন্দোলন-বিষয়ে আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার সম্মতিক্রমে সেই পত্রের অধিকাংশ এস্থানে উদ্ধৃত হইল।

"বর্ত্তমান সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনে দেশের লোক যেরূপ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠিতেছে, এবং রাজা প্রজার মধ্যে সংঘর্ষণ উপস্থিত, লোকের মন রাজশক্তির প্রতি বিদ্বেষ পূর্ণ হইতেছে, এই অবস্থায় আপনারা কি নিশ্চিন্ত থাকিয়া রাজবিরুদ্ধে এই ভাবের হ্রাস করিবার পক্ষে সহায়তা করিবেন না?

"আচার্য্য কেশবচন্দ্র ভগবৎ কৃপায় দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়াই বোধ হয় রাজভক্তি আমাদের ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন *। তিনি এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি দুর্ব্বল ও পাপপূর্ণ হয় তবুও আমাদের সম্মান লাভ করিবেন, এবং আমরা বশ্যতা স্বীকার করিব। এই গবর্ণমেণ্টের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিহার্য্য। রাজদ্রোহিতা অবিশ্বাসের নামান্তর মাত্র। এই রাজভক্তি যে ব্যক্তিনিষ্ঠ না হইয়া কেবল শুষ্কমতে আবদ্ধ থাকিবে না। তাহারও আভাস তিনি দিয়া গিয়াছেন।

"আমরা এখন রাজপ্রতিনিধির কার্য্য আমাদের মনোমত হইতেছে না বলিয়া তাঁহাকে অবমানিত করিতে ত্রুটি করিতেছি না। এত অভদ্র ব্যবহার যে দেশে রাজপ্রতিনিধির প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে, সে দেশে রাজভক্তি কোথায় পলায়ন করিয়াছে বলিব? এই সকল দুর্ব্যবহার কি স্বয়ং রাজার হৃদয়কে বিদ্ধ করিতেছে না? দুঃখের বিষয় কেবল সাধারণ ভাবে ব্রাহ্মসমাজের লোকের হাড়ে ২ এই হলাহল প্রবেশ করে নাই, নববিধান বিশ্বাসী, যাঁহারা কেশবচন্দ্রকে সম্মুখে আদর্শরূপে স্থাপন করেন-তাঁহাদেরও অনেকের মধ্যে সংক্রামিত হইতেছে, দেশের লোকেরত কথাই নাই। সংবাদপত্র গুলি যেন গবর্ণমেণ্টের কুৎসা রটনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ সঞ্চার করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

"শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, স্কুলের ছাত্রেরা পর্য্যন্ত বিভাগীয় গবর্ণরকে স্বীকার করিতে, মস্তক নত করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে বিমুখ। বরং অপদস্থ করিতে অগ্রসর। বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েদের পর্য্যন্ত এই ভাব। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দেশের সর্ব্বনাশ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প, এই তাঁহাদের

* দূর ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে নয়, ভগবদিঙ্গিতক্রমে রাজভক্তি নববিধানের মূলমতের অন্তর্গত হইয়াছে। সম্।

বিশ্বাস। গবর্ণমেণ্টকে অপদস্থ করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়নের রীতিমত চেষ্টা চলিতেছে, অথচ গবর্ণমেণ্ট অবশেষে বাধ্য হইয়া কঠোর শাসনে হস্তপ্রসারণ করিলে গবর্ণমেণ্টেরই দোষ হইল, এই সাধারণ ধারণা।"

আন্দোলন ও গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ পূর্ব্ববঙ্গে কতদূর গড়াইয়াছে,২১শে নবেম্বর ঢাকানগরস্থ একজন সম্মানিত বিশ্বস্ত বন্ধুর পত্রে তাহা বিবৃত;—"চট্টগ্রাম হইতে" * * মহাশয় আমাকে যাহা লিখিয়াছেন তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন। তিনি লিখিয়াছেন, চট্টগ্রামে ঢাকা হইতে পত্র আসিয়াছে, ছাত্রগণ ছোটলাটকে যেন ঢাকার ন্যায় অপমান করে। কাশীবাবু D. N. Church এর পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা কমিটিতে যোগ দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপর চোট পাট হইতেছে। আগড়তলায় তিনি চরিত্রগঠনবিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তার পর দিন শুনিলেন ছাত্রগণ বাজারে দোকানদারদিগকে বিলাতী জিনিষ বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া শাসাইয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে স্কুলের ছাত্রদের ভয়ে শিক্ষকেরা পর্য্যন্ত জড় সড়। তাঁহার বক্তৃতাতে তিনি বলিয়াছিলেন, ছাত্রগণ আলোচনা করিবে বটে, কিন্তু আন্দোলন করিবে না। এই সুযোগে প্রধান শিক্ষক মহাশয় উঠিয়া তাহার সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন, বক্তার বলিবার উদ্দেশ্য ছাত্রেরা discus sion করিবেন, কিন্তু agitation নহে। ইহাতে না কি তাহারা অসন্তুষ্ট। পরে শিক্ষকেরা তাঁহাকে বলিলেন, তাঁহার আসাতে তাঁহারা সাহস করিয়া মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে সমর্থ হইয়াছেন। একজন এম, এ, বি, এল, উকিলও নাকি এই কথা বলিলেন। ছাত্রগণ এখন পিতা মাতা অভিভাবক ও শিক্ষকদের হাতের বাহির হইয়া পড়িয়াছে, আন্দোলনকারী বাগ্মীদের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে উঠিতেছে, বসিতেছে।

"সংবাদ পত্রাদিতে লেখা হইতেছে এবং World ও N. D. ও সমর্থন করিতেছে, গবর্ণমেণ্ট বাস্তবিক কঠোর আচরণ দ্বারা দেশে ভীতি উৎপাদন করিতেছেন, ও রুশিয়া রাজত্বের সূত্রপাত করিতেছেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু লোক সাধারণের উপর যে কি অত্যাচার উৎপীড়ন আন্দোলন কারীদের যত্ন ও চেষ্টাতে হইতেছে তাহার খবর কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের নিজপক্ষ সমর্থনের জন্য একটী কথাও বলিবার সুযোগ ঘটে না। লোকেরা যথা ইচ্ছা গালাগালি দিতেছে, গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাক্। কিন্তু প্রজার উপর যখন উৎপীড়ন আরম্ভ, তখন তাহা দমনের জন্য দৃঢ় হস্ত। তখন সকলের কটাক্ষ!

"আন্দোলনকারীদের উৎপীড়নের আরও কিছু কথা শুনুন্। বিক্রমপুরে কোন এক হাটে ১৬ই অক্টোবর বাজার বসিতে দেওয়া হয় নাই। জেলেরা মাছ লইয়া আসিয়া বিক্রয় করিতে পারে নাই। মাছের নৌকা ডুবাইয়া দিয়াছে। গরিব ধোপা দশ সের বিলাতী লবণ লইয়া

যাইতেছিল, তাহা বাবুরা ফেলিয়া দিয়াছেন। যণ্ডামার্ক ছেলে মাকে আহার করিতে না দিয়া তাঁহার প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন ফেলিয়া দিয়াছে। এইরূপ অত্যাচারের কথা সেই সকল স্থান হইতে আগত বৃদ্ধদের মুখে শুনিতেছি। গবর্ণমেণ্ট সৈন্য পাঠাইতেছেন, স্পেশেল কনষ্টবল সাজাইয়া বাবুদের জব্দ করিতেছেন ইহা হইল গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার। ভাবিয়া দেখুন এমন কাণ্ডের সূত্রপাত হইতেছে যেন ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এ দেশে নাই, প্রজাসাধারণ যেন স্কুলের বালক ও আন্দোলনকারীদেরই হাতের পুতুল।

"শ্রীমতী অ্যানী বেশান্ত (Annie besant) তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে নগ্নপদে ছাত্রদের প্রবেশ করিতে দেন নাই। তিনি বলেন, রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য বিদ্যালয় নহে, শিক্ষার জন্য। বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষকদের আদেশই প্রবল থাকিবে। আজ কলিকাতা হইতে কাল লাহোর হইতে, আর এক দিন বোম্বাই হইতে তারে খবর আসিল, আর অমনি ছেলেরা ক্ষেপিয়া গেল। এইরূপ হইলে শিক্ষা ও শাসনের মূলে কুঠারাঘাত পড়ে। তিনি তাহার প্রশ্রয় দিবেন না, যদি তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত না করে, তবে বিদ্যালয় ধ্বংস হইয়া যাউক, তিনি দূর হইতে তাহা দেখিবেন।

"আর এক স্থানে ফুলার সাহেব বালিকাদের জলযোগ করিবার জন ২০৲ দান করিয়াছেন, শুনিলাম সম্পাদক নাকি এই টাকা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক! কলেজে স্কুলে আদেশ অমান্যের অপরাধ ধরিয়া কতক ছাত্রের জরিমানা হইয়াছিল। সেই জন্য strikeএ প্রথম দিন ৬৯ জন উপস্থিত, ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া গত শনিবার ২২৫ জনে দাঁড়াইয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, ৫ জন খাঁ সাহেব ভিন্ন স্কুলগৃহ খালি, ঢাকা কলেজ পরিত্যক্ত। দশ হাজার ছাত্র পথে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!! সেই সব মিথ্যা। স্কুলের ছাত্রদের এখনও সুমতি হয় নাই, কেবল অভিভাবকদের দোষে।"

এই আন্দোলনে বাঙ্গালীজাতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের যেরূপ অবিশ্বাসভাজন ও বিরাগভাজন হইলেন, এবং যে প্রকার তাঁহাদের নৈতিক ক্ষতি হইল, শত বৎসরেও সেই ক্ষতির পূরণ হয় কি না সন্দেহ। অতএব বঙ্গ মহিলাদিগের প্রতি আমাদের এই নিবেদন যে,কাহারও কথায় বা লেখাতে তাঁহারা যেন মতামত স্থির না করেন, হুজুকে না চলেন, কর্ত্তব্য বুদ্ধি বিবেকের আলোকে চলেন। তাঁহাদের বড় সাবধান হওয়া আবশ্যক।"

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

(হিমাচল—শিমলাশৈলে যাত্রা।)

দেরাদুন হইতে হিমাচলশৃঙ্গশিমলা পর্ব্বতে যাওয়ার সঙ্কল্প ছিল। শিমলায় আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রচন্দ্র গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে বোর্ডের কর্য্যোপলক্ষে স্থিতি করিতেছিলেন। আমরা শিমলাব্রহ্মমন্দিরের পার্শ্বস্থ গৃহে কয়েক দিন বাস করিব স্থির করিয়া তাঁহাকে পত্র

লিখি। শ্রীমান্ আমাদের পত্র পাইয়া এরূপ লিখেন যে, "আমি যখন এখানে বাস করিতেছি, আপনি অন্যত্র থাকিতে পারিবেন না, মন্দিরে থাকিবার সুবিধাও হইবে না, শিমলায় আপনি কোন্ দিন পঁহুছিবেন আমাকে জ্ঞাপন করিবেন, আমি যথাসময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিব।"

বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণ ৩টার ট্রেণে দেরাদুন হইতে শিমলা শৈলে যাত্রা করা যায়। আমরা এ পর্য্যন্ত ইণ্টার মিডিয়ড গাড়ীতে চলিয়াছি, কালকা হইতে শিমলা পর্য্যন্ত ইণ্টারমিডিয়ড গাড়ী নাই, জানিয়া তৃতীয় শ্রেণীর টিকট ক্রয় করা যায়। রাত্রি ৯টার সময় অম্বালা জংশনে পঁহুছিয়া তথায় রাত্রি যাপন পূর্ব্বক পরদিন প্রাতঃকালে কালকা যাইবার ট্রেণে আরোহণ করিতে হইবে। দেরাদুন হইতে অম্বলা পর্য্যন্ত ৬।৭ ঘণ্টা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে অবস্থানে বিশেষ কষ্ট হইবে না ভাবিয়াছিলাম। দেরাদুন ষ্টেশন হইতে সেই ট্রেণে অল্পসংখ্যক যাত্রিক চলিয়াছিল। অপরাহ্ণ ৫টার সময় হরিদ্বারে পঁহুছিয়া দেখি ষ্টেশনে মহাজনতা। আমরা যে গাড়ীতে ছিলাম, তাহা হইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সেই গাড়ীখানা মেয়ে যাত্রিকদিগকে দেওয়া হইল। সেস্থানে সেই ট্রেণের সঙ্গে আরও কয়েক খানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর যোগ হয়, তাহাতেও যাত্রিকদিগের স্থান হইয়া উঠিতেছিল না। পেশওয়ারপর্য্যন্ত সেই ট্রেণ খানার গতি। পঞ্জাবী যাত্রিকগণে উহা এরূপ পূর্ণ হইয়াছিল যে, কোন কম্পার্টমেণ্টে তিল রাখিবার স্থান ছিল না। আমরা পঞ্জাবী পুরুষদিগের সঙ্গে গাড়ীর এক পার্শ্বে বসিয়াছিলাম। পঞ্জাবী লোকেরা অতিশয় ভদ্র, আমাদের যাহাতে কোন রূপ ক্লেশ না হয় পার্শ্বস্থ পঞ্জাবী যাত্রিকগণ যত্ন করিতে লাগিল, এবং আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল। এক ঘণ্টার পর রুর্খি ষ্টেশনে পঁহুছিয়া বিষম ব্যাপার দর্শন হয়। সেস্থানে সহস্রাধিক যাত্রিক সমবেত দৃষ্ট হইল। বোধ করি চারি আনা যাত্রিকও সেই গাড়ীতে আরোহণ করিতে পারিল না। তৎপর শাহারণপুরেও যাত্রিকদিগের ভয়ঙ্কর ভিড় ছিল। রাত্রি ৯টার সময়ে অম্বলায় পঁহুছান গেল। প্ল্যাটফারমে নিশা যাপনের ব্যবস্থা করা যায়। তখন এক জন মুটে গাড়ী হইতে আমাদের বেডিং ও ব্যাগ প্ল্যাটফারমে নামাইয়াছিল ও পরদিন প্রাতঃকালে কালকা যাইবার গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিল, তজ্জন্য আমরা তাহাকে ॥০ আনা দক্ষিণা দানে বাধ্য হইয়াছিলাম। বিষম জুলুম।

পর দিন ৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে ৭টার ট্রেণে অম্বলা হইতে যাত্রা করা যায়। ন্যূনাধিক এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা কালকাতে পঁহুছিয়া পার্ব্বত্য ট্রেণে আরোহণ করি। গাড়ী গুলি শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং পাহাড়ে উঠিবার গাড়ী অপেক্ষা অনেক ভাল। তাহা ইষ্টইণ্ডিয়া রেল গাড়ীর ন্যায়, কেবল আকারে ছোট। কালকা শিমলা রেলওয়ে হওয়ার পূর্ব্বে টঙ্গারোহণে

যাত্রিকগণ কালকা হইতে শিমলা পর্ব্বতে আরোহণ করিতেন। K. S. Railway ভারতবর্ষে লর্ড কার্জ্জনের অদ্ভুত কীর্ত্তি। ৫৭ মাইল দুরারোহ পর্ব্বতের উপর দিয়া লৌহবর্ত্ম প্রসারণ করা সামান্য ব্যাপার নহে। শকট শ্রেণী সর্পগতিতে ১০৩ টি ছোট বড় টনেল (পার্ব্বত্যসুড়ঙ্গ) অতিক্রম করিয়া সবেগে ছয় হাজার বা সাত হাজার ফুট উচ্চ গিরিশিখরে আরোহণ করে। কোন কোন সুড়ঙ্গ দৈর্ঘ্যে এক মাইল হইবে। তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলে যেন নিঃশ্বাস অবরুদ্ধ হয়, ঘন মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যারজনীর নিবিড় অন্ধকারের ন্যায় অন্ধকারে আরোহী দিগকে ঘেরিয়া লয়। তখন প্রত্যেক গাড়ীতে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতে থাকে। সেই আলোর সাহায্যে সন্নিহিত আরোহীদিগকে কথঞ্চিৎ নয়ন গোচর হয়। অনেক গুলি ষ্টেশনে অধিক বিলম্ব হয় বলিয়া ট্রেণ টঙ্গা অপেক্ষা বড় শীঘ্র শিমলায় পঁহুছিতে পারে না। আমরা পূর্ব্বাহ্ণ ৮॥ টার সময় কালকা পরিত্যাগ করিয়া অপরাহ্ণ ৪॥ টার সময় শিমলা পঁহুছিয়াছিলাম। প্রথমতঃ গিরিপাদ হইতে ৩৭ মাইল পর্য্যন্ত গিরি শিখরে ইতস্ততঃ নিরবচ্ছিন্ন মনসাজাতীয় গুল্মবিশেষ নয়ন গোচর হইয়াছিল। তৎপর বহুদূর ব্যাপী চেরি নামক সতেজ সমুন্নত তরু-শ্রেণী নয়ন মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল *।

তদনন্তর সর্ব্বত্র পিলু নামকসুবিশাল সুরম্য পাদপরাজি গিরিরাজশিখরকে অলঙ্কৃত করিয়া আছে, লক্ষিত হইল। বেগগামী বাষ্পীয় শকট হইতে হরিৎ-কান্তি তরু, গুল্ম লতাসমাচ্ছন্ন শুভ্র স্ফটিকহারবৎ স্বচ্ছ নির্ঝরমালায় অলঙ্কৃত গিরিকন্দর সকলের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুদ্বৎ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হওয়া গিয়াছে। এক এক স্থানে প্রকৃতি দেবী যেরূপ লাবণ্যচ্ছটা বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন এই অকবির অযোগ্য লেখনী দ্বারা তাহার বর্ণনা হয় না। কবি-কুলগুরু কালিদাসই অষ্টাদশ শ্লোকে নগাধিরাজ দেবাত্মা হিমাচলের প্রকৃত বর্ণনা করিয়াছেন, অন্যের সাধ্য কি?

পূর্ব্বে আর্য্য যোগী ঋষিগণ যোগসমাধি-সাধনের জন্য অতুল ধর্ম্মতৃষ্ণায় বহুকষ্টে দুরারোহ হিমালয়ের সানুদেশে আরোহণ বা অরণ্যাকীর্ণ দুর্গম কন্দরে প্রবেশ করিয়া তপস্যাকুটির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তপস্যা করিতেন। সুখাসক্ত সাধারণ সংসারী লোক-দিগের সেই দেবভূমি হিমাচলে গমনের কি সাধ্য ছিল? সেই দুর্গম দুরারোহ স্থানকে ইংরাজ জাতি সাধারণের পক্ষে যে কত সুগম করিয়াছেন, বিজ্ঞান ও অধ্যবসায়বলে যে কি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, ভাবিলে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা-ভারে মস্তক অবনত হয়। পূর্ব্বে কে জানিত যে আমাদের ন্যায় দুঃখী দুর্ব্বল লোক সুখে স্বচ্ছন্দে গিরিরাজ হিমালয়ে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুপম শোভা দর্শন পূর্ব্বক কৃতার্থ হইবে,

* এই বৃক্ষ হইতে নাকি টার্পিণ তৈল নির্গত হয়।

এক্ষণ ক্ষুদ্র বালক বালিকা পর্য্যন্ত অক্লেশে হিমালয়-শৃঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক সুখে বাস করিতেছে। ধন্য ইংরাজ জাতি! কিন্তু একটি দুঃখের বিষয় এই যে, পূর্ব্বে যোগী ঋষিগণ যোগধাম হিমালয়ে যোগ-সাধনে সিদ্ধ হইয়া দেবজীবন প্রাপ্ত হইতেন, যোগেশ্বর বিশ্বরাজ মহা-দেবকে দর্শন ও তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপন পূর্ব্বক স্বর্গসুখ ও বিমলানন্দ সম্ভোগ এবং হিমালয়ের গৌরববর্দ্ধন করিতেন। এক্ষণ বিষয়ী বিলাসী লোকেরা সহজে সদলে সেই দেবভূমিতে যাইয়া তাহাকে বিলাস-ক্ষেত্র ও সংসারকোলাহলের স্থান করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের যেটুকু ধর্ম্মভাব নিম্নভূমিতে থাকে সেই সুরম্য উচ্চ ভূমিতে যাইয়া তাহা হারাইয়া বসেন। আধ্যা-ত্মিকতার পরিবর্ত্তে ঘোরতর সাংসারিকতা চঞ্চলতা বিলাসতৃষ্ণা ও বাহ্যিক সুখস্পৃহা অন্তরে সঞ্চয় করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন। উচ্চভূমি দেবভূমিতে যাইয়া তাঁহাদের অধোগতি পাপবৃদ্ধি ও অসার-তার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কয় জন লোক হিমাচলে বাস করিয়া জীবনের কল্যাণ সাধন করিয়া আইসেন? কাহার কাহার শারীরিক ব্যাধির নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু তথায় বাস করিয়া আত্মার রোগের বৃদ্ধি হয়। স্ত্রী পুরুষ স্বাধীনভাবে কেবল ছুটা-ছুটি ও আমোদ গল্প ক্রীড়া কুর্দ্দন করিয়া বেড়াইবেন, কোর্টসিপ ও পরিণয়সম্বন্ধ স্থির করিবেন সেই উদ্দেশ্যে হিমালয়ে যাইয়া সেই দেবভূমির অবমাননা করা অপেক্ষা নিম্নভূমি গৃহে বসিয়া থাকা তাঁহা-দের পক্ষে কল্যাণ।

স্থানে স্থানে অভ্রভেদী সমুচ্চ হিমাচল-শৃঙ্গ ইংরাজরাজের প্রভাবে কোলাহলপূর্ণ বিশাল নগরে পরিণত হইয়াছে। প্রধান রাজপুরুষগণ এবং রাজকীয় প্রধান কার্য্যালয় সকলের কর্ম্মচারিগণ সংবৎসরের মধ্যে ৮ মাস কাল শিমলা দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। কেবল শীতের দৌরাত্ম্যে পলায়ন করিয়া শীত ঋতুর চারি মাস সমতল ক্ষেত্রে স্থিতি করিয়া থাকেন। ৬৭ মাইল পথ দূর হইতে আমরা ভারতের পার্ব্বত্য রাজধানী মহানগরী শিমলার সৌধমালার শোভা দর্শন করিতেছিলাম। শিমলাতেই ভার-তের রাজপ্রতিনিধি, প্রধান সেনাপতি এবং পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর গ্রীষ্ম কাল যাপন করেন, এবং তাঁহাদের কার্য্যা-লয় সকল প্রায় ৮মাস কাল সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকে। শিমলার সন্নিহিত একটি ষ্টেশনে প্লেগ পরীক্ষা হইয়া থাকে। সেখানে নিম্ন শ্রেণীর সমুদায় যাত্রিককে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিতে হইয়াছিল। আমাদের চারি দিকে পুলিশ কনেষ্টবল দণ্ডায়মান হইল, এবং এক জন ডাক্তার সাহেব ও এক জন লেডী ডাক্তার এবং তাঁহাদের হিন্দুস্থানী অনুচর কয়েক জন উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার সাহেব অঙ্গুলি-যোগে এক এক জন করিয়া ক্রমশঃ যাত্রিকদিগের হস্ত স্পর্শ করিলেন। এক এক জন হিন্দু স্থানী অনুজীবী এক এক খানা খাতা ও এক একটি পেন্‌সিল হস্তে করিয়া এক এক জন যাত্রিকের নিকটে যাইয়া "জল্‌দি করো, জল্‌দি করো,

তোমারা নাম ক্যা হ্যায়, বাপকা নাম ক্যা হ্যায়। তোম জলদি করো কাঁহাছে আয়া হ্যায়, তোমারি ক্যা পেশা হ্যায়, জল্‌দি করো, কাঁহা জাওগে।" ইহারা তাড়া তাড়ি এইরূপ প্রশ্ন করিয়া প্লেগ্‌ পরীক্ষা করিয়াছিল, তাহারা ভাল করিয়া উত্তর না শুনিয়াই খাতার পেন্‌সিলের আঁচড় দিতেছিল। আমরা খাতা খানা তাকাইয়া দেখিলাম, তাহাতে আঁচড় মাত্র, উর্দ্দু বা নাগরী কোন অক্ষরই নাই। ইহা এক বিদ্রূপের ব্যাপার ও নিয়ম রক্ষা মাত্র। কয়েক মিনিটের মধ্যে পরীক্ষা হইয়া গেল। বোধ হয় তাহার পরবর্ত্তী ষ্টেশনেই আমাদিগকে নামিতে হইল। নব যুবক শ্রীমান্ সুরেন্দ্রচন্দ্র ও আমাদের অপর এক জন যুবক আত্মীয় শ্রীমান্ তরেণকে আমরা ষ্টেশনে প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহারা রিক্‌শানামক শকটবিশেষে আমাদিগকে আরোহণ করাইয়া বড় শিমলা স্থিত তাঁহাদের আবাসে লইয়া গেলেন। আমরা যে ট্রেণে ছিলাম সেই ট্রেণে কাঙ্গড়ার রাজাও শিমলার যাত্রিক ছিলেন। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ভীষণ ভূমিকম্পে গৃহাদি পতন হওয়ায় কাঙ্গড়া প্রদেশের বহু সহস্র লোক হতাহত হইয়াছিল। হতাবশিষ্ট দুর্দ্দশাপন্ন লোকদিগকে সাহায্যদানের উপযুক্ত ব্যবস্থার পরামর্শ করিবার জন্য তিনি গবর্ণরজেনারল ও পঞ্জাবের লেপ্‌টনাণ্ট গবর্ণর কর্ত্তৃক আহুত হইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

আশীষ ;—জগদ্বিখ্যাত স্বর্গগত মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহারা শেষ জীবনে বিচরিত। তিনি স্বীয় জীবনে ভগবানের যে সকল আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কৃতজ্ঞতা, প্রার্থনা এবং আত্মালোচনাযোগে সেই সমস্ত সংক্ষেপে এই আশীষ পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার আত্মজীবনের ষষ্ঠ্যধিকা চিন্তা ঘটনা ও অবস্থা গভীর আধ্যাত্মিক ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। রচনার প্রাঞ্জলতা, মাধুর্য্য এবং ভাবের গাম্ভীর্য্যের বর্ণনা হইয়া উঠে না। "আশীষ" সুপাঠ্য পুস্তক। ইচ্ছা হয় মহিলাগণ তাহা পাঠ করেন। এই পুস্তক পড়িলে তাঁহারা বিশেষ উপকার ও আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। পুস্তকের ভাব ও রচনা প্রণালী যেমন উৎকৃষ্ট, উহার কাগজ ছাপাই এবং বাইণ্ডিং তদ্রূপ উত্তম।

মূল্য ১৲, ডাক মাসুল ৵১০ মাত্র।

স্বদেশী—প্রথম খণ্ড ; দেশীয় শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যবিষয়ক মাসিক পত্রিকা। ডাক মাসুল সহ বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। এই প্রথম খণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয় সকল আছে ;—মঙ্গলাচরণ, উদ্বোধন, আমাদের বর্ত্তমানাবস্থা, আমাদের কর্ত্তব্য, বঙ্গে দুর্গোৎসব, দেশীয় শিল্প, বস্ত্রশিল্প, কল কারখানার আবশ্যকতা, তাঁত সংবাদ, স্বদেশী শিল্প প্রসঙ্গ, বিবিধ প্রসঙ্গ।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলস্বরূপ এই স্বদেশী পত্রিকা। স্বদেশীয় ব্রত স্বদেশে শিল্প বাণিজ্যাদির উন্নতি সাধন। ভগবান্

তাঁহার সেই ব্রত সফল করুন। স্বদেশীর চেষ্টা এই যে, সেই উন্নতিসাধন দেশীয় ভাবে করিবেন, বিলাতী প্রণালী অবলম্বন, বিলাতের সাহায্য গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার এই বিশেষ ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা।

উক্ত পত্রিকার ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে ;—

"সুতরাং দেশহিতৈষিগণকর্ত্তৃক বস্ত্রবয়নের মিলস্থাপনের চেষ্টা না হইয়া তাঁতের সংখ্যার উন্নতি, চরকার অধিক প্রচলনই নিতান্ত হিতজনক।"

"আমরা বিদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহারবর্জ্জন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।"

২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত।

"বস্ত্রবয়নের কল কারখানা প্রভৃতির আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী।"

কালচক্রের বিষম পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণ আর সে কাল ও সে যুগ নাই: যুগপ্রভাব এবং বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে অগ্রাহ্য করিয়া নিরবচ্ছিন্ন দেশীয় প্রাচীন প্রণালীতে দেশের হিতাকাঙ্ক্ষিগণ দেশের হিত সাধন করিবেন ইহা অসম্ভব। পাশ্চাত্য জ্ঞান সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে ভোজ্য ও পরিচ্ছদাদিবিষয়ে এদেশের স্ত্রী পুরুষের রুচি ও প্রবৃত্তির অত্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জোর জবরদস্তি করিলেও আর মোটা ভাত খাইয়া ও দেশীয় সামান্য কাপড় পরিয়া আদুল গায়ে সর্ব্বদা থাকিতে প্রায় কেহ বাধ্য হইবে না। এ বিষয়ে হিতাকাঙ্ক্ষিগণ কত দূর কৃতকার্য্য হইবেন জানি না। তাঁহারা এক্ষণ সেই যুগ ও সেই কাল পুনর্ব্বার আনয়ন করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। বঙ্গদেশে প্রায় ৮ কোটি লোক। প্রতি বৎসর গড়ে ২২ কোটি টাকার বিলাতী কাপড় বিক্রয় হয়। এত কাপড় কি কতক গুলি তাঁতীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাঁত, দুঃখী বিধবাদের চরকা যোগাইয়া উঠিতে পারিবে? একটা বিলাতি কলে এক দিনে যত কাপড় প্রস্তুত হয় হাজার তাঁতে ও চরকায়, মাসে ও তাহা হইবার সম্ভাবনা কম। অতএব কাপড় বুননের বিলাতী কল স্বদেশে স্থাপন করা প্রয়োজন। অবশ্য কয়েক জন কৃতবিদ্য যুবাকে কিছু কাল কল কারখানার কাজ শিক্ষা করিতে হইবে, এবং কল খরিদ করার জন্য বহু লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে। বর্ত্তমান উৎসাহ উদ্যোগের সময় ইহার যোগাড় হওয়া অসম্ভব নহে। পূর্ব্বাপেক্ষা এদেশে লোক সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাঁতে ও চরকার সাহায্যে বঙ্গের ৮কোটি লোকের বস্ত্র যোগান দুষ্করকার্য্য। দুর্ম্মূল্যে অপকৃষ্ট বস্ত্র গরিব লোকেরা কত দিন খরিদ করিতে পারিবে? এক জন তাঁতী এক খানা কাপড় আমাদের এক জন বন্ধুর নিকটে বিক্রয় করিতে আসিয়া তাহার মূল্য ।৷৹ দেড় টাকা বলিয়াছিল, বন্ধু বলিলেন এ যে বড় অধিক মূল্য। তাঁতী বলিল, "মহাশয়, পাঁচ দিনের পরিশ্রমে এই কাপড় খানা তৈয়ার হইয়াছে, তাহার উপর সূতার মূল্য আছে। দেড় টাকায় বিক্রয় না করিলে কিছুতেই পোষাবে না।" হয়তো সেরূপ বিলাতী কাপড় দশ বার আনায় পাওয়া যাইবে।

মঙ্গলময় বিধাতা জ্ঞান, সভ্যতা ও ক্ষমতায় সমুন্নত পশ্চিম ইংলণ্ডের সঙ্গে এই অনুন্নত দেশ ভারতবর্ষকে ইহার উন্নতি ও কল্যাণের জন্য বিশেষ ভাবে সংযুক্ত করিয়াছেন। সেই পশ্চিমদেশের সঙ্গে একেবারে যোগ ছিন্ন করিয়া পাশ্চাত্য জাতির সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া এদেশকে উন্নত করিবার জন্য যত্ন করিলে বিধাতার বিধির বিরুদ্ধ কার্য্য হইবে, তাহাতে কখনও কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

"আমরা বিদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার-বর্জ্জন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি"। এই প্রতিজ্ঞা কি কখনও রক্ষা পাইতে পারে? উচ্চ শিক্ষার বিজ্ঞান দর্শনাদি পুস্তক বিলাতের সুপণ্ডিত গ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক রচিত ও বিলাতে মুদ্রিত। এই প্রতিজ্ঞানুসারে সমুদায় দেশহিতৈষী ছাত্র সেই সমস্ত গ্রন্থ-পাঠ বর্জ্জন করিলে কি দেশে উচ্চ শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে না? এদেশের গৃহস্থদের নিত্য ব্যবহার্য্য অনেক গৃহস্থালী বস্তু বা তন্নির্ম্মাণের উপাদন সকল বিলাত হইতে আনীত হয়, তদ্ভিন্ন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া উঠে না। এই অবস্থায় প্রতিজ্ঞাপালন কিরূপে হইবে? এই প্রতিজ্ঞার মূলেই ভুল হইয়াছে। ডাক্তারী অস্ত্র শস্ত্র ঔষধাদি বিলাতী সামগ্রী, তাহাও কি ব্যবহৃত হইবে না?

স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতর প্রধান উদ্দেশ্য ভ্রাতৃভাব স্থাপন। বিদেশীয়দের সঙ্গে সম্বর্দ্ধন করিয়া কি সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে? না ভ্রাতৃবিদ্বেষ বাড়িবে?

মৃত্তিকা নির্ম্মিত সিংহারূঢ়া দশভুজা দুর্গামূর্ত্তির পূজাতে অদ্বিতীয় নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের পূজা হয়, ইহা একটী নূতন কথা।

হরিবাবু ও তাঁহার স্ত্রী প্রেমলতা।

হরিবাবু গবর্ণমেণ্ট আফিসে কাজ করেন, ১৫০ টাকা মাসে বেতন পান, তিনি কলিকাতার লোক; সহরের মধ্যে তাঁহার একখানি বাড়ী আছে। তাঁর পরিবারটি বড় ছোট নয়, অনেকগুলি ছেলে মেয়ে। কোন ক্রমে তিনি ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া এবং সংসার চালান। তাঁহার স্ত্রী প্রেমলতা বেশ শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, কিন্তু একটু প্রখরা। হরিবাবু সাদা সিদে ভাল মানুষ, একটু নির্ব্বোধ, তাই তিনি বর্ত্তমান "স্বদেশী" এবং "বয়কট্" স্রোতে পড়ে একটা বিষম পণ করে ফেলেছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছেন যে, বিদেশীয় কোন দ্রব্য ব্যবহার করবেন না। এ জন্য বড় বড় সংবাদ পত্র তাঁহাকে "বঙ্গের কুলতিলক" বলে প্রশংসা করেছেন। তাঁহার বিষম পণের কথা আফিসের সাহেব অবশ্য জানিতে পারেন নাই।

হরিবাবু সংপ্রতি কন্যার বিবাহে তিন হাজার টাকা ধার করেছিলেন, তিন মাস সুদ দেওয়া হয় নাই। এই পূজার সময় তিন মাসের সুদ ৯০ টাকা দিতে হয়েছে। জাতীয় সভায় ২০টাকা, আফিসের পেয়াদাদের বক্সিস ও অন্যান্য খরচ করে বাকি ৩০ টাকা গিন্নীর হাতে দিয়েছেন। ছেলে

মেয়ের পূজার কাপড় নূতন বৈবাহিকের বাড়ীর তত্ত্ব,বাজার দেনাশোধ এবং সংসার খরচ চালাতে হবে যাকে, তার হাতে এত অল্প টাকা প'ড়লে তার মন কেমন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে, তা সকলেই বু'ঝতে পারেন। প্রেমলতা সাক্ষাৎ অগ্নিমূর্ত্তি হলেন। নায়েগারার জল-প্রপাতের মত বেগে তাঁহার মুখ দিয়া কত কথা অকথা বাহির হইয়া গেল। তাহা কে গণনা করিতে পারে? সেই জোয়ারে হরিবাবু বেচারা ভেসে গিয়া একেবারে দুঃখসাগরে গিয়ে পড়িলেন। বাস্তবিক প্রেমলতার তৎকালীন মূর্ত্তি ও কীর্ত্তি দেখিলে কেহ আর বলিতে পারিতেন না যে, "প্রকৃতি-মাধুর্য্য রসের আধার প্রেমের প্রতিমা স্নেহের অবতার।" কবিরা যা বলেন বলুন। মনের ঝাল মিটাইয়া গালিগালাজ দিয়া ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া প্রেমলতা গৃহকার্য্যে চলিয়া গেলেন। গৃহস্বামী কর্ত্তা মহাশয়, বিঘূর্ণিত মস্তকে অন্ধকারাচ্ছন্ন চক্ষে কাঁপিতে কাঁপিতে ছাদে গিয়া উঠিলেন। একটি মাদুর পেতে তথায় শয়ন করিয়া দুঃখীর বন্ধু তামাকু সেবন করিতে লাগিলেন ও আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন. এদিকে পঞ্চমীর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ও ভাবনার ক্লান্তি উভয়ে মিলিয়া দয়া করিয়া তাঁহাকে ঘুম পাড়াইল। হরিবাবু কত ক্ষণ নিদ্রিত ছিলেন জানি না। গৃহিণীর প্রজ্বলিত ক্রোধানল ক্রমে নির্ব্বাপিত হইল, তিনি ছাদে আসিয়া স্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "হাঁগা তুমি খাবে না?" "না আমি আজ খাইতে পারিব না. আমার পেট ফুলিতেছে, মাথা বেথা করিতেছে।" "ও কিছু নয়, এস খাবে এস, খাইলেই ভাল হয়ে যাবে।" হরিবাবুর খাওয়া হইলে গৃহিণী বলিলেন, "দেখ তোমাকে দেখে আমার রাগ হয়, আর দুঃখ হয়। আমারই অদৃষ্টের দোষ। লোকে বলে স্ত্রী ভাগ্যে ধন, পুরুষ ভাগ্যে সন্তান. তা তোমার তো ভাগ্য বেশ ফলেছে। আমারি ভাগ্যে ফলে নাই। তবে কিনা তুমি বড় নির্ব্বোধ, পরের বুদ্ধিতে নেচে বেড়াও, তা নাহলে তুমি এই টানা টানির সময় জাতীয় সভায় ২০৲ টাকা কি করে দিয়ে এলে? আর তাঁহারাই বা কি করে নিলেন? তাঁহারা কি জানেন না যে, ২০৲ আমাদের এক সের রক্ত? সে যা হোক, তোমার মুরোদ যে কত আমি তো জানি, তাই আমি একটা উপায় করিছি, আমার গহনা বাঁধা দিয়ে ৩০০৲ টাকা ধার করে এনেছি, বলে 'যাক প্রাণ থাক মান।' এখনকার বিপদ তো কাটুক্" হরিবাবু বলিলেন, "তা বেশ, কিন্তু এমনি করে তো তোমার সকল গহনাই শেষ হয়ে গেল। গহনা উদ্ধার হইবে কি করে?" প্রেমলতা বলিলেন, "তা আর তোমার ভাবিতে হইবে না। আমি তা ভেবে রেখেছি। আমার সেটের বাছা ষষ্ঠীদাস, কালু, মালু, চিনু, রামু চার ছেলের বিবাহেতে কুড়ি হাজার টাকা আদায় করিব। সকল দেনা শোধ হয়ে আরও হাতে টাকা থাকিবে। কিন্তু তোমাকে তার একটী টাকাও দিব না।" হরিবাবু বলিলেন,

"হাঁগা, কালুর বয়েস এখন কুল্লে দশ বৎসর।" "তা হোক্ দিন যায় মা ক্ষণ যায়।" এই বলিয়া গৃহিণী তত্ত্বের ফর্দ্দ দিলেন। ফর্দ্দ পড়িয়া হরিবাবুর হরিষে বিষাদ, তিনি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, "দেখ প্রেম, তুমি আমার প্রতিজ্ঞার কথা জান, সংবাদপত্রে আমার প্রসংশা পড়িয়া কত হেসেছিলে, আমি এখন বিলাতী শাড়ী ও বিলাতী জুতা এবং অন্যান্য বিদেশী দ্রব্য কি করে কিনিব?" "হাঁ আমি হেসেছিলাম বটে, কিন্তু সে তোমার বোকামীতে হেসেছিলাম। তুমি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের চাকর হয়ে, কেমন করে ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞা করিলে? ডাকাতেরাও 'নুন খেলে গুণ মানে' কিন্তু তুমি সে কথাও ভুলে গেলে, তোমার প্রথমে চাকরী ছেড়ে তবে প্রতিজ্ঞা করিতে হয়. কৃতজ্ঞতা যে ধর্ম্ম একি তোমার মনে নাই? ইংরাজের স্কুলে পড়ে, ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষা করে টাকা উপার্জ্জন করে, আপনার এবং পরিবারের প্রাণ রক্ষা করিতেছ, তোমার প্রতিজ্ঞা কোন মতেই রক্ষা পাইতে পারে না।" হরিবাবু বলিলেন, 'কেন? হাতীকা দাঁত, মরদকি বাত।' কাপুরুষ কি করে হব? আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে ধর্ম্ম যে রক্ষা হবে না।" প্রেম একটু রেগে বলিলেন, "রেখে দাও তোমার হিন্দী বাত। তুমি আবার মরদ্ কিসে? 'চাকুরি না কুকুরি।' যখনি চাকুরি করিতেছ তখন আবার মরদ কিসে? আর ধর্ম্ম রক্ষার কথা বলিতেছ, তোমার ও প্রতিজ্ঞা অন্যায়, সে জন্য ইহা রক্ষা করিলে পাপ, বরং রক্ষা না করিলে পুণ্য। তুমি যদি রেগে প্রতিজ্ঞা কর যে, তুমি অমুকের ঘরে আগুন দিবে, সে প্রতিজ্ঞা কি রক্ষা করিতে হইবে? অন্যায় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে গিয়া দশরথ রাজা নিজে মরিলেন, রামকে বনবাস দিলেন, আর সীতার চির দুঃখের কারণ হইলেন। তোমার তো নিজের বুদ্ধি নাই, পরের বুদ্ধিতে মেতে প্রতিজ্ঞা করেছ। মাতালের প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ নয়। আর তোমার প্রতিজ্ঞা দেশানুরাগের উপর নয়, বিদেশ-বিদ্বেষের উপর স্থাপিত। সুতরাং এ ধর্ম্মসঙ্গত প্রতিজ্ঞা নয়, রক্ষা করিতে হবে না। আর তুমি যদি আমাদের ভাসাইয়া দিয়ে একা উলঙ্গ হয়ে বনে বসে থাকিতে পার তবে তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়।" হরিবাবু বলিলেন, "তুমি যে বড়ই বকিতেছ, কেবল বকেই যাইতেছ, আমারও argument (যুক্তিপ্রদর্শন) আছে, আচ্ছা তুমি আর একটু বুঝাইয়া বল দেখি।"

"অবোধকে বুঝাব কত বুঝ নাহি মানে"
"ঢেকিকে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে"

তোমাকে এক সামান্য কথায় বুঝাইয়া দিতেছি। তোমাকে তো চাকুরি করিতে হইবে? কোর্ট পেণ্টুলেন পরে যেতে হবে, ছুঁচ না হলে সে সব শিলাই কি করে হবে, ছুঁচ যে বিলাতী। কাটারী কুড়ুল হাতা বেড়ী ব্যবহার করিতে হবে, সে সমস্ত প্রায়ই বিলাতী লোহার নির্ম্মিত. এখন কি বুঝিতে পারিতেছ? আর শুন,

তোমার প্রতিজ্ঞার অর্থ বর্ত্তমান সভ্যতার সঙ্গে যোগ কেটে দেওয়া, জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে বিদেশীরা মানবসমাজের অনেক প্রকার সুখ সুবিধার জন্য কত দ্রব্য প্রস্তুত করেছেন, সে সমস্ত ব্যবহার না করা, এবং অসভ্যতার অন্ধকারে পড়া একই কথা। আমরা জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি করে অল্প পরিশ্রমে অধিক কাজ করিতে পারিবার এবং অল্প খরচে অধিক সুখ সম্ভোগ করিবার উপায় করে নানা প্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া বিদেশীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিলে দেশের মঙ্গল হইবে, আর এই চেষ্টার মধ্যে ধর্ম্মকে বজায় রাখিতে হইবে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় রাখিতে হইবে। ব্যক্তিগত দেশানুরাগ এবং পরস্পরের সহায়তা দ্বারা দেশের মঙ্গল হয়। এরূপ করিলে রাজা বিরোধী না হইয়া সহায়তাই করিবেন। সংবাদ পত্র পড়িয়া দেখিয়াছি রাজপুরুষেরা কত ভাবে কত প্রকারে এই দিকে দেশের লোকের মন আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেছেন। বিদ্বেষের ভাবে মঙ্গল হবে না, ধর্ম্মেরই জয় হয়। "হরিবাবু বলিলেন, দেখ প্রেম, সত্য সত্যই তুমি আমার বশিষ্ঠ বা সুকদেব, তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী হৃদয়রতন, প্রাণের আলোক। বিধাতাকে শত ধন্যবাদ যে, তিনি এমন দীন অধমকে এমন স্ত্রীরত্ন দিয়াছেন। আমার এখন ঘোর কেটে গেল, বিষয়টা এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি।" গৃহিণী হেসে বলিলেন, "তোমার আর কবিতার বুলি কপ্‌চাতে হবে না, কাল সকালে জিনিষ পত্র কিনে আনিতে যাও। আর একটা কথা বলি তোমায়, যদি নিতান্ত গুরু ধরিতে ইচ্ছা হয়েছে তবে তুমি তোমার এই ঘরের গুরুকে গুরু পদে বরণ কর, আমার কাছে মন্ত্র নেও, আমাকে নেতা কর। এতে তোমার কাপুরুষত্ব হবে না নিন্দা হবে না, মনে আছে কি? লর্ড লিটন লেডী লিটনকে প্রকাশ্য সভায় Commanding officer (সেনাপতি) বলে বর্ণনা করেছিলেন। তুমি তো আর তাঁর চেয়ে বড় লোক নও, আমি তোমার Commanding officer, আমার বিনা অনুমতিতে কিছু করিবে না। আমার হুকুম সর্ব্বদা তামিল করিবে।"

হরিবাবু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে সকল সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে অগ্রাহ্য করে তাঁহার গৃহলক্ষ্মী দেবীর আদেশ পালন করিলেন। সকল বিপদ্ কেটে গেল। এদিকে জাতীয় সভা ক্রোধ এবং দুঃখের সহিত তাঁহার পতনের বিষয়সম্বন্ধে মন্তব্য তাঁহাদের পুস্তকে লিখিয়া রাখিলেন। কিন্তু সে মন্তব্য হরিবাবুর অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিল না।

R. M. bose.

জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও ভাগিনেয়াদের নিকটে পত্র *।

পূজনীয়া দিদি,

বিপদ যখন কেটে যায় তখন আর

* শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্র নাথ ' যিনি এখন নববিধানপ্রচারার্থ ইয়ুরোপ ও আমেরিকা দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। আমেরিকা হইতে তিনি নিম্ন লিখিত পত্র লিখিয়াছেন।

যে বিপদ নয়। তার স্মৃতি মনকে কোমল করে ও ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ করে, এবং সেই জন্য এক রকম অপূর্ব্ব আনন্দ এনে দেয়। London এ পৌঁছে তোমাদের বিপদের কথা শুনে ছিলাম। ক্রমে ক্রমে সে বিপদ কেটে গেল—এতে আমাদের সকলেরই মনকে ভাল করে দিক্।

Meadville এ পৌঁছে তবে তোমাদের চিঠী পেলাম। আবার সেই ডিসেম্বর মাসে Gugeand এ পৌঁছে তবে হয়ত এর পরের চিঠী পাব। বিদেশ কিন্তু আমার কাছে বিদেশ ব'লে মনে হচ্চেনা। এখনকার লোকেরা যেন সব কত দিনের আপনার লোক। থাবার ব্যবস্থাটা যদি ভগবান্ তুলে দিতেন তাহ'লে দেশ ভ্রমণ যেমন আনন্দের এমন আর কিছুই নয়।

Meadville জায়গাটী এমন সুন্দর! ঠিক যেন আমাদের সেকালের ঋষিদের আশ্রম। প্রকৃতির শোভা ও বর্ত্তমান সভ্যতার সঙ্গে ধর্ম্মভাব মিলে এ জায়গাটাকে বড় রমণীয় ক'রেছে। এখানে থাকিবার জন্য সুন্দর ঘর পেয়েছি, পড়িবার জন্যে হাতের কাছেই সুন্দর লাইব্রেরী সঙ্গী; এখানকার Professor ও Students সবাই অতি চমৎকার লোক। কাজ ও বিশ্রামে এখানে আন্দাজ তিন সপ্তাহ কেটে গেল। পরশু আবার রেলগাড়ীতে চড়ে নতুন ভ্রমণে বেরুতে হবে।

কত সুন্দর দেশ, কত প্রকৃতির শোভা, কত সভ্যতার শিল্প যে দেখলাম, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য, সুইজার ল্যাণ্ডের পাহাড় ও হ্রদের শোভা, প্যারিস ও লণ্ডনে নানা প্রকার শিল্প ও কলা বিদ্যা। এসব দেখে ফুরায় না। এখানে আসার পর এক দিন বরফ পড়া দেখ্‌লাম। ভারি চমৎকার!

তোমাদের ঘরকন্না, সমাজ, স্কুল প্রভৃতি আশা করি বেশ সচ্ছন্দে চল্‌চে। সকলকে ভালবাসা দিও। ক্রমশঃ

মহিলাদের রচনা।

টুটিছে হৃদয়।

নাহি বল পড়ে ছুটী, দুরবল হিয়া,
বলগো কেমনে তাঁরে রাখিব বাঁধিয়া।
হৃদয়ের ফুল দুটি ভাঙ্গিয়া সবলে,
নিরদয় হয়ে কেন লয়ে গেলে চলে।
হাঁসি খেলি সাধ করে হৃদয় আমার,
ভাঙ্গিয়া টুটিয়া পড়ে বল নাহি তার।
রবি অস্তাচলে যায় পশ্চিম গগনে,
আমার জীবন অস্ত হবে কোন্ খানে।
বলে দাও, ভগবান্ করুণানিলয়,
এজ্বালা নিবাবে কবে লইয়া আমায়।

সম্বলপুর। শ্রীমতী স—

মেজদাদা।

এ রাজ্য ছাড়িয়া গিয়াছ চলিয়া
সুন্দর স্বরগ ধামে,
তোমার বিচ্ছেদে আমরা সকলে
কাঁদিতেছি তব নামে।
জননীর ক্রোড়ে সুখে আছ সেথা,
অমৃত করিছ পান।

হেথায় আমরা হাহাকার করি
করিতেছি শোক পান।
আর যে তোমায় পুন এ ধরায়
দেখিতে পাব না ভাই,
আকুল হইয়া কঁাদিয়া কাঁদিয়া
ভাবিতেছি শুধু তাই।
এক এক করে সাত ভাই বোন
ক্রমে চলে গিয়েছেন,
তাঁহাদের শোকে জনক জননী
অধীর হয়ে আছেন।
তাহার উপরে এতই সত্বরে
তুমি যে সেথায় যাবে,
স্বপনেও ভাই কভু ভাবি নাই
তোমায় ছাড়িতে হবে।
কর্পূরের মত যাবে যে উপিয়া
মোরা কভু ভাবি নাই,
কত স্মৃতিচিহ্ন গিয়াছ রাখিয়া
দেখিতেছি বসি ভাই।
বালিকা বধূর কি হইল আহা!
বলিতে পারি না আর,
এ জনমের মত যত সুখ আশা
সকলি ফুরাল তার।
পিতা ও মাতার প্রাণের যাতনা
নাহি নাহি বলিবার,
দেবতুল্য পিতা সহেন সতত
যত দুঃখ হয় তাঁর।
ওহে দয়াময় তোমার চরণে
অনন্ত বিশ্বাস তাঁর,
সংসারের দুঃখ তাঁরে কি করিবে
তুমি যে আছ তাঁহার।
তবু দয়াময় তুমিই তাঁদের
বেঁধেছিলে স্নেহবন্ধনে.
আবার তোমার মঙ্গল ইচ্ছায়
তাঁহারে নিলে চরণে।
বিনা মেঘে যথা বজ্রপাত দেখে
হঠাৎ সবে চমকে।
সেরূপ করিয়া লইলে তুলিয়া
সেই সুন্দর বালকে,
হে মঙ্গলময় তোমার চরণে
এই ভিক্ষা মোর নাথ,
নশ্বর জগতে তোমার কাজেতে
হয় যেন দেহ পাত।
যত দুঃখ ক্লেশ সতত সহিব
তোমার আদেশ জেনে,
তোমার চরণে রাখিয়া জীবনে
কাটাব ভববন্ধনে।
তুমি শান্তিদাতা পরম শ্রীহরি
তোমা পদে এই নিবেদন,
আমাদের সবে তোমার শ্রীপদে
রাখ হে এখন।

সীতাপুর। শ্রীমতী স—

সংবাদ।

প্রাচীন শ্রেণীর হিন্দু মহিলাগণ গুরুতর শোকতাপে অতিশয় অধীর হইয়া পড়েন; পতি বা পুত্র কন্যাদির মৃত্যু হইলে তাঁহারা চতুর্দ্দিক শূন্য ও অন্ধকার দেখেন; মাসাবধি এমন কি বৎসরাবধি পর্য্যন্ত বিলাপ ও আর্ত্তনাদ করিয়া থাকেন। মৃত্যু উপস্থিত জানিলে সেই সকল নারী একেবারে আকুল হইয়া পড়েন। কিন্তু ব্রাহ্ম পরিবারের অনেক মহিলাকে দৃষ্ট হইয়াছে যেন, কঠিন

শোকাঘাত প্রাপ্ত হইলেও বিলাপ আর্ত্ত-নাদ করেন না, ধীর শান্তভাবে শোক-যাতনা বহন করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে, পরলোক ও আত্মার অমরত্বে দৃঢ় বিশ্বাসবশতঃ অনেক মহিলা দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা আশ্রয় করেন, তাহাতে কোন ভুল নাই। অনেক মুমূর্ষু মহিলাকে ভগবানের নাম করিয়া পরলোকের নানা তত্ত্ব বলিয়া হাসিতে হাসিতে প্রাণ দান করিতে দেখা গিয়াছে।

সম্প্রতি নববিধানব্রাহ্মসমাজের দুটী যুবতী কন্যা দীর্ঘকাল ঘোরতর রোগ যন্ত্রনা ভোগ করিয়া পারলৌকিক নানা কথা বলিয়া বা শুনিয়া আশ্চর্য্য ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয়দানে প্রসন্নবদনে যেন নিত্য আনন্দধামে যাইতেছেন, এই ভাবে পরলোকেযাত্রা করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের মনে অত্যন্ত শান্তি ও আনন্দ হইয়াছে।

মহিলাদিগের অনেক গুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ রচনা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এবার স্থানাভাবে তাহার অত্যল্প মাত্র প্রকাশ করিতে পারা গেল। তজ্জন্য দুঃখিত।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, সম্বলপুরনগরস্থ শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী-প্রণীত "অশোকা" এবং "কাহিনী ও গল্প" এই দুই খানা পুস্তক সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। অবকাশ মতে উক্ত পুস্তক দুই খানা পাঠ করিয়া আগামী কোন সংখ্যায় আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতে যত্ন করিব।

আমরা বহু গ্রাহক গ্রাহিকার নিষ্ঠুর ব্যবহারে অতিশয় দুঃখিত ও আশ্চর্য্যান্বিত। গত আষাঢ় মাসে মহিলার ১০ম বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। অনেকেই গত বৎসরের মূল্য এমন কি তাহার পূর্ব্ব বৎসরের বাকি মূল্য প্রদান করিতেছেন না। ক্রমে তিন চারি বার পত্র লিখা গিয়াছে, কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। কয়েক জনের নিকট ভি, পি, করা গিয়াছিল, অনেকে ভি, পি, ফেরত পাঠাইয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা অর্থ-সম্বন্ধীয় কিরূপ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। পত্রিকাদির ঋণ পরিশোধে এরূপ উপেক্ষা বড় দুঃখের বিষয়।

মহিলার নিয়মাবলী।

মহিলা পত্রিকা প্রতিমাসে সংক্রান্তি দিবসে প্রকাশিত হয়। ডাক মাশুলসহ ইহার বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ মহিলার মূল্য ও অর্থসম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকটে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক প্রকাশিত হইবে। কাহারও প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া যাইবে না।

অনেক মহিলা পত্রিকা বৎসরাধিক কাল গ্রহণ করিয়া মূল্য দান করেন না, বড় দুঃখের বিষয়। যাঁহারা মূল্যদানে অসমর্থ তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্রিকা ফেরত পাঠাইয়া দেন, অথবা আমাদিগকে তাহা পাঠাইতে নিষেধ লেখেন। তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া প্রাপ্য মূল্য না পাইলে অনেক সময়ে আমরা সেই মূল্যের জন্য ভি, পিতে মহিলা পাঠাইয়া থাকি।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

বায়ু সঞ্চালন *।

(কি কি উপায় দ্বারা দূষিত বায়ু বিশুদ্ধ করা যায়।)

কি কি উপায়ে বায়ু পরিষ্কৃত হয় আজ সেই বিষয়ে কিছু বলিতে চাই। দেখাযায় প্রকৃতির ভিতর বায়ু বিশুদ্ধ হইবার অনেক উপায় আছে। প্রথমতঃ বৃষ্টি দ্বারা বায়ু পরিষ্কার হয়, বাতাসের সঙ্গে যে সব দূষিত পদার্থ মিশ্রিত হয় বৃষ্টির সময়ে জলের সঙ্গে সেই সব পদার্থ মিশ্রিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হয়, সুতরাং বৃষ্টির পর উপরিভাগে বায়ু যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ উদ্ভিদজগৎ ও জীবজগতের শ্বাস প্রশ্বাস-ক্রিয়ার আশ্চর্য্য প্রণালী দ্বারা অপ্রত্যক্ষীভূত ভাবে বায়ু বিশুদ্ধ হইতেছে, জীবগণ প্রশ্বাস দ্বারা যে দূষিত বায়ু বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, উদ্ভিদেরা আবার সেই বায়ু গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে। এ এক প্রকৃতির আশ্চর্য্য প্রণালী। উদ্ভিদ্‌গণ যে বায়ু পরিত্যাগ করে তাহা আমাদের পক্ষে অতি বিশুদ্ধ বায়ু। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উদ্ভিদ্‌গণ প্রশ্বাস দ্বারা অক্সিজেন গ্যাস বাহির করিয়া দেয়, তাহা আমাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায়। আর আমরা যে কার্ব্বণিক গ্যাস বিষাক্ত বলিয়া পরিত্যাগ করি, উদ্ভিদের তাহাই জীবনোপায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উদ্ভিদ্‌জগৎ ও প্রাণীজগতের মধ্যে যে, এক আশ্চর্য্য আদান প্রদানের প্রণালী চলিয়াছে তাহা দ্বারা সর্ব্বদাই বায়ু পরিষ্কৃত হইতেছে। তাহা না হইলে এতদিনে পৃথিবী ভয়ানক বিষাক্ত বায়ুতে পরিপূর্ণ হইত ও একটী প্রাণীও জীবিত থাকিতে পারিত না।

তৃতীয় উপায় বায়ুপ্রবাহ, যদি একটী ঘরে বায়ু প্রবাহিত হইবার যথেষ্ট পথ থাকে তাহা হইলে কখনই বায়ু বিষাক্ত বা দূষিত হয় না। দূষিত বায়ুর সঙ্গে যদি বিশুদ্ধ বায়ু যথেষ্ট পরিমাণে মিশিতে পারে তাহা হইলে বায়ুর দূষিতাংশ অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। খুব জোরে বাতাস বইলে দূষিত বায়ু একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

দূষিত বায়ু ও বিশুদ্ধ বায়ু একত্র সহজেই মিশে যায়, তার একটী কারণ এই, দুটী বায়ুর মধ্যে একটী হালকা ও একটী ভারি। হালকা ও ভারি দুটী বাষ্প খুব শীঘ্র একত্র মিশিতে চেষ্টা করে ও দুটী মিশে এক হইয়া যায়। গৃহেতে যে বায়ু থাকে তার সঙ্গে

---

* ২৯শে মার্চ্চ ১৯০৪ শনিবার ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়ে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর প্রদত্ত বক্তৃতার সার।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ মিশে বাতাস কিছু ভারি হয়ে থাকে, আর বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু হালকা; সুতরাং খুব সহজেই দুটো বায়ু মিশে এক হয়ে যায় ও দূষিতাংশ কমে যায়, এই গুলি বায়ুপরিষ্কৃত করিবার জন্য প্রকৃতির নিয়ম। আমরা অজ্ঞতাদোষে প্রাকৃতিক নিয়মের প্রকৃত ব্যবহার না করায় নানা কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করি ও অকাল মৃত্যুতে পতিত হই। আমারা কতকটা না জানার জন্য ও আর কতকটা জেনে শুনে একটু আলস্য বা কুড়েমির জন্য এই সকল কষ্ট ও মৃত্যু ভোগ করি। গৃহের বায়ু পরিষ্কৃত করিবার প্রধান উপায় বায়ুসঞ্চালন। কি প্রকারে গৃহের ভিতর যথেষ্ট পরিমাণ বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে তাই দেখা যাউক।

আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, সুতরাং সর্ব্বদাই ঘরের জানলা দরজা খুলে রাখা হয়, আর বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু ঘরে প্রবেশ করিয়া দূষিত বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যায়। সুতরাং বায়ুর দূষিতাংশ চলিয়া যায়। শুদ্ধ দরজা জানলা থাক্‌লে হয় না, বাড়ীর চারি দিকে একটু মুক্ত স্থান থাকা চাই, খোলা জায়গা না থাক্‌লে ভাল বাতাস আস্‌বে কোথা থেকে? আজকাল কলিকাতায় বেশ এক নিয়ম হয়েছে যে,বাড়ী করিতে হইলে বাড়ীর চারি দিকে অন্তত দুই হাত করিয়া জমি ফেলিয়া রাখিতে হইবে, এই রূপ যদি প্রত্যেকে দুই হাত করিয়া জমি ফেলিয়া রাখেন, তাহা হইলে ২টী বাড়ীর মধ্যে ৪ হাত জমি খোলা রহিল। সুতরাং বায়ু চলাচলের পক্ষে বেশ পথ রহিল, এ নিয়মটী যে কত উপকারী তা বলা যায়না। সুতরাং দেখা গেল যে, শুধু জানলা দরজা থাক্‌লে হবে না, তার সঙ্গে সঙ্গে একটু খোলা জায়গা থাকা চাই। আর একটি দৃষ্টি রাখা উচিত, যেদিক্ দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হয় ঘরের জানলা দরজা ঠিক সেই দিকে করা দরকার। আমাদের দেশে বৎসরের অধিকাংশ ভাগই দক্ষিণ দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়, কেবল শীতকালে উত্তর দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। সুতরাং এদেশে ঘরের জানলা দরজা উত্তর দক্ষিণ মুখী হওয়া খুব দরকার। বাড়ী প্রস্তুত করিবার সময় এসব বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি করা উচিত। জানলা দরজা খুব বড় বড় ও রিজু রিজু হওয়া দরকার। যদি এক দিকেই দুইটী জানলা করা যায় তাহলে খুব কমই বায়ু প্রবাহিত হয়,সুতরাং রিজু জানলার দিকে বিশেষ দৃষ্টি করা উচিত। একটী জানলা থাক্‌লে কথনই বায়ু প্রবাহিত হয় না, সাধারণতঃ এটা আমরা ভাল বুঝিতে পারি না, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা অতি পরিষ্কার রূপে জানিতে পারা যায় যে, বায়ু সঞ্চালনের জন্য অন্ততঃ দুটী পথ থাকা চাই। একটী দ্বারা দূষিত বায়ু বাহির হইবে ও অপরটীর দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করিবে। ঘরের দরজা জানলা করা ছাড়াও আর একটী উপায় করা দরকার। যদিও কার্ব্বণিক গ্যাস বাতাসের চেয়ে ভারি, কিন্তু প্রশ্বাস বায়ু গরম, সুতরাং হালকা হয়ে যায়। আমরা ঘরের ভিতর বসে যত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলি সব উপরে ছাতের নীচে গিয়ে জমে, কারণ বাতাসের চেয়ে হালকা জিনিষ হলেই উপরে উঠে যায়, অতএব ঐ কার্ব্বণিক গ্যাস বাহির করিয়া দিবার

জন্য কড়ির নীচে দেয়ালের গায় ছিদ্র রাখা দরকার। আর একটা দেখা দরকার, একঘরের বাতাস অন্য ঘর দিয়ে বয়ে যেন না যায়। একঘরে যদি একটী রোগী ও পাশের ঘরে যদি একজন সুস্থ লোক থাকে, তাহলে রোগীর ঘরের বাতাস ঐ ঘর দিয়ে চলাচল হওয়াতে তার অসুখ হইবার সম্ভাবনা। যদি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় তবে দেখা যায় যে, বেশী অসুখ শীতকালে আর কম অসুখ গরমকালে হয়। তার কারণ এই, শীতকালে ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে সব দরজা জানলা বন্ধ করা হয়, আর সেই কারণই অসুখ বেশী হয়। শীত-কালে দরজা জানলা বন্ধ করিলে ততটা কষ্ট হয় না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কম পড়ে, বা বায়ু কম দূষিত হয় এমন তো কোন কথা নাই। সুতরাং কি গ্রীষ্ম কি শীত কোন সময়ে ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করা উচিত নয়। অনেকে বলতে পারেন, শীতপ্রধান দেশেতো সব জানলা দরজা বন্ধ করতে হয়, তাহলে ঘরের বায়ু কিরূপে সঞ্চালিত হয়? শীতপ্রধান দেশে প্রায় সব বাড়ীতেই Fire placa থাকে, এবং তার উপর বরাবর লম্বা চিমনি থাকে। ঐ চিমনির ভিতর দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়। মনে করুন ঐ Fire place র চারিদিকের বাতাস অগ্নির উত্তাপে গরম হয় ও গরম হওয়ার দরুন হালকা হয়, সুতরাং খুব শীঘ্রই ঐ চিমনির ভিতরদিয়ে উপরে উঠে যায়, আর অমনি দরজার ফাক দিয়ে বাতাস জোরে ঘরে প্রবেশ করে। এইরূপে ক্রমাগত বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে। তা ছাড়া পার্লামেণ্ট ইত্যাদি বড় বড় সভায় ৬। ৭ শত লোক একসঙ্গে দরজা বন্ধ করে থাকে। সুতরাং ১২ টী চিমনিতে কিছুই হয় না, সেসব স্থানে ২। ২॥ ঘণ্টা অন্তর যন্ত্র সাহায্যে বায়ু প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। এমন স্থান আছে যেখানে দরজা জানলা করিবার কোন উপায় থাকে না। অথচ মানুষকে তার ভিতরে থাকতে হয়, যেমন খনি। খনিতে কিরূপে বায়ু সঞ্চালিত হয় এটা অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। খনির উপরে দুটো খুব বড় বড় চিমনি করা হয়; একটা চিমনির নীচে খুব আগুন জ্বালা হয়; সুতরাং সেই চিমনির নিকটবর্ত্তী অনেকট স্থানের বাতাস গরম হয়ে হালকা হয় ও ঐ চিমনি দিয়ে উপরে উঠে বাহির হইয়া যায়, যেই এক দিক থেকে বাতাস বাহির হইতে থাকে, অমনি অপর চিমনির দ্বারা জোরে বিশুদ্ধ বায়ু খনিতে প্রবেশ করিতে থাকে; কারণ একটা স্থান কখনও শূন্য থাকে না। বায়ু সঞ্চালনের নানা উপায় করা সত্বেও এক ঘরে অধিক লোক শোয়া কোন মতেই উচিত নয়। প্রতিজনের জন্য অন্ততঃ ৩০০ Cubicfeet জায়গা চাই। একজন লোক শুতে হলে চারি দিকে ৪৮ ফিট্ জায়গা চাই।

মূল্যপ্রাপ্তি।

৯ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়,	পুরী	১৲
" ক্ষুদীরাম বসু,	কলিকাতা	১৲

১০ম বৎসর।

শ্রীমতী ক্ষীরোদাসুন্দরী সেন,	ঢাকা	২৲
" বাসন্তী দেবী,	সম্বলপুর	২৲
শ্রীযুক্ত তারকনাথ রায়,	কলিকাতা	২৲
" রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়,	পুরী	২৲
" পান্নালাল বসু,	কলিকাতা	২৲
শ্রীমতী সরলাসুন্দরী কান্তগিরি,	বালীগঞ্জ	২৲
" বিন্ধ্যবাসিনী সেন,	কুমিল্লা	২৲
শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ দাস,	ঢাকা	২৲
শ্রীমতী বিধুমুখী সেন,	ঢাকা	২৲
শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার দত্ত,	চট্টগ্রাম	২৲
শ্রীমতী কুমুদিনী রায়,	ঢাকা	২৲
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত,	রাজবাড়ী	২৲
" শশাঙ্কমোহন দাস,	ঢাকা	২৲

১১শ বৎসর।

শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বন্দ্যো.	পুরী	২৲
শ্রীমতী ইচ্ছাময়ী দাস,	ঢাকা	২৲
" অশোকলতা দেবী,	দেরাদুন	২৲
" সরযূবালা সেন,	মজফরপুর	২৲
" কুমুদিনী রায়,	ঢাকা	২৲
শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন দাস,	ঢাকা	১৲

REG. No. C 32.

সূচী।

কলিকাতা

রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে"

কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ৪ঠা মাঘ মুদ্রিত।

যুবরাজ।

যুবরাজ-পত্নী।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ "

১০শ ভাগ] পৌষ, ১৩১২ ; জানুয়ারি, ১৯০৬। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

রাজভক্তি।

ভারতবাসীদিগের রাজভক্তি প্রকৃতিনিহিত। তাঁহারা রাজাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজাদের রাজ্যে যাইয়া দেখা যায় যে, রাজাদিগের চরিত্র যেমন হউক না কেন তাঁহাদের প্রতি প্রজাদিগের অগাধ ভক্তি। পিতা মাতা যেমন সন্তানপ্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণজন্য পরম পিতা ও পরমমাতার প্রতিনিধিস্বরূপ। রাজাও তদ্রূপ প্রজাদের শাসন ও ধনমান প্রাণরক্ষার জন্য রাজাধিরাজ বিশ্বরাজ পরমেশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ ও তাঁহা কর্তৃক নিযুক্ত, ধার্ম্মিক লোকেরা এরূপ বিশ্বাস করেন। জনক জননীর চরিত্রে শত দোষ ত্রুটি থাকিলেও তাহার আলোচনা না করিয়া সন্তান তাঁহাদিগকে ভক্তি করিবেন, এই বিধি; তদ্রূপ প্রজাগণ রাজাকে তাঁহার দোষ দুর্ব্বলতাসত্বে সর্ব্বদা ভক্তি করিবেন, তাঁহার বাধ্য থাকিবেন, রাজশক্তিকে সম্মান করিবেন, বিধাতার এই প্রকার বিধি। নানা প্রকার গুণসম্পন্ন প্রজা-হিতৈষী রাজা প্রজাবৃন্দের অশেষ ভক্তির পাত্র।

আমাদের পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানাস্পদ সম্রাট্‌কুমার যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ এবং যুবরাজপত্নী ভারতপরিদর্শনার্থ শুভাগমন করিয়াছেন, গত বারে আমরা পাঠিকাদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছি। গত ১৪ই পৌষ শুক্রবার অপরাহ্নে ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী এই কলিকাতা মহানগরীতে তাঁহাদের পদার্পণ হইয়াছে। রাজধানীর প্রজাবর্গ তাঁহাদিগকে মহাসমারোহ ও আদর শ্রদ্ধাসহকারে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের শুভাগমনজন্য কয়েক দিন রাজধানীতে আনন্দোৎসব হইয়াছে। মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদের অশেষ আদর ও প্রেমাস্পদ যুবরাজ এবং মহামান্যা যুবরাজপত্নীকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন। তাঁহাদের শুভাগমনে ভারতের কল্যাণ হউক। মহিলা তাঁহাদিগকে গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদান ও মঙ্গলময় ঈশ্বরের নিকটে তাঁহাদের কল্যাণকামনা করিতেছেন।

যুবরাজ ও যুবরাজ-পত্নীর শুভাগমন।

যুবরাজ জর্জ আলবার্ট আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, সুতরাং দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ পদে বৃত হইয়াছেন। রাজকুমার জর্জ আলবার্ট ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে টেকের রাজকুমারী ভিক্‌টোরিয়া মেরিমেকে বিবাহ করিয়াছেন। রাজকুমারের এক্ষণ প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম, এবং তাঁহার মহিষীর প্রায় ৩৮ বৎসর বয়স হইয়াছে। তাঁহাদের তিন পুত্র ও এক কন্যা।

প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল তদানীন্তন প্রিন্সঅব্‌ওয়েলস্ আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড ভারতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। এবার তাঁহার পুত্র ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী যুবরাজ সস্ত্রীক এদেশে পদার্পণ করিলেন। আমরা সাদরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করি, এবং ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি যে, তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাটের মস্তকে শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

বিগত ২৩শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ভারতের অন্যতর প্রধান নগর বম্বাইয়ে রাজকুমার সস্ত্রীক পদার্পণ করিয়াছিলেন। প্রথম দিনের অভ্যর্থনাসভাতে তিনি অতিশয় সহৃদয়তা, সৌজন্য ও বাৎসল্য সহকারে অভিনন্দনপত্রের প্রত্যুত্তর দান করিয়াছেন। বোম্বাই, ইন্দোর, জয়পুর, লাহোর, পেশওয়ার, দিল্লি, আগ্রা, গোয়ালিয়ার, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি ভারতের প্রধান ও প্রাচীন নগরসকল দর্শন পরিভ্রমণ করিয়া বিগত ২৯শে ডিসেম্বর তাঁহারা ভারতের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য মহানগরীতে বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। হাওড়া ষ্টেশনে রেলওয়েযোগে উপস্থিত হইয়া ষ্টীমারে তাঁহারা প্রিন্সেপ ঘাটে উপস্থিত হন। প্রিন্সেপ ঘাটে অতি সমারোহসহকারে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির পক্ষ হইতে সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। তৎপর পদাতিক সৈন্য, অশ্বারোহী সৈন্য প্রভৃতি রাজকীয় সৈন্যগণের অতি বৃহৎ ও দীর্ঘ প্রসেশন বাহির হয়, এবং মহাসমারোহসহকারে রাজকুমার সস্ত্রীক গভর্ণমেণ্ট হাউসনামক রাজপ্রাসাদে উপনীত হন। তাঁহাদের গন্তব্য পথের দুই ধারে দর্শকদের জন্য গ্যালারী ও মঞ্চ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুই পার্শ্বে অগণ্য জনমণ্ডলী সমবেত হইয়া রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছে। সুবিস্তৃত ময়দানের সর্ব্বত্র মানুষের মস্তক ভিন্ন অপর কিছু প্রায় দৃষ্ট হয় নাই। এরূপ বিশাল জনসমুদ্র কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। সায়ংকালে রাজপ্রাসাদে লেভি হইয়াছিল। ৩০শে ডিসেম্বর প্রাতে যুবরাজ রাজকীয় কিংস্ ওউন রেজীমেণ্টে নিশান দান করেন, অপরাহ্নে ঘোড়দৌড় দর্শন করেন, রজনীতে বাঙ্গালিদের বেলভেডিয়ার প্রাসাদে ভোজন

করিয়াছেন। ৩১শে রবিবার পূর্ব্বাহ্নে সেণ্টপল গির্জ্জাতে উপাসনায় যোগদান করিয়া অপরাহ্নে ভাগীরথী বক্ষে বারাকপুর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

১লা জানুয়ারী প্রাতে রাজকীয় ঘোষণা-সূচক প্যারেড দর্শন, অপরাহ্নে ঘোড়দৌড় ও রজনীতে রাজকীয় ভোজ হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী ময়দানে সাধারণ অভ্যর্থনা সভা হইয়াছিল, হিন্দুশাস্ত্রানুরূপ ও কোরাণের বিধি অনুসারে ও কোন কোন প্রাচীন পদ্ধতিমতে অনুষ্ঠান সকল হইয়াছিল। সে দিন কুচবিহার মহারাজের উডল্যাণ্ডস্ ভবনে জলযোগ হয়। ৩রা জানুয়ারী গভর্ণমেণ্ট হাউসে উদ্যানসম্মিলন এবং রজনীতে প্রধান সেনাপতির গৃহে ভোজ হইয়াছিল। তৎপর রাজকুমার নগরের আলোকমালা দর্শনে বহির্গত হন। ময়দান, চৌরঙ্গি, ইসপ্লানেড, ডালহাউসী স্কোয়ার, চিৎপুররোড, হ্যারিসন রোড, ষ্ট্রেণ্ড প্রভৃতি রাজপথ সকল অতি অপূর্ব্ব আলোকমালাতে সজ্জিত হইয়াছিল। তাড়িৎ আলো, গ্যাস আলো এবং অপর নানাবিধ আলোকে গৃহ ও রাজবর্ত্ম সকল অতি মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছিল। ৪ঠা জানুয়ারী ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন ও ষ্টেট "বল" হয়। ৫ই শুক্রবার সিনেটগৃহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনসভাতে রাজকুমার ডি, এল, উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

দারভাঙ্গার মহারাজ এক লক্ষ টাকা ইচ্ছানুরূপ ব্যয় করিবার জন্য যুবরাজকে প্রদান করিয়াছিলেন। উহা হইতে ত্রিশ ৯০ সহস্র টাকা মেডিকল কলেজের উন্নতির জন্য এবং ১০ সহস্র টাকা লেডী ডফারিণ হাসপাতালের জন্য প্রদান করিয়াছেন। ৪ঠা তারিখ যুবরাজ মেডিকাল কলেজ এবং যুবরাজপত্নী লেডী ডফারিণ হাঁসপাতাল দর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সম্রাট্ যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন ভারতবর্ষ পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার শুভাগমন হইলে তখনও মহাসমারোহ হইয়াছিল। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ভারতের এক প্রান্ত হইতে কাশ্মীরের মহারাজ প্রভৃতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। মহানগরীর গৃহ অট্টালিকা সকল পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন ও চূণকাম করা হইয়াছিল। বাঙ্গালী পল্লীর ভিতর দিয়া প্রোসেশন বাহির হইয়াছিল। এবার সেরূপ হয় নাই। আলো ও বাজিতে প্রচুরার্থ ব্যয় হইয়াছে। যুবরাজ ও যুবরাজপত্নীর শুভাগমনোপলক্ষে গড়েরমাঠে কাঙ্গালী দিগকে ভোজ দিলে আনন্দের ব্যাপার হইত। রাজকুমার রাজকুমারপত্নীর অস্তুতে শুভাগমন করিলে কাশ্মিরের মহারাজ কাঙ্গালী ভোজন করাইয়াছিলেন। শুনিলাম গড়ের মাঠে দরবারের দিন, দরবারে উপস্থিত লোকদিগের জন্যে প্রায় দুই হাজার টাকার স্বদেশী উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন ক্রয় করা হইয়াছিল।

ভেলবিডিয়ার রাজপ্রাসাদে এক দিন মহিলাদের সম্মিলন হইয়াছিল, রাজকুমার-মহিষী উপস্থিত থাকিয়া বাঙ্গালী মহিলাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন। যুবরাজ ও যুবরাজপত্নী ভারতসাম্রাজ্যে ৪॥০ মাস স্থিতি করিবেন, তাঁহারা বর্ম্মাদেশে যাইতেছেন।

—

শিশুশিক্ষা ও জননী

শিশুশিক্ষাসম্বন্ধে জননীর দায়িত্ব অতি গুরুতর। আমরা ইহার গুরুত্ব তেমন উপলব্ধি করি না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের মহাপণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সরের মতে শিক্ষার অন্যতর উদ্দেশ্য সন্তানপালন উপযোগিতালাভ। তিনি আমোদ করিয়া বলিয়াছেন, যদি কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে অনেক শত বৎসর পরে ভবিষ্যদ্ বংশীয়দের নিকট আমাদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ে কেবল স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষার কাগজমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, এবং অন্য কোন প্রকারের ঐতিহাসিক নিদর্শন না থাকে, তাহা হইলে তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিবে, এই কি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের শিক্ষার ব্যবস্থা? বোধ হয় যেন এই সকল পাঠ্যগ্রন্থ চিরকৌমার ব্রতধারীদের জন্যই লিখিত; কারণ সন্তানপালনের শিক্ষাসম্বন্ধে কোন জ্ঞান বা উপদেশ তো ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, বাস্তবিক ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে? যাহারা ভবিষ্যদ্বংশের ভার মস্তকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইবে, তাহাদের শৈশবে শরীর, মন ও নীতির বিকাশের উপযোগিনী শিক্ষা পূর্ব্বে লাভ করা একান্ত আবশ্যক। মনে কর, দেহতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান বা নীতিশাস্ত্রসম্বন্ধে কোন শিক্ষা লাভ না করিয়া জননী তাঁহার প্রথম সন্তান লাভ করিলেন। নিরাশ্রয় শিশু মাতৃক্রোড়ে স্থাপিত, মাতৃযত্নে প্রতিপালিত, বর্দ্ধিত ও শাসিত হইতে চলিল, কিন্তু মাতা জানেন না যে, শিশুর শরীরের উপাদান কি, কিরূপে তাহা পরিপুষ্ট বা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, মনের শক্তি কিরূপে বিকশিত হয়, শরীরের সঙ্গে মনের কি সম্বন্ধ, নীতি কথায় না কার্য্যে, দৃষ্টান্তে না উপদেশে, শাসন কি প্রণালীতে পরিচালিত হওয়া উচিত, ইত্যাদি ইত্যাদি বহু বিষয়ে তিনি অনভিজ্ঞ। এই অবস্থায় ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অকাল মৃত্যু লক্ষ লক্ষ শিশুকে ধরা-ধাম হইতে অপসারিত করিতেছে, লক্ষ লক্ষকে যৌবনে পদার্পণ করিতে দিতেছে না, এবং যদিও মৃত্যুর হস্ত হইতে এড়াইতেছে কিন্তু লক্ষ লক্ষ রুগ্ন, বিকৃত কিংবা অকর্ম্মণ্য হইয়া জীবন-ভার বহন করিতেছে? মানব-সমাজের এই দুঃখরাশির জন্য কে দায়ী? অশিক্ষিত, অপ্রস্তুত ও অনুপযুক্ত পিতা মাতা, পিতা অপেক্ষা মাতা কি অধিক দায়ী নহেন? শারীর বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ডাক্তার যদি রোগীর ক্ষতস্থানে ছুরিকা প্রয়োগ করিতে চায়, তাহাতে আমরা যদি আশ্চর্য্য হই, তবে অনভিজ্ঞা জননী শিশুপালনের ভার গ্রহণ করিতে গেলে কেন আশ্চর্য্য হই না? শিশুপ্রকৃতি কি এমনই সহজ জিনিষ যে, হাতুড়ের হাতে সমর্পণ করা যায়? তোমার ছেলেটি খুব সতেজ ও বুদ্ধিমান্, পড়া শুনায় মনোযোগী, বৎসরের পর বৎসর তোমার আনন্দবর্দ্ধন করিয়া উন্নতি লাভ করিতেছে, হঠাৎ একদিন জ্বরবিকারে সে অকালে তোমায় দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেল, তোমার কোমল প্রাণে প্রথম শেল বিদ্ধ করিল তোমার শরীর মন ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু তুমি হয়ত অতি-

রিক্ত মানসিক পরিশ্রম হইতে তাহাকে নিবারণ না করিয়া উৎসাহ দান করিয়াছিলে; শীঘ্র শীঘ্র তাহার উন্নতি দর্শন করিবার প্রত্যাশায় শরীর ও মনের বিকাশ সমভাবে লাভ করিবার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন মনে কর নাই। সেই জন্য তাহার স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ঘটিল। এই রূপ শত শত দুর্ঘটনা যে অহরহ ঘটিতেছে, জননীরা কি তাহার মধ্যে আপনাদের অপরাধের পরিসীমা করিতে পারিতেছেন? তখন এই আপসোশ করিলে কি হইবে? আমারত কপাল ভাঙ্গিল, হায় হায়! আমি কেন শরীরতত্ত্ব শিক্ষা না করিয়া অনাবশ্যকীয় বিদ্যা শিক্ষায়, কবিতা আবৃত্তি ও রচনাপ্রভৃতিতে বাল্যযৌবনে সময় নষ্ট করিয়াছিলাম। গাড়ীর কোচম্যান শিক্ষালাভ না করিয়া ঘোড়ার রাস ধারণ করে না, নাবিক নৌবিদ্যা শিক্ষা না করিয়া নৌকার ক্ষেপণীতে হাত দেয় না, মনুষ্য শিশু কি এমনই যাহা তাহা একটা জিনিষ যে, তাহার প্রকৃতি ও শরীরাদিবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া তাহা পরিচালনের ভার গ্রহণ করা যায়?

শিশুর শরীর ও মনের তত্ত্ব অবধারণ করিবার জন্য বর্ত্তমান যুগে কত বিচার ও আন্দোলন হইতেছে, তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। যীশু একদিন শিশুকে আদর ও সম্মান দেখাইয়া ছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্ আজ পাশ্চাত্য জগতে শিশুতত্ত্বলাভের জন্য তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িতেছে। শিশুরচরিত্রপাঠে কৌশল লাভ করিবার জন্য নানা বিদ্যালয় ও সমিতি গঠিত হইয়াছে।

লণ্ডনের ডাক্তার ফ্রান্সিস ওয়ার্ণার নাকি এক লক্ষের অধিক শিশুর শরীর ও মনের তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর দোষে ও শিশুদিগের প্রতি মনোযোগের অভাবে তাহাদের অধিকাংশের স্নায়বিক বিকার ঘটিতেছে। এই জন্য বিলাতের শিক্ষাবিভাগ, বিদ্যালয়ের শিশুদিগের শরীর পরীক্ষার জন্য নানা স্থানে ডাক্তারনিয়োগের ব্যবস্থা করিতেছেন। কোন কোন বিদ্যালয়ে শিশুদের দৈহিক ভারের ওজন, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি নিয়মিত সময়ে লওয়া হয়; ডাক্তার তাহাদের চক্ষু, দন্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করেন। রুগ্ন শিশুদের উপর পাঠের ভার লঘু করা হয়। শিশুশ্রেণীতে পাঁচ বৎসরে ন্যূনবয়স্ক বালকদের ভর্ত্তি করানিবারণের চেষ্টা হইতেছে। কিছু দিন হইল কতিপয় লোকের ধারণা হয় যে, ইংরেজ জাতির দৈহিক অবনতি ঘটিতেছে, অমনি তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য কমিশন বসিয়া গেল। তাহাদের নির্দ্ধারণের ফলে এই দেখা গেল যে, বাল্যকালে বিদ্যালয়ে যে শারীরিক অবনতি ঘটে তাহা দ্বারাই জাতীয় শারীরিক দুর্ব্বলতা ঘটিতেছে। সুতরাং ব্যবস্থা হইতে লাগিল, বিদ্যালয়ে ডাক্তার দ্বারা শিশুদের নিয়মিতরূপে পরীক্ষা করান, যে সকল বিদ্যালয়ে পাঁচ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক শিশুদিগকে শিক্ষা দান করে, তাহাদের অর্থসাহায্য হ্রাস করা, এবং দরিদ্রশ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্ষুধার্ত্ত বালক বালিকাদের জন্য ভোজনের বন্দোবস্ত করা। এই শেষোক্ত নিয়ম এখনও

পার্লেমেণ্টে মঞ্জুর হয় নাই, কিন্তু উহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা হইতেছে। আর আমাদের দেশে শিশুদের আহার ভালরূপ হউক আর না হউক, তাহাদের পড়ার বন্দোবস্তের জন্য পিতামাতা অধিক ব্যস্ত। পাঁচ ঘণ্টা স্কুলে খাটিয়া আসার পরও গৃহে আরো পাঁচ ঘণ্টা কিসে গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখা যাইতে পারে, কিসে ক্রীড়ার সময় কমাইয়া পড়ার সময় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, কিসে ১৫ বৎসর পূর্ণ না হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে,ইত্যাদি বিষয়ে পিতা যেমন মাতাও তেমন আগ্রহান্বিত। ইংরেজেরা বলেন, ভারতবর্ষে শিশু ও যুবকদের পরিপক্কতা তাঁহাদের সঙ্গে তুলনায় ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে জন্মে। যদি ইহা আমাদের নিজেদের দ্বারা ঘটে তাহা হইলে অকালক্ষয়ও অনেক বৎসর পূর্ব্বে ঘটে। মোটের উপর লাভ অপেক্ষা লোকসানই অধিক।

শৈশবে শিশুদের শিক্ষা যে হয় না তাহা মনে করা বড় ভুল। তাড়াতাড়ি বর্ণমালা পুস্তক তাহাদের হস্তে না দিলেই কি নয়? স্ব স্ব চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া জড়জগতের ও মানবরাজ্যের কত তত্ত্ব তাহারা আপনা আপনি সংগ্রহ করিতেছে। সাক্ষাৎ দর্শন ও পর্য্যালোচনা দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তাহার সঙ্গে কি পুস্তকলব্ধ জ্ঞানের তুলনা হইতে পারে? নিজ পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপরে যদি পুস্তকে সঞ্চিত জ্ঞান দণ্ডায়মান হইতে পারে, তবে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের দেশে মুখস্থ বিদ্যার এত প্রাধান্য যে, এতদ্দেশের শিক্ষিত লোকেরা কার্য্যক্ষেত্রে বুদ্ধি খাটাইয়া কোন কাজ করিতে বড় একটা সক্ষম নহেন। এই জন্যই পাশ্চাত্য জাতি বুদ্ধি কৌশলে আমাদিগকে পরাস্ত করিতেছে; কল কৌশলে আমরা তাঁহাদের নিকট হার মানিতেছি। এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে জননীগণ যেন সাবধান হন, শিশুদিগকে অকালপক্ব করিবার যেন প্রয়াস না পান। ইউরোপ ও আমেরিকায় যে, সকল শিশু প্রকৃতি পর্য্যালোচনার বিদ্যালয় ও সমিতি রহিয়াছে; যুবক যুবতীদের বাল্যকালের স্মৃতি বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিয়া এবং শিশুদিগকে পর্য্যালোচনা করিয়া যে সকল মীমাংসা স্থির হইয়াছে, এই সমুদায়ের ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, অনভিজ্ঞা জননী ও শিক্ষকদিগের হস্তে পড়িয়া শিশুরা বড়ই বিড়ম্বিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। অনেক সময় তাহাদের উপর অযথা অত্যাচার উৎপীড়ন হইতেছে। যেরূপ শাসন বা শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে, তাহা তাহাদের উপর চাপান হইতেছে। যে সকল কাজ তাহারা স্বপ্রবৃত্ত হইয়া করে, তাহার অধিকাংশই পিতা মাতার চক্ষে অন্যায় কিংবা অপকর্ম্ম হইলেও কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অতি শাসনে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বিকৃতি ঘটিতেছে, ইত্যাদি। পক্ষান্তরে শিক্ষা চিত্তাকর্ষক ও আনন্দজনক করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। কঠোর প্রকৃতি পুরুষে হস্তে বেত্রঘাত, রোষকষায়িত নেত্র, ধমক গালাগালি প্রভৃতির স্থানে এক্ষণ

কোমলপ্রকৃতি নারীর সস্নেহ সম্ভাষণ, মনোহর উপকরণ,গল্প, খেলা, সঙ্গীত, বাদ্য, অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদি অধিকার বিস্তার করিতেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-দানের ভার একমাত্র নারীদিগের উপরই ন্যস্ত। তাঁহারা যথারীতি কলেজে শিক্ষা-প্রণালীতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া এই সকল কার্য্যভার পরিচালন করিতেছেন। এই সমস্ত ট্রেণিং কলেজের বিগত বার্ষিক পরীক্ষার ফল দৃষ্টি করিয়া জানা গেল পুরুষ দের জন্য ১২টি কলেজ, কিন্তু নারীদের জন্য ১৭টি কলেজ ইংলণ্ডে বিদ্যমান। এই সকল বিদ্যালয় হইতে শত শত শিক্ষয়িত্রী বৎসর বৎসর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন।

কথা প্রসঙ্গে অনেক আবান্তরিক বিষয় আসিয়া উপস্থিত হইল শিশু-শিক্ষার জন্য জননীদের কি কি বিষয় জানা ও শিক্ষা লভ প্রয়োজন এখন আলোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যেমন আপন শরীরের গঠন ও পোষণপ্রণালী প্রভৃতির স্থূল মর্ম্ম অবগত হওয়া সুস্থ থাকিবার পক্ষে প্রয়োজন। তদ্রূপ প্রত্যেক পিতা ও মাতার পক্ষেও শারীরতত্ব শিক্ষালাভ করা প্রয়োজন, ত্বক্, অস্থি, ও আভ্যন্তরীন যন্ত্র সমূহ—যথা, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক ইত্যাদির গঠনপ্রণালী ও ক্রিয়া, শ্বাস প্রশ্বাস ও রক্তসঞ্চালন, আহার, পরিশ্রম, স্নান, মলমূত্র পরিত্যাগ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে আবশ্যকীয় জ্ঞান লাভ জননীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। ২য়তঃ স্বাস্থ্যরক্ষাসম্বন্ধে উপদেশ ;—জল, বায়ু আহার্য্য, পরিশ্রম, নিদ্রা, পরিচ্ছদ, গৃহনির্ম্মাণ ও পরিষ্কার, পয়ঃপ্রণালী, আবর্জ্জনা ও সংক্রামক রোগ ইত্যাদি বহু বিষয়ে স্থূল স্থূল জ্ঞান লাভ করা একান্ত প্রয়োজন।

মহিলা।

পৃথিবীতে যেমন দুই তৃতীয়াংশ জল এবং এক তৃতীয়াংশ স্থল, তেমনি ভাবে গণনা করিলে মানবসমাজে নারীর প্রভাব দুই তৃতীয়াংশ এবং পুরুষের প্রভাব এক তৃতীয়াংশমাত্র। বৃক্ষের মূল যেমন মৃত্তিকার ভিতরে প্রোথিত থাকিয়া নীরবে অদৃশ্যভাবে বৃক্ষকে জীবিত রাখে ও পরিপুষ্ট করে, ধূমযানের ধূম যেমন শকট পরিচালিত করে, তেমনি নারীগণ মানবসমাজে শক্তি সঞ্চালন করিয়া সমাজকে সঞ্জীবিত, পরিপুষ্ট ও পরিচালিত করিয়া থাকেন। এজন্য হিন্দু শাস্ত্রকারগণ নারীকে শক্তিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মাতা, পত্নী, কন্যা, ভগ্নী, ধাত্রী, শিক্ষয়িত্রী, পরিচারিকা প্রভৃতি বিবিধ বেশে নারী সমাজের সেবা ও শাসন করিয়া আসিতেছেন। এই মহাশক্তিকে কে তুচ্ছ করিতে পারে? কে এই দুর্জ্জয় প্রভাবকে প্রতিরোধ করিবে? এই শক্তি যত উন্নত মার্জ্জিত হইবে ততই মানবজাতি অধিকতর উন্নতি হইতে উন্নতির অবস্থায় উত্থিত হইবে,যতই হীন অমার্জ্জিত হইবে ততই মানবসমাজ অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। আর্য্যগণ বলিয়া-

ছেন, "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" পৃথিবীর ইতিহাস এই মহাসত্যের অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন করে। এক জন চিন্তাশীল লেখক বলিয়াছেন, "কোন দেশের নারীজাতির অবস্থা আমাকে বলিয়া দাও, আমি সেই দেশ সভ্যতার কোন্ সোপানে স্থিতি করে বলিয়া দিতেছি।" ভারতের অবস্থা যে এ প্রকার হীন, তাহার কারণ নারীজাতির শিক্ষার অভাব ও দুর্গতি। মোসলমানসমাজের অনুন্নত অবস্থা নারীজাতির অবরোধ প্রথার অনিবার্য্য ফল। ইউরোপ এবং আমেরিকা যে সভ্যতার অত্যুচ্চ অবস্থায় উত্থান করিয়াছে, এবং দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার অন্যতর কারণ নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা। সুশিক্ষিতা ধর্ম্মপরায়ণা সতী নারীর প্রভাবে গৃহ স্বর্গধাম হয়, পুত্র কন্যাগণ নন্দনকাননের কল্পতরুস্বরূপ প্রস্তুত হয়, ভ্রাতা ভগ্নী দাস দাসী সকলে আনন্দ শান্তি সম্ভোগ করে, দেশের মুখ সমুজ্জ্বল হয়, জগতে সুখী পরিবার স্থাপিত হয়। পুরুষ রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতে পারেন, কিন্তু পরিবারের মধ্যে সুকঠিন শাসনভার একমাত্র নারীর হস্তেই অর্পিত। যে গৃহের কর্ত্রী সাধ্বী নারী, সেই গৃহে ধর্ম্মবীর, কবি, দার্শনিক, যোদ্ধা, রাজনীতিজ্ঞ, সাহিত্যসেবক, ধর্ম্মযোদ্ধা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, পৃথিবীতে কেহই মহাগুণশালী হইতে পারে না, যাহার জননী মহাগুণসম্পন্না নহে। বাস্তবিক এই কথা সম্পূর্ণ সত্য, ইতিহাস ইহার সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছে। সতী সুশিক্ষিতা ধর্ম্মপরায়ণা নারীর সংখ্যা দেশে যতই বৃদ্ধি হয় ততই দেশের মঙ্গল। ইহাদের জীবনপ্রভাব দেশময় বিস্তৃত হওয়া কর্ত্তব্য, এবং যাহাতে ভারতের সকল শ্রেণীর মহিলাগণ খ্যাতনামা সতী সাধ্বী রমণীদিগের আদর্শে জীবন গঠন করিতে পারেন, তজ্জন্য প্রত্যেকের যত্ন করা সমুচিত। এই উদ্দেশ্যে আমরা আদর্শস্থানীয়া নারীদিগের জীবন মহিলার পাঠিকাবর্গকে ক্রমশঃ উপহার প্রদান করিব। ভরসা করি ইহা মনোযোগের সহিত অধীত হইবে ও আদর্শ গুলি জীবনে গৃহীত হইবে।

কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।

ইংলণ্ডের অলোকসামান্য সভ্যতা এবং প্রভুত্বের মূলে ইংরেজ-রমণীর প্রভাব সামান্য নহে। ইংলণ্ডের রিডলি ল্যাটিমার হাওয়ার্ড ও উইলবার ফোরস, সেক্স্পিয়ার মিল্টন, বার্ক, সেরিডন, নেলছন ওয়েলিংটন প্রভৃতি যেমন জগতের সম্মানভাজন, ফ্লোরেন্স, নাইটিঙ্গেল ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া প্রভৃতি অসামান্যা রমণীগণও তেমনি জগৎপূজ্যা। যদি ইংলণ্ডের প্রতিভাশালী পুরুষদিগের জন্য আমরা তাহাকে ভীতি-মিশ্রিত সম্মানদান করি, তবে তাহার সতীসাধ্বী সেবাপরায়ণা মহিলাদিগের জন্যও আমরা তাহাকে সরল প্রাণে ভক্তি করিয়া থাকি। ইংলণ্ড হইতে তাহার পুণ্যশ্লোকা মহিলাদিগকে

বর্জ্জন কর, ইংলণ্ড মনুষ্যবাসের অযোগ্য শ্বাপদপূর্ণ অরণ্যে পরিণত হইবে। ইংলণ্ডের প্রাণস্বরূপা ললামভূতা এই নারীকুলের মধ্যে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গিল সর্ব্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। কহিনুর যেমন ইংলণ্ডের রাজমুকুটের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে, এই কুমারীর আশ্চর্য্য চরিত্র তেমনি সমস্ত ইংলণ্ডের মুখ সমুজ্জ্বল করিয়াছে। ইঁহার চরিত্র ভাগবতস্বরূপ, ইহাপাঠে জীবন উন্নত হয়, ধর্ম্মভাব প্রাণে সঞ্চারিত হয়, জীব-দুঃখে প্রাণ বিগলিত হয়, এবং জীবের সেবার জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা জন্মে। ভক্তির সহিত এই জীবনী প্রত্যেকের অধ্যয়ন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ইঁহার পিতা উইলিয়মসোর নাইটিঙ্গেল ইংলণ্ডের এক জন অত্যন্ত ধনী জমিদার ছিলেন। তাঁহার দুইটী কন্যা ছিল, তন্মধ্যে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল কনিষ্ঠা ছিলেন। ইটালীর অন্তর্গত ফ্লোরেন্সনগরে ইঁহার জন্ম হয়, তান্নমিত্ত ফ্লোরেন্স নাম ইঁহার নামের সঙ্গে সংযুক্ত কয়া হইয়াছে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। লিহারষ্ট-নামক স্থানে ইঁহার বাল্য জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। এখানেই ইঁহার দয়াপ্রবণ হৃদয়ে জীবের প্রতি প্রেম এবং পরদুঃখে সহানুভূতি বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ফ্লোরেন্স নাইটীঙ্গেল যখন অতি শিশু বালিকা ছিলেন, তখন হইতেই পরের উপকার, দুঃখীর দুঃখমোচন করার প্রবৃত্তি তাঁহার প্রবল ছিল। কিসে অন্যকে সুখী করিবেন, কিরূপে অপরের সাহায্য করিবেন, এইটি যেন তাঁহার প্রাণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। ইতর প্রাণীদিগকেও তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তাহারা নির্ভয়ে তাঁহার নিকটে আসিত; তাঁহাদের একটি বৃদ্ধ ঘোটক ছিল, সে আর কার্য্যের উপযোগী ছিল না, কিন্তু ফ্লোরেন্স তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও আদর করিতেন। ঘোড়াটি তাঁহার পকেটে মুখ দিয়া রুটী বাহির করিয়া খাইত, দুজনের মধ্যে এমনি সখ্য ভাব ছিল।

এক জন বৃদ্ধ পাদরী ফ্লোরেন্স নাইটীঙ্গেলকে বড়ই ভাল বাসিতেন। তিনি এই বালিকাকে সঙ্গে করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন। পাদরী মহোদয় বেশ দয়ালু ছিলেন, এবং চিকিৎসাও জানিতেন। এই রূপ ভ্রমণকালে ফ্লোরেন্স ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধিয়া নানা প্রকার খেলনা ও খাদ্য সামগ্রী লইয়া যাইতেন, এবং তাহা পীড়িত ও দীনদুঃখী বালকবালিকাদিগের মধ্যে বিতরণ করিতেন। তিনি এই বাল্য বয়সেই রোগীদিগের শুশ্রূষা কার্য্যে সাহায্য করিতেন। তাঁহার পিতার এক জন বৃদ্ধ মেষ-পালক ছিল। তাহার একটি প্রিয় কুকুর ছিল, কুকুরটী অতি আশ্চার্য্য ভাবে মেষ গুলি রক্ষা কারত, এবং তদ্দ্বারা বৃদ্ধ মেষ রক্ষকের প্রচুর সাহায্য হইত। একটি দুষ্ট বালক এক দিন ঢেলা মারিয়া কুকুরটিকে আহত করে, তজ্জন্য সে পীড়িত হইয়া পড়ে, আর মেষরক্ষা করিতে পারে না। বালিকা এবং বৃদ্ধ পাদরী অশ্বারোহণে তথায় গিয়া মেষ-রক্ষককে বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কুকুর কোথায়?" সে

শোকাশ্রু নয়নে বলিল, "একটি দুষ্ট বালক তাহার পা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, আমি আর তাহাকে প্রতিপালন করিতে পারিব না, তাহাকে মারিয়া ফেলিব।" ইহা শুনিয়া তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত হইলেন। পাদরী মহোদয়কে লইয়া বালিকা কুকুরের নিকটে গেলেন, কুকুরের পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ঔষধ দিলেন; ভগবানের কৃপায় কয়েক দিনের পর কুকুরটি আরোগ্যলাভ করিল, এবং বৃদ্ধ মেষরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইল। ইহাতে বৃদ্ধের মনে কত আনন্দ! ধন্য কুমারি! ধন্য তোমার দয়া!

কুমারা নাইটীঙ্গেল চিরদিন ইতর প্রাণী দিগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। বহু বৎসর পরে যখন তাঁহার যশসৌরভ সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয় তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "ক্ষুদ্র প্রিয় জন্তু রোগীদিগের বিশেষতঃ প্রাচীন পীড়ায় আক্রান্ত লোক দিগের অতি সুখময় সঙ্গী হইয়া থাকে। এক জন পীড়িত ব্যক্তি তাহার সেবা শুশ্রূষার কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, "একজন শুশ্রূষাকারিণী এবং একটি কুকুর, ইহার মধ্যে আমি কুকুরকে শ্রেষ্ঠ সঙ্গী বলিয়া মনে করি।" ভারতের ইতর জন্তু গুলি বড়ই অনাদৃত! যে কুকুর ইউরোপ প্রভৃতি স্থানে মনুষ্যের কত সেবার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, এই বঙ্গদেশ তাহার দুর্দ্দশার একশেষ। গো মহিষ অশ্বাদি গৃহপালিত পশুর অবস্থাও অধিক উন্নত নহে। ইতর প্রাণিগণ দেশের মূল্যবান সম্পত্তি, মনুষ্যের অতি হিতকারী, কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, ইহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ এবং ইহাদের অবস্থা উন্নত করার জন্য এপর্য্যন্ত এদেশের কাহারও দৃষ্টি পতিত হয় নাই।

কুমারী নাইটীঙ্গেলের পিতা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে উন্নত মত পোষণ করিতেন। তিনি তাঁহার কন্যাকে গণিত, ইতিহাস, গ্রীক লাটিন ও আধুনিক ভাষা প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। কুমারী সঙ্গীত বিদ্যা ও শিল্প কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত কালে যখন তিনি রোগী ও আহত সৈন্যদিগের শুশ্রূষা কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, তখন এই সুকুমার বিদ্যা তাঁহার অত্যন্ত উপকারে আসিয়াছিল। বাল্যাবধি কুমারীর প্রাণে এই ভাব প্রবল ছিল যে, মঙ্গলময় ঈশ্বর পৃথিবীতে যাহাকে যে বিশেষ কার্য্যে প্রেরণ করেন, তাহার হৃদয়ে সেই কার্য্যসাধনের উপযোগী সদ্গুণ ফলের বীজ বপন করিয়া থাকেন। পরসেবায় প্রবৃত্তি এবং পরশুভাকাঙ্ক্ষা তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল। তিনি অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও মনোযোগের সহিত কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেন। যে কার্য্য তাঁহার কর্ত্তব্য, সর্ব্বোত্তম এবং পবিত্র, তাহাতেই তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন, তাঁহার কর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া কত লোক তাঁহার অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন।

(ক্রমশঃ)

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

হিমাচল-শিমলা শৈল।

আমরা বিগত ৭ই জ্যৈষ্ঠ হিমাচল-শৃঙ্গ শিমলা শৈলে পঁহুছিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের আবাসে যাইয়া আতিথ্যগ্রহণপূর্ব্বক স্থিতি করি।

সেখানে যেরূপ শীত ভোগ করা যাইবে ভাবা গিয়াছিল, তখন সেরূপ শীত কিছুই অনুভব হইতেছিল না। সামান্য রেপার বা বালাপোষের আচ্ছাদনে রাত্রি যাপন করা যাইতেছিল। সেপ্রকার আচ্ছাদনেরও তত প্রয়োজনবোধ হইতেছিল না। সকলেই বলিতেছিলেন, শিমলাপাহাড়ে এরূপ গরম আর কখনও দেখা যায় নাই। তখন রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন মহোদয় শীতাভাবজন্য কষ্ট বোধ করিয়া শিমলার রাজপ্রাসাদ হইতে ৮ মাইল দূরে অন্য উচ্চতর শিখরে যাইয়া স্থিতি করিতেছিলেন। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ভীষণ ভূমিকম্পে কাঙ্গড়া প্রদেশে সহস্র সহস্র গৃহ অট্টালিকা চূর্ণ এবং বহু সহস্র লোক হতাহত হইয়াছিল, সেই ভূকম্পন শিমলা শৈলকেও কম্পিত করিয়াছিল। শিমলা পাহাড়ে তখনও প্রতিদিন দুই এক বার ঈষৎ কম্পন অনুভব হইতেছিল।

পরদিন প্রাতঃকালে হিমালয়ব্রহ্মমন্দির দর্শন করিতে যাওয়া হয়। আমরা বড় শিমলানামক স্থানে ছিলাম, সেই স্থান হইতে ব্রহ্মমন্দির অর্দ্ধ মাইলের অধিক দূরে নহে। কিন্তু গমনাগমনের পথ অত্যন্ত অসমতল। কুচবিহারমহারাণীর অর্থ সাহায্যে এবং অপর অনেক লোকের যত্নে ও সাহায্যে শিমলার রমণীয় স্থানে হিমালয় ব্রহ্মমন্দিরনামক মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। মন্দির ও তাহার চারি দিকের প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিয়া হৃদয় পুলকিত হইয়াছিল। ঘনসন্নিবিষ্ট উত্তুঙ্গ পিলুপাদপশ্রেণী এবং স্বভাবজাত ও সযত্নসম্ভূত কুসুমিত গোলাবাদি ক্ষুদ্র তরুরাজি সেই স্থানের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। গবর্ণমেন্টের অনুমতি ব্যতীত শিমলা পহাড়ের একটি বৃক্ষ কেহই ছেদন করিতে পারে না। উক্ত ব্রহ্মমন্দিরের অন্তর্গত বহু দূর ব্যাপী স্থান। মন্দিরের পার্শ্বে অতিথিভবন (দ্বিতল গৃহ) বিদ্যমান। দুই এক জন ধর্ম্মসাধক সেই গৃহে সেই সুরম্য স্থানে অবস্থিতি করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে নির্জ্জন সাধন ভজন করিতে পারেন। সেই সময়ে পঞ্জাব ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতর সভ্য আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত লালা কাশীরামজি স্বীয় পুত্র কন্যাসহ স্থিতি করিতে ছিলেন। বহুকাল পরে তথায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি অত্যন্ত অনানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার আতিথ্যগ্রহণে তাঁহার সঙ্গে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই আমাদের অবস্থানের অন্যরূপ ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়া গেল। বহু অর্থব্যয়ে ও বহু যত্নে হিমালয় ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মোপাসক নাই। অনেক সময়ই মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা হয় না। গ্রীষ্মাদি ঋতুর ৬।৭ মাস শিমলাবাসের সময়। তখন লালা কাশীরাম নিজের দুই কন্যাকে সঙ্গে করিয়া এবং দুই এক জন বন্ধুকে ডাকিয়া আনিয়া প্রতিরবিবার অপরাহ্ণে সামাজিক উপাসনা করিয়া থাকেন। তিনি পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর আফিসের এক জন কর্ম্মচারী, যত দিন সেই আফিস শিমলাতে স্থিতি করে, তত

দিন তথায় তাঁহার স্থিতি। সম্প্রতি তিনি পেন্‌সন প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া থাকিবেন অতঃপর আর কি সম্বৎসরের কয়েক মাস নিয়মিত রূপে শিমলা শৈলে তাঁহার বাস করার সম্ভা বনা আছে?

আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ শ্রীমান্ করুণাচন্দ্রের ধর্ম্মপত্নী মোহিনী দেবী ১৮৯৪ সালে ৬ই মে ৩৪ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে শিমলা পর্ব্বতে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। হিমালয় ব্রহ্মমন্দিরের পার্শ্বে নিষ্কিন্নিম্ন স্থানে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাঁহার সুন্দর সমাধি বেদিকা স্থাপিত। মোহিনী দেবী আচার্য্যের দৈনিক প্রার্থনা সকল লিপিবদ্ধ করিয়া নববিধানসাধকমণ্ডলীর বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সেই প্রার্থনা বলী তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিস্বরূপ হইয়া আছে। তিনি অনেক সময় আচার্য্য ও আচার্য্যপত্নী সহ শিমলা শিখরে বাস করিয়াছেন। তাঁহাকর্ত্তৃক তাঁহার শেষ জীবনে পরিচারিকা পত্রিকা সম্পাদিত হইতেছিল। তিনি আর্য্যনারী সমাজের সম্পাদিকা ছিলেন। স্বর্গগত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কন্যানির্ব্বিশেষে তাঁহাকে স্নেহ করিয়া ছিলেন, এবং যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছিলেন। নানা সদ্‌গুণের জন্য মোহিনী দেবী সকলের আদরণীয়া ছিলেন। এরূপ গুণবতী কন্যা বিরল।

ছোট শিমলাতে তারাবিয়ুনামক ভবনে শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন রুগ্নাবস্থায় শেষ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। গুরুতর পীড়ার সময় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি ইংরাজি ভাষায় নবসংহিতা এবং যোগবিজ্ঞাননামক দুই খানা অমূল্য পুস্তক সেখানে থাকিতেই রচনা করিয়াছিলেন। আচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র সেন তারাবিয়ু ভবন ক্রয় করিয়া রাখিয়াছেন। উহা শ্রীমদাচার্য্যের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ হইয়া আছে। বন্ধুবর কাশীরাম তাহা দর্শন করিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ন্যূনাধিক এক মাইল পার্ব্বত্য অসমতল পথ পদ ব্রজে অতিক্রম করিয়া তথায় যাওয়া আমাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়াছিল। রিক্‌সার অনুসন্ধান করা গিয়াছিল। সে দিন ঘোড় দৌড় ছিল, সকল সাহেব মেম তাহাতে মত্ত ছিলেন। ঘোড়দৌড়-ক্ষেত্রে যাইবার জন্য সমুদয় রিক্‌সা তাঁহারাই ভাড়া করিয়াছিলেন। হিমালচচূড়ায় ঘোড়দৌড়! যোগভূমি অত্যুচ্চ হিমালয়শিখরে সুসভ্য পাশ্চাত্য নবীন যোগীদিগের ইহাই নবীন যোগসাধন! রিক্‌সার অভাবে আমরা সে দিন তারাভিয়ু দর্শনার্থ গমনে অসমর্থ হইয়াছিলাম। পরে আর সময় হইয়া উঠে নাই, এক দিন অন্তরই শিমলা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। শিমলা পর্ব্বতে দূরে গমনাগমনের জন্য রিক্‌সাযানই দুর্ব্বল লোকদিগের প্রধান অবলম্বন। আরোহী সহ উক্ত যান ৩।৪ জন কুলি ঠেলিয়া টানিয়া লইয়া যায়। অন্য উচ্চ পাহাড়ে যেমন আরোহণের জন্য ঝাঁপান ও ডাণ্ডি সচরাচর পাওয়া যায়। শিম্‌লাতে তাহা সুলভ নহে।

গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে

বহু দূর পর্য্যন্ত একটি সমতল প্রশস্ত রাজবর্ত্ম বিস্তৃত। সেই পথ সর্ব্বোচ্চ। গভর্ণর জেনারেলের, পঞ্জাবের লেপ্টন্যাণ্ট গবর্ণরের এবং প্রধান সেনাপতির অশ্বশকটমাত্র উক্ত পথে চালিত হয়। অন্য কোন ঘোড়ার গাড়ী চালাইবার হুকুম নাই। অপরাহ্নে সাহেব বিবী দলে দলে সেই রাজপথে ভ্রমণ করিতে বাহির হন। ৩টার পর হইতে ছিন্ন ও মলিন বস্ত্রধারী কুলি মজুরদিগের সেই পথে বাহির হওয়া নিষেধ। সেই রাজবর্ত্ম হইতে সুদূরে উত্তর প্রান্তে শুভ্র স্ফটিকনিভ চির হিমানী-রঞ্জিত গগনস্পর্শী শিখর গিরিশ্রেণী নয়ন গোচর হয়। কত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া হিমালয়চূড়ায় ইতস্ততঃ শত শত বর্ত্ম প্রসারিত করা হইয়াছে! অসাধ্য সাধন! শিম্‌লাতে নির্ঝর অধিক দৃষ্ট হয় না। কিন্তু প্রত্যেক ভদ্রলোকের বাড়ীতে উপর ও নীচে নির্ম্মল নির্ঝরজলের অভাব নাই।

শিমলায় ইংরাজ বণিক্‌দিগের বিপণি-শ্রেণী মহাসমৃদ্ধিশালিনী। দেশীয় বাজারও বহু বিস্তৃত। পাহাড়িয়া নারী সকল অতিশয় ভূষণপ্রিয়া। বাজারে অলঙ্কার বিক্রয়ের দোকান অল্প নয়। পার্ব্বত্য নারীদিগের আদরের নানা আকারের রজতাভরণে বহু বিপণি পূর্ণ। মরি ও নৈনিতাল পর্ব্বতে বাঙ্গালি অধিবাসীদিগের খাদ্যাদির অপ্রতুলতা। শিমলা শৈলে সেরূপ নয়, এখানে মাছ তরকারী যথেষ্ট পাওয়া যায়। সচরাচর অপরাহ্নে দেখা যায় যে, আফিসের ফেরত বাঙ্গালী বাবুরা বাজারে যাইয়া তাঁহাদের প্রিয় খাদ্য ইলিস মৎস্য খরিদ করেন, এবং তাহা হাতে করিয়া আনন্দমনে গৃহাভিমুখে চলিয়া যান। বঙ্গদেশ হইতে মৎস্যপুঞ্জ বরফের বাক্সে পুরিয়া ট্রেণে শিম্‌লায় চালান হয়, তাহাতে মাছ পচিতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বঙ্গ দেশের প্রধান২ আফিস ৮মাসের জন্য শিম্‌লায় উঠিয়া আইসে, সুতরাং সেই সকল আফিস-সংক্রান্ত সমুদায় বঙ্গালী কর্ম্মচারীকে ৮মাস কাল শিমলা পর্ব্বতে বাস করিতে হয়, তজ্জন্য সে খানে বহু বাঙ্গালী বাবুর স্থিতি। কিন্তু গ্রীষ্ম কালে ও শরৎকালে যেমন আমোদ উল্লাস করিয়া বেড়াইবার জন্য দলে দলে বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষ দার্জ্জিলিং পাহাড়ে যাইয়া স্থিতি করেন, দূরতাপ্রযুক্ত ও বহুব্যয় ও কষ্টসাধ্য বলিয়া হউক শিম্‌লা পর্ব্বতে কেবল আমোদ প্রমোদের জন্য প্রায় কোন বাঙ্গালী স্ত্রী বা পুরুষ গমন করেন না। হিন্দুস্থানী ও পঞ্জাবী লোকদিগের তত আমোদস্পৃহা নাই। তবে নানা স্থান হইতে অনেক রাজা মহারাজ বড়লাট বাহাদুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিবার জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে শিম্‌লা পর্ব্বতে যাইয়া কিছু দিন স্থিতি করেন।

চারি দিন শিম্‌লা পর্ব্বতে স্থিতি করিব, এরূপ মনস্থ ছিল। লালা কাশীরাম জীর অনুরোধে আরও তিন দিন থাকিতে বাধ্য হওয়া গেল। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্নে হিমালয়-ব্রহ্মমন্দিরে লালাজীর উদ্যোগে এক সভা হয়। উর্দ্দু বক্তৃতা-দানে বাধ্য হওয়া যায়। "আস্রারে তওহিদ"

(একত্ববাদের গূঢ় তত্ত্ব) বক্তৃতার বিষয় ছিল। এক জন উচ্চ পদস্থ সুবিখ্যাত মোসলমান সভাপতি হইবেন স্থির ছিল। সেদিন পীড়িত হওয়াতে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কতিপয় সম্ভ্রান্ত মোসলমান, পঞ্জাবী ও বাঙ্গালী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। কাবোলের রাজ্যচ্যুত আমির ইয়াকুবখাঁর ভূতপূর্ব্ব প্রধানকর্মচারী খাঁ বাহাদুর বৃদ্ধ আল্লাবকৃশ সাহেব শ্রোতৃবর্গের অন্তর্গত ছিলেন। বক্তৃতা হইয়া গেলে তৎসম্বন্ধে তিনি উর্দ্দু ভাষায় উচ্চ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তৎপর এক জন পঞ্জাবী ব্রাহ্ম বন্ধু কিছু বলেন। অবশেষে বাঙ্গালী বাবুদিগের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় উপদেশ ও সঙ্গীতাদি হইয়াছিল। লালাজীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হারমোনিয়ম যোগে হিন্দি ভাষায় সুমিষ্ট ভজন গাহিয়াছিলেন। পর দিন ১৫ই সোমবার বেলা ১০ টার ট্রেণে রাউলপিণ্ডি নগরে যাত্রা করা যায়। ১৬ই মঙ্গল বার অপরাহ্নে আমরা তথায় উপনীত হই।

দুইটি স্নেহের কন্যার তিরোধান।

সম্প্রতি নববিধানমণ্ডলী হইতে দুইটী দেবী প্রকৃতি কন্যা দিব্য ধামে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদের একটী দেবী ব্রজবালা। তিনি কঠোর রোগ যাতনার মধ্যে আশ্চর্য্য ধর্ম্মনিষ্ঠা ও পরলোকে বিশ্বাসের পরিচয় দান করিয়া অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বৈবাহিক জীবন ৮বৎসরমাত্র ছিল। তিনি বাল্যকাল হইতে অতিশয় নিষ্ঠাবতী ও ধর্ম্মানুরাগিণী ছিলেন। ২০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার বিবাহ হয়, এ পর্য্যন্ত তিনি আমিষ ভক্ষণ করেন নাই, পরে বাধ্য হইয়া আমিষ ভোজনে প্রবৃত্ত হন। "এই মাছ আমার অখাদ্য।" তিনি এরূপ বলিয়াছেন। ব্রজবালার শ্বশুরপল্লীর সমুদায় মহিলা মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করেন। তিনি দীর্ঘকাল রোগ যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু অতি শান্ত ভাবে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। মৃত্যুর সাত দিন পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সর্ব্বদা তাঁহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তখন হইতে তিনি ব্রজবালার মুখে একটীও সাংসারিক কথা শুনিতে পান নাই। ব্রজবালা প্রফুল্ল ও প্রশান্তমুখে পরলোক ও পরলোকস্থ আত্মীয় বন্ধুদিগের কথা সর্ব্বদা বলিয়াছিলেন। দিব্য ধামে যাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ যেন সর্ব্বদা ব্যাকুল ছিল। ব্রজবালার দিদীকে তাঁহার শেষ জীবনের সমুদায় বৃত্তান্ত লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা গিয়াছিল, এ পর্য্যন্ত তাহা না পাওয়াতে, ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁহার বিষয় সংক্ষেপে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল;—

"সাধু অঘোরনাথ গুপ্তের পুত্রবধূ শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ব্রজবালা দেবী গত ৫ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার প্রাতে পতি পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামে যাত্রা করিয়াছেন। দেবী ব্রজবালার বয়স ২৮বৎসরমাত্র ছিল। সন্তান হওয়ার পর হইতেই তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল, নানাপ্রকার চিকিৎসা ও স্থান পরিবর্ত্তনে তাঁহার রোগ সারিল না। তিনি

অতি ভাল কন্যা ছিলেন। কিশোরগঞ্জ নিবাসী বিধানবিশ্বাসী শ্রীযুক্ত জগমোহন বীর মহাশয় ইঁহার বৃদ্ধ পিতা আজও বর্ত্তমান। কয়েক মাস হইল তিনি স্থানপরিবর্ত্তনের জন্য কিশোরগঞ্জে পিতার নিকট ছিলেন। সেখানে নানাকারণে রোগের উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। বীরমহাশয় কন্যাকে ভাল করিতে পারিলেন না বলিয়া বিদায় দিবার সময় বড়ই ব্যাকুল ভাবে রোদন করিয়াছিলেন। কে জানিত তিনি আর এ জীবনে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যাকে দেখিতে পাইবেন না। বিশ্বাসী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রজবালা অল্প বয়স হইতে ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ নিষ্ঠাবতী হইয়াছিলেন। স্বভাবতঃই তাঁহার মন বৈরাগ্যপ্রিয় ছিল। খাওয়া পরা বেশ বিন্যাসের দিকে তাঁহার মনোযোগ ছিলনা। উপাসনা সংকীর্ত্তন ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে তিনি বড় অনুরাগিণী ছিলেন। সংসারের কাজ কর্ম্ম হইতে অবসর পাইলেই নির্জ্জন স্থানে যাইয়া ধ্যান করিতেন। কিশোরগঞ্জ হইতে কলিকাতায় আসার পর তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, শীঘ্রই দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিবেন। ব্রজবালা আত্মীয়দিগের নিকট প্রায়ই বলিতেন, 'আর আমি এ সংসারে থাকিব না; আমার মন ভক্তিভাজন প্রতাপ বাবু, মহিম বাবু (তাঁহার ভগ্নীপতি) প্রভৃতির নিকট যাইবার জন্যই ব্যস্ত হইয়াছে, আমি তাঁহাদিগকে আমার চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি। আহা! ঐ ধাম কি সুন্দর, কি মনোহর!' আশ্চর্য্য, তিনি সংসারের কিংবা একমাত্র চারি বৎসরের শিশুর জন্য কোন কথাই বলেন নাই, সেই পরলোকবাসী আত্মীয়দিগের কথা বলিতেই তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হইত। আত্মীয়গণ নিষেধ করিলে বলিতেন, 'আমি ভুল বলিতেছি না, আমার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে' যাহা দেখিতেছি তাহাই বলিতেছি।' ব্রজবালা বড় সরলপ্রকৃতি ছিলেন। কাহারও সহিত বিবাদ কলহ করিতে তাঁহাকে দেখা যাইত না। তাঁহার অতিশয় সহ্যগুণ ছিল। দয়াময় শ্রীহরি তাঁহার কন্যার আত্মাকে চির শান্তিতে রক্ষা করুন; তাঁহার শিশু সন্তান, স্বামী ও বৃদ্ধ পিতার মনে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

দ্বিতীয়। দেবী সূর্য্যকুমারী; ইনি মজফরপুর নিবাসী ভূত পূর্ব্ব ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ব্রহ্ম দেবনারায়ণ মহাশয়ের একমাত্র প্রিয়তমা কন্যা ছিলেন। ইঁহার স্বামী হাইকোর্টের উকিল চট্টগ্রামনিবাসী শ্রীমান ধীরেন্দ্র লাল কাস্তগিরি। সূর্য্যকুমারী ত্রিহুত প্রদেশের কন্যা, বাঙ্গালী পরিবারের বধূ হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজগুণে ও সৌজন্যে স্বামিকুলের সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ইঁহার শ্বশ্রূমাতা বধূর গুণকীর্ত্তন করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। ইনি ৫।৬ মাস রোগ যাতনার পর আশ্চর্য্য ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয়দান করিয়া পিতৃদেবের সঙ্গে পরলোকের কথা বলিতে বলিতে এবং প্রার্থনা ও সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে শান্ত গম্ভীরভাবে দিব্যধামে যাত্রা করিয়াছেন। "Death is Power and Life is infinite" নিজহস্তে অঙ্কিত এই মটোটি মৃত্যুর পূর্ব্বে সূর্য্যকুমারী

নিজের পার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-তত্ত্বে তাঁহার বিষয় এরূপ লিখিত হইয়াছে।

"শোকসন্তপ্তহৃদয়ে কল্যাণীয়া কন্যা শ্রীমতী সুরজকুমারী কান্তগিরীর পরলোক-গমন বার্ত্তা প্রকাশ করিতেছি। ইনি আমাদের বাঁকিপুরস্থ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মদেব নারায়ণের একমাত্র অবশিষ্ট সন্তান ছিলেন। আট বৎসর হইল ইনি হাইকোর্টের উকিল চট্টগ্রামনিবাসী খ্যাতনামা কান্তগিরী পরিবারের শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলালের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন। দুইটি পুত্রসন্তান (একটি ৭ বৎসরের ও একটি ২ বৎসরের) রাখিয়া স্বামী ও বৃদ্ধ পিতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া গত ২১শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬॥• টার সময় দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুরজকুমারী বড় বুদ্ধিমতী, নম্রস্বভাব ও মিষ্টভাষিণী ছিলেন। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে তাঁহার বড়ই সুমিষ্ট ব্যবহার ছিল। নিজে বিহারী হইয়াও বাঙ্গালী আত্মীয়া আত্মীয়গণের সহিত অতি সদ্ভাবে জীবনাতিপাত করিয়া গিয়াছেন। আমরা এ পৃথিবীতে তাঁহাকে হারাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। তাঁহার বয়ঃক্রম কেবল-মাত্র ২৫ বৎসর হইয়াছিল। ছয় মাস কাল ইনি কঠোর রোগযাতনাভোগ করিয়াছিলেন। ইহার স্বামী ও পিতা ইহার চিকিৎসাসম্বন্ধে কোন চেষ্টার আর বাকি রাখেন নাই, অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াও ইহাকে আরোগ্য-দান করিতে পারিলেন না। বিধাতা যাঁহাকে এখানে রাখিবেন না মনে করিয়াছেন তাঁহাকে আর কে এখানে রাখিতে পারে? মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত সূর্য্যকুমারীর জ্ঞান বেশ ছিল। দয়াময় তাঁহার কন্যার আত্মাকে দেহমুক্ত করিয়া সকল প্রকার যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন। এখন সেই অমর আত্মা দিব্যধামে তাঁহার পুণ্যময় ক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করিয়া চিরসুখে সুখী হউক। তাঁহার পৃথিবীবাসী পিতা, স্বামী ও ও আত্মীয়গণের আত্মাতে সান্ত্বনা ও শান্তি বিতরিত হউক। লীলারসময় হরির এই সকল লীলা দেখিতে দেখিতে আমরা তাঁহাতেই সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসস্থাপন করিতে শিক্ষা করিয়াছি।"

ভাগিনেয়াদের নিকটে পত্র।

(আমেরিকা প্রবাসী কর্ত্তৃক লিখিত)

স্নেহের টুনি, খেনি, শান্তি ও ফুটকি,

তোমাদের সকলের চিঠী পেয়েছি। এখানে চিঠি আস্তে এক মাস লাগে। জবাব যেতে আর এক মাস লাগে। তত দিনে তোমরা কি লিখেছিলে সে কথা হয়ত ভুলে যাবে। আর তত দিনে অসুখ সেরে গিয়ে তোমাদের সবারই শরীর বেশ ভাল হবে।

আমি এখানে এক দিন বরফ পড়া দেখেছি। আর এ চিঠি যখন তোমরা পাবে তখন এখানে রোজ বরফ পড়িবে। সমস্ত রাস্তা বরফে ঢেকে যাবে, তার উপর দিয়ে চাকা নেই এমনতর গাড়ীতে ক'রে লোকেরা সব যাতায়াত করবে। বরফের পাহাড় কাকে বলে তোমরা কি জান?

আমি এখানে আসবার সময় সমুদ্রের উপর বরফের পাহাড় দেখেছি। তিমি মাছের কথা তোমরা বোধ হয় পড়েছ। আমি সমুদ্রে তিন চারটে তিমি মাছও দেখেছি। নাকের ভিতর দিয়ে ফোয়ারার মত তারা জল বার করছিল। ভারি মজা! তোমরা যখন আমেরিকায় আসবে তখন এ সব জিনিষ দেখতে পাবে। আরও কত জিনিষ দেখতে পাবে। তখন আমি তোমাদের কাছে শুনব। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা গ্রহণ কর।

শুভাকাঙ্ক্ষী
বড় মামা।

মহিলাদিগের রচনা।

উদ্যোগী ও অলসের প্রতি *।

কে তুমি হে পান্থবর, চলেছ কোথায়?
সম্মুখে অনন্ত পথ, চলেছ কি চাহি?
ভেবেছ কি মনে মনে, করিবেই শেষ,
এ অনন্ত পথ তব, চলিয়াছ তাই।
বারেক কাহার পানে, ফিরিয়া না চাহ,
ধন্য হে উদ্যম তব, ধন্য হে সাধনা,
অচিরে হইবে তুমি পূর্ণ মনোরথ।
হে অলস মনে মনে, কি ভাবিছ বসে?
নাহি কি তোমার কাজ ত্রিসংসার মাঝে?
সময় স্রোতের প্রায় কভু নহে স্থির,
আপনার বেগে শুধু, ধায় অবিরত।
চতুর সুজন যে গো, আপনার কাজ,
নীরবে আনন্দ মনে সেরে লয় একা।
অলস যে জন হয় আলস্যেতে রয়,
সময় চলিয়া গেলে করে হায় হায়।

* পূর্ব্বে অনেক অধ্যায় যে বালিকাটীর পদ্য প্রকাশিত হইয়াছে, এই পদ্যও তাঁহা কর্ত্তৃক বিরচিত।

প্রেম।

এক মনে ডাক তাঁরে অবোধ পরাণ,
জগদীশ করিবেন শান্তি সুধা দান।
প্রেমময় দয়াময় প্রেম অবতার,
সপ প্রেম কায়মনে চরণে তাঁহার।
এই প্রেম ব্যর্থ আর হইবে না কভু,
নিরদয় কভু নয় দয়াময় প্রভু।
প্রাণ লও মন লও সবি লও মম,
একান্ত আমার হও তুমি প্রিয়তম।
আঁধার এ গেহ মম নাহি হেতা আলো,
তোমারে দেখিব নাথ ঢাল জ্যোতি ঢাল।
তুমি হে সর্ব্বস্ব মম হৃদয়ের ধন,
অনাথিনা দুঃখিনীর লও প্রাণ মন।

সদর পুর। শ্রীমতী সন্—

উড়িষ্যার রাজপরিবার।

উড়িষ্যার গড়জাতের রাজপরিবারের সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে মহিলায় দুই বার লিখিয়াছি; আজ আবার কিছু লিখিতেছি। সম্প্রতি একটী গড়জাত রাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁর অনুরোধে আমি কয়েক দিন তাঁহার নিকট যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ইনি বামণ্ডার ভূতপূর্ব্ব মহারাজ সার সুচল দেব সি, আই, ই র কন্যা; উড়িয়া ও বাঙ্গালা উত্তম জানেন। কিছু কাল পূর্ব্বে এই গড়জাত রাণীরা বাইরের কোন স্ত্রীলোকদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করা উচিত বোধ করিতেন না।

এখনও অনেকে ইহা পছন্দ করেন না। কিন্তু সেই রাণী যাঁর সহিত আমার সম্প্রতি সাক্ষাৎ হইয়াছে, তিনি সকলের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে ভাল বাসেন, কেবল ভালবাসেন তাহা নহে, তিনি এক দিন আমাকে বলিলেন, "লোকের সঙ্গে আলাপে অনেক উপকার আছে। আমাদের 'নঅরে' (রাজপ্রাসাদে) আমি আসিবার পূর্ব্বে রাজ্যের কোন স্ত্রীলোকের অন্দর মহলে রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার ছিল না, কিন্তু আমি আসিয়া সকলকে বলিয়া দিয়াছি, যে কোন স্ত্রীলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিবে, সে আমার সাক্ষাৎ পাইবে।"

কটকেই উক্ত রাণীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন কটকে আরও ৪।৫টি রাণী উপস্থিত ছিলেন। রাণীদিগেরও এ অঞ্চলে অপর রাণীদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপের বড় একটা নিয়ম ছিল না, ইনি নিজে সকলের বাড়ীতে প্রথমে যান, তৎ পর সেই সব রাণীদিগকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে আনেন। ইনি বলিলেন, "আমি যদি প্রথমে না যাইতাম তাঁহারা আসিতেন না। কারণ তাঁহারা যাওয়া আসা পছন্দ করেন না।"

এক দিন রাণীর সহিত একটী বাঙ্গালীর মেয়ে, ও একটী মেম দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা নমস্কার করিলে পর রাণীও মাথা নুয়ে নমস্কার করিলেন। কিছু কাল পূর্ব্বে এমন কি গড়জাত রাজগণও কাহাকেও নমস্কার করিতেন না, বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাবে এই সব হইতেছে। আমি অন্য কোন রাণীকে প্রতি নমস্কার করিতে দেখি নাই।

এক দিন, অপর একটি রাজপরিবারের ব্রাহ্মণী, পরিচারিকা প্রভৃতি কয়েক জন রাণীকে দেখিতে আসিয়াছিল। সেখানে রাণীর শাশুড়ী, খুড়তত শাশুড়ী, পিসতত শাশুড়ীরা উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় ঐ গৃহে রাজা আসিলেন, রাণীকে বাদ দিয়ে আর সকলকে উঠে দাঁড়াইতে হইল। রাজার যাওয়ার পর কিছু ক্ষণ পরে রাণীকে কিঞ্চিৎক্ষণের জন্য কার্য্যানুরোধে উঠিতে হইল। তখন তাঁহার শাশুড়ী প্রভৃতি যাহারা উপস্থিত ছিলেন সবাইকে যত ক্ষণ রাণী উপবেশন করেন নাই, তত-ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। তাই বলে আপনারা কেহ মনে করিবেন না, রাণীর শাশুড়ীকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল বলিয়া আমিও তাঁহাদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া ছিলাম। আমি বসিয়াই ছিলাম। তাঁহারা গুরুজন হইলেও মনে করেন, যিনি রাজ্যের রাজা, তিনি আমারও রাজা, আমরা মা হইলেও তাঁহারই প্রজা। আমি এক দিন শুনিলাম, রাজা তাঁহার মাকে ডাকিলেন, মা "আজ্ঞা" বলে উত্তর দিলেন। রাণী তাঁহার শাশুড়ীকে "আপনি" বলিতেছেন, শাশুড়ীও বৌকে "আপনি" বলিতেছেন।

রাণীর সহিত এক দিন রাজপরিবারের কথা হইতে হইতে তিনি বলিলেন, "রাজকন্যারা বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময় অন্যান্য যৌতুকের সহিত কয়েকটী পরিচারিকা পান। ইহা রাজা রাজ-

পরিবারে অনেক সময় অত্যন্ত অশান্তি ঘটে। কিন্তু আমার বাবা সেরূপ কাহাকে ও আমার সহিত পাঠান নাই। বাবা উহা পছন্দ করিতেন না। আর আমি এখানে আসিবার পর পরিবারে যে সব যুবতী কন্যা ছিল, রাজা (তাঁহার স্বামী) তাহাদের বিবাহ দিয়েছেন। আর যে সব ছোট ছোট মেয়ে আছে, তাহারা বড় হইলে তাহাদের বিবাহ দেওয়া হইবে। রাজা ৪০ চল্লিশটি অনাথ সন্তানকে বাড়ীতে রাখিয়া প্রতিপালন করিতেছেন।"

অন্যান্য গড়জাতে যেরূপ রাজা ও রাণীর সঙ্গে কোন বিশেষ সম্পর্ক থাকে না, কথা বার্ত্তা অধিকাংশ অপর লোক দ্বারা হয়। এই রাজপরিবারে সেরীতি একে বারে নেই। আমাদের মত সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় প্রয়োজন হইলেই রাজা রাণীর সহিত নিজে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। রাজ্যের উন্নতি অন্যান্য বিষয়েও রাণীর সহিত কথা হয়।

এক দিন রাণী আমাকে ব্রাহ্ম বিবাহ পদ্ধতি ও উপাসনার প্রণালী কিরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আমি যত দূর পারি উত্তর দিয়েছিলাম। রাণী শুনিয়া বলিলেন, পৌত্তলিক পূজা মূর্খ অজ্ঞানী-দিগের জন্য। সত্যই এক জন অনন্ত মহান্ পুরুষ আছেন, যাঁহা হইতে এই নিখিল বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে, যিনি সকলের ভিতরে থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন।"

আর একটী কথা বলিয়াই শেষ করিব। প্রতিবৎসর পৌষ পূর্ণিমা ও শ্রাবণ পূর্ণিমাতে রাজা রাণীর অভিষেক হয়। প্রত্যেক গড়জাতে এ প্রণালী আছে। এই দিন এবং জন্মদিনে রাণী রাজাকে প্রণাম করেন।

আমাদের দেশে যত এই রূপ রাজ-পরিবার হইবে ততই সুখের ও শান্তির বিষয় হইবে। তাহা হইলে বহু পূর্ব্ব হইতে আমাদের দেশে যে একটি প্রবচন আছে "রাজার রাণী, কাণার কাণী" এ বাক্য অমূলক হইয়া যাইবে।

অজ্ঞানতার অন্ধকারে থাকিয়া আমা-দের দেশের লোক আগে পৃথিবীর ধন রত্নকেই মূল্যবান্ মনে করিতেন, ভগবানের কৃপায় দিন দিন সে ভাব দূর হইতেছে, ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, ভিক্ষা করি, ধরাধামে তাঁহার স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হউক, ঘরে ঘরে তাঁহার পুণ্য প্রদীপ জ্বলিয়া উঠুক্।

কটক। শ্রীমতী রে—

নারী-পূজা।

"হিন্দুর নারীমর্য্যাদা অবশ্য প্রশংস-নীয়" একখানি পুরাতন "ভারতী" পত্রিকার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে আমি বলিলাম, "হিন্দুর নারীমর্য্যাদা অবশ্য প্রশংসনীয়। অন্য কোন দেশে রমণীর প্রতি এরূপ সম্মাণ প্রদর্শন হয় না। হিন্দুর আরাধ্য দেবতা নারী।"

আমার কথা শুনিয়া উপস্থিত মহিলা-বৃন্দ হাসিয়া উঠিলেন। আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। জমিলা বেগম প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—

"মাফ করুন মিসেস চাটার্জ্জি! এ দেশে ললনার পদ দাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে!"

জমিলা এক জন বিখ্যাত উকিলের পত্নী; কুসুমকুমারী রায়ের সহিত ইঁহার খুব বন্ধুত্ব। অপর কামিনী আমেনা বেগম বিধবা; ইনি দশ বৎসর পশ্চিমে ছিলেন, খুব ভাল ইর্দ্দু জানেন। ইনিও কুসুমের প্রিয় বন্ধু। মিসেস রায়ের সহিত ইঁহাদের ঘনিষ্ঠতা এত অধিক যে, ইঁহারা পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকেন। উক্ত মোসলেম রমণীদের সহিত আমার পরিচয়মাত্র দুই তিন মাস হইল, হই য়াছে; কিন্তু কুসুম আমার সমবয়স্কা বাল্য সখী।

কুসুমের বসিবার কক্ষে বসিয়াই আমি "ভারতী" দেখিতেছিলাম। আমি তর্কের জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিলাম না; তথাপি আমার ঐ উক্তি লইয়া যথেষ্ট বাদানুবাদ চলিল। আমেনা বেগম ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—

"এ দেশে রমণী জাতি পুরুষের নিজস্ব সম্পত্তিবিশেষ!"

আমি। ইহা আপনাদের ভ্রম। হিন্দু নারীকে শ্রদ্ধা না করিলে, তাহাকে দেবী রূপে কল্পনা করিত না। অধিকাংশ দেবতাই নারী।

আমেনা। আমরা কিন্তু ফল দেখিয়া বিচার করিতে চাই! দেবী-কল্পনার কথা ছাড়িয়া সত্য ঘটনা দেখান।

আমি। ও ভাই কুসুম! তুমি আমার সাহায্য কর। আন ত তোমার মহাভারত খানা, ইঁহাদিগকে আমরা ঐতিহাসিক ঘটনা দেখাই।

কুসুম। তোমরা তিন জনেই আমার সমান শ্রদ্ধার পাত্রী, আমি কাহারও পক্ষপাতিতা করিতে পারি না। মহাভারত বা ইতিহাসে কাজ কি? বর্ত্তমান সামাজিক ঘটনার আলোচনা করিতে পার।

আমি। (মোসলেম কামিনীদ্বয়ের প্রতি) আপনারা কি দময়ন্তী সীতা, সাবিত্রীপ্রমুখ ভারত-ললনাকে দাসী বলিতে চান?

জমিলা। না। সতী সাবিত্রী প্রভৃতি নিজগুণে ধন্যা হইয়াছেন। সীতা নিজে ভাল লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় সমাজ তাঁহাকে কি রূপে পূজা করিয়াছিল?

আমি। (ও কথার উত্তর না দিয়া) পুরাকালে অনেক দেবী ছিলেন। লীলাবতী, খনা প্রভৃতি বিদুষী ললনা ভূতলে অতুল।

আমেনা। তাঁহারা বিদুষী ছিলেন, সে গুণ তাঁহাদের নিজের। এখানে কথা হইতেছে, নারীর প্রতি সমাজের ব্যবহারের। খনা জ্যোতিষ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্না ছিলেন। আজিও পল্লীগ্রামে এমন কৃষক নাই যে, দুই চারিটি খনার বচন না জানে। কিন্তু—

আমি। কিন্তু আর কি? গ্রামে গ্রামে খনার বচন আবৃত্তি করা হয়, ইহাতেই বুঝা যায়, খনা সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইতেছেন!—

আমেনা। ক্ষমা করুন, মিসেস্ চেটার্জ্জি! আমার কথা টুকু শেষ হইতে দিন! খনা এখন পূজিতা হইতেছেন, কিন্তু তিনি মরিয়াছেন কি প্রকারে তাহা কি আপনি বিদিত নহেন? তাঁহার যে রসনা ঐ বচন গুলির জনয়িত্রী, সেই রসনা ছেদন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে!

আমি। হত্যা ত করা হয় নাই;—তবে হাঁ,—খনার রসনা কর্ত্তিত হইয়াছিল।

জমিলা। 'হত্যা' কি গাছে ধরে? খনার স্বামী তাঁহার জিহ্বাচ্ছেদন করিলে পর খনা নীরবে স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া অশ্রু পাত করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন!

কুসুম। আপনারা পুরাতন কথা ছাড়ুন। বর্ত্তমান শতাব্দীর ঘটনা দ্বারা জয় পরাজয় দেখা যাউক।

আমি। বেগম সাহেবেরা দুই জন, আর আমি একা। জোর যার, মুলুক তার, সুতরাং আমি বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করি।

কুসুম। সে কি! তুমি এত শীঘ্র তর্ক ছাড়িবে কেন? যত দূর পার অগ্রসর হও।

আমেনা। আমরা দুই জন হইলেও মোটের উপর আপনার তুলনায় দুর্ব্বল। কারণ, আপনি উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তা;—(ঈষৎ হাস্যে) যদিও এফ্, এ, ফেল! আপনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া এবং নানা পুস্তক পাঠে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। আর আমরা কঠোর অবরোধে থাকি,—আমরা কেবল কুসুমদিদীকে জানি, আর চিনি আপনাকে।

আমি। বেশ, বেশ, চলুন; আপনারা নাছোড় বান্দা! কুসুমদিদি! 'বর্ত্তমান শতাব্দী' মানে বাঙ্গালার ১৩১২ সন, না? খ্রীষ্টাব্দের ২০ শ শতাব্দী?

কুসুম। ত্রয়োদশও নয়, বিংশও নয়;—এই শেষ এক শত বৎসরের ভিতরের ঘটনা ধর না।

আমি। বেশ! ইদানীং ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হওয়ায় রমণী জাতি কল্পিত দেবত্বের পদ হইতে ক্রমে সত্যকার দেবী পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জমিলা। তাহা কতক পরিমাণে সত্য। আপনি আর একটী কথা শুনিয়া রাখুন,—আপনারা যখন হিন্দু সমাজের দেবী লইয়া গৌরব ও গর্ব্ব করেন, তখন উক্ত সমাজের দোষকেও আপনাদের নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকুন।

আমি। এ বড় শক্ত condition!

কুসুম। শক্ত হইলেও পণটা ন্যায় সঙ্গত বটে। উঁহারা পূর্ব্বেই তোমার ফাঁকির পথ বন্ধ করিলেন! বুঝিলে, প্রভা দিদি?

আমি। কি রকম ফাঁকি?

কুসুম। উঁহারা কোন হিন্দু পরিবারের অবলার দুর্দ্দশার কথা বলিলে তুমি বলিতে পারিতে, "আমাদের ব্রাহ্মসমাজে কিন্তু ওরূপ হয় না!"

আমি। তাহা ত ঠিক। ব্রাহ্ম

সমাজে অবলাপীড়ন হয়, ইহা কেহ বলিতে পারে কি?

আমেনা। যদি কেবল নববিধান-সমাজ লইয়া থাকেন, তবে আপনারা হিন্দুসমাজের দেবী লইয়া টানাটানি করেন কেন? কেবল গুণের প্রশংসার ভাগ লইতে অগ্রসর হইবেন, আর দোষের নিন্দা গ্রহণ করিবেন না, ইহা ত বড় অবিচার!

জমিলা। এই জন্য আপনি বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিতেছিলেন, এখন বুঝিলাম। তবে থা'ক, নারী পূজার আলোচনায় কাজ নাই, অন্য কথা পাড়ুন।

আমি প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম; একটু পরে ভাবিলাম, "আমি এতই ভীরু যে বিনা তর্কে হারিব?" প্রকাশ্যে বলিলাম,—

"না বেগম সাহেবা! আপনাদের ভয় নাই! আমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিব না,—চলুন!"

সকলে হাসিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদিগকে হাসানই আমার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা কিন্তু শিষ্টাচারের অনুরোধে আর সামাজিক কথা বলিতেছিলেন না। তাহা আমার অসহ্য হইল, আমি জেদ করিয়া বলিলাম,—

"কই বেগম সাহেবা, আপনি ত একটীও প্রপীড়িতা ললনার কাহিনী বলিতে পারিলেন না!"

জমিলা। বলিলে, "একটি কেন, অনেক বলা যায়,"—

"সে বহ্নির শত শিখা কে করিবে গণনা?"

আমি। আপাততঃ একটী শিখাও দেখান দেখি!

জমিলা। বেশ। যে সকল হিন্দু রমণী পূজিতা হন, সেই হিন্দু কুলকামিনীর ভাষায় ত আমরা শুনিতে পাই।

"সাবাসি সাবাসি বটে হিন্দুর সন্তানে,
গড়াকি তোদের বুক নিরেট পাষাণে?
* * *
বালিকা বধিতে তোর শাস্ত্র টানাটানি
* * *
নাই দয়া নাই ধর্ম্ম, বোঝে নাক কর্ম্মাকর্ম্ম
শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বালিকা চিবায়।"

আমেনা। শুনুন মিসেস চাটার্জ্জি।

"শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বালিকা চিবায়!"

কি বলেন, ভাই! ঐ কয় ছত্র পদ্যকে ব্যথিত হৃদয়ের 'আর্ত্তনাদ' না পূজা প্রাপ্তিতে হর্ষে 'আশীর্ব্বাদ, বলিব?

আমি। উহা ত কবির রচনা—কল্পিত বেদনা।

জমিলা।—আপনি বালবিধবার যন্ত্রণাকে কল্পিত বেদনা বলিলেন?

আমিনা। একেবারে কল্পিত নহে, অনেক পরিমাণে সত্য—

কুসুম। ধ্রুব সত্য।

আমেনা। কিন্তু উহাত সামাজিক নিয়ম, কাজেই সহিতে বাধ্য হওয়া যায়।

আমেনা। কবিকল্পনার কথা ছাড়িয়া আমি সদ্য দেখাই, ভারতবর্ষ কি কি উপাদানে নারী পূজা করে, তাহার দৃষ্টান্তের জন্য আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে

হইবে না। শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রণীত "Heart Beats" গ্রন্থখানি দেখিয়াছেন?

আমি। প্রথমে ভাবিয়া দেখিলাম, উক্ত গ্রন্থে কেবল পারমার্থিক কথা আছে। একটু চিন্তা করিয়া শেষে সাহসের সহিত বলিলাম, "হাঁ, দেখিয়াছি। তাহাতে কোন ললনা-দলনতত্ত্ব নাই।" ক্রমশঃ।

R. S. Hossain
(মোসলমানকন্যা।)

সংবাদ।

যুবরাজ প্রিন্‌স অব্ ওয়েস্ স্বীয় পিতামহী স্বর্গগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া দেবীর স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন কালে যে সুমিষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিছেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন, "আমি এদেশে আসিয়া যত অনুষ্ঠান করিয়াছি, তন্মধ্যে আমার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র অনুষ্ঠান।"

বঙ্গাধিপতি ফ্রেজার মহোদয়ের প্রাসাদে এদেশের যে সকল রাজা মহারাজ ও নবাব পরিবারের এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের মহিলাগণ যুবরাজ-মহিষীকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই অত্যন্ত পরদা নিশিন। অবরোধের দৃঢ়তা রক্ষা পাইবে না ভাবিয়া লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণরের প্রাসাদে যাইতে তাঁহাদের অনেকের আপত্তি ছিল। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, একজন পুরুষও সেখানে ছিল না। মেয়ে মানুষ চাপরাশী আরদালি ও দরওয়ানপ্রভৃতির কাজ করিয়াছিল। বঙ্গাধিপপত্নী ও কুচবিহারের মহারাণী উপস্থিত সকল মহিলাকে যুবরাজপত্নীর সঙ্গে পরিচিত করিয়াদিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের ধনী পরিবারের মহিলাদিগের বিচিত্র বেশ ভূষ রীতি নীতিদর্শনে বোধ হয় যুবরাজ-মহিষীর অত্যন্ত কৌতূহল বৃদ্ধি হইয়াছিল। মহিলাদিগের জন্য এরূপ পরদার ব্যবস্থা হয় তো তিনি কোথাও দর্শন করেন নাই। বম্বাইয়ে মহারাষ্ট্রী ও পারসিক মহিলাদের জন্য লাহোরে পাঞ্জাবী মহিলাদিগের জন্য যুবরাজ-পত্নীর নিকটে উপস্থিত হইবার কালে এ প্রকার পরদার ব্যবস্থা করিতে হয় নাই, কেবল পুরুষেরা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন না।

সম্প্রতি বরিশালে খাদ্য দ্রবের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে একজন দুঃখী দরিদ্র লোকের অতিশয় অন্নাভাব হয়। তাহার তিনটি সন্তান ক্ষুধায় আকুল হইয়া ক্রন্দন করে। বেচারা ভিক্ষা করিয়া এক মুষ্টি অন্ন প্রাপ্ত হয় নাই, কোন প্রতিবেশীর দয়া আকর্ষণ করিতে পারে নাই। পরে ক্ষুধার্ত্ত সন্তানদিগের তাড়নায় অনন্যোপায় হইয়া তিনটি সন্তানকে স্বহস্তে বধ করিয়াছে, এবং নিজে উদ্বন্ধন-দণ্ডে প্রাণ ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তত হইয়াছে। এই মহাপাপের ভাগী কি নিষ্ঠুর প্রতিবেশিগণ হইবে না? প্রতিবেশিনী কোন নারী কি সেই অন্নদুঃখী লোককে দুই এক মুষ্টি অন্ন দান করিতে পারিতেন না? আমরা জানি যে, নারীহৃদয় পরদুঃখকাতর দয়ার্দ্র কোমল।

প্রেরিত।

বাঁকিপুরে মেয়েদের সেবা।

সেবার ধর্ম্ম মেয়েদিগকে বড় উচুঁ করিয়া

দিতে পারে বোধ হয় আর কিছুই তাঁহা-দিগকে তাদৃশ উচুঁ করিয়া দিতে পারে না। বাঁকিপুরে মেয়েদের বড় সেব র ভাব দেখিতেছি। প্লেগ রোগাক্রান্ত রোগীর সেবাতেও আপনাদিকে উৎসর্গ করিতে ইহাঁরা পশ্চাৎপদ নহেন। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, গত বৎসরের পূর্ব্ব বৎসর এখানে যখন আমাদের সমবিশ্বাসা গয়া নিবাসী ডাক্তর চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহা-শয়ের তৃতীয়া কন্যা প্লেগরোগাক্রান্তা হইয়া পড়েন, আমাদের পরিবারের এক কুমারী কন্যা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পীড়িতা ভগিনীর সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আরও ২।১টী ভগ্নী অল্পাধিক সেবা করিয়াছিলেন। এবার আবার তাঁহাদের সেবার যথেষ্ট পরিচয় হইয়া গিয়াছে। অঘোর পরিবা-রস্থ শ্রীমান্ গোরাপ্রসাদ মজুমদারের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিধাননন্দিনী যখন দুরারোগ্য টাইফয়েড্ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া সমুদায় ব্রাহ্ম পরিবারে নিরাশার সঞ্চার করি-য়াছিলেন। তখনকার অত্রত্য ভগ্নীদিগের সেবার চিত্র অঙ্কিত করা এ ক্ষুদ্র লেখনীর পক্ষে সর্ব্বথা অসম্ভব। আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া কেহ অবিশ্রান্ত ব্যজন করিতে-ছেন—কেহ মস্তকে বরফ ও অডিকলং প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদন করিতেছেন, চিকিৎসকের নির্দে-শানুসারে ঔষধ পথ্যাদির বব্যস্থা করিতে-ছেন; কেহ বা উত্তাপবিহীন হস্তপদা দিতে ব্যবস্থিত ঔষধ সংঘর্ষণ করিয়া শারী রিক উত্তাপ পুনরুদ্দীপিত করিতেছেন। সে সময়কার ব্যস্ততার চিত্র কোন্ লেখনী অঙ্কিত করিবে তাহা জানি না। ব্রাহ্ম পরিবারের মহিলাদিগের মধ্যে এরূপ সেবার দৃশ্য আর কোথাও দেখিয়াছি কি না জানি না। সেবার ধর্ম্ম আমাদিগের পরিবারে যতই বিস্তৃত হইবে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি এ পরিবারে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। শ্রদ্ধেয়া ভগিনীগণ; আপনাদের এ ছবি নিশ্চয়ই জগতে সুখী পরিবাররচনা করিবে। অঘোর পরিবারের প্রতিষ্ঠাত্রী দেবী অঘোর কামিনী এই সেবার ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। তোমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছ। মোকামাতেও দেবী "গিরিবালা এ স্বর্গের ছবি দেখাইয়া-য়াছেন। আজ তোমরা সেই স্বর্গগতা জ্যেষ্ঠা দিগের পদানুসরণ করিতে দাঁড়াইয়াছ। তোমরাও ধন্য এবং তোমাদের পরিবারও ধন্য হইবে। ভগবান্ তোমাদের মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

মহিলার নিয়মাবলী।

মহিলা পত্রিকার ডাক মাশুলসহ বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। গ্রাহক ও গ্রাহি-কাগণ মহিলার মূল্য ও অন্যসম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে এবং প্রবন্ধাদি সম্পা দকের নিকটে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক প্রকাশিত হইবে। কাহারও প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া যাইবে না।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

"জীবতত্ত্বের মোটামুটি কথা" *

জীবতত্ত্বের বিষয়ে মোটামুটী কয়েকটা কথা বলিব, এত অল্প সময়ে খুব মোটামুটী কয়েকটী কথা ছাড়া কি বলা যেতে পারে। এমন কি পণ্ডিতরা পর্য্যন্তও এ বিষয়ে বেশী জানিতে পারেন নাই, তাঁরাও বলেন, মোটামুটী কথা। আমি এ বিষয়ে ১৫ বছর ধরে পড়ছি। অনেকে ৫০।৬০ বছর ধরে পড়েন, তবুও বলেন, তাঁরা বেশী জানেন নাই। জীবতত্ত্ব বলিতে গেলে আমাদের প্রথমে দেখা উচিত জীব কাকে বলে, সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা হওয়া দরকার। প্রথমেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বই হইতে আমরা পড়ি, পদার্থ ত্রিবিধ;—চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ, এটা ভুল। এখন বোধ হয় উদ্ভিদটা আর চেতন অচেতন নাই, এই দুই নাম আছে। উদ্ভিদটা চেতন পদার্থের মধ্যে এসেছে। যদি দেখি চেতন ও অচেতনে কি প্রভেদ, তার উত্তরে যদি বলি, চেতন পদার্থ কথা বলে অচেতন বলিতে পারে না, এ কথাটা ঠিক হয় না। দুইটীর মধ্যে প্রভেদ এই, চেতন পদার্থে সাড়া দেয়, অনুভূতি আছে। উদ্ভিদের সাড়া আছে কি না, কিংবা কোন পদার্থসম্বন্ধে অনুভূতি আছে কি না, এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবিশিষ্ট। জড়ের মধ্যে অনুভূতি আছে কি না, তাহা আমরা পরিষ্কার বলিতে পারি না। যদি বলি, চেতনের যে সব গুণ আছে, জড়ের তাহা নাই, কিন্তু কতক গুলি গুণ চেতন ও অচেতন উভয়েরই আছে। মনে হয়, ক্রমে চেতন ও জড়ের মধ্যে যে দেওয়াল আছে সেটাও ভেঙ্গে যাবে। উভয়ের একটি সাধারণ গুণ এই যে, উভয়েরই ভার আছে, একটা গাছেরও ভার আছে, একটা পাথরেরও ভার আছে। জীবের জড়ের সঙ্গে এই একটা প্রধান প্রভেদ, তার আত্মরক্ষার চেষ্টা আছে। শুধু যে শত্রুর হাত হতে আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে তা নয়, কিন্তু যাতে জীবনরক্ষা পায় তার জন্য সংগ্রাম আছে। তার পরের গুণ, জীবমাত্রই আহার অন্বেষণ করে, পরিপাক করে। এই সব গুণ জড়ের নাই, যদি দেখা যেত একটা ইট কতকগুলি ভাত খাচ্ছে, তার বাচ্চা হল, তাহা হইলে কি মজাই হত। জীবের লক্ষণ যে, আহার পরিপাক করে, দেহের বর্দ্ধনসাধন করে; ছোট শিশু ছিল, ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল। বীজ হতে অঙ্কুর বাহির হইয়া আপনাকে পুষ্ট করে। জীবের লক্ষণ আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি। প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায় যে কুমীর মাছকে খাচ্ছে, মাছ আবার ছোট মাছকে, সেই মাছ আবার পোকা খাচ্ছে, এই প্রকার সকলেরই আত্মরক্ষার চেষ্টা আছে। এই যে দুটি গুণ, তাহা জড়ের নাই। জড় হতে জীবকে এই দুটিতে প্রভেদ করা যায়। একটি গাছ হল, তাহাতে শত শত গাছ হল, প্রত্যেক গাছেরই অসংখ্য বীজ হয়, সেই বীজ হইতে কত গাছ হয়; পুকুরে যদি একটি মাছ

* বিগত ১৯০৩ সাল ১৪ই জুলাই অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন, তন্মূলক।

ছেড়ে দেওয়া হয়, তা হতে কত শত মাছ হয়, যদি একটি হাঁস রাখ তা হতে একটা হাঁসের পাল ছানা হয়ে যায়। জড়ের একটা প্রধান অভাব যে বংশবৃদ্ধি হয় না। যদি মানুষ একটি টেবিল চেয়ার কিনে রাখেলে কিছু দিন পরে তাঁর কয়েকটা ছানা হত, তাহা হইলে কোন ভাবনা ছিল না।

ইহার পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছিলাম যে, একটা ডিমের ভিতরে কেমন করে আস্তে আস্তে জীবশিশু বর্দ্ধিত হয়। বীজের ভিতরেই ঠিক সেই রকম। বলিয়াছিলাম যে, ডিমের ভিতরে এক পাশে অতিশয় ক্ষুদ্র একটি প্রাণ আছে; সেইটা ক্রমে ক্রমে বাড়ে। আর ডিমের ভিতরের কুসুম আর চারি দিকের সব সাদা জিনিষটা ঐ ক্ষুদ্র প্রাণ টুকুর আহারের জন্য। ঐ টুকু খেয়ে ঐ ক্ষুদ্র প্রাণ বাড়ে, তবে মুরগীর বাচ্চা বাহির হয়। ডিমের মধ্যে ঐ ক্ষুদ্র প্রাণ উত্তাপ পেয়ে ক্রমে ক্রমে বাড়ে পাখীটা সমস্ত দিন ডিমের উপরে বসে আছে, অর্থাৎ ডিমটাকে গরম করে রাখে, ঠাণ্ডা হতে দেয় না, একটা পাখী যখন উড়ে যায় আর একটা এসে ডিম গুলিকে ঢেকে বসে। এই রকম ক্রমাগত ২১ দিনে তবে ডিম ফোটে। বীজের ভিতরেও তাই। একটা শিমের বিচি আনুন, সেটাকে পুঁতে দিলে তার উপর দিক্ থেকে খানিকটা ঠেলে একটা অঙ্কুর বাহির হবে, তার পর সেই অঙ্কুরটা আগে মাটির দিকে যাবে, মাটীতে আপনাকে বসিয়ে পর পর মাটী ঠেলে সেই অঙ্কুরটা উপর দিকে যাবে। ঐ বীজের এক ধারে ক্ষুদ্র বীজশিশু থাকে, আর যা কিছু থাকে সেটা বীজশিশুর খাদ্য। প্রথমে যখন ঐ বীজ শিকড় বীজকে ভেদ করে অঙ্কুর হয়ে বাহির হয়, তখন সে কি খায়, ঐ বীজটা খেয়ে তবে মুখ বাহির করে। বীজটা মাটীতে পুঁতিয়া দেওয়াতে উত্তাপ ও জল পাইয়া ঐ বীজশিশু বীজের আহার পাইয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তার পর সেটাকে ভেদ করিয়া মুখ বাহির করে। শিম ইত্যাদি কতকগুলি শস্যের বীজ দুভাগে বিভক্ত, সেই দুটি ভাগকে বীজদল অর্থাৎ বীজপাতা বলে, বস্তুতঃ ওগুলি পাতা, যার ভিতরে বীজের জন্য খাদ্য রয়েছে। যাঁরা নিরামিষ খান তাঁরা যেন মনে রাখেন যে, তাঁরা বীজের খাদ্য আহার করেন। যেমন কতক গুলি বীজের বীজদল সকল দুভাগে বিভক্ত, কতক গুলিতে আবার একটি বীজদল যেমন ধান্যের। ধান্যের এক ধারে মুখের দিকে একটা ছোট অঙ্কুরের মত বীজ শিশু থাকে, এত ছোট, সেটা বোধ হয় আপনারা কেহই লক্ষ্য করেন নাই কিন্তু বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, ধানটাকে আধখানা করে কাটলে বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। আমি অনেক বার কেটে দেখেছি। আপনারা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিবেন, যে চাল বা ভাতের এক দিক্ ভাঙ্গা, ঠিক গোল নয়। সেই ভাঙ্গা জায়গাটায় সেই বীজশিশু থাকে। যখন ধান ভেঙ্গে চাল করা হয় তখন সেটা ভেঙ্গে পড়ে যায়।

১১শ ভাগ।
৭ম সংখ্যা।
মাঘ।
১৩১২।
মহিলা
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
মাসিক
পত্রিকা।

সূচী।

কলিকাতা

নাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিসণ প্রেসে"

কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ৪ঠা মাঘ মুদ্রিত।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১১শ ভাগ] মাঘ, ১৩১২ ; ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬। [৫ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

জননী বালক বালিকাদিগকে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা নীতি শিক্ষা দিবেন, ইহা আমরা অনেক বার বলিয়াছি। জ্যেষ্ঠ গুরু জনের প্রতি কথায় ও আচরণে বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করা কনিষ্ঠের পক্ষে একটি প্রধান নীতি। হিন্দু মোসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে নীতির কিছু কিছু ভিন্নতা আছে। হিন্দু সম্প্রদায়স্থ পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রভৃতি গুরু জনকে সন্তান ও কনিষ্ঠগণ ভূতলে মস্তক অবনত করিয়া ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করে, এবং তাহারা গুরুজনের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া থাকে; মোসলমানেরা ভূতলে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক কোন মনুষ্যকে প্রণিপাত করে না, ঈশ্বরোদ্দেশ্যে কেবল সেরূপ প্রণতি করিয়া থাকে, তাহারা উহাকে সেজ্‌দা বলে। মোসলমানগণ মস্তক অবনমন পূর্ব্বক ললাট দেশে দক্ষিণ করতল স্থাপন করিয়া গুরু জনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। তাহাকে সেলাম বলে। খ্রীষ্টানেরা মস্তক অবনমন এবং মস্তকের টুপি উত্তোলন করিয়া সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

তুমি হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রীষ্টান যে সম্প্রদায়ের মা হওনা কেন? জাতীয় প্রাচীন রীতি অনুসারে গুরুজনের প্রতি বালক বালিকাদিগকে ভক্তি সম্মান প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দিতে পার। কিন্তু এবিষয়ে আতিশয্য ও ন্যূনতা যেন না হয়। তুমি নিজে কার্য্যতঃ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে। বর্ত্তমান সময়ে অনেক স্থানে গুরুজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বালক বালিকাদিগের নিতান্ত উপেক্ষা ও ত্রুটি হইয়া থাকে। তাহারা বে আদব (নীতি বিহীন) বলিয়া অপবাদ প্রাপ্ত।

পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠ গুরুজন নিকটে উপস্থিত হইলে কনিষ্ঠ উপবিষ্ট থাকিলে আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য বালক বালিকাদিগকে উপদেশ দিবে।

গৃহ হইতে বিদেশে যাইতে হইলে গুরুজনকে বন্দনা করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থী হইতে বলিবে। এ বিষয়ে পরে আমাদের আর ও অনেক বলিবার আছে।

——

মহিলা পাঠিকাগণের প্রতি নিবেদন।

(জটে সন্ন্যাসী।)

এই সংসারটী একটী মজার রহস্য ; এ ব্যাপারটী কি তাহা প্রায় কেহই ঠিক জানে না। কিন্তু যে যেমন মনে দেখে, সে ইহাকে তেমনি দেখে। এখানে যে যাহা চায় সে তাহাই পায়। সংসার রহস্য কেহই নিজে ঠিক বুঝে না, কিন্তু সকলেই অন্যকে বুঝাইতে চায়। কেহ বা চিৎকার করিয়া বলে যে এ সংসার কেবল দুঃখের স্থান, এখানে কোন প্রকার সুখ নাই, শান্তি নাই, আরাম নাই, সদ্ভাব নাই, ধর্ম্ম নাই। এ সংসার কেবল অসুরের তাণ্ডব নৃত্যের স্থান, এখান হইতে দূরে গিয়া ঈশ্বর এবং ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর। এখানে নানা প্রকার কষ্ট বহন করিয়া, পরলোকের জন্য প্রস্তুত হও। কেহ বলিতেছে সংসারই সর্ব্বস্ব। পরকাল নাই, ঈশ্বর নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই। যেন তেন প্রকারেণ মজা লুট। Eat drink and be merry. আহার বিহার কর সুখে থাক।

কেহ কেহ বলে সংসার কার্য্যক্ষেত্র। পরিশ্রম ও কার্য্য দ্বারা ইহার লুক্কায়িত রত্ন সংগ্রহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। কেহ বলে "জোর যার মুল্লুক তার"। পার যদি পরের ধন মান প্রাণ হরণ করিয়া আপনার সুখ সম্পত্তি বৃদ্ধি কর, ছলে বলে ও কৌশলে পরের বিষয় আত্মসাৎ কর। সে বিষয় সামান্য এক খণ্ড ক্ষেত্রই হউক আর মহা জমিদারী বা বিশাল রাজ্যই হউক, শোকের ক্রন্দন, রক্তপাত ও প্রাণ হরণের ভয় করিও না। এই দলের লোকদের বড় বড় পদ। এদলে অনেক রাজাধিরাজ মহারাজ, রাজা, রায় বাহাদুর, জমীদার, উকিল, মোক্তার এবং সামান্য গৃহস্থ ও কৃষকও আছে। ইহাদের বিষ বড় মারাত্মক। কৃষ্ণের পদদলিত কালিয়ের বিষ অপেক্ষাও অধিক তেজস্কর। তাহার বিষে একটী হ্রদ বিষাক্ত হইয়াছিল ; কিন্তু ইহাদের বিষে সমগ্র সংসার বিষাক্ত। আর এক দল লোক আছেন যাঁহারা নিজে কিছুই জানেন না বা বুঝেন না, নিজেকে শিক্ষিত করিতে কোন প্রকার চেষ্টা বা যত্ন করেন না। কিন্তু তাঁহারা সকলকে সকল প্রকার বিষয় শিক্ষা দেন। ইহাদেরও সংখ্যা বড় কম নহে। ইহাদের মধ্যে অনেকে সংবাদ পত্রের সম্পাদক, পুস্তক লেখক, বক্তা, শিক্ষক, অধ্যাপক, ধর্ম্ম প্রচারক, অর্দ্ধশিক্ষিত, এমন কি বিদ্যালয়ের পুঁটে পুঁটে ছাত্র ও ছাত্রীরা পর্য্যন্ত আছে। তাহারা তাহাদের উপদেশের বিষয় প্রায় কিছুই জানে না, কিন্তু তাহাদের বোল, চাল ও অঙ্গভঙ্গী এবং হাত পা নাড়াতে কাহার সাধ্য যে তাহাদের সর্ব্বজ্ঞ না বলিয়া বাঁচিতে পারে। আর এক

দল লোক আছেন যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ব জানেন, প্রকৃত রসজ্ঞ ও রসগ্রাহী এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী কিন্তু তাঁহারা প্রায় কোন কথা বলেন না এবং বলিবার সাবকাশ পান না, এবং অল্প স্বল্প বলিলেও তাহা কাহারও কানে যায় না। যে দেশে আকাশব্যাপী ভেকের শব্দের লহরী চলে; সে দেশে কি কোকিলের কলকণ্ঠ বিনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত শুনা যায়? জোটের কিন্তু কোন কথা মনে লাগে না। আমার মনে একটী উপদেশ গাঁথিয়া আছে, একটী সূত লেগে আছে, আমার গুরুদেব যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই আমার মনে লাগিয়া আছে। তিনি বলিয়াছেন যে এ সংসার হরিলীলা স্থান, তিনি একটু অঞ্জন আমার চক্ষে লাগাইয়া দিয়াছেন তাহাতেই আমি এই সংসারটীকে বাড়ীর মত দেখি। এই বাড়ীর প্রত্যেক মহলে শ্রীহরি নানা লীলা করিতেছেন; কোন মহলে প্রেমে মত্ত হইয়া প্রেমিক ভক্তদিগের সঙ্গে হাসি ও খেলা করিতেছেন; কোন মহলে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ধরিয়া যোগীদের কাছে আছেন এবং কর্ম্মীদের সঙ্গে মিলিয়া সংসারের নানা কার্য্য করিতেছেন। গুরুর প্রসাদে শুনিয়াছি যে এ সংসার ধোঁকার টাটী নয় কিন্তু মজার খুটী এখানে বসেই আমি মজা লুটি। তাঁহার প্রসাদে জানিয়াছি এখানে বিপদ, সম্পদের; এবং দুঃখ, সুখের কারণ এবং মৃত্যু অমৃতের সোপান এবং মৃত্যুর দ্বারাই মানুষের মৃত্যুর মৃত্যু হয়, জীবিতের ইহকাল পরকাল এক হইয়া যায়; দেহের মায়া কেটে যায়, এবং অমৃত ধামে অমৃত পুরুষের সঙ্গে মিলে ইহ পরলোকে বিচরণ করে।

মহিলার পাঠিকাদিগের কি আমার কথায় বিশ্বাস হয়? যদি হয় তবে তাঁহারা ইহলোকে স্বর্গ সম্ভোগ করিতে পারিবেন। কিন্তু একটা কাজ করিতে হইবে; দীন ভাবে একাগ্র চিত্তে "সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম, আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ শুদ্ধমপাপ বিদ্ধম্" এই মন্ত্রটী সাধন করিতে হইবে, এবং এই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যখন যাহা ইঙ্গিত করিবেন তাহা অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবেন. সামান্য চেষ্টায় সিদ্ধিলাভ হইবে, কারণ তিনি বিদুরের খুদগ্রাহী এবং দ্রৌপদীর শাকগ্রাহী দেবতা অপেক্ষাও অধিক করুণাময় ও সহজ লব্ধ।

"হরি আমার বড় দয়াময়। মনে হলে, পাষাণ গলে, দুনয়নে প্রেমধারা বয়। আহা কিবা ভালবাসা, না চাহিতে পূরে আশা, চাহিতে তাই বড় লজ্জা হয়। এই নিবেদন, করি এখন, যেন তাঁর পদে হই লয়।"

কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কিরূপে জীবের সেবা শুশ্রূষা করিতে হয়, তাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইংলণ্ডে রোগীর শুশ্রূষার কার্য্য (nursing) অতি ঘৃণার ব্যাপার ছিল। নিকৃষ্ট শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা এই কার্য্যে ব্যবহৃত হইত

এবং তাহারা উপযুক্ত রূপে শুশ্রূষার কার্য্য করিতে সক্ষম ছিল না। কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল সাংসারিক সুখ শান্তির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পীড়িত ও আহত ব্যক্তি-দিগের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করি-লেন। এই কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করার জন্য কেইসারওয়ার্থ নগরে গমন করেন ও তথায় কয়েক মাস শিক্ষা করিয়া তিনি ফ্রান্সের অন্তর্গত প্যারিসনগরের একটি ভগ্নী সম্প্রদায়ের নিকট সেবা ব্রত শিক্ষার জন্য গমন করেন। তৎকালে (১৮৫১ সালে) প্যারিসে সুবৃহৎ প্রদর্শনী হইতেছিল। এখানে শুশ্রূষা কার্য্য শিক্ষা করিয়া ইংলণ্ডে একটি স্বাস্থ্যালয়ে সেবাব্রত আরম্ভ করিলেন। এই স্বাস্থ্যালয়ে তিনি তিন বৎসর অক্লান্ত ভাবে পীড়িতা মহিলা-দিগের সেবা করিলেন এবং ইহার অনেক উন্নতি সাধন করিলেন। ক্রমাগত পরিশ্রম চিন্তা ভাবনায় তাঁহার নিজের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল এবং স্বাস্থ্য লাভের জন্য তিনি কিছু দিন গৃহে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন এমন সময় তাঁহার জীবনের মহাব্রত গ্রহণের সময় উপস্থিত হইল। যে কার্য্যের জন্য তিনি পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া ছেন, সমস্ত সভ্য জগতে দেবীর ন্যায় সম্মানিত হইয়াছেন, সেই পবিত্র স্বর্গীয় কার্য্য সাধনের জন্য তিনি ভগবানের পবিত্র আহ্বান লাভ করিলেন। অনেক দিন ইউরোপে শান্তি বিরাজ করিতেছিল, কিন্তু ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রুসিয়া ও তুরস্কের মধ্যে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স এই যুদ্ধে তুরস্কের সহায়তা করেন। এই যুদ্ধ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে অভিহিত। প্রত্যেক আহত ও পীড়িত সৈন্যদিগের দুর্গতির একশেষ হইয়া থাকে, কিন্তু এই যুদ্ধে ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতি আহত ও পীড়িত সৈন্যদিগের বর্ণনাতীত ক্লেশ হইয়াছিল। তাহাদের ভীষণ যন্ত্রণার লোমহর্ষণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ইংলণ্ডের লোক চমকিত ও ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রিমিয়াতে লোক সকল যুদ্ধে আহত হইত কিন্তু কৃষ্ণসাগরের অপর পারে স্কুটরী (Scutari) নামক স্থানে হসপাতাল ছিল। সৈন্যদিগকে তরঙ্গায়িত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া হাসপাতালে লইয়া যাইতে হইত। দুইটি লম্বা ঘরে হাসপাতাল ছিল। সময় সময় তাহাতে চারি হাজার রোগী থাকিত। রোগীদের দুর্দ্দশার সীমা নাই, লাগালাগি ভাবে রোগীদিগকে রাখা হইয়াছে, আহত, জ্বরাক্রান্ত ওলাউঠা প্রভৃতি পীড়িত সৈনিকগণ পড়িয়া রহিয়াছে। কেবা তাহাদের সেবা করে, কেবা তাহাদের দুঃখ দুর্গতি দূর করে, দেখিলে বোধ হইত যেন রোগীই রোগীর সেবার জন্য মুমূর্ষের মুমূর্ষুই সেবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছে।

সৈনিকদিগের এতাদৃশ দুর্দ্দশার কথা শ্রবণ করিয়া কুমারী নাইটিঙ্গেল তৎকালীন ইংলণ্ডের যুদ্ধমন্ত্রী সিডনী হারবার্ট সাহেবকে নিজে শুশ্রূষা কারিণী হইয়া ক্রিমিয়ায় যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্ব্বক পত্র লেখেন। শ্রীযুক্ত হারবার্ট সাহেব আহ্লাদ সহকারে সম্মতি জানাইয়া পত্রো-ত্তর প্রদান করেন।

দয়ার আশ্চর্য্য শক্তি, কুমারী নাইটীংগেলের অলৌকিক ক্ষমতা। তাঁহার চরিত্রের আকর্ষণে তেত্রিশটী ইংরেজ মহিলা সুশ্রূষাকারিণীরূপে তাঁহার সমভিব্যাহারে সুদূর ক্রিমিয়াতে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সুখস্বচ্ছন্দতা, আমোদ প্রমোদ আত্মীয় স্বজনের সহবাস, পৃথিবীর কত প্রকার সুখের আশা, সকলই কেবল পরসেবার জন্য অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়া চির কুসংস্কার পদ দলন করিয়া এই কয়েকটী মহিলা লইয়া দয়াবতী রমণী ক্রিমিয়ায় চলিলেন। কি মনোহর দৃশ্য! কি দেবদুর্ল্লভ কার্য্য! এইতো ঈশ্বরের যথার্থ উপাসনা, এইতো প্রকৃত মহাযজ্ঞ, এইতো পরিত্রাণলাভের সোপান। ধন্য দয়াময় ঈশ্বর, ধন্য তোমার কন্যা কুমারী নাইটীংগেল।

ইহারা পরিস্কৃত কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছেদ পরিধান করিয়া এই পবিত্রতীর্থ যাত্রায় অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা সৈনিকদিগের ভীষণ দুর্গতি নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমদুঃখে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। আহত সৈনিকদিগের বিকট আঘাত ধৌত ও পরিস্কৃত, তাহাদের বস্ত্র শেলাই ও ডাক্তারের সাহায্য করিতে লাগিলেন। চারিদিকে কেবলই বিশৃঙ্খলা দেখিয়া কুমারী নাইটীংগেল তাহা বিদূরিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি অবিলম্বে রোগীদিগের রক্ষাগার প্রস্তুত করাইলেন। বস্ত্রাদি ধৌত করার জন্য স্বতন্ত্র স্থান করিলেন এবং প্রাণ মন দিয়া রোগীদিগের সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন সেখানে ক্রমাগত দেড় বর্ষ কাল যাপন করিয়া দেবকন্যার ন্যায় সৈনিকদিগের সেবা করিতে লাগিলেন। নিম্নশ্রেণীর ইংরেজ সৈনিকদিগের প্রকৃতি অনেকেই জ্ঞাত আছেন, ইহারা অধিকাংশই নীতিজ্ঞানবিহীন নরশার্দ্দূলবৎ কিন্তু দেবত্বের সংস্পর্শে ইহারাও যেন বশীভূত হইয়া পড়িল। যেখানে অত্যন্ত কঠীন পীড়া, এবং মৃত্যু নিকটে, দেবকন্যা গিয়া সেথাই উপস্থিত। তাঁহার অনুপম পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মুমূর্ষু সৈনিকও শান্তি লাভ করিত। তাঁহার স্বভাব কি সুমিষ্টই ছিল, বাক্য কি অমৃতময়ই ছিল! যেন সাক্ষাৎ মাতৃরূপিণী দেবপ্রতিমা! রজনীতে যখন ডাক্তারেরা নিদ্রার জন্য চলিয়া গিয়াছেন, সমুদায় হাসপাতাল নীরব, সহস্র সহস্র রোগী পড়িয়া রহিয়াছেন, তখন কুমারী নাইটীংগেল একটী ছোট ল্যাম্প লইয়া রোগীদিগকে দেখিবার জন্য বাহির হইতেন।

তাঁহাকে দেখিয়া সকলে পুলকিত ও আশ্বস্ত হইত। সৈনিকগণ তাঁহাকে মাতৃদৃষ্টিতে দর্শন করিতেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি সমুদায় সভ্যদেশে তাঁহার প্রশংসা ধ্বনিতে নিনাদিত হইতে লাগিল। আমেরিকার বিখ্যাত কবি মহাত্মা Longfellow তাঁহাকে "আলোকধারিণী রমণী" নাম দিয়া একটি সুমিষ্ট কবিতা লিখিয়াছিলেন। ক্রিমিয়া হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে সমুদয় ইংরেজ জাতি তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান ও সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি পরিচিত কি সম্মানিত হইতে ভাল বাসিতেন না। স্ত্রী জাতিসুলভ

লজ্জাশীলতা তাঁহার চরিত্রের অলঙ্কার ছিল।

পৃথিবীর নানা স্থানের হাসপাতাল প্রভৃতির কার্য্যবিষয়ে তিনি সর্ব্বদা মনোযোগী ছিলেন। যদিও ক্রিমিয়ার সেবা করিতে গিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তথাপিও দীন দুঃখী পীড়িত লোকদিগের হিত চিন্তা ও হিত সাধন করিতে কদাচ বিস্মৃত হইতেন না। যখন ফ্রান্স ও জারমণীর মধ্যে যুদ্ধ হয়, তখন পীড়িত সৈনিকদিগের কিরূপে শুশ্রূষা করিতে হইবে তদ্‌বিষয়ে নানা প্রকাব সুপরামর্শ প্রদান করেন। যেখানে দুঃখ যাতনার কথা তিনি শুনিতেন তাহাতেই তিনি ব্যাকুল হইতেন। ইংলণ্ডের মহারাণী ভারতেশ্বরী স্বর্গীয়া ভিক্টোরিয়া দেবী মিস নাইটিংঙ্গেলকে মূল্যবান পুরস্কার প্রদান করেন। তাঁহারই নামে "Nightingale Home" স্থাপন জন্য ৭৫০ সাড়ে সাত কোটি টাকা প্রদান করেন। তদ্দ্বারা একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শুশ্রূষাকারিণী প্রস্তুত করাই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। এই আশ্রমটী অতি মনোহর এবং বর্ষে বর্ষে কত সুশিক্ষিতা শুশ্রূষাকারিণী প্রসব করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন এবং কুমারী নাইটীংঙ্গেলের অমরকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কুমারী নাইটীংঙ্গেল জগতের বন্দনীয়া। ভারতরমণীগণ কি ইহার পবিত্র চরিত্র পাঠ করিয়া ইহার পদানুসরণ করিতে অভিলাষ করেন না? আমাদের বিশ্বাস এই পুণ্যকীর্ত্তি অবগত হইলে ভারত রমণীগণ ইহার পদানুসরণ করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। ভগবান্ আর্য্য নারীদিগের হৃদয়ে শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করুন ও এই ভাগ্যবতী মহিলার আদর্শ গ্রহণে তাঁহাদিগকে স্বদেশের সেবা করিতে প্রবৃত্ত করুন। ভগবান্ পতিত ভারতের সহায় হউন।

(লিজি এনিরিজ কৃত গ্রন্থাবলম্বনে এই জীবনী লিখিত হইল।)

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে লর্ড বিশপের মন্তব্য।

১৮৮৩ সালে ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক দানোপলক্ষে লর্ড বিশপ জনসন সাহেব স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে নিজের উচ্চ মন্তব্য প্রকাশ করেন। ১০ সংখ্যক অপার সার্কুলার রোডে উক্ত কলেজ গৃহে পুরস্কার দানের সভা হয়, উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক দান করা হইয়াছিল। অধ্যাপকদিগের মুখে বক্তৃতা শ্রবণ ও গৃহে অধ্যয়ন করিয়া তাঁহারা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। লর্ড বিশপ সেই সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন। অনরেবল্ মিষ্ট্রেশ বেয়ারিং পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন। মিষ্ট্রেশ গিবন, মিষ্ট্রেশ গ্রাণ্ড এবং ফাদার লাফোঁ প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন, কলেজের শিক্ষা প্রণালীর বিষয় প্রথমে সকলকে বুঝাইয়া দেন। লর্ড বিশপ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম আচার্য্যজীবন

চরিত পুস্তক অন্য বিবরণ চতুর্থ অংশ হইতে এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—

"নারী শিক্ষা দেশীয় লোকের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সমুচিত। ইংরাজগণ যে সকল সম্পৎ স্বদেশ হইতে লইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা সে গুলি ইঁহাদের সম্মুখে ধরিতে পারেন, ইঁহারা আপনাদের বুদ্ধি ও হৃদয়ের প্রেরণায় অবস্থা বুঝিয়া উহা গ্রহণ ও ব্যবহার করিবেন। নারীগণের শিক্ষা অতি গুরুতর বিষয়। ইহাতে ইয়ুরোপীয়গণের হস্তক্ষেপ করা কখনও উচিত নয়। নারীশিক্ষা প্রয়োজন, ইহা তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারেন। দেশীয়গণ কোন্‌টি গ্রহণীয় বা কোন্‌টি গ্রহণীয় নয়, বিচার করিবেন। ভিক্টোরিয়া কলেজের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, পুরুষোচিত শিক্ষা ইহাতে প্রায় হয় না। নারী সমুচিত শিক্ষা ইহাতে দেওয়া হইয়া থাকে। নারীগণের মধ্যে কেহ বিএ, এম, এ, পরীক্ষা দিতে পারেন কিন্তু ইহা সকলের উপযোগী নহে। এই বিদ্যালয়ে যে সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা উৎকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট নয়, এই কথা হইতেছে না। কেশবচন্দ্র যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইবেন। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পাইলেন, মহিলাগণ আপনারা গৃহে শিখিয়া পরীক্ষা দিয়াছেন। এ অতি প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা। এ প্রণালীর শিক্ষায় এক বৎসরে যদি এরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে, মনে হয় এরূপ শিক্ষা চলিলে অল্প দিন মধ্যে এটি একটি বড় বিদ্যালয় হইবে। তিনি আশা করেন যে, ইয়ুরোপীয় মহিলাগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন।"

স্ত্রী ও পুরুষজাতির মধ্যে কাহারা অধিক পাপ করে ?

আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রমস্থিত মহিলাদিগের সাপ্তাহিক সভা ছিল , সেই সভাতে নানা সমালোচনা হইত। এক দিন উক্ত সমিতি স্থিত মহিলাদিগকে আচার্য্য প্রশ্ন করেন,"বলদেখি স্ত্রী ও পুরুষজাতির মধ্যে কাহারা অধিক পাপ করে ?" একটী মহিলা 'এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন' "জেলখানাসকলের স্ত্রীকয়েদী ও পুরুষ কয়েদীর সংখ্যা গণনা করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, এই দুই জাতির মধ্যে কোন্ জাতি অধিক পাপ করিয়া থাকে ?" বাস্তবিক জেলখানা সকলে এক শত কয়েদীর মধ্যে গড়ে ৫।৭ টি স্ত্রী কয়েদী দেখিতে পাওয়া যায়। চুরী ডাকাতি ও জাল জুওয়াচুরী এবং খুন জখমী করার অপরাধে পুরুষেরা যত কারাবাসী হয়, তাহার তুলনায় নারী দশ ভাগের এক ভাগও নয়। আমাদেরও বাস্তবিক তাহাই ধারণা। ময়মনসিংহনগরে একটী মহিলাকে আমরা বলিয়াছিলাম যে, পুরুষ জাতি অপেক্ষা নারী জাতির চরিত্র বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তিনি এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "এবিষয়ে আপনাদের বড় ভুল। স্ত্রীলোকেরা দুর্ব্বল প্রকৃতি, তাহারা কেবল

সুযোগ ও সাহসের অভাবে প্রকাশ্যে গুরুতর পাপ কার্য্য সকল করিয়া উঠিতে পারে না, শারীরিক অসামর্থ্য ও নানা প্রতিবন্ধক তাহাদিগকে নিবৃত্ত রাখে। নতুবা প্রকাশ্য দুষ্ক্রিয়াতে তাহারা পুরুষাপেক্ষা কখনও নিকৃষ্টরূপে পরিগণিত হইত না। ক্রোধ হিংসা দ্বেষ স্বার্থ পরতাদি নীচ প্রবৃত্তি পুরুষ অপেক্ষা বরং স্ত্রীলোকের অধিক। সবল পুরুষদের চাপে দুর্ব্বলা নারীদিগের সেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল তাদৃশ স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না।"

যাহা হউক আমরা পুরুষদিগের যে রূপ দুষ্ক্রিয়ার অভিনয় দেখিতেছি, তাহাদের পার্শ্বে নারীগণ কখনও কুকর্ম্মে দাঁড়াইতে পারে না। পরমোপকারী জনের প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে ভীষণ কৃতঘ্নতা প্রকাশ, তাহাদের নিন্দাপবাদ রটনা করিয়া জগতে তাহাদিগকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা, এমন কি ক্রুশে বিদ্ধ, করবালের আঘাতে হত এবং অনলে দগ্ধ করিয়া পৃথিবী হইতে তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া, এ সকল লোমহর্ষণ দুষ্ক্রিয়া মহাপাপ যুগে যুগে কাহারা করিয়াছে? নারীগণ, না পুরুষেরা? ইতিহাস ইহার জলন্ত সাক্ষী, এ সমস্ত মহাপাপের প্রবর্ত্তক পুরুষ, কোন কোন নারী যদি তাহাতে যোগ দান করিয়া থাকে, পুরুষদিগের প্ররোচনায় ও উত্তেজনায় করিয়াছে ইহুদি জাতীয় ভাক্ত ধর্ম্মযাজক পুরুষদিগের অন্তরে যদি বিন্দুমাত্র প্রেম ও কৃতজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে জগৎপূজ্য পরমোপকারী দেবাত্মা ঈশা নানা প্রকারে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হইয়া ক্রুশে নিহত হইতেন না, মহাপুরুষ মোহম্মদ স্বীয় জ্ঞাতি কুটুম্বগণ কর্ত্তৃক নানারূপে প্রপীড়িত হইয়া সদলে জন্ম ভূমি হইতে বিতাড়িত হইতেন না; নির্ব্বাণধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহামুনি বুদ্ধদেবের অনুবর্ত্তী ধর্ম্মাত্মা শিষ্যগণের নিষ্ঠুর হিন্দুগণকর্ত্তৃক বিষম লাঞ্ছনা ও ভারতবর্ষ হইতে নিষ্কাশন হইত না। খ্রীষ্ট শিষ্যগণ দেবপ্রেরণায় জগতের উপকার করিতে যাইয়া দলে দলে ক্রুশে হত, অনলে দগ্ধ সিংহ শার্দ্দূলাদি হিংস্র পশুর কবলগ্রস্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, দুরাত্মা পুরুষদিগের এ সকল কীর্ত্তি ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পুরাকালে যে কেবল এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে এক্ষণ হয় না, তাহা নয়, এই জ্ঞানসভ্যতাসমুন্নত বর্ত্তমান কালেও কৃতঘ্ন দুর্ব্বিনীত দলের মুখপাত্র পুরুষেরা সাধু মহাজনদিগকে বধ করিতে ত্রুটি করিতেছে না; তবে রাজশাসনের ভয়ে তাঁহাদের পবিত্র দেহে অস্ত্র চালনা করিতে সাহসী হয় না, তাহাদের তীব্র অস্ত্র সংবাদ পত্র ও রসনা। সাংবাদ পত্রে ও বক্তৃতায় অজস্র সাধুনিন্দা ও সাধুর অপবাদ রটনা করিয়া তাহারা তাঁহাকে জগতে আধ্যাত্মিকভাবে নিহত করিতে ও লোকের নিকটে শ্রদ্ধা বিবর্জ্জিত ও অবিশ্বাসভাজন করিতে কিছু মাত্র ত্রুটি করিতেছে না। সাধুর সদ্গুণ সকলকে গোপন, গুণকে দোষ বলিয়া প্রখ্যাপন, তিল প্রমাণ দোষ দুর্ব্বলতাকে পর্ব্বতাকার করিয়া লোকের চক্ষে ধারণ সাধু নিন্দাকারী পাষণ্ড লোক-

দিগের জীবনের কার্য্য। তাহারা বিচারকের আসনে স্বতঃ উপবিষ্ট হইয়া সাধুর বিচার করে, তাহাকে মারে, কাটে ও দণ্ড দেয়, এবং নির্ব্বাসিত করিয়া থাকে। উপকার স্বীকার ও কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে সাধু মহাজনদিগের প্রতি তাহাদের এই দুর্ব্যবহার। অকৃতজ্ঞ গর্ব্বিত পুরুষ ব্যতীত কয় জন স্ত্রীলোক এরূপ দুষ্ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত হয়, এবং এক তরফা সাধুবিচারে নিযুক্ত হইয়া থাকে?

আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মাঘোৎসবে প্রারম্ভিক সাধনোপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক ও উন্নতিসাধক পরমোপকারী বন্ধু মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, ১৮০২ শক ১৮ই পৌষ ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহাতে সাধুর গুণ গ্রহণ করিব, আমরা সাধুর বিচার করিবার অধিকারী নহি, এই মর্ম্মে যে কতক গুলি কথা বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ "মাঘোৎসবনামক" পুস্তক হইতে গৃহীত হইল ;—

"ধর্ম্মে সুপণ্ডিত, বিচারপতির আসনে বসিয়া ঈশা, মুসা, গৌরাঙ্গ, নানক প্রভৃতিকে যৎপরোনাস্তি কঠোর পরীক্ষা করিয়া দণ্ডনীয় করে; করে করুক, মারে মারুক, আমাদিগের সম্বন্ধে সাধু বিচারের অধিকার নাই। আর যে কেহ থাকুক, বিচার করিতে আমি নাই। আমি সামান্য লোককেও কখন বিচার করি নাই। দুষ্ট রসনা তুমি এত দম্ভে স্ফীত? তুমি সাধুদিগকে বিচার কর? সাবধান! রসনা, গুরুনিন্দা মহাজনবিচার হইতে আপনাকে রক্ষা কর। পৃথিবী যাহাদিগের দ্বারা উপকৃত, তাহাদিগের উপকার স্মরণ করিবে। আমাদিগের হস্ত পদ জিহ্বা বদ্ধ। আমাদিগের দৃষ্টি ভক্ত-চরণে, উপকারী বন্ধুর হস্তের প্রতি। যদি কেহ বলে, অমুক সাধু কি এই দোষে দোষী ছিলেন না? আমরা বলিব ভগবানের নিকটে বিচারনিষ্পত্তির ভার। মলিন জীব আমরা কেন সাধুনিন্দা করিব? যদিও সাধুর ত্রুটি থাকে, কোন্ সাধুর ত্রুটি নাই? আমরা সরলা ভক্তিকে কেন মলিন করিব? তাঁহাদিগের গুণ লইতে ঈশ্বর আমাদিগকে বলিয়াছেন। ঈশ্বর বলিয়াছেন, 'প্রেরিতে প্রেরিতে অনৈক্য থাকিবে, দণ্ড দিতে হয় আমি দিব। তুমি কৃতজ্ঞ হইয়া উপকার লইবে, তাহাদের হস্ত হইতে ঈশ্বরের ধন গ্রহণ করিবে।' বুদ্ধিমানেরা বিচার করিতে চায় বিচার করুক, যেখানে যেখানে দোষ আছে প্রদর্শন করুক। আমরা কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞায় বেদকে, বাইবেলকে, কোরাণকে, ঈসা, মুসা, নানক বুদ্ধ এবং রামমোহনকে নমস্কার করিব।" ইত্যাদি।

রাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া রাজ্য বিপ্লব ঘটাইয়া অবিনীত উদ্ধত পুরুষেরাই প্রজা পুঞ্জকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া থাকে, ও রাজ্যের অমঙ্গল বিধান করে, কোমল প্রকৃতি স্ত্রীজাতি নয়। এদেশের প্রজাবৃন্দ রাজভক্ত বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে দেখা যায় রাজার

যত দোষ ত্রুটি থাকুক না কেন, তিনি অন্যায়াচারী অত্যাচারী হইলেও প্রজাগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে। পিতা মাতার দোষ ত্রুটি থাকিলেও উপকৃত সন্তান তাঁহাদিগকে ভক্তি করে, তাঁহাদের দোষ ঘোষণা ও আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগকে লোকের নিকটে অপদস্থ করে না, ইহা যেমন স্বাভাবিক, তদ্রূপ পিতৃস্থানীয় রাজার সম্বন্ধেও প্রজার সেই ভাব রক্ষা করাই স্বাভাবিক। যে রাজার শাসনাধীনে থাকিয়া আমরা নানা প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, সুখস্বচ্ছন্দে কুশলকল্যাণে জীবন যাপন করিতেছি, তৎকৃত উপকার স্বীকার ও তাঁহার গুণ গ্রহণপূর্ব্বক দোষ ত্রুটি আলোচনা না করিয়া তাঁহার বাধ্য ও অনুগত থাকা এবং তাঁহাকে ভক্তি করা একান্ত সমুচিত। রাজাকে বা রাজপ্রতিনিধিকে অমান্য ও অভক্তি করিলে তাঁহার নিয়োগকর্ত্তা রাজাধিরাজ ঈশ্বরকে অমান্য ও অভক্তি করা হয়। কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, কেবল আইন মান্য ও রাজবিধি স্বীকার করিয়া চলিলে রাজভক্তি হয় না, রাজাকে ব্যক্তিগতভাবে প্রমত্ত ভক্তি অর্পণ করিতে হইবে, ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশকে মস্তক অবনত করিয়া মান্য করিতে হইবে। তুমি শাসনকার্য্যে রাজা ও রাজপ্রতিনিধি এবং রাজপুরুষদিগকে সৎপরামর্শদানে সাহায্য করিতে পার, তাঁহাদের আদেশ ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চলিলে ও তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিলে তাঁহাদের প্রতি লোকের মনে বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধভাব জন্মাইয়া দিলে তুমি ঘোরতর অপরাধী। দুঃখের বিষয় স্বাভাবিক রাজভক্তির ঘোরতর বিপরীত ভাব—রাজা রাজপ্রতিনিধি ও রাজ পুরুষদিগের প্রতি বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধ ভাব এক্ষণ এদেশের লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে। সেনাপতি * বাবু ও তাঁহার অনুগামী স্বদেশোদ্ধারকারী সেনাগণ যাহা বলুন না কেন, ভক্ত কেশবচন্দ্রের এই মত যে, দোষ ত্রুটির আলোচনা না করিয়া রাজা ও রাজপ্রতিনিধিদিগকে কেবল ভক্তি করা তাঁহাদের বিধি ব্যবস্থা ও আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকা। কেশবচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত নববিধান ধর্ম্মের মূল মতের অন্তর্গত রাজভক্তি। স্কুলের অবোধ বালকগণপর্য্যন্ত স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশ হিতৈষিতার গর্ব্ব করিয়া আজ কাল রাজবিরোধী হইয়া দাঁড়াইতেছে। খ্যাতিমান বিদ্বান্ ও বাগ্মী লোকদিগের স্বদেশপ্রেমের প্রবল বন্যায় স্বদেশ উৎসন্ন হইবার উপক্রম। কোন্ যুগে এদেশের লোকেরা রাজপ্রতিনিধি ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগকে "শূওয়র" "গাধা" "ফুল ফুলার" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে? এক্ষণ বাঙ্গালীরা তাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আইন কানুন ও রাজাজ্ঞা ও রাজবিধি অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেছে; বক্তা ও লেখকদিগের কুশিক্ষার ফলে স্কুলের বালকগণ নীতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া শিক্ষকের অবাধ্য হইতেছে, বিদ্যালয়ের নিয়ম বিধি অগ্রাহ্য ও অমান্য করিয়া চলিতেছে। ফল এই হইতেছে যে, রাজকীয় আদেশে তাহারা দণ্ডিত ও স্কুলকলেজ হইতে তাড়িত এবং চির জীবনের জন্য গবর্ণমেণ্টের কাজ পাইবার আশা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

যে কোন শিক্ষক সেই নীতিভ্রষ্ট উচ্ছৃঙ্খল বালকদিগের পক্ষসমর্থন করিয়াছেন, তাঁহারাও দণ্ডিত হইয়াছেন। এই রূপ ফল হইয়াছে যে, বাঙ্গালী কৃতবিদ্য হিন্দু যুবকদিগের গবর্ণমেণ্টের কাজ পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। তাহাদের স্থানে মোসলমানগণ নিযুক্ত হইতেছে। বাঙ্গালী হিন্দুগণ ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অবিশ্বাস ভাজন হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ব্বল প্রজা এরূপ রাজশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে, রাজার সঙ্গে প্রজার সঙ্ঘর্ষণ ঘটিয়াছে, এদেশে আর কখনও শুনা যায় নাই। এদেশের পক্ষে বিষম দুর্ভাগ্য উপস্থিত। ইহার কুফল বহুকাল ভোগ করিতে হইবে। কেশবচন্দ্র কখন কখন বিজেতা ইংরাজ জাতির দোষ দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তীব্র রূপে অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়াছেন, বিশেষ ভাবে নয়, বন্ধুভাবে, সাধারণভাবে। তিনি কৃতজ্ঞতাভারে অবনত ছিলেন, রাজপ্রতিনিধি ও রাজপুরুষদিগের বিরুদ্ধে লিখায় বা কথায় কখনও তীব্রতা প্রকাশ করেন নাই। তিনি চির বিশ্বস্ত রাজভক্ত প্রজা ছিলেন। মাতৃগণ, ভগিনীগণ, তোমরা সুকোমল ভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা, অবাধ্যতা ও অনীতির পথ হইতে আপনাপন বালকবালিকাদিগকে আকর্ষণ করিয়া তাহাদের কল্যাণ সাধন ও ভাবী অমঙ্গলের পথ অবরুদ্ধ কর। আমরা জানি তাহারা অনেকে তোমাদের অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি চেষ্টা যত্ন করিয়া দেখ। শুভ চেষ্টা ফলবতী হইবে।

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

(রাওলপিণ্ডীনগরে গমন।)

বিগত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বেলা ১০ টার গাড়ীতে হিমাচলশৃঙ্গ শিমলা শৈল হইতে রাওলপিণ্ডী অভিমুখে যাত্রা করা যায়। শিমলা হইতে রাওলপিণ্ডী কয় শত মাইল দূরে, নিশ্চিত জানা নাই। আমরা পর দিন মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার সময় রাওলপিণ্ডী ক্যানেটন্‌মেণ্টে পঁহুছিয়াছিলাম। শিমলা হইতে যাত্রা করিয়া সেই দিন সায়ংকালে অম্বালায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আমরা পঞ্জাবের ট্রেণে আরোহণ করি, এই ট্রেণের গতি পেশওয়ার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আমরা ইণ্টার ক্লাসের গাড়ীর এক প্রকোষ্ঠে কয়েক জন মোসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে স্থিতি করিয়াছিলাম। তাঁহারা আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। প্রত্যূষে লাহোর নগরে পঁহুছান যায়। সেই স্থানে ট্রেণ প্রায় এক ঘণ্টা স্থিতি করে। আমরা অপরাহ্লে বিশাল রেলওয়ে সেতু যোগে ঝিলম নদ পার হই। ঝিলমের অন্যতর নাম বিতস্তা। বিতস্তা সমুচ্চ কাশ্মীরপর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইয়া সিন্ধুনদের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে। বিতস্তার তীরে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর। ঝিলমের সুবিস্তৃত পরিসর, এক শত স্তম্ভের উপর তদুপরি সেতু নির্ম্মিত। পঞ্জাবের অন্যান্য নদী অপেক্ষা এই নদীর গভীরতা অধিক বোধ হইল। ঝিলমের অপর কূলে ঝিলমনগর ও বৃহৎ ষ্টেশন। সেই ষ্টেশনে নানা

প্রকার ফল ও মিষ্টান্নাদি পাওয়া যায়। তখন অত্যন্ত গ্রীষ্মোত্তাপ ছিল, পঞ্জাবের প্রায় সকল ষ্টেশনেই শরবত ও বরফ বিক্রয় হইতেছিল। গুজরাণওয়ালা প্রভৃতি কয়েকটি নগর উপনগর ও জংশন অতিক্রম করিয়া আমরা ঝিলমে পঁহুছিয়া ছিলাম। আমাদের গাড়ীতে এক জন কাবোলী ভদ্র লোক ছিলেন। ২২ দিন হইল তিনি কাবোল ছাড়িয়া দিল্লীতে গিয়াছিলেন। লাহোর নগরের ষ্টেশনে তিনি কি উদ্দেশ্যে এদেশে আসিয়াছেন, পুলিশ আসিয়া তাঁহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া অনুসন্ধান লইয়াছিল। কাবোলী হইলেও তিনি অতিশয় শান্ত মিষ্টভাষী ভদ্রলোক। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যখন কাবোল পরিত্যাগ করি, তখন কাবোল বরফে আচ্ছন্ন ছিল, এদেশে আসিয়া যেন আমি জলন্ত চুল্লীর উপর বাস করিতেছি। এত উত্তাপ আমি কখনও ভোগ করি নাই।" পারস্য ভাষায় লিখিত কাবোল রাজ্যাধিপতির ফরমাণ (ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার অধিকারপত্র) তাঁহার সঙ্গে ছিল, তিনি আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "হোকোমনামা ব্যতীত কাবোল হইতে এদেশে, এবং এদেশ হইতে কাবোলে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না।" তিনি বলিলেন, "আমি আজ পেশওয়ারে যাইতেছি, পেশওয়ার হইতে ১৪ মাইল দূরে জম্‌রুদ পর্য্যন্ত ট্রেণে পঁহুছিয়া পরে অশ্বারোহণে কাবোল রাজধানীতে যাইব, ১২দিনে সেথানে পঁহুছিব।" উক্ত কাবোলী ভদ্র লোক কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, "এদেশের লোকের বড় মন্দ অভ্যাস, তাহারা চায়ের জল পান করে, এবং পুনঃ পুনঃ তামাক খায়।" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, কাবোল শীতপ্রধান স্থান, তত্রত্য অধিবাসিগণ কি শারীরিক উত্তাপবৃদ্ধির জন্য চা পান করে না? তিনি বলিলেন, "এত দিন কাবোলে চায়ের ব্যবহার ছিল না, এক্ষণ সে দেশে চা পান আরম্ভ হইয়াছে। চা তামাকাদি সেবনে কোন ফল নাই, কেবল অপব্যয় হয়।" চা তামাকাদির প্রতি তাঁহার অতিশয় বিরাগ দেখা গেল।

রাউলপিণ্ডির অনতি দূরে তরুলতাদিশূন্য কতক গুলি মৃণ্ময় উপশৈল এবং কয়েকটি পার্ব্বত্য সুড়ঙ্গ অতিক্রম করা গেল। আমরা রাউলপিণ্ডিতে পঁহুছিয়া বাঙ্গালী পল্লীতে শ্রীমান্ বিনয়চন্দ্র মজুমদারের আবাসোদ্দেশ্যে যাত্রা করি। পূর্ব্বে পত্র লেখা হইয়াছিল। আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, ষ্টেশনে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব। কিন্তু আফিস হইতে ফিরিয়া আসিতে তাঁহার বিলম্ব হইয়াছিল। তিনি ষ্টেশনাভিমুখে ছুটিয়াছিলেন, পথে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। রাউলপিণ্ডি ষ্টেশনে বিদেশী নূতন লোকের প্রতি মুটে ও টাঙ্গা গাড়ওয়ানদিগের জুলুম কম নয়। বিনয়চন্দ্রকে ষ্টেশনে উপস্থিত দেখিলে, তাহারা তত ব্যতিব্যস্ত করিয়া আমাদিগের হইতে অধিক পয়সা আদায় করিতে পারিত না।

মহিলাদিগের রচনা।

মেজদাদা।

(ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে লিখিত।)

গিয়াছ চলিয়া চির সুখময়
শান্তিপূর্ণ পরলোকে,—
আজি, ব্যথিত উচ্ছ্বাসে নয়নের জল
পড়িছে তোমার শোকে!
আজি ভ্রাতৃ দ্বিতীয়াতে মেজদা তোমারে
পড়িছে কেবল মনে,
উদ্দেশে তোমার এ বিশেষ দিনে
প্রণমি ও শ্রীচরণে।
আর বৎসরেতে এমনি দিনেতে
ছিল হৃদি প্রীতিপূর্ণ—
আজি, কালের প্রবাহে সে আনন্দ আশা
হইয়া গিয়াছে চূর্ণ!
মনে পড়িতেছে কেবলই তোমার
হাসিমাখা মুখ খানি,
ঘোর ব্যাধি মাঝে না হয়ে কাতর
মুখে দয়াময় বাণী।
এত ধৈর্য্য শান্তি রোগ যাতনায়
দেখি নাই কভু হায়!
সে যাতনা মনে কল্পনা করিতে
হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়!
আজিকে তোমার সব দুঃখ ক্লেশ
হয়ে গেছে অবসান,
পরম পিতার চরণেতে গিয়া
করিছ অমৃত পান।
বৃদ্ধ পিতা মাতা পত্নী প্রেমময়ী
শিশু সে বকুল ফুল,
ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ ভগ্নী স্নেহময়ী
ধরাতে শোভা অতুল!
এমন স্নেহের বন্ধন কাটিয়া
ত্যজি এ স্নেহের ভূমি,
কোন্ সুখের স্থান দেখিয়া নয়নে
ভুলিয়া রয়েছ তুমি?
"বঙ্গের উদ্যানে পারস্য কুসুম"
লিখিতে প্রয়াসী ছিলে
সে আশা জীবনে না হতে পূরণ
সহসা চলিয়া গেলে!
পর উপকার করিবারে সদা
আকুল হইতে প্রাণে
সে ব্যথার ব্যথী বন্ধুরে হেরিতে
আসিল না বন্ধুজনে
সুসময়ে শুধু বন্ধুনামধারী
সার মাত্র নরদেহ
পশুত্বে হৃদয় পরিপূর্ণ হায়!
তারা কি মানব কেহ?
শেষ সময়েতে কি আলোক জ্যোতি
দেখিয়া কহিলে হাসি,
জননী গো দেখ কি মধুর শোভা
কি সুন্দর আলো রাশি।
আর আমি হেথা থাকিব না মাগো
বাড়ী যাবো কবে বল?
'মহর্ষির' মত শেষ আকিঞ্চণ
হৃদয়ে পূরণ হল!
আজি সব কথা জাগিয়া হৃদয়ে
কাতর হতেছে প্রাণ!
শোকদগ্ধ এই অন্তর মাঝারে
দাও প্রভু শান্তি দান!

শোকার্ত্তা ভগিনী।—

—০—

বাঁকিপুরস্থ নারীসমিতি।

অদ্য "অঘোর নারীসমিতির" জন্ম

দিন। মঙ্গলময়ের কৃপায় এই ক্ষুদ্র সমিতি ধীরে ধীরে একাদশ বৎসরে পদার্পণ করিল। স্বর্গগতা দেবী অঘোর কামিনী এই সমিতির স্থাপয়িত্রী। তাঁহার কোমল প্রাণ দুঃখীর দুঃখে দুঃখিত হইল। সেই দুঃখ যৎকিঞ্চিৎ নিবারণার্থ গুটি কয়েক ভগিনীকে লইয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই আগষ্ট এই নারীসমিতির প্রথম অধিবেশন হইল। তাঁহারই চেষ্টা ও উৎসাহে ৪২ জন স্থানীয় মহিলা সমিতির সভ্য শ্রেণী-ভুক্ত হইলেন; এবং মাননীয়া শ্রীমতী মুক্তকেশী মজুমদার মহাশয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও শ্রীমতী সরলাবালা রক্ষিত বি, এ. সম্পাদিকা ও শ্রীমতী সুসার বাসিনী তাঁহার সহকারী হয়েন, এবং অঘোর কামিনী নিজে চাঁদা আদায়ের ভার গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু খ্রীষ্টান প্রভৃতির অন্তঃপুরে যাইয়া অন্তঃপুরিকাদিগকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত এবং চাঁদা সংগ্রহ করিতেন। সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল "জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে নারী ও শিশুগণের শরীর মন ও আত্মার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধন করা"। অন্নদান, বস্ত্রদান, চিকিৎসা, সেবা, বিদ্যাদান ও চরিত্রদান প্রভৃতি উপায় দ্বারা উপরি উক্ত উদ্দেশ্য সাধিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কোন সভ্যের গোচরে কোন আশ্রয়হীন অসুস্থ, সাহায্যপ্রার্থী ও আপন্ন লোক আসিলে তিনি তাহা সমিতির নিকট জ্ঞাপন করি-তেন। সেই সময়ে যত প্রকার অভাবগ্রস্ত নারী এবং শিশু, সভ্যাদিগের সম্মুখে উপ-স্থিত হইত, তাহাদের সকল প্রকার অভাব সমিতি যথাসাধ্য মোচন করিতেন। এক-বার ফরিদপুরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, সমিতি যথাসাধ্য সাহায্য করিলেন। যদি কোন দুঃখী রোগী আসিত সমিতি হইতে সে ঔষধ পথ্য সকলি পাইত। এই সকল রোগীর চিকিৎসার জন্য এক জন উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রায় বৎসরাবধি শ্রীমতী সরলাবালা রক্ষিত সম্পাদিকার কার্য্য করেন, কিন্তু তিনি কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরিত হওয়াতে শ্রীমতী নরেশনন্দিনী পাল সম্পাদিকাপদে নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার সময়ে ১৭ই আগষ্ট ১৮৯৫ সালে অঘোর কামিনী বার জন সভ্যের মতে Lady Eliot এবং Mr. and Mrs. M. M. Ghosh এই তিন জনকে রেলগাড়ীতে অত্যাচরিত রাজবালার অত্যা-চারের প্রতিবিধানের জন্য তিন খানি পত্র লেখেন, এই সমিতির চেষ্টায় ক্রমে বাঁকি-পুরে তৃতীয় শ্রেণীর স্ত্রীলোক আরোহীর জন্য ভিন্ন বিশ্রামের ঘর প্রস্তুত হয়। আট নয় মাস কর্য্যের পর শ্রীমতী নরেশনন্দিনী সম্পাদিকার কার্য্য হইতে অবসর লয়েন, এবং শ্রীমতী তরুলতা ঘোষ উক্ত কার্য্য-ভার গ্রহণ করেন। এই রূপে অঘোর কামিনীর অশেষ উদ্যম উৎসাহে সমিতির কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছিল, কিন্তু হায়! দুই বৎসরকাল অতিক্রম হইতে না হইতে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই জুন তারিখে সমিতি অকালে মাতৃহারা হইল। মনে করিলাম এ শিশু সমিতি বুঝি আর বাঁচিল না। কি করিয়া বাঁচিবে? কিন্তু সমিতির ভগ্নীগণ এই অসহায় সমিতিকে ক্রোড়ে

তুলিয়া লইলেন, এবং তাঁহাদের চেষ্টা, যত্নে সমিতি মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলেন। ভগ্নীগণ স্বর্গগতা দেবীর স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ ব্যস্ত হইলেন, দরিদ্র সমিতি হইতে কোন চিহ্ন স্থাপন করিতে না পারিয়া পূর্ব্ব "নারী-সমিতি" নামের পরিবর্ত্তে "অঘোর নারী-সমিতি" নাম দান করিলেন। এই সময়ে তরুলতা ঘোষ সম্পাদিকার পদ হইতে অবসর লইলেন; এবং শ্রীমতী হেম কুসুম মল্লিক উক্তস্থান গ্রহণ করিলেন। বিগত নয় বৎসরকাল ইনি এই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। দরিদ্র-সমিতি এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ নয়! যথাসাধ্য দূরে নিকটে অনাথা, নিরাশ্রয়া, অভাবগ্রস্তাদিগের সাহায্য করিতেছেন। কেবল বাঁকিপুরে নয়, ছাপরা, দানাপুর, বারাকপুর, কলিকাতা, হাবড়া, সারাঘাট, লক্ষ্ণৌ, বৈদ্যনাথ ইত্যাদি অনেক স্থানই ইহার নিকট অল্লাধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রতি বৎসর শীতক্লিষ্ট লোকদিগের শীতনিবারণার্থ চাদর বা কম্বল বিতরণ করা হইতেছিল। গত ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর হঠাৎ সমিতির সহকারী সম্পাদিকার পরলোক গমনে ইহার কাজ কর্ম্ম বৎসরাবধি বন্ধ ছিল। কিন্তু সমিতির ভগিনীগণ পুনরায় জাগরিত হইয়া ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ২রা মার্চ্চ সমিতির পুনরধিবেশন করেন। এই সময়ে মাননীয়া শ্রীমতী মহালক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়া সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ এবং শ্রীমতী প্রেমলতা রায় সহকারী সম্পাদিকার পদ গ্রহণ করেন।

আজ সমিতির জন্মদিনে তাহার কার্য্যাবলী সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এখন বিগত বৎসরের বিবরণ যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া শেষ করিব। গত বৎসর এই সময়ে আসানসোল ষ্টেশনে একটি মহিলাকে একাকী পাইয়া কতকগুলি চরিত্রহীন রেলওয়ে কর্ম্মচারী তাহাকে নাবাইয়া যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করে। এ সংবাদ শ্রবণমাত্র ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর অধ্যক্ষকে তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত দেড় টাকা খরচ করিয়া তার দেওয়া হয়; এবং তাহাতে সে স্ত্রীলোকটির মঙ্গল হইয়াছিল। তাহার পর দুইটি জমজ শিশুর আহার এবং পরিধানের জন্য কিছু কিছু সাহায্য করা হয়। একটী স্থানীয় নিরাশ্রয়া বিধবা এবং তাহার সন্তান সন্ততির জন্য মাসিক দুই টাকা সাহায্য করা হয়। স্থানীয় রামমোহন রায় সেমিনারী স্কুলের প্রথম শ্রেণীর একটি ছাত্রকে মাসিক ১।০ পাঁচ সিকি করিয়া সাহায্য দেওয়া হয়। আরও তিনটী বিধবা মহিলা ও একটি ছাত্রকে মাসিক ১৲ এক টাকা হিসাবে দেওয়া হয়। পরে সমিতির সকল সভ্যের সম্মতি অনুসারে পঞ্জাবে যে ভয়ানক ভূমিকম্পে ভীষণ দুর্ঘটনা হইয়াছিল, তাহাতে কত পরিবার অসহায় নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছিল; তাহাদের সেই কষ্টের দিনে সহানুভূতি ও সামান্য সাহায্যার্থ সমিতি হইতে ৫৲ টাকা এবং সমিতির সভ্যগণ এবং স্থানীয় কয়েকটি সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলা হইতে কিছু কিছু প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ২৭৲ টাকা পঞ্জাবে প্রেরণ করা হইয়াছে।

সমিতির প্রথম বর্ষ হইতে আজ পর্য্যন্ত একটির পর আর একটি ছাত্রের পড়িবার খরচ দেওয়া হইতেছে। প্রথম ছাত্রটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আমরা দুর্ব্বল ক্ষুদ্র নারীজাতি, এ বিস্তীর্ণ জগতের কথা আমরা অল্পই জানি, এবং ইহার জন্য আমরা যাহা করি তাহা অতি সামান্য, তথাপি তাঁর শক্তি তাঁর ব্যবহারে ব্যয় করিয়া আমাদিগের আত্মা যে অসীম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহার পরিসীমা কোথায়? সৎকার্য্য করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উৎসাহে তাহা করিতে ইচ্ছা হয়। এ আশা ও উৎসাহ কোন দিন কোন সীমা দ্বারা আবদ্ধ হইবে না।

এই সমিতির স্থাপয়িত্রী সেই পূজনীয়া দেবীর শেষ দিন পর্য্যন্ত আশা ও উৎসাহ অক্ষুণ্ণ রহিল। যদিও তিনি এখন মৃত্যুর অন্তরালে লুকায়িত হইয়াছেন তথাপি তাঁহার আদর্শ আমাদিগের নিকট এখনও উজ্জ্বল এবং জীবন্ত। যে ব্রতে তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন, যে আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই ব্রত ও আদর্শ আজ আমাদিগকে তাঁহার প্রদর্শিত পথে আহ্বান করিতেছে। এস ভগ্নীগণ, আমাদিগের যতটুকু সাধ্য জগতের দীন দুঃখী অসহায় নিরাশ্রয় যারা, তাহাদের দুঃখে দুঃখ, সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাইয়া যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া এই ক্ষুদ্র জীবনকে ধন্য ও সার্থক করি।

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ আমাদিগের সহায় হউন।

বাঁকিপুর "অঘোর নারী সমিতি" } ৭ই আগষ্ট ১৯০৫

স্ত্রী।

পত্নী পতির সহায়। যখন চিত্তদৌর্ব্বল্যে পতির প্রাণ কোথায় ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হয়, পুণ্য প্রতিমা পত্নী অমনি পুণ্য আকর্ষণে তাহা যথাস্থানে সংরক্ষিত করেন। স্বামীর হৃদয় সংসারের লোকের অজ্ঞেয় হউক, কিন্তু সে হৃদয় স্ত্রীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। যে পত্নী সম্পদে বিপদে সহানুবর্ত্তিনী না হন, তাঁহাকে পত্নী বলিয়া পরিচয় প্রদান করা যাইতে পারে না। পতি পত্নীর একমাত্র উপাস্য দেবতা, তাঁহার প্রতি পত্নীর প্রীতি ও ভক্তি উভয়ই থাকা বিশেষ প্রয়োজন, ভক্তি না থাকিলে ভালবাসা কখনও পরিস্ফুট ও বিশুদ্ধ হয় না।

মনুষ্যহৃদয়ে পুণ্য এবং পাপ ভাল এবং মন্দ স্বর্গ এবং নরক, বিপরীত ভাবের সমন্বয়। কেবল সৌন্দর্য্য ও শোভাই জগতের প্রাণস্বরূপ নহে। সৌন্দর্য্য কবির ধ্যান ও আরাধনার সামগ্রী, এবং কাব্যের প্রধান অবলম্বন হইলেও যে মহাকাব্যে মানব চরিত্র প্রদর্শিত হইবে, সৃষ্টির রহস্য চিত্রিত হইবে, তাহা কেবল সৌন্দর্য্যময় হইলেই চলিবে না, পরন্তু তাহাতে কোমলতা ও কঠোরতা দুইই থাকা আবশ্যক।

পাঁচদোনা।

দেবীসমাগম।

[রাবেয়া *।]

দেবী! জীবনের শুভ মুহূর্ত্তে তোমার

---

* এই প্রবন্ধ চট্টগ্রাম ভগ্নীসমাজের বার্ষিক উৎসবে পঠিত হইয়াছিল।

সহিত পরিচিতা হইয়াছিলাম, তোমার অরূপ রূপে মোহিতা হইয়াছিলাম ; যখনই স্বর্গবাসিনী দেবকন্যাদিগের বিষয় ভাবি তুমি সকলের আগে আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার কর। তোমার ভগবৎপ্রেম ও বৈরাগ্যপূর্ণ পবিত্র জীবন আমার হৃদয়কে অমৃতাভিষিক্ত করে।

দেবি! তুমি এ হৃদয়ে অনেক বার আসিয়াছ, যখনই আসিয়াছ আমার জীবন-পথ আলোকিত করিয়াছ, আমার সংসার-বন্ধন শিথিল করিয়াছ। আমি আজ কৃতজ্ঞতাভরে তাহা স্বীকার করি, এবং ঈশ্বরের পুত্র কন্যাদের নিকট তোমার পবিত্র জীবন-কাহিনী কথঞ্চিৎ বিবৃত করিয়া ধন্য হই।

দেবি! সংসারচক্রে পড়িয়া তুমি ক্রীত দাসী হইয়াছিলে। তোমার নিষ্ঠুর প্রভু তোমাকে শারীরিক ও মানসিক কত ক্লেশ দিতেন। তুমি কিছুতেই সেই সকল নিষ্ঠুর অত্যাচার সহিতে পারিলে না, গোপনে পলায়নের চেষ্টা করিলে ; এবং তাড়াতাড়ি পলাইতে গিয়া আছাড় খাইয়া হাতখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। এই বিষম ক্লেশের মধ্যেও তুমি কেমন সুন্দর প্রার্থনা করিলে ;—

"হে ঈশ্বর! আমি পিতৃমাতৃহীনা দুঃখিনী, বন্দিনী হইয়া আছি, হস্ত ভগ্ন হইয়া গেল, এই সব দুর্দ্দশায় আমার শোক নাই। আমি তোমার প্রসন্নতা চাই। বল প্রভু! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন কি না?

দেবি! তুমি প্রার্থনার উত্তর পাইলে, স্বর্গীয় বাণী তোমায় সান্ত্বনা ও আশা দান করিলেন। তুমি আবার সেই নিষ্ঠুর প্রভুর গৃহে দাসীত্ব করিতে গেলে।

দেবি! ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, দেবতারা তোমাকে আদর করিলেন, তুমি সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া দিবারাত্রি ধর্ম্মালোচনা, উপাসনা ও সাধনায় প্রাণ মন ঢালিয়া দিলে। তুমি কাহারও নিকটে শিক্ষা না পাইয়াও জ্বলন্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলে।

দেবি! এক দিন কেহ তোমাকে বাহিরে আসিয়া সৃষ্টির শোভা দেখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তুমি সে সময় স্রষ্টার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিতা হইয়াছিলে। তাই তুমি বলিলে "একবার ভিতরে আসিয়া স্রষ্টার শোভা দেখ।"

আহা! তুমি অনিমেষে স্রষ্টার পানে তাকাইয়া আছ, তোমার নয়ন আর কোন দিকে যায় না। তোমার এই অরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার প্রাণ মন মুগ্ধ হইয়া পড়ে।

দেবি! তোমার অসামান্য বৈরাগ্য-প্রতিভায় তুমি কেমন লাবণ্যময়ী হইয়াছ। তুমি জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিতে, একটি ভগ্ন জলপাত্রে জল পান করিতে, পুরাতন দরমা তোমার শয্যা, এক খণ্ড ইষ্টক তোমার উপাধান, ইহা দেখিয়া অন্যের কষ্ট হইত। কেহ বলিলেন, "তপস্বিনি! তোমার ইঙ্গিত পাইলে অনেক ধনী লোক তোমার অভাব দূর করিবেন।" তুমি বলিলে, "সাংসারিক অভাবসম্বন্ধে কাহারও নিকটে প্রার্থনা করিতে আমার লজ্জা হয়। আমার জীবিকাদাতা ঈশ্বর। যাহা কিছু চাহিয়া

লইতে হয় তাঁহার হস্ত হইতে লইব। যিনি জীবিকাদাতা, তিনি কি দরিদ্রদিগকে দরিদ্রতার জন্ম ভুলিয়া আছেন, এবং ধন আছে বলিয়া ধনী দিগকে স্মরণ করেন?"

এক জন যোগী তোমার নিকট সংসারের নিন্দা করিতে ছিলেন। তুমি তোমার বৈরাগ্যপূর্ণ তেজোময় বাক্যে তাঁহাকে কেমন তিরস্কার করিলে। তুমি বলিলে, "সংসারবিরাগী সংসারের ভাল মন্দ লইয়া বিচার করে না, সংসারকে স্মরণও করে না। যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহারই প্রসঙ্গ করিয়া থাকে। তুমি অত্যন্ত সংসার-প্রেমিক, নতুবা ঈশ্বর প্রসঙ্গ ছাড়িয়া সংসার প্রসঙ্গ করিতে না।"

দেবি! তোমার বৈরাগ্যের মূর্ত্তি দেখিয়া, কেহ তোমাকে কিছু দান করিতে ভীত হইত। তুমি বলিতে "যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিন্দা করে, তিনি তাহারও জীবিকা বন্ধ করেন না, যাঁহারা আশ্রিতে তাঁহারা প্রেমের উদ্যমে তাঁহাকে কি জীবিকাদানে বঞ্চিত করেন? যদবধি তাঁহাকে জানিয়াছি সংসারের প্রতি বিমুখ হইয়াছি।

দেবি! তোমার পবিত্র শরীর খানিও ঈশ্বরকে উৎসর্গ করিয়াছিলে। তাই তুমি চিরজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া তাঁহার কার্য্যে নিযুক্তা ছিলে। তোমার পবিত্র দেহ খানি তাঁহারই আজ্ঞাধীন ছিল।

দেবি! তুমি পীড়িতা হইলে, দুই জন সাধু তোমাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা তোমার প্রতাপ স্মরণ করিয়া কোনও কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছিলেন; তুমি বলিতে অনুমতি দান করিলে এক জন বলিলেন, "আর্য্যে! প্রার্থনা করুন ঈশ্বর আপনাকে "আরোগ্যদান করিবেন।" তুমি তেজের সহিত বলিলে, "তুমি কি জান না কাহার ইচ্ছায় এই রোগ জন্মিয়াছে? তাঁহার ইচ্ছায়ই কি হয় নাই? কেমন করিয়া আমি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রার্থনা করি। সখার ইচ্ছাকে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করা কি কর্ত্তব্য?"

দেবি! তুমি সখার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটী ফলও ভক্ষণ করিতে না। দশ বৎসর পর্য্যন্ত তোমার খোর্ম্মা ফল খাওয়ার ইচ্ছা ছিল, প্রচুর খোর্ম্মা ফল থাকা সত্ত্বেও নিজের ইচ্ছা হইয়াছিল বলিয়া খাও নাই। তুমি বলিতে "আমি দাসী, দাসীর আবার নিজের ইচ্ছা কি? আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহা আমার প্রভুর ইচ্ছার বিরোধী হইলে আমার পক্ষে তাহা অবৈধ।"

দেবি! এক দিন, এক জন সাধু, সমস্ত রাত্রি তোমার সঙ্গে উপাসনা করিয়াছিলেন। তুমি তাঁহার নিকটে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলে, "যিনি আমাকে তাঁহার সেবা করিতে সাহায্য করিলেন, আমি তাঁহার এই করুণার জন্য তাঁহাকে কি কৃতজ্ঞতা দান করিব?"

দেবি! তুমি সমুদয় প্রাপ্ত বস্তু হারাইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া ধন্যা হইয়াছ। তুমি তোমার উপাস্য দেবতাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া পূজা করিতে, নরকের ভয়ে বা স্বর্গলোভে তুমি তাঁহার অর্চ্চনা করিতে না। তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই তোমার

পূজার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তাই তুমি কি চমৎকার প্রার্থনা করিয়াছিলে।

"পরমেশ্বর! তুমি ইহলোকে যাহা কিছু আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ, তাহা তোমার শত্রুকে দাও। পরলোকের যাহা কিছু তাহা তোমার বন্ধুকে দাও। তুমিই আমার পক্ষে যথেষ্ট, আমি আর কিছুই চাই না। হে ঈশ্বর! যদি আমি নরকের ভয়ে তোমার পূজা করি, আমাকে নরকানলে দগ্ধ কর, যদি স্বর্গলোভে তোমার সেবা করি আমার পক্ষে তাহা অবৈধ কর। যদি শুদ্ধ তোমার জন্য তোমার পূজা করিয়া থাকি তবে তোমার সৌন্দর্য্য উজ্জ্বলরূপে দেখিতে আমায় বঞ্চিত করিও না।"

শ্রীমতী প্র—

নারী-পূজা।*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আমেনা। মূল গ্রন্থে নাই বটে, কিন্তু মেঃ এস্, জে, ব্যারোস্ কর্ত্তৃক লিখিত মজুমদার মহাশয়ের জবনীতে একটি নমুনা পাওয়া যায়।

আমি। অবলাপিড়নের নমুনা?—আচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে?

আমেনা স্থিরস্বরে বলিলেন, "হাঁ, তাঁহার মাতার মৃত্যু ঘটনা। যৎকালে মজুমদার মহোদয়ের জননী ওলাউঠা রোগে আক্রান্তা হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলেন, তখন গৃহস্বামী নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইতেছিলেন!* বাড়ীর গাভীটার কোন রূপ পীড়া হইলেও বোধ হয় কর্ত্তা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। বিধবার প্রতি সমাজের ব্যবহার কিরূপ হয়, তাহা মজুমদার মহোদয়ের ভাষায় চমৎকার শুনায়! আপনারা তাঁহার জীবনীর ১৪ শ হইতে ১৬ শ পৃষ্ঠা পুনরায় পাঠ করিয়া দেখুন। তাহা পাঠ করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! গৃহপালিত কুকুর বিড়ালও বোধ হয় বিনা চিকিৎসায় মারা যায় না; আর ঈশ্বরের সৃষ্টজগতের শ্রেষ্ঠতমা জীব পরিবারের এক জন বধূ রোগের যন্ত্রণায় অধীরা, কেহ তাঁহার প্রতি ফিরিয়া চাহে নাই! বিধবার জন্য চিকিসক ডাকিতে হইবে, একথাও কেহ ভাবে নাই! মজুমদার স্বয়ং তাঁহার পিতৃব্যদেব সুখনিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য যাইতেছিলেন, কিন্তু কর্ত্তাদের কক্ষে তিনি প্রবেশ করিতে পারেন নাই!!†

---

* মোসলমানকন্যা আর্ এস্ হোসেন কর্ত্তৃক রচিত।

* উক্ত গ্রন্থ হইতে কোন কোন অংশ অবিকল উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। সেই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ স্বয়ং মাতৃহারা পুত্রের ভাষায়ই চমৎকার শুনায়,—

"Everybody in the house was up except my uncle, who was the karta (Head). Nobody seemed to care to call in a doctor......My perplexity may be imagined."

† "Rushing to speak to my uncles, I was not admitted to their rooms; and no one, not even a servant, would go for a medical man. Maddened and despairing,

"চাকরটা পর্য্যন্ত চিকিৎসক ডাকিতে যাইবে না,—না যাউক। কিন্তু পুত্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না! যাঁহার জননী জন্মের মত বিদায় লইতেছে, তিনি কি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? না! তিনি পাগলের ন্যায় পথে ছুটিলেন,—(স্বর্গীয়) কেশবচন্দ্র সেন এবং অপর কয়েক জন বন্ধুকে ডাকিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রাত্রিকালে সকলেরই গৃহদ্বার রুদ্ধ ছিল। তিনি জনৈক ডাক্তারের বাড়ী গেলেন; ডাক্তারের চাকর হতভাগাকে তাড়াইয়া দিল! সে ভৃত্যটিতো ভারতবর্ষেরই পুরুষ, সে অবশ্যই জানিত, কিরূপে নারী-পূজা করিতে হয়। তাই বিধবার জন্য প্রভুকে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে, ভাবিয়া সে মাতৃশোকাতুর পুত্রকে তাড়াইয়া দিল!!

"আমরা মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাই, সেই উনবিংশ বর্ষীয় বালক মাতৃশোকে পাগল প্রায় হইয়া পথে ছুটাছুটি করিতেছেন। দ্বার হইতে দ্বারান্তরে গিয়া মুমূর্ষু মাতার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। আর তাঁহার হৃদয়ে কি আকুলতা, কি মর্ম্মান্তিক যাতনা ছিল, তাহা আমরা বেশ অনুভব করিতে পারি। আমরা ঈশ্বরের যত প্রকার আশীর্ব্বাদ ভোগ করি, তন্মধ্যে মাতৃচরণ শ্রেষ্ঠতম আশীর্ব্বাদ। সব সুখসমৃদ্ধি তুলাদণ্ডের এক দিকে, আর মা এক দিকে!!

"ইহাকে—বিধবার প্রতি এই রূপ নির্ম্মম নির্দ্দয় ব্যবহারকে যদি আপনারা 'নারী-পূজা' বলেন, তবে আর আমার বলিবার কিছু নাই।"

আমি। ঈদৃশী ঘটনা বিরল। কেবল একটী বিধবার প্রতি যত্ন হয় নাই বলিয়া সকলে দোষী হইতে পারে না।

কুসুম। না প্রভা দিদি! ওরূপ ঘটনা বিরল নহে—তবে কথা এই যে, আর কেহ মজুমদার মহাশয়ের মত ঐ প্রকার কলঙ্ককাহিনী লিখিয়া রাখে না, তাই আমরা সে সব ঘটনা জানিতে পারি না। আমিও দুই চারিটি* পরিবারের ঐ রূপ অবস্থা জানি।

I rushed into the streets, tried to call up Keshub and other friends; but every gate was shut for the night. I ran to a doctor's house in the neighbourhood, but his servant turned me out. I don't know into how many places I went, and pleaded my poor, dying mother's case, but could not get medical help.

"......What need to bewail the world's hard heartedness? What need to curse the selfish cruelty of men and women to the wretched, forsaken Hindu widow?......

"But if men were more compassionate, and society recognized their (women's) rights to the commonest necessaries of life, perhaps they would be less hard on themselves, and many a heart-stricken son would be spared the misery I felt when I found my mother's beloved life sink under the load of the world's neglect and indifference."

'আমি। (জমিলা বেগমের প্রতি) আর আপনি? আপনি কোন লোমহর্ষণ ব্যাপার অবগত আছেন?

জমিলা। একটী ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; সে অনেক কথা!

আমি। বলুন, শুনি!

জমিলা বলিলেন,—এক জন বড় লোকের শিশু কন্যা পীড়িত ছিল। বাড়ীতে দাস দাসী, ঘোড়া গাড়ী, যত প্রকার বিলাস দ্রব্য হইতে পারে, সবই প্রচুর ছিল। কেবল কন্যা জাতিতে অভিশাপ মনে করা হয় বলিয়া খুকীর চিকিৎসা হইতে ছিল না।

"কোন অভাব নাই—অপর শিশুরা টাকা লইয়া ছিলিমিলি খেলা করে, অথচ দুগ্ধপোষ্য শিশুটি বিনা চিকিৎসায় মরিতেছে, এ চিন্তা গৃহিণীর সহ্য হইল না! তিনি বারম্বার সবিনয়ে সজল নয়নে কর্ত্তাকে চিকিৎসক ডাকিতে অনুরোধ করিলেন,—কর্ত্তা শুনিলেন না! এমন কি কর্ত্তা এক দিন নিজের প্রয়োজনবশতঃ ডাক্তারের নিকট যাইতেছিলেন, সেই সময় কর্ত্রী সকাতরে বলিলেন, 'খুকীর অবস্থাও ডাক্তারকে জানাইও।' 'মেয়ে কি কখন ও মরে?' এই বলিয়া কর্ত্তা প্রস্থান করিলেন।

"অতঃপর অসহায়া গৃহিণী উপায়ান্তর না দেখিয়া মুমূর্ষু শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া নীরবে অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন! পুংশাবককে যখন পিতা হনুমানবধ করিতে চেষ্টা করে, তখন শাবকটিকে বক্ষে লইয়া হনুমানমাতা বনে জঙ্গলে পলায়ন করিয়া শিশুর প্রাণ রক্ষা করে! কিন্তু পর্দ্দানিশীন মহিলা পিতৃ অত্যাচার হইতে শিশুকন্যাকে রক্ষা করিবার জন্য কোথায় যাইবেন? নগরে অসংখ্য ডাক্তার আছেন,—থাকুন; তাহাতে অন্তঃপুরিকার লাভ কি?"

আমি। "ঈস্! মানুষ এমন পাষণ্ড হয়! শেষে কি হইল ভাই? শিশুটি বাঁচিল, না অযত্নে মারা গেল?"

জমিলা। "শিশুটি শেষে বাঁচিল। যৎ কালে কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া মাতা রোদন করিতেছিলেন, সেই সময় দৈবাৎ উক্ত পরিবারের ভাগ্যবান্ জ্যেষ্ঠ পুত্র তথায় গিয়াছিল। সে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, তাই মাতার ক্রন্দনে তাহার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল। সে নিজে ডাক্তারের নিকট গিয়া কয়েক মাত্রা ঔষধ আনিয়া দিল। সে ঔষধ আনিয়াছিল কেবল জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য! ঈশ্বরকৃপায় সেই সামান্য ঔষধে খুকী বাঁচিল। সেই ধনী পরিবার অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে! সেই শিশু, সেই পিতা, মাতা, ভ্রাতা—সকলেই জীবিত আছেন!!"

আমি। "পরিবারটি হিন্দু, না মুসলমান?"

জমিলা। "তাহা আমি বলিব না,—তাঁহাদের মুখে মসী লেপন করিয়া কাজ কি? এই পর্য্যন্ত বলাই যথেষ্ট—তাঁহারা বঙ্গবাসী!"

আমি। "দেখুন, এদেশে যে জঘন্য অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে; ইহাই সব অনিষ্টের মূল। মুসলমান সমাজ এ বিষয়ে

অগ্রণী। তাঁহারা চাকরের সম্মুখেও বাহির হন না, এই জন্য মোসলেম রমণী একেবারে নিরুপায়া। ঐ পর্দা তাঁহাদিগকে পশু—হনুমান মাতা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, অসহায় করিয়াছে।”

(ক্রমশঃ)

—

সংবাদ।

আমরা সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের অনেকগুলি নগর উপনগর ও পল্লী ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি; এক দিন ময়মনসিংহ জিল্লার এক জন মাননীয় ভূম্যধিকারীর ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। ভূম্যধিকারী কৃত বিদ্য ধর্ম্মানুরাগী বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী চরিত্রবান্, গৃহকর্ত্রী সুগৃহিণী সতীলক্ষ্মী, তিনি একজন প্রসিদ্ধ বড় জমীদার কন্যা। তাঁহার পিতৃ দেব কয়েক বৎসর হইল পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল; সেই জন্য গৃহকর্ত্রী পিতৃব্যের ন্যায় আমাদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন। অন্তঃপুরে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকরিবামাত্র তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কাল অপরাহ্লেই চলিয়া যাইবেন, অন্য কাহারও নিমন্ত্রণ যেন গ্রহণ করা না হয়।” আমরা বলিলাম, মা, তোমার কনিষ্ঠভ্রাতার গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ হইবেই, তাহা গ্রহণ না করিলে চলিবে না, আজ রাত্রিতে তোমার গৃহে ভোজন হইবে; কিন্তু ভোজ্যজাতের যেন কোন আড়ম্বর না হয়, আমরা জানি বড় আড়ম্বর হয়; আমরা রাত্রিতে রুটি খাইয়া থাকি, রুটি ও তাহার সামান্য উপকরণ যেন প্রস্তুত হয়। তিনি বলিলেন "রুটি নয়,লুচি ও পোলাও হইবে।” আমরা বলিলাম, মা, পোলাওটা বাদ দিলে ভাল হয়। পরে যথাসময়ে ভোজন করিতে যাইয়া দেখি, গৃহকর্ত্রী রন্ধনশালা হইতে লুচি পোলাওয়ের সঙ্গে নানাবিধ উচ্চ শ্রেণীর ব্যঞ্জনোপকরণ ক্ষীর পায়স ও বিবিধ মিষ্টান্ন স্বয়ং রন্ধন করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, ব্যঞ্জনাদির ঘটা দেখিয়া আমাদের চক্ষু স্থির হইল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, মা, এ সকল সামগ্রী কে প্রস্তুত করিল? তিনি বলিলেন,“আমি স্বয়ং প্রস্তুত করিয়াছি, পাচকব্রাহ্মণ ও পরিচারিকাগণ উপলক্ষমাত্র ছিল, তাহারা আমার সাহায্য করিয়াছে।” আমরা দেখিয়া শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বড়লোকের কন্যা ও বড় লোকের পত্নীর সামান্যাবস্থাপন্ন অভ্যাদগতের প্রতি এত আদর যত্ন অতি আশ্চর্য্যের ব্যাপার! গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রী উভয়ের বিনয় সৌজন্য শ্রদ্ধা ভক্তির তুলনা নাই। এই গৃহলক্ষ্মীর তিনটি শিশু বালক, তাহারা সুবিনীত ও অতি প্রসন্নবদন, পিতৃমাতৃচরিত্র প্রাপ্ত। ইহাদের বিনয় মধুর ব্যবহার দেখিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঞ্চার হয়,গৃহকর্ত্রীর স্বহস্ত প্রস্তুত সমুদায় ব্যঞ্জন সুস্বাদ ছিল, মিষ্টান্নের মধ্যে অমির্ত্তি বড়ই সুরস ও মোলায়েম হইয়াছিল। এত কে খাইতে পারে? আমাদের এক প্রকার স্বাদ গ্রহণমাত্র হইয়াছিল। মহিলাতে সময়ে সময়ে নূতন নূতন রন্ধনপ্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে, গৃহকর্ত্রী

তাহা পড়িয়া উৎসাহসহকারে সেই সমু: দায় স্বয়ং প্রস্তত করিয়াছেন। এই ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুগৃহিণীর সুদৃষ্টান্ত পাঠিকাগণ কি অবহেলা করিবেন?

উপরে যে বিনয় ভক্তি ও সৌজন্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল তাহার বিপরীত চিত্রের প্রতি দৃষ্টি কর। পূর্ব বঙ্গ নগর বিশেষের একটি বড় বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে মহামান্য লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর গিয়াছিলেন। সেই বিদ্যালয়ের কার্য্য প্রধানতঃ সাধারণ ব্রহ্মদিগের দ্বারা পরিচালিত। বালিকারা এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিল, গভর্ণর মহোদয় উপস্থিত হইলে দণ্ডায়মান হইয়া মস্তক অবনমনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে না, কিন্তু কাহারো কাহারো উপরোধ অনুসারে তাহারা দণ্ডায়মান হইয়াছিলমাত্র, সেলাম করে নাই। লাটসাহেব ছাত্রীদিগের উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য কয়েকটী টাকা পারিতোষিকস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, কোন কোন বালিকা কাঁদ কাঁদ ভাবে আমি ফুলার সাহেবের দান গ্রহণ করিব না বলিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, বা করিতে চাহিয়াছে। ইহা আমরা সেই বালিকাবিদ্যালয়ের অদূরে স্থিতি করিয়া বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি। কোমল-প্রকৃতি বালিকাদের কি বিষম বিকৃত ভাব ও অবিনয়! তাহারা কি ভয়ানক বিষাক্ত হইয়াছে।

ময়মনসিংহস্থ জামালপুর সবডিভিজনে একটী ইয়ুরোপীয় মহিলা এক জন ভদ্র লোকের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ৭।৮ জন স্কুলের ছাত্র সেই মহিলাকে আবেষ্টন করিয়া বিদ্রূপ করিবার জন্য "বন্দে মাতরং" বলিয়া চিৎকার করিতে থাকে। তত্রত্য মুন্সেফ বাবুর আবাসের পার্শ্বে এই ব্যাপার হয়। সম্ভ্রান্ত মহিলার প্রতি বালকদিগের এই দুর্ব্ব্যবহার দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হন। কেহ কেহ সেই মহিলাকে বলেন, "ইহারা অবোধ বালক আপনি ক্ষমা করিবেন।" তিনি বলিলেন, "ইহাদের প্রতি আমার কোন রাগ হয় না। এই ব্যবহারের মূলে ইহাদের পিতা ও অভিভাবকগণ রহিয়াছে। বাঙ্গালী জাতি যে Disloyal ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।" ময়মনসিংহ নগরের পল্লীবিশেষে জনানামিশনের দুইটী ইয়ুরোপীয় মহিলা যাইয়া এক পরিবারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৫।৬ বৎসরবয়স্ক একটী বালক বা বালিকা তাঁহাকে দেখিয়াই বলে "মা, বন্দে মাতরং বলিব?" মা বারণ করিলেন, তাহাতে সে নিবৃত্ত থাকে।

আমরা রাজবাড়ীতে সবডিভিজনল আফিসরের আবাসে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম, সে স্থানে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সবডিভিজনের একজন দেশীয় খ্রীষ্টবাদী প্রচারকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলিলেন, "স্কুলের ছাত্রদিগের অত্যাচারে আমরা অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। তাহাদের উৎপাতে আমাদের রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়টি ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, তাহারা আমাদের গৃহ ও গির্জার প্রাচীরের স্থানে স্থানে "বন্দে মাতরং" লিখিয়া রাখিয়াছে, কোন সাহেব দেখিলে থুথু ফেলিয়া ও নাক টিপিয়া ঘৃণা

প্রকাশ করিয়া থাকে, একটী ইয়ুরোপীয় মহিলা আমাদের গিরজায় আসিতেছিলেন, তাঁহাকে তাহারা "বন্দে মাতরং" বলিয়া তাড়া করিয়া যাইয়া তাঁহার গায়ে কাদা ছুড়িয়া ফেলিয়াছে। ফল এই হইয়াছে যে, তাহাদের কেহ বেত্রাঘাত প্রাপ্ত, কেহ অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত এবং কেহ স্কুল হইতে বহিস্কৃত হইয়াছে।

ঢাকা কলেজিয়ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্কুলের নিয়ম বিধি লঙ্ঘনকারী ছাত্রদিগকে শাসন করিয়া পথে মার খাইয়াছেন। তজ্জন্য তিনি স্বদেশহিতৈষীদিগের ভয়ে রাত্রিতে বাড়ী হইতে বাহির হইতে হইলে এক জন পুলিশ কনেষ্টবল সঙ্গে করিয়া চলেন। ময়মনসিংহে ও টাঙ্গাইলে পুলিশকে অপমান ও মারামারি করার জন্য কতক গুলি ছাত্র বিচারাধীন আছে, তাহাদের পক্ষসমর্থনের জন্য কলিকাতা হইতে বারিষ্টার প্রেরিত হইয়াছে। কত যে অনিয়ম ও অত্যাচারের ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া আসা গেল, মহিলাতে তাহা আর উল্লেখ করিতে চাহি না। এবার বিশেষভাবে ইয়ুরোপীয় মহিলাদের প্রতি অপমান ও অত্যাচারের দুই তিনটী ঘটনাই উল্লিখিত হইল। এ সকল স্বদেশহিতৈষীদের পত্রিকায় প্রায় প্রকাশিত হয় না। কেবল গভর্ণর ও রাজপুরুষদিগের প্রতি কটুক্তি ও গালি বর্ষণ হয়, এবং নিজেদের পক্ষসমর্থনের জন্য এমন অনেক কথা লিখা হয় এবং অতিরঞ্জিত করা হয়, যাহার কোন মূল নাই। দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইতে হয়। এতাদৃশ কুৎসিত ব্যাপারে ব্রাহ্ম সমাজের লোকের যোগ আছে বলিয়া অনেক সুবিবেচক লোক দুঃখিত। গবর্ণমেণ্ট অনেক ক্ষমা করিয়াছেন, এবং অনেক সহ্য করিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে এক জন নামজাদা বড় বক্তা পূর্ব্ব বঙ্গে যাইয়া পূর্ব্ব বঙ্গের অশেষ অনিষ্ট করিয়া আসিয়াছেন। তিনি ময়মনসিংহ হইতে ঢাকায় যাইবার ২।১ দিন পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া দুই জন লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাকে যেন ষ্টেশন হইতে চারি হাজার লোক "বন্দে মাতরং" বলিতে বলিতে উৎকৃষ্ট ঘোড়ার গাড়ীযোগে ঘটা করিয়া বক্তৃতা স্থলে লইয়া যায়। তিমি সে দিন সে ভাবে যাইয়া গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে সকল ভয়ঙ্কর কথা বলিয়াছিলেন, তজ্জন্য তখনই তাঁহাকে Arrest করা প্রয়োজন ছিল। এদিকে সেই সময় লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণরের জাহাজ নদীর ঘাটে সংলগ্ন, কেবল কয়েক জন নগরবাসী সম্রান্ত মোসলমান তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। তাঁহারা নিজেদের অভিনন্দনপত্রে এরূপ লিখিয়াছিলেন, আমরা আশা করি যে, আপনা দ্বারা নানা বিষয়ে অনুন্নত এই পূর্ব্ববঙ্গের কল্যাণ ও উন্নতি হইবে। শুক্লকেশ বৃদ্ধ মাননীয় ছোটলাট ফুলার সাহেব তদুত্তরে এরূপ বলেন, এ প্রদেশের মঙ্গলসাধনে আমি যেন ঈশ্বরের হস্তে ব্যবহৃত হইতে পারি, ঈশ্বর এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। ইহার বিরোধী যাহারা তিনি তাঁহাদিগকে শুভবুদ্ধি দান করুন।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

"সাধু ফ্রান্সিস"। *

আমাদের মধ্যে এখানে অনেক খ্রীষ্টান মেয়েরা বাড়ী বাড়ী পড়াইয়া বেড়ান, এদেঁর সঙ্গেই মেয়েদের আলাপ হয়, তাঁরা ইহাদের দ্বারাই যাহা কিছু ক্রিষ্টিয়ানিটী বিষয়ে জ্ঞান পান। কিন্তু এদেঁর মধ্যে তেমন বড় লোক জানতে পাওয়া যায় না, যদিও অনেকে ভাল আছেন, তাঁরা যিশুখ্রীষ্টের ধর্ম্ম বুঝাবার, দেশের লোকের উপকার করিবার বিশেষতঃ এ দেশের মেয়েদের উপকার করিবার উদ্দেশ্য লইয়া এদেশে আসেন। মেয়েরা কিন্তু, এই যে ক্রিষ্টিয়ানিটী, ইহার প্রবর্ত্তক কারা, ইহার ইতিহাস কি রকম এসব বিষয় অত পড়েন না, জানেনও না। ক্রাইষ্ট ১৮০০ বছর আগে জন্মেছিলেন, তাঁর জন্মাবার পর থেকে কি করে সমস্ত পৃথিবীময় এই ধর্ম্ম প্রচারিত হল, জানলে অবাক্ হইতে হয়। ইহাদের মধ্যে যে কত ভাল ভাল সাধু জন্মেছিলেন, বলা যায় না। এখনও অনেক আছেন। আমি তাই বলছি যে, এদেশে যে সব খ্রীষ্টানদের দেখি, এঁদের দেখে খ্রীষ্টজগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয় তাহা ঠিক নয়। আমরা ইহাদের কেবল মাংস খাইতে ও বেশ বিন্যাস করিতে দেখি। কিন্তু যদি ইহাদের ইতিহাস পড়ি তবে এসব ভাব মনে থাকে না। এই ১৯০০ বছর এই ধর্ম্ম চলে আস্‌ছে, ইহার মধ্যে ইহাতে কত সাধু কত কবি জন্মেছেন, আমাদের সে বিষয়ে অনেক শেখবার জানবার আছে। ইহার পূর্ব্বে একবার মহাপুরুষদের গুণসম্বন্ধে বলা হয়, তখন বলা হয়েছিল যে, প্রকৃতির সঙ্গে এবং ফুলের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করা যায়। তাঁদের মাধ্য একটা স্বাভাবিকতা আছে, তাঁদের জন্ম উন্নতি বৃদ্ধি সব স্বাভাবিক। আর একটী গুণ কি লুকান ভাব আছে, তাঁরা কোন কাজ লোককে দেখাবার জন্য করেন না। তাঁদের কোন কাজ ধরে বেঁধে করাতে হয় না, যে কাজ করেন, সব ভালবেসে। মহাপুরুষ অনেক রকমের আছেন, কেহ লেখেন ভাল, কেহ বলেন ভাল, কেহ কেহ বড় বড় রাজ্য চালাতে, শাসন করিতে পারেন। মহাপুরুষদের গুণ কি, স্বাভাবিকতা, যদি ইহা না থাকে, তবে সন্দেহ হয় উচ্চদরের মহাপুরুষ কি না? ওদেশের সাধুদের সঙ্গে আমাদের সাধুর সঙ্গে অনেক মেলে। আমরা এখানে যে খ্রীষ্টানদের দেখি বিলাতে এর চেয়ে অনেক উচুদরের সাধু আছেন, তাঁদের জীবন, ইহাদের মত নয়, খুব উচ্চ ও গভীর। এখানে যে সমস্ত প্রচারক আসেন, তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ প্রটেষ্টাণ্ট। প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম্ম এক ছিল, প্রথমে সমস্তই ক্যাথলিক ছিল, গ্রিকচর্চ্চের নিয়মে

* বিগত ১৯০২ সাল ২১শে জুলাই শ্রীযুক্ত প্রমথলাল সেন প্রদত্ত বক্তৃতামূলক।

সমস্ত খ্রীষ্টজগৎ চলিত। এই রকম অনেক দিন চলে এসেছিল, তার পর লুথার দেখলেন যে, এ ধর্ম্ম খারাপ হয়ে গেছে, এর মধ্যে অনেক অন্যায় আছে, কুসংস্কার প্রবেশ করেছে ইহার মধ্যে ধর্ম্মের নামে অনেক অধর্ম্ম করা হয়। তিনি এই সমস্তের প্রতিবাদ করলেন। তাহাতে একটা মহাবিপ্লব হল, তার ফলস্বরূপ প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম হল। যে সব প্রচারক সাহেব মেমদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, তার মধ্যে অধিকাংশ প্রটেষ্টাণ্ট, আমাদের শুধু এদের কাছ থেকে শিখলে হবে না। দেখতে হবে, গোড়ায় এ ধর্ম্ম কি রকম ছিল, তার পর কত বৎসর এক সঙ্গে ছিল তাও দেখতে হবে। খ্রীষ্টধর্ম্মে অনেক সাধু জন্মেছেন, ইহার মধ্যে ফ্রান্সিসের জীবন বলছি। এঁর বিশেষ গুণ কি? বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য ছিল, এবং সাধুতা উচ্চ ও স্বাভাবিক, এঁর জীবনে অনেক শিখবার আছে। আজ সকালে আমার বিলাতের একজন বন্ধু একটী মেয়ে সাধুর বিষয় আমাকে লিখিয়া পাঠান, তার নাম এগাথা, আমি ভাবিয়াছিলাম, তাহা হইলে এঁর বিষয়ই আজ বলিব। এঁর বিষয় এখানে একটু বলিলে মন্দ হবে না। এগাথা অনেক আগে অর্থাৎ খ্রীঃ ২।৩ শতাব্দীতে রোমে জন্মগ্রহণ করেন, তখন খ্রীষ্টানদের উপর খুব অত্যাচার হত। যখন রোমে এ ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তখন রোমের সম্রাট্ ইহার বিরোধী ছিলেন, তখন খ্রীষ্টান হলেই প্রাণ দিতে হত। এগাথার বাপ মা, ছেলেবেলায় মারা যায়, সিসিলীতে তিনি জন্মান। ডিসিয়স তখন রোমের সম্রাট্ ছিলেন। এগাথা ছেলেবেলায় দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন, সকলেই তাঁর দিকে আকৃষ্ট হইত ও ভাল বাসিত। তাঁর সৌন্দর্য্যের কথা চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সম্রাট্ এগাথার গুণ ও সৌন্দর্য্য বিষয় শুনিয়া তাঁর মন্ত্রীকে দেখিবার জন্য পাঠান। এঁরা যদিও খ্রীষ্টানদের অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, সহরে বা রাজ্যে কোন খ্রীষ্টান সাধু সন্ন্যাসী আসিলে, তাঁহাকে তখনই মারিয়া ফেলা হইত, কিংবা তাড়াইয়া দেওয়া হইত, পাছে তাহারা দেশের মধ্যে একটা বিপ্লব উপস্থিত করে, এই ভয় করিত। মন্ত্রী এই কথা শুনে দেখতে গেলেন, তিনি দেখে একেবারে মোহিত হলেন, সম্রাট যে তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন তাহাকে জানান। এগাথা বলিলেন, আমি গেসসকে ভাল বাসি, এ জীবন আর কারও হবে না। সম্রাট্ এ কথা শুনে ভারি চটে যান, তখন কেবল চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিসে তার সর্ব্বনাশ করিতে পারেন। তার আগে তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিসে তার মন নোওয়াতে পারেন। আর একজন মেয়েকে বলিলেন, তুমি যদি উহাকে ভুলাইতে পার তবে অনেক টাকা দিব, সে তাকে কত করে বুঝাতে লাগিল যে কত সুখে থাকবে, তা না হলে তোমাকে ভয়ানক যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলা হবে। এ সব কথাতে কিছুই হল না, কিছুতেই তার মত হল না। সম্রাট্ যখন একথা শুনিলেন, রাগে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠিলেন, ভাবলেন যে, এতটুকু মেয়ের এত তেজ। তখন লোককে ভয়ানক যন্ত্রণা দিয়ে মারা হত, লোহা ফুটিয়ে ফুটিয়ে মারত। এগথাকেও সে রকম করিল, শেষকালেও

বলিল, এখনও স্বীকার কর, তবুও কিছু হল না, স্থিরভাবে এগাথা প্রাণ দিল। ইহার পরেই সে সময় একটা আগ্নেয়গিরি ফেটে বেরোল। দেশময় একটা হুলুস্থূল পড়ে গেল যে, ইহাকে মারা হয়েছে বলে এরূপ হয়েচে, সমস্ত লোক ভয়ানক চটে গেল, সব লোক সম্রাটের বিরুদ্ধে লাগল। সে দেশে এ সমস্ত ঘটনা এত জড়িয়ে আছে যে, সকলে বিশ্বাস করিল যে, এগাথা খুব ভাল ছিল বলে এ রকম হয়েছে। এ মেয়েটীর বিষয় যদি ভাল করে আলোচনা করে দেখি, তবে ইহার মহত্ব বুঝিতে পারিব। তখন ক্রিষ্টিয়ানিটীর অত প্রথমে ধর্ম্মগ্রহণ করা ও আপনাকে খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দেওয়া সহজ কথা নয়। নিশ্চয় ভিতরে একটা খাঁটি সত্য জিনিষ ছিল। এত লোক এত ভয় দেখাল কিছুতেই তাঁর ভয় হয় নাই। তিনি বড় ঘরের মেয়ে ছিলেন, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ধর্ম্মের জন্য জীবন দিলেন। সাধুর ভিতরে এমন একটা ব্যাকুলতা থাকে, যে সাধু না হয়ে তিনি থাকতে পারেন না। তাঁরা যে নিয়ম মেনে, জোর জবরদস্তি করে সাধু হন তা নয়, ইহাদের মধ্যে এ রকম অনেক জীবন আছে; যদিও অনেক কল্পনা আছে। কিন্তু যেমন এই গল্পটি বলিলাম, ইহাতে উপকার হতে পারে, যদিও একটী ছোট মেয়ে, তেমনি আরও অনেক জীবন আছে যা পড়লে আমাদের উপকার হয়।

সাধু ফ্রান্সিসের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাবের মিলন দেখি, কোমলতা ও কাঠিন্যের মিলন। এ দুটীর মিলন থাকা দরকার। অনেক পুরুষের এক রকম গুণ আছে, অর্থাৎ নারীর গুণ নাই, কারও বা নারীর কোমলতা আছে, কিন্তু বীরত্ব নাই, যেখানে দুই গুণের মিলন দেখা যায়, তাকে আদর্শ পুরুষ বলা যায়। মেয়েদের মধ্যেও যেমনি শুধু নারীর গুণ বা পুরুষের গুণ থাকিলেই হয় না, কিন্তু যে নারীতে দুই গুণের সামঞ্জস্য হইয়াছে, তাহাকে আদর্শ বলা যায়। মেয়েদের মধ্যে মিসেস বুথ তেমনি পুরুষের মধ্যে সেণ্ট ফ্রান্সিস এঁদের দুই গুণের মিলন ভগবানেতে হয়েছে দেখিতে পাই। প্রকৃতির একটা খণ্ড বলে তাঁদের নেওয়া যায়। মহাপুরুষদের যে ভাব আছে তাহা জানিলে ঈশ্বরের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়, তাঁর পূর্ণতাসম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। ৪০০ বছর আগে ফ্রান্সদেশে অনেক ক্যাথলিক সাধু জন্মেছিলেন। ইটালীতে ও ফ্রান্সে অনেক বড় বড় সাধু, কবি, বড় বড় চিত্রকর সব জন্মেছিলেন, ইংলণ্ডে তত নয়, পাণ্ডিত্য সাধুতা এসব বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা ইংলণ্ডে বড় দেখা যায় না, ইউরোপের অন্য অন্য জাতিতে বেশী দেখা যায়, এজন্য ইউরোপের ইতিহাস পড়া দরকার। সাধু ফ্রান্সিসের কথা বর্ণনা করে কত গল্প আছে তা বলা যায় না। পরীক্ষায় যেমন মানুষের জীবন প্রকাশ পায়, এমন আর কিছুতে নয়। তিনি ধর্ম্ম প্রচার করিতে এক দিন বেদীতে বসে উপদেশ দিচ্ছিলেন যে, এক গালে মারলে, আর এক গাল ফিরিয়ে দিবে। তার পর উপদেশ দিয়ে যখন নেবে আসছেন, তখন, এক জন লোক গিয়ে বলিল, আপনি যে উপদেশ দেন, তাহা কি আপ নিজে পালন করেন। লোকটা

খুব রেগে এই কথা বলিল, অর্থাৎ সে ভাবে যে, যিনি আমাদের উপদেশ দিলেন, তিনি নিজে কি সে রকমে করেন। তিনি বলিলেন, আমি পারি কি না পারি সে বিষয় বলা ঠিক নয় তবে আমি চেষ্টা করি, আমার সাধন এই। কথা শুনে লোকটী স্তম্ভিত হয়ে গেল, তার মনে লজ্জা হল, সে ক্ষমা চাহিল। একবার একটি যুবক বড় খারাপ হয়ে পড়ে, তাকে সকলে, তাঁর কাছে আনিতে চায়। ফ্রান্সিস বিশপ ছিলেন। ইহা খুব উচ্চপদ, তাঁর নীচের একজন কর্ম্মচারী সে এসে উহাঁকে বলিল যে, আপনি তাহার সঙ্গে নম্র ব্যবহার করিবেন না, খুব ধমক দিবেন। আপনি, বড় মিষ্ট কথা বলেন, একটুও শক্ত হতে পারেন না। তিনি বলিলেন, তোমরা কি চাও আমি ওকে ধমকাব, তা আমি করব না। তিনি তাকে একটুও ধমকালেন না, প্রথমে আস্তে আস্তে কথা বলিতে লাগিলেন, অনেক বুঝাইলেন. কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, তখন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। সেই যুবকটি তখন বলিল, আপনি কেন কাঁদছেন ; তিনি বলিলেন, তুমি তোমার জন্য কাঁদবে না আমি তোমার জন্য কাঁদি। ইহাতে তার মনে খুব লাগিল। তার প্রাণে সরলতা ছিল, তার জন্য তাঁর প্রাণে এত ব্যথা হল, যে তিনি কাঁদলেন। ইহাতে যুবকটি অনুতপ্ত হল, তার উপকার হল। উঁর সহকারী কর্ম্মচারীরা যখন ওকে একটু কড়া হতে বলতেন, ধমকাতে বলতেন, তখন উনি বলিতেন, দেখ, ধমক দিলে শাসন করলে এই হয় যে, তখন একটা সম্মান দেখায়, ক্রমে কপট হয়ে যায়। যদি বাস্তবিক তাহার মঙ্গল চাও তবে এমন করে কথা বল যাতে তার মনে লাগে। ধমক দিলে তার মনে রাগ হয় ও শেষে কপট হয়, যদি তার যথার্থ মঙ্গল চাও তবে এমন কর যাতে তার মন স্পর্শ করে। পাপী অপরাধী এই উপায়ে ভাল হবে ও অনেক হয়েছিল। ফ্রান্সিসের অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ ছিল, তাঁকে উপাসনা করিতে হইত, সেখানে বড় বড় লোক ও তাদের মেয়েরা সব আস্তেন। তাঁর কাছে সকলে পাপ স্বীকার করিতেন। ইংরাজিতে তাকে কন্‌ফেশন বলে। রোমাণ ক্যাথলিক চর্চ্চের এই নিয়ম, সব দোষ স্বীকার করিতে হয়, যাঁরা তা করেন না, নিজের মনের অবস্থা জানাতে হয়। এ রকম ভাবে অনেকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হত। তাঁর মা বাবা ভাই সকলে তাঁর কাছে পাপ স্বীকার করিতে আসতেন। মা বলতেন, আমার ছেলে বটে, কিন্তু উনি আমার গুরু, ফ্রান্সিসের মার অনেক দিন পর্য্যন্ত সন্তান হয়নি, তিনি প্রার্থনা করেন, আমার যে সন্তান হবে, তাকে আমি তোমার চরণে উৎসর্গ করিব। ফ্রান্সিসের ছেলেবেলা হইতে ধর্ম্মভাব ছিল। সাধু আগষ্টাইন প্রথমে মন্দ ছিলেন, মার প্রার্থনায় ভাল হলেন।

(ক্রমশঃ)

মূল্যপ্রাপ্তি।

৮ম বৎসর।

শ্রীমতী প্রসন্নতারা গুপ্ত,	বালীগঞ্জ	২৲

৯ম বৎসর।

শ্রীমতী প্রসন্নতারা গুপ্ত,	বালীগঞ্জ	২৲
শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দত্ত,	নওয়াখালী	২৲

১০ম বৎসর।

শ্রীমতী প্রসন্নতারা গুপ্ত,	বালীগঞ্জ	২৲
„ কমলিনী দেবী,	কলিকাতা	২৲
„ সুরবালা সেন,	বদরপুর	২৲
„ ইন্দুবালা রায়,		২৲
শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দত্ত,	নওয়াখালি	২৲
„ গোপীমোহন চৌধুরী,	হরিপুর	১৲
„ দুর্গাদাস বসু,	বাঘিল	২৲

১১শ বৎসর।

শ্রীমতী কুসুমকুমারী ঘোষ,	কলিকাতা	২৲
কিরণকুমারী মিত্র,	„	২৲
„ আমোদিনী ঘোষ,	হায়দরাবাদ	২৲
শ্রীযুক্ত গোপীমোহন চৌধুরী,	হরিপুর	২৲
„ পূর্ণচন্দ্র মজুমদার,	মুর্শিদাবাদ	১৲

মহিলার নিয়মাবলী।

মহিলা পত্রিকা প্রতিমাসে সংক্রান্তি দিবসে প্রকাশিত হয়। ডাকমাশুলসহ ইহার বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ মহিলার মূল্য ও অর্থসম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকটে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রিট কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক প্রকাশিত হইবে। কাহারও প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া যাইবে না।

অনেক মহিলা পত্রিকা বৎসরাধিক কাল গ্রহণ করিয়া মূল্য দান করেন না, বড় দুঃখের বিষয়। যাঁহারা মূল্যদানে অসমর্থ তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্রিকা ফেরত পাঠাইয়া দেন, অথবা আমাদিগকে তাহা পাঠাইতে নিষেধ লেখেন। তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া প্রাপ্য মূল্য না পাইলে অনেক সময়ে আমরা সেই মূল্যের জন্য ভি, পিতে মহিলা পাঠাইয়া থাকি।

REG. No. C 32.

সূচী।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

কলিকাতা

রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিসণ প্রেসে"

কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ২রা চৈত্র মুদ্রিত।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"

১ম ভাগ] ফাল্গুণ, ১৩১২ ; মার্চ্চ, ১৯০৬। [৮ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

তুমি জীবনে সুনীতির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন না করিয়া যদি বালকবালিকাদিগকে কেবল আদেশ উপদেশ কর তাহাতে কোন শুভ ফল হইবে না, বরং বিপরীত ফল ঘটিবে। তুমি রোরুদ্যমান বালক বা বালিকাকে শান্ত করিবার জন্য যদি বল "তোকে হাতী দেখাব, বা সন্দেশ খেতে দিব।" একথা শুনে সে তখন শান্ত হইতে পারে। পরে তুমি তাহাকে হাতী দেখাতে পারিলে না, সন্দেশও খেতে দিলে না, আর পাঁচটা মিথ্যা কথা বলে তাকে ভুলাইলে। তোমার এই রূপ কপট ব্যবহার ও মিথ্যাচরণের দৃষ্টান্তে ছেলে মেয়ের যে কত দূর অনিষ্ট হয়, ক্রমে তাহারা যে কত দূর মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক হইয়া উঠে, তাহা তুমি কি বুঝিতে পার না? অতঃপর তাহারা মিথ্যাচরণ কপটাচরণ করিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইবে না।

যদি বালক বালিকাদিগকে তুমি সত্য …দেখিতে চাও, তবে নিজে সত্যনিষ্ঠ হইবে; কথায়, কার্য্যে, ভাবে ও ইঙ্গিতে মিথ্যাচরণ করিবে না। জানিও তাহাদের সম্বন্ধে তোমার শত উপদেশ ও আদেশ তোমার চরিত্রের কুদৃষ্টান্তে বিফল হইবে, তোমার প্রতি তাহাদিগের আর শ্রদ্ধা ভক্তি থাকিবে না।

জননীর জীবনের গুরুতর দায়িত্ব। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত উভয়ের যোগে শিশু সন্তানদিগকে তাঁহার শিক্ষা দিতে হয়। নতুবা কোন ফল হয় না। দৃষ্টান্ত বিপরীত দেখিলে তাহাদের চিত্ত বিকৃত হয়, তাহারা অবাধ্য হইয়া উঠে। বাল্য শিক্ষা ও বাল্য কালের অভ্যাস প্রস্তর রেখার মত শিশুদের অন্তরে দৃঢ়তর বদ্ধমূল হইয়া থাকে, বয়স হইলে বহু শাস্ত্রালোচনা ও বহু শিক্ষায় তাহা প্রায় নিরসন হয় না। অতএব সাবধান! তুমি বালক বালিকাদিগকে কুদৃষ্টান্ত কখনও প্রদর্শন করিও না। এ বিষয়ে নিজের আত্মীয় স্বজন ও দাস দাসীদিগকেও সাবধান করিবে।

মহিলাদিগের নিকটে নিবেদন।

শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রীগণ!

মেরুদণ্ডের উপর মানবদেহ গঠিত, ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপ লাবণ্য সমস্তই মেরুদণ্ডের উপর স্থাপিত, ইহাকে অতিক্রম করিয়া যেমন মানবদেহ থাকিতে পারে না; তদ্রূপসত্য এবং সত্যপরায়ণতা আত্মার মেরুদণ্ডস্বরূপ, ইহাকে অতিক্রম করিয়া আত্মার কোন উন্নতি বা শোভা সৌন্দর্য্য হইতে পারে না। সেই জন্য সত্য ও তাহার সাধনসম্বন্ধীয় তত্ত্ব না জানিলে কোন প্রকার উন্নত জীবনের আশা নাই। তোমরা যে বিধাতার কৃপায় উন্নত জীবন লাভ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছ, তাহাতে আমাদের আনন্দের সীমা নাই। তোমাদের এই উচ্চব্রত পালনসম্বন্ধে আমরা যথাসাধ্য সহায়তা করিতে চেষ্টা করিব. প্রথমতঃ সত্যসম্বন্ধে। কয়েকটি প্রবন্ধ তোমাদিগের নিকটে উপস্থিত করিব এবং তৎসম্বন্ধে তোমাদের প্রশ্ন জানিতে পারিলে তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। আমাদের জ্ঞান শক্তি ও বুদ্ধি অল্প, কিন্তু যত টুকু আছে তত টুকু তোমাদের সেবায় অর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি।

যাহা স্বাধীন বা স্বাবলম্বন তাহাই সত্য, অর্থাৎ যাহা অন্যের আশ্রয় না লইয়া স্বয়ং স্থিতি করে তাহাই সত্য। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ নানা প্রকার আলোচনা গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতের মূলে একটি গূঢ় রহস্যপূর্ণ শক্তি আছে, জাগতিক সমস্ত জড়ীয় ও মানসিক বিষয় এই গূঢ় শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই শক্তির বিকার নাই, অর্থাৎ ইহার প্রকৃতি বা ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন নাই, একই ভাবে আছে, এবং এই শক্তি হইতে যাহা কিছু তাহারও বিকার নাই। সে সমস্ত নানা ভাবে বিকশিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের মৌলিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন নাই। জড়বিজ্ঞানবাদী ও ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদী উভয়ের এত দূর মিল। এখানেই জড়বিজ্ঞানবাদীদের বিজ্ঞানের শেষ, কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদীরা আরও অগ্রসর হইয়া স্থির করিয়াছেন যে, এই গূঢ় মৌলিক শক্তি চৈতন্যময় প্রেমময় এবং পূর্ণ মঙ্গলময় পুরুষ। যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝা গেল যে, ঈশ্বরই মূল সত্য, বিষয় গুলি তাঁহা হইতেই উদ্ভাবিত, সুতরাং সে গুলিরও প্রকৃতিগত স্থায়িত্ব আছে, অর্থাৎ তাহাদের মৌলিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটী একটু পরিষ্কার হইবে। ব্রহ্ম বা মূল শক্তি হইতে তেজ উৎপন্ন হইয়াছে, দাহ-শক্তি ইহার প্রকৃতি বা ধর্ম্ম। তেজ এ সংসারে নানা প্রকার কার্য্য করে, কিন্তু কখনও তাহার প্রকৃতিকে অতিক্রম করে না। রন্ধনের অগ্নি শারীরিক অগ্নি বা রেল গাড়ীর পরিচালক অগ্নি সকলই একই প্রকৃতিবিশিষ্ট, যদিও তাহাদের কার্য্য বিভিন্ন প্রকার, সত্যের স্থায়িত্ব দেখিয়াই পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রকৃতির নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয়।

সত্য মূলে যে একই তাহার পরিভাষা

বলা হইল। উদ্ভাবিত সত্যের পরিভাষা আর একটু বিশদরূপে আলোচনা না করিলে ভাবটি স্পষ্ট হইবে না। মূল সত্তা হইতে যে সমস্ত সত্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদিগকে বিষয় বলি। এই বিষয় গুলি দুই প্রকার, যথা জড় বা ইন্দ্রিয়গোচর, অজড় ও মনোগোচর; এই বিষয় গুলি যেরূপ, সেই গুলিকে সেরূপ বর্ণনা করা সত্য। এই বর্ণনাই আমাদের ভবিষ্যতের কার্য্যের পরিচায়ক হয়। মনে কর একটি আম্র বৃক্ষ দেখিলাম, নানা প্রকার পরিদর্শন এবং পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিলাম যে, ইহা কি রূপে জন্মে, কিরূপে রক্ষিত হয়, কোন্ প্রকারে এবং কোন্ সময়ে ফল দেয়। যাহা স্থির করিলাম তাহার বর্ণনা লিখিয়া রাখিলাম। এই বর্ণনা দ্বারা আমার এবং অন্যের ভবিষ্যৎ কার্য্যে সহায়তা হয়। এই রূপ গাছ দেখিলে বলিতে পারা যায় যে, এইটি বৃক্ষ এবং ইহা কি প্রকার, ইহার কখন ফল পাওয়া যায়। সত্যের লক্ষণ যাহা বলিয়াছি সে গুলি স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে সত্যের মধ্যে দুইটি উপাদান আছে। প্রথম বিষয়ের সত্তা, দ্বিতীয় বিষয়ের মৌলিক প্রকৃতির স্থায়িত্ব, বিষয়ের সত্তা এবং স্থায়িত্বে বিশ্বাস না থাকিলে আমাদের এ সংসারে বাঁচা দুষ্কর হইত। যদি প্রকৃতিগত নির্ব্বিকারত্বে এরূপ বিশ্বাস না থাকিত তবে আমরা বিষয়ের বর্ত্তমানাবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভবিষ্যতের কথা বলিতে পারিতাম না, এবং তৎসম্বন্ধে কিছু করিতে পারিতাম না। আজ রাত্রি হইবে, কাল সূর্য্যোদয় হইবে, ঋতুগণ পর্য্যায়ক্রমে আসিবে; আমার অদ্যকার যে সমস্ত অভাব মোচন হইল, সেগুলি আবার কাল হইবে, যথাকালে আবার পান ভোজন করিতে হইবে, নিদ্রা যাইতে হইবে ইত্যাদি।

এই রূপ ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস না থাকিলে আমরা কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিতাম না, যদি আমরা বিশ্বাস না করিতাম যে আমাদের দৈনিক অভাব-প্রতিদিন হইবে তবে আমরা অভাব মোচনের কোন উপায় করিতাম না, এবং সেই জন্য জীবন ধারণ করিতে অক্ষম হইতাম। এখন ভাবিয়া দেখ সত্যনির্দ্ধারণ-সত্যে বিশ্বাস ও সত্যের অনুসরণ না করিলে আমাদের কতটা অনিষ্ট হয়, কতটা সুখ শান্তির অভাব হয়। যে জাতি বা যে ব্যক্তি যে পরিমাণে সত্য লাভ করিয়াছে, এবং যে পরিমাণে সত্যের অনুসরণ করে সে জাতি বা ব্যক্তি সেই পরিমাণে সুখী। আমাদের রাজপুরুষ ইংরাজগণ নানা প্রকার জড় সত্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং তাহার অনুসরণ পূর্ব্বক নানা প্রকার কল কৌশল করিয়া শারীরিক সুখসম্ভোগের পরিমাণ কেমন বৃদ্ধি করিয়াছেন, আমরা এ বিষয়ে উদাসীন, সেই জন্য নানা প্রকার নৈসর্গিক সম্পত্তি ও সত্যে আমরা দরিদ্র, এবং তাঁহাদের মুখাপেক্ষী।

সত্যই বল। মানুষ যে পরিমাণে সত্য লাভ করিয়াছে সেই পরিমাণে এ সংসারে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। নিরাশ্রয় মানুষ বন্য পশুসদৃশ এ সংসারে এক দিন আসিয়াছিল, নানা প্রকার প্রতি-

কুল অবস্থা তাহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু সেই মানুষ এখন সত্যের বলে দেখ কিরূপ উন্নত ও শক্তিশালী হইয়াছে, এ সংসারে সে কিরূপ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। দূরস্থ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রের গতি সে আপনার গণনার ভিতর আনিয়াছে, বিদ্যুৎকে সত্যবলে পরাজিত করিয়া আপনার পত্রবাহক ও সেবক করিয়াছে। অগ্নি এবং জল দ্বারা আপনার কত কার্য্য করাইয়া লইতেছে। অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিয়া অপার অতলস্পর্শ অসীম জলধির উপর দিয়া যাতায়াত করিয়া আপনার সুখ সম্পত্তি কেমন বৃদ্ধি করিতেছে, জঙ্গল কাটিয়া নগর, পাহাড় কাটিয়া পথ, ভূগর্ভ ভেদ করিয়া রত্ন আহরণ করিয়াছে। সত্যের প্রভাব মানসিক জগতে কম নয়। কত বিজ্ঞান কত দর্শন কত তত্ত্ব বাহির হইয়া মানুষকে কত উন্নত করিয়াছে। নৈতিক বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান এবং ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিয়া পশুর তুল্য মানুষ আজ দেবসদৃশ হইয়াছে। সত্যের বলে ঈশা অকুতোভয়ে ক্রুশে প্রাণ দিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। সত্যের বলে শাক্যসিংহ রাজপ্রাসাদ রাজসিংহাসন রাজভোগ ত্যাগ করিয়া জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সত্যের বলে রাজর্ষি রামমোহন কুসংস্কারের ঘোর অন্ধকার সময়ে আর্য্য ঋষির পবিত্র 'ব্রহ্মবাদের আলোকস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সত্যের বলে আমাদের কেশব হিন্দু সমাজকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া নূতন সমাজ স্থাপন করিয়াছেন, উপধর্ম্মের স্থানে আর্য্য ঋষির প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবাদ এবং নানা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের প্রচারিত ধর্ম্মের সার লইয়া সমন্বয়ের যুগধর্ম্মকে পুষ্ট করিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সত্যেই সুখ, এ সংসারে অসত্যের পথে কেহ কখনও প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারে না। যে পরিমাণে সত্যের ব্যবহার সেই পরিমাণে সুখ আর যে পরিমাণে তাহার বিপরীত ব্যবহার হইয়া থাকে সেই পরিমাণে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সত্যকে অতিক্রম করা নিজ প্রকৃতিকে অতিক্রম করা একই কথা। আপনার প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া কে সুখী হইতে পারে? যিনি যে পরিমাণে আপনার প্রকৃতিসম্বন্ধীয় সত্য জানেন এবং তাহার অনুসরণ করেন, তিনি সেই পরিমাণে সুখী। পান, ভোজন, পরিশ্রম ও বিশ্রাম ইত্যাদি শারীরিক প্রকৃতিসম্বন্ধে যাহার জ্ঞান নাই সে কতই কষ্ট পায়। স্ত্রী পরিবার আত্মীয় স্বজন প্রতিবাসী ও দেশবাসীর সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধ বোধ না থাকিলে এবং তদনুসারে না চলিলে কে সুখী হইতে পারে? বহির্জগৎসম্বন্ধে সত্য জানা না থাকিলে কে বিষয়গুলিকে আপনার সুখের নিমিত্ত নিয়োগ করিতে পারে? আত্মসম্বন্ধে সত্য না জানিলে কি ব্রহ্মকে লাভ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতে পারিতাম? অনেকে বলে যে সত্যের পথে চলিলে কষ্ট পাইতে হয়, একথা একেবারে ভুল। সত্যের পথ এবং প্রকৃতির পথ একই, প্রকৃতির পথে চলিলে কেন দুঃখ হইবে? ক্ষুধা বোধ হইলে আহার করা শারীরিক প্রকৃতি, এই প্রকৃতিপালনে সুখ না তাহার বিরুদ্ধাচরণ

সুখ? তবে লোকে এমন কথা কেন বলে তাহার কারণ আছে। এক জন লোক সত্যের পথে থাকিয়া খাওয়া পরার কষ্ট পাইতেছে, আর একজন অসত্যের পথে চলিয়া বেশ সুখে সচ্ছন্দে আছে। এইরূপ দেখিয়া স্থূলদর্শী পশুপ্রকৃতি লোকে বলে যে, সত্যের পথে দুঃখ। মানুষ একেবারে মানুষ হয় নাই। জাগতিক যাবতীয় বস্তু যেরূপ ক্রমবিকাশ দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, মানুষও সেইরূপ হয়। প্র ত মানুষের তিনটি অবস্থা, যথা—পশুত্ব, মনুষ্যত্ব এবং দেবত্ব, বা তামসিক রাজসিক এবং সাত্বিক। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সুখ। পান ভোজন ইত্যাদি পাশব অবস্থার সুখ। জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি ইত্যাদি মানবাবস্থার সুখ। ব্রহ্মজ্ঞানে এবং ব্রহ্মে অবস্থানে দেবত্বের সুখ। মনে কর এক জন লোক পাশব-প্রকৃতি বর্ব্বর তাহার সত্যাসত্য ন্যায়া-ন্যায় বোধ নাই সে পাশব প্রকৃতি চরিতার্থ করিতে পারিলে সুখী। বাঘ মানুষ খাইতে পারিলে বড় সুখী, নরহত্যা করা যে অন্যায় সে তো জানে না, কিন্তু যে ব্যক্তির উচ্চ ভাব বিকশিত হইয়াছে, সত্যাসত্য ন্যায়ান্যায় বোধ হইয়াছে, সে ব্যক্তি সত্যের পথ ন্যায়ের পথ অতিক্রম করিলে সুখী হইতে পারিবে না। সত্য এবং ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া উপবাস করা বরং তাহার পক্ষে সুখকর। মানুষের ক্রমবিকাশের অবস্থানুসারে সুখ দুঃখের তারতম্য হয়, নিম্ন অবস্থায় যাহা সুখের পরাকাষ্ঠা উচ্চাবস্থায় তাহা নয়। যাহা কিছু বলা গেল তাহার সার বলি-তেছি। এই সারগুলি ধরিয়া চিন্তা করিবে। আমাদের কথা সঙ্গত বা অসঙ্গত তাহা ভাবিবে, এবং কোন বিষয় জিজ্ঞাসা থাকিলে আমাদিগকে জানাইলে তাহার উত্তর দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব!

(১) যাহা স্বাধীন ভাবে আছে তাহাই সত্য। ঈশ্বরই কেবল স্বাধীন ভাবে আছেন, সেই জন্য তিনি একমাত্র মূল সত্য।

(২) যে সমস্ত বিষয় তাঁহা হইতে হইয়াছে তাহাও সত্য এবং ভগবানের ন্যায় সে গুলি মূলে নির্ব্বিকার অর্থাৎ অপরি-বর্ত্তনীয় কিন্তু এগুলির ক্রিয়া নানাপ্রকার।

(৩) সত্যই বল।

(৪) সত্যই সুখ।

সম্রাজ্ঞীর প্রতি ভক্ত কেশবচন্দ্রের ভক্তি।

(আচার্য্য জীবন অস্ত্যবিবরণ হইতে উদ্ধৃত)

"কেশবচন্দ্র কলিকাতায় অবস্থানকালে দেশীয় এবং ইউরোপীয়গণের মধ্যে "কার্য্য-বিধানব্যবস্থা" লইয়া যে ঘোর বিদ্বেষ উপস্থিত হয় তাহা অতি ক্লেশের সহিত দেখিয়া তৎপ্রতিবিধানের জন্য তিনি যত্ন করিয়াছেন। এখন "নবসংহিতা" প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া তৎসম্বন্ধে শিথিলযত্ন হইবেন, ইহা কখনও তাঁহাতে সম্ভবপর নহে। ইংলণ্ডের ভারতে আগমনমধ্যে যিনি বহু-কাল পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন এক আর্য্য-বংশের দুই শাখার মিলনদর্শন করেন, ইংলণ্ড ও ভারত উভয়ের গৌরববর্দ্ধনজন্য স্বয়ং ভগবান্ এই মিলন সাধিত করিয়াছেন

ইহাতে যিনি বিশ্বাস করেন, এক অপরকে পরিহার করিয়া কদাপি সৌভাগ্যের পথে আরোহণ করিতে পারে না ইহা যাঁহার ধারণা, 'যাহাতে সুশাসনপ্রণালী ও সুব্যবস্থা রক্ষা পায়' তজ্জন্য যথোচিত চেষ্টা করা যিনি গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করেন, এমন কি "পদদলিত কোটি কোটি সামান্য লোকের রাজ্যসম্বন্ধে অবস্থার উন্নতি-সাধন' উচ্চতম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য বলিয়া যিনি গ্রহণ করেন, 'রাজভক্তিকে নীচ আনুগত্য ও দাসত্ব হইতে রক্ষা করা' যাঁহার রাজভক্তির মূলে অবস্থান করিতেছে, এ সম্বন্ধে দর্শন ও মত্ততা উভয়কে যিনি সমভাবে জীবনগত করিয়াছেন, সর্ব্বোপরি রাজভক্তির সহিত হরিভক্তি মিলাইয়া যিনি 'যাহা তোমার তাহাই আমার, তাহাই আমাদের, যাহা তোমার নয় তাহা আমাদের নয়। আমরা রাজাটাজা মানি না আমরা কেবল হরিকে মানি' ঈদৃশ নির্ভীক বাক্য যিনি অটল বিশ্বাসের সহিত উচ্চারণ করিতে পারেন, তিনি যে রাজপ্রতিনিধির নিরপক্ষপাত শাসনপ্রণালীস্থাপনের উদ্যোগে সৎপরামর্শদান করিবেন অথবা উপযুক্ত সময়ে রাজভক্তিপ্রকাশের জন্য প্রার্থনা করিবেন ও ঘোষণাপত্র ঘোষিত করিবেন, ইহা নিরতিশয় স্বাভাবিক। ২৪শে মে বৃহস্পতিবার মহারাজ্ঞীর জন্মদিনে তিনি এই প্রার্থনা করেন;—'হে প্রেমময়, হে ভারতের রাজা, আজ হরিভক্তির সঙ্গে রাজভক্তি মিলাইয়া তোমার পূজা করিব, কৃপা করিয়া পূজা গ্রহণ কর। আজ রাজ্ঞীর জন্মদিন উপলক্ষে ভারত আনন্দের উৎসব করিতেছে। আরো আনন্দিত হউক, আরো উৎসব করুক। হে মহারাজাধিরাজ, আমরা তোমারি দাস, হে গুরু, আমরা তোমারি সন্তান, হে পরম পিতা, আমরা সংসার জানি না, পরিবারের পিতামাতাকে জানি না, আমরা কেবল এক ঈশ্বরকে জানি। আমাদের সকলি তুমি. আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া তোমারি। আমাদের ভারতশাসন পরিত্রাণের শাসন, কল্যাণের হেতু, আমরা তাহাই জানি। এই রাজ্ঞী তোমারি প্রেরিতা, ইহা আমরা মানি। হরি, সংসারে আমাদের মা যেমন, রাজ্যে তেমনি আমাদের মা মহারাণী। যাহা তোমার তাহাই আমার, তাহাই আমাদের, যাহা তোমার নয়, তাহা আমাদের নয়। আমরা রাজাটাজা মানি না, আমরা কেবল হরিকে মানি।

'আমাদের রাজার কীর্ত্তি আমরা একটুও বাদ দিতে পারি না। মা, তোমার বিধানের ভিতর এই রাজা, তোমারি ভিতরে এই রাণী। এই আর এক খানি রূপ। মা, কত রূপ দেখাও। রাজ্যে গিয়া রাণী হও, রাণীর মন্ত্রী হও। কীর্ত্তি তব অনেক প্রকার, কিন্তু ভক্তের কাছে এক প্রকার। যত দিন বাঁচিব তোমার কীর্ত্তি মাথায় করিব। মা, তাই আজ তোমার কন্যার জন্মদিন, তুমি তাঁহাকে স্নান করাইয়া সকলের অপেক্ষা বড় যে সিংহাসন তাহার উপরে বসাইতেছ। সমুদ্র পর্ব্বত তাঁহাকে রাজভক্তি দিবে। আম। ক্ষুদ্র, আমরা তাঁকে রাজভক্তি

দিব না? মা, তুমি যাঁহাকে রাজ্যেশ্বরী করিলে, কোটি কোটি লোক যাঁর অধীনে, আমরা তাঁহাকে মানিব না? মা, তুমি আমাদের বলিলে তোমাদের কল্যাণের জন্য আমি একটি ছোট মাকে পাঠাইলাম, তোমরা ইহাকে মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, রাজভক্তি সব দিবে। মা, আমাদের যাহাকে যাহা বলিতে বলিবে তুমি, আমরা তাঁহাকে তাহাই বলিব। মা, আজ তোমার কাছে কত হিরা, মুক্তা পান্নার মুকুট রহিয়াছে, কত বাজনা গান হইতেছে। ইংরাজ বাঙ্গালা সকলে রাজভক্তির গান করিতেছে। মা, ভাগ্যে আজ তোমার বাড়ীতে আসিলাম, তাই দেখিতেছি তুমি আজ তোমার সদ্‌গুণে ভূষিতা, সুনীতিসম্পন্ন রাজকন্যাকে নিজে অভিষিক্ত করিতেছ। আজ যখন আমি দেখিলাম রাজকন্যা নূতন পরিচ্ছদ পরিয়া সিংহাসনে বসিলেন, তখনই শুনিলাম তুমি তাঁহার মাথার হাত দিয়া বলিতেছ 'ভারতের রাণী, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি।' অমনি স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে শঙ্খধ্বনি হইল। হিমালয়, তোমার উপরে আজ মহারাণীর জন্মোৎসব হইতেছে, কত কামানের শব্দ হইতেছে। তুমি একবার বল রাণীর জয়! তার সঙ্গে সঙ্গে বল, জয় মা জয়! মা, তুমি একবার সকল ভক্তকে লইয়া তোমার ভারতের রাণীকে লইয়া এই খানে বস, আমরা দেখি। আমরা কেমন সুখে সুখী, আমরা রাজ্যটাকেও মার কাছে আনিলাম। মা, আজ সব এক হইয়া গেল। ধন্য নববিধান, তুমি সকল ধর্ম্ম এক করিলে। যেমন নববিধানের লোক রাজভক্ত এমন কি আর কেহ হইতে পারে? যে বলিল তোমাকে মার সন্তান, বল দেখি রাণী, এমন রাজভক্তি আর কার হতে পারে? ভারতকে তুমি কুশলে রেখেছে, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা লও, ভক্তি লও। আর রাজার রাজা তুমি, হে হরি, তোমার এই ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্য, নববিধানের রাজ্য আমরা কুশলে রাখব। মা, আমরা কয়টি তোমারি দাস, তোমার আজ্ঞা শুনিয়া কাজ করিব। রাজাধিরাজ তুমি, তোমারি চরণে ইংলণ্ড ভারতবর্ষে এক হউক। মা, তুমি আজ সকল বিবাদ বিসংবাদ দূর কর, আমরা সকলে এক হই। মা, আমার তোমরা নববিধান পূর্ব্ব পশ্চিমে সকল স্থানে যেন প্রচার করিতে পারি। মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। আমরা যেন রাজভক্তি দেখাইয়া কুশলের রাজ্য স্থাপন-করিতে পারি।"'

'নববিধান পত্রিকার অতিরিক্ত' এই নামে মহারাণীর জন্মদিনে হিমালয় হইতে এই ঘোষণাপত্র বাহির হয়*। "আজ আমার রাণীর জন্মদিন। ভারত আনন্দ

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র শেষ জীবনে হিমাচলে অবস্থান কালে উপরি উক্ত প্রার্থনা, এবং এই ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ইল্‌বার্ট বিলের আন্দোলনে ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে বিষম হিংসা দ্বেষ এবং সঙ্ঘর্ষণ ঘটিয়াছিল। তখন মহামতি লর্ড রিপণ রাজপ্রতিনিধি ও প্রধান শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

কর। সমগ্র দেশস্থ স্বদেশীয় নরনারী, বন্ধুগণ, সমবিশ্বাসিগণ, আনন্দ কর। ব্রিটিষ জয়পতাকার নিম্নে যাহারা নিরাপদে জীবন যাপন করিতেছে তাহাদের প্রত্যেকে আজ এই আনন্দের দিনে সকৃতজ্ঞ আনন্দ করুক। বিক্টোরিয়ার কল্যাণকর শাসনাধীনে যে সকল কল্যাণ সম্ভোগ করিতেছে তজ্জন্য কোটি কোটি নরনারী আজ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্তোত্রনিনাদ ভগবৎসন্নিধানে প্রেরণ করুক। আমাদের অনুকম্পনশীলা মহারাজ্ঞীর নামে আমরা নূতন সঙ্গীত গান করি। মহোচ্চ হিমালয় 'ঈশ্বর রাণীকে আশীর্ব্বাদ করুন' এই শব্দ নিনাদিত করুন, গভীর গর্জ্জনে তরঙ্গমালা তুলিয়া বলয়বেষ্টন প্রকাণ্ড সমুদ্র সেই আনন্দধ্বনি প্রতিধ্বনিত করুন। ঈশ্বর বলিতেছেন, রাজভক্ত লোকদিগের ওষ্ঠাধরে 'রাণী' 'আমাদের প্রিয় রাণী' 'আমাদের কল্যাণী রাণী' এই শব্দ উচ্চারিত হউক। সকল জাতি সকল ধর্ম্মের নৃপগণ, নৃপতনয়গণ, অভিজাতগণ, জ্ঞানিগণ, সাধুগণ ভক্তগণ, নরনারী বালকবালিকাগণ, ভারতের দূর দুরান্তর প্রদেশ হইতে ঈশ্বরের মন্দিরে সমাগত হউন, এবং তাঁহার পবিত্র সিংহাসনসন্নিধানে রাজভক্তির কর অর্পণ করুন। পঞ্জাবী ও সিন্ধী, রাজপুত ও মহারাষ্ট্রী, বিহারী ও বাঙ্গালা, দাক্ষিণাত্যের তামিল- ও তেলেগুভাষী জাতি, পার্ব্বত্য ও আদিম জাতি, হিন্দু ও মুসলমান, বুদ্ধ, শিখ এবং পারসিক সকলে আইস, তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন সমবেততানলয়ে উন্নতমনা রাজ্ঞীর প্রশংসাগান কর, এবং তোমাদের সঙ্গীতধ্বনিতে স্বর্গের প্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হউক। হৃদয়শূন্য ভক্তি, লাভালাভগণনায় কপটবাধ্যতাস্বীকার মহান্ ঈশ্বর কখন গ্রহণ করিবেন না, রাজা নয় কিন্তু তাহার ছায়া বা সংজ্ঞামাত্র-স্বীকার অথবা ফলাফলবিচারপ্রণোদিত রাজনীতির হৃদয়শূন্য স্ববিশ্বাস তাঁহার সন্তোষের কারণ হয় না। হৃদয়োত্থিত উচ্ছ্বসিত অনুরাগ, পুত্রসমুচিত প্রকট প্রীতি, উদ্দাম অকৈতব কৃতজ্ঞতা, প্রেমন্তোৎসাহপূর্ণ রাজভক্তি, এই সকলের জন্য ভারত চিরপ্রসিদ্ধ, এই সকল আজ আনন্দোৎসবের দিন অর্পিত হইবে। আমাদের রাজ্ঞী উৎকৃষ্টগুণসম্পন্না, ভূমণ্ডলে যত সকল শাসনপ্রবৃত্ত নৃপতি আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মেতে, শোভনগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, প্রকৃতপক্ষে সুকোমল স্নেহময়ী আমাদিগের মাতা, রাজ্যসম্পর্কে যে সকল বিবিধ কল্যাণ আমরা সম্ভোগ করিতেছি তাহার উৎস, রাজ্ঞীসমুচিত সদ্‌গুণে যথা যোগ্য অত্যুন্নত। অনুরক্তসন্তানসমুচিত রাজভক্তি উপহারে আমরা ঈদৃশী মাতা রাজ্ঞীর সম্মাননা করিতেছি, অপিচ পৃথিবীর অধিরাজকে স্বীকার করিতে গিয়া আমরা স্বর্গাধিরাজের বিধাতৃত্বস্বীকার করি। আমরা ইঁহার সম্মান করিতে গিয়া যিনি ইঁহাকে আমাদের শাসনকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাকেই আমরা গৌরবান্বিত করি। সত্যই আমাদের সাংসারিক ও নৈতিক শিক্ষা ও উন্নতির জন্য প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে ইংলণ্ডের শাসনাধীনে স্থাপন করিয়াছেন। পার্থিব রাজশাসনপ্রণালীর সঙ্গে যে সকল ভ্রম ভ্রান্তি

অপূর্ণতাসংযুক্ত আছে, সে সকলেতে যদিও সময়ে সময়ে দেশশাসন কলঙ্কিত হয়, তথাপি দেখ, সর্ব্বাভিবকারী বিধাতা তাঁহার মঙ্গলসঙ্কল্প কেমন সাধিত করিয়া লইতেছেন, এবং সমগ্র ভারত ইংলণ্ডের রক্ষণাধীনে বিবিধ জাতির মধ্যে তাহার প্রাপ্য স্থানের দিকে এবং স্বর্গরাজ্যের দিকে কেমন অগ্রসর হইতেছে। অতএব আমরা সর্ব্বপ্রকার অসন্তোষের ছল দূরে পরিহার করিয়া ভগবদধান মাতা রাজ্ঞীর প্রতি গভীর রাজভক্তি অর্পণ করি। এ সময়ে ভারতে জাতীয় বিদ্বেষ প্রচণ্ড ভা ধারণ করিয়াছে, এবং লোকদিগের অসন্তোষ ও বিরাগ উদ্দীপন ও বর্দ্ধন করিতে উদ্যত হইয়াছে, আমরা যেন এই সকল প্রতিকূল প্রভাবের অধীন না হই. কিন্তু আমাদের অনুকম্পনশীলা রাজ্ঞী ও তাঁহার অভিজাত প্রতিনিধি—যিনি ভগবৎপরিচালনায় আমাদের এত উপকার করিয়াছেন—দৃঢ়তা সহকারে তাঁহাদের পক্ষসমর্থন করি। উৎসাহপ্রমত্ত রাজভক্তিসহকারে সমগ্র ভারত আজ আনন্দ প্রকাশ করুক, এবং সকলে মিলিত হইয়া করুণাময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, তাঁহার আশীর্ব্বাদ সম্রাট্ মহারাজ্ঞী, রাজপরিবার, ইংলণ্ডস্থ মন্ত্রিবর্গ, ভারতস্থ অভিজাত রাজপ্রতিনিধি এবং তাঁহার সহযোগিগণের মস্তকে বর্ষিত হউক, এবং ইংলণ্ড ও ভারত অকপট সখ্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়া ইহ পরলোকের সুখসৌভাগ্য উপার্জ্জন করুক।"

"বিজিত ও নেতৃগণের মধ্যে যখনই অসদ্ভাব হয় তখন বিজিতগণের কি প্রকার ভাবাবলম্বনকরা সমুচিত তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ "করিও না" এতচ্ছীর্ষক প্রবন্ধের আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি।"

"কার্য্যবিধান ব্যবস্থা লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত, তাহাতে আমার ইচ্ছা হয় যে সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় সমাজের সংস্রব ত্যাগ করি, আর কখনও উহার সঙ্গে যোগ না রাখি। সৎপরামর্শ—(এরূপ) করিও না।

"এই পাণ্ডুলিপির বিরোধী সংবাদপত্রগুলি দেশীয় সমাজের জঘন্য-কুৎসা-নিন্দায় এমনই পূর্ণ যে, আমার প্রবৃত্তি হয় যে, আমার টেবিল হইতে উহাদিগকে সরাইয়া দি, আর উহাদিগের গ্রাহকশ্রেণী হইতে নাম উঠাইয়া লই।—(এরূপ) করিও না।

"আমার চিত্ত এমনি বিরক্ত ও খিট্‌খিটে হইয়াছে, আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি আমাকে জনবিদ্বেষী সংশয়ী করিয়া তুলি।—(এরূপ) করিও না।

"সমুদায় উন্নতি বন্ধ হইয়া গেল, দেশীয় সমাজ শতবর্ষ পিছাইয়া গেল, আমি উন্নতিসম্বন্ধে আর আশা করি না।—(এরূপ) করিও না।

"আমি ক্রোধন, খিট্‌খিটে এবং বিদ্বেষী হইয়া পড়িতেছি, এবং আমার পূর্ব্বপুরুষগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ক্ষমা হারাইয়া ফেলিতেছি।—(এরূপ) করিও না।

"ইউরোপীয় এবং দেশীয়গণের মধ্যে মিল হইতেছিল, এখন উভয়ের মধ্যে ব্যবধান এত বাড়িয়া গেল যে, ভারতের ইতিহাসে ঈদৃশ দুই বিরোধী জাতির কোন

কালে মিলন হইতে পারে না, আমি এই দর্শন-রাজনীতি ও ধর্ম্মসঙ্গত সিদ্ধান্ত করিতেছি—করিও না।

"ইংরাজেরা যদি আমার দেশীয়গণকে গালি দেয় আমিও তাহাদিগকে গালি দিব।—(এরূপ) করিও না।

"আপনারা উচ্চ জাতি বলিয়া যদি তাহারা অভিমান করে, আমি আমাদের জাতিকে উচ্চ বলিয়া অভিমান করিব, এবং তাহাদিগকে বিদেশী বলিয়া ঘৃণা করিব।—করিও না।

"নিঃসম্বন্ধ জাতিকে ভালবাসা অসম্ভব, আমি এই বিশ্বাস করি।—করিও না।

"যে সকল ইয়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারী নয়, তাহারা গবর্ণমেণ্টকে এবং আমাদের রাজপ্রতিনিধিকে ধিক্কার করিতেছে,আমিও তাহাই করিব।—করিও না।

"এত সভ্যতা ও উন্নতিসত্ত্বেও যদি এই রূপ হয়, আমি বিধাতাকে বিশ্বাস করিব না, প্রার্থনা করিব না।—(এরূপ) করিও না।"

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

রাউলপিণ্ডি।

বিগত সংখ্যায় হিমালয়শৃঙ্গ শিমলা হইতে আমাদের রাউলপিণ্ডিতে গমন পর্য্যন্ত পথের বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে রাউলপিণ্ডি ১৪৪১ মাইল দূরে। আমরা গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সায়ংকালে রাউলপিণ্ডি Cantonment ষ্টেশনে পঁহুছিয়া এক খানা টাঙ্গারোহণে বাঙ্গালী পল্লীতে প্রীতিভাজন শ্রীমান্ বিনয়চন্দ্র মজুমদারের আবাসাভিমুখে যাত্রা করি। বিনয়চন্দ্র ষ্টেশনে যাইতেছিলেন, পথে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে তাঁহার আবাস ছিল। আমরা তথায় যাইয়া অবস্থিতি করি। তাঁহার বাসগৃহ সঙ্কীর্ণ ছিল, সেই গৃহে আমাদের অবস্থানে অসুবিধা হইবে ভাবিয়া তিনি এক মাইল অন্তর রাউলপিণ্ডিনগরে প্রসিদ্ধ সম্পন্ন ডাক্তার শ্রীযুক্ত কালানাথ রায়চৌধুরীর প্রশস্ত ভবনে আমাদের অবস্থিতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরদিন উক্ত নগরে যাইয়া ডাক্তার বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়। তিনি তখন হইতে তাঁহার গৃহে স্থিতি করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমরা বিকালে চলিয়া আসিব বলিয়া ক্যাণ্টনমেণ্টে ফিরিয়া যাই। অপরাহ্নে ডাক্তার বাবু গাড়ী পাঠাইয়া দেন। তখন আমরা তাঁহার গৃহে যাইয়া অবস্থিতি করি।

রাউলপিণ্ডি শহর হইতে ক্যাণ্টনমেণ্ট এক মাইল দূরে, সাধারণ লোকের গমনাগমনে অত্যন্ত সুবিধা। এক পয়সা ভাড়ায় টম্‌টম যোগে সেই এক মাইল পথ যাওয়া যায়। এরূপ শস্তা ভাড়ায় গাড়ী কোথাও পাওয়া যায় না। রাউলপিণ্ডি হইতেই কাশ্মীরে যাইবার উৎকৃষ্ট পথ। কাশ্মীরের যাত্রিকগণ টাঙ্গা বা টম্‌টম্ কিংবা এক্কাগাড়ী যোগে সচরাচর তথায় গিয়া থাকেন। গ্রীষ্ম ঋতুতেই ভূ-স্বর্গস্বরূপ কাশ্মীরে গমনের সুবিধা। সেই সময় বহু বাঙ্গালী যাত্রিক এবং অনেক বড়লোক কাশ্মীরে যাত্রা

করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ আমাদেরও তথায় গমনের ইচ্ছা ও সঙ্কল্প ছিল,২।০ জন বাঙ্গলী সহযাত্রী যুটিয়াছিলেন। কিন্তু বহু সময় সাধ্য ও অর্থসাধ্য বলিয়া সেই ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করা যায়। গমনাগমনে ও কাশ্মীরের প্রধান নগরে অবস্থানে শতবাধি টাকা ব্যয় এবং এক মাস কাল যাপন না করিলে চলে না। এক কাশ্মীরদর্শনের জন্য এত সময় ও অর্থ ব্যয় করা তখন আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। রাউলপিণ্ডি হইতে মরি পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া কাশ্মীরে যাইতে হয়। পরে মরি গিরি পর্য্যন্ত আমাদের যাওয়া হইয়াছিল।

পঞ্জাবের নগর সকলের রাজপথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে একটি সুন্দর দৃশ্য নয়নগোচর হয়। গরিব মেথর ও মুটে হইতে ধনী বড়মানুষ ও রাজা মহারাজ পর্য্যন্ত সকলের একবিধ পরিচ্ছদ। সকলেরই মস্তকে স্থূল উষ্ণীষ, পরিধানে পায়জামা ও কোট। তবে বড় মানুষদিগের অধিক মূল্যের এবং সামান্য লোকদিগের সামান্য মূল্যের পরিচ্ছদ। কিন্তু সকল লোকেরই পরিচ্ছদে একতা আছে। এ দিকে কলিকাতায় রাস্তার দিকে তাকাইয়া দেখ, কি ভিন্নতা ও বিচিত্রতা। দেখ, কতক গুলি লোক আদুড় গায়ে চলিয়াছে, হাঁটুর উপর কাপড় জড়ান,কোমরে গামছা বাঁধা; কতক গুলি বাবু লাল বা কালপেড়ে মিহি ধুতি পরিয়া কোঁচা ঝুলাইয়া, কোঁচান সূক্ষ্ম চাদর গলায় জড়াইয়া চুরুটের ধূম উদ্গিরণ করিতে ২ চলিয়াছেন; কতক গুলি বাবু সাধারণ পরিচ্ছদ ধুতি চাদর ও পিরাণে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া বিচরণ করিতেছেন। সকলেরই শীর্ষদেশ শিরস্ত্রাণবিহীন অনাবৃত। এ বিষয়ে একতা। এরূপ দলে দলে ভিন্ন ভিন্ন আকারের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অনাবৃত মস্তক যুবা বৃদ্ধ সকলে চলিয়াছে, পৃথিবীর কোন নগরের পথে দৃষ্ট হয় না,এক বঙ্গদেশেই এ দৃশ্য নয়নগোচর হয়। যাহা হউক বঙ্গীয় মহিলারা মস্তক হইতে বক্ষস্থল পর্য্যন্ত ঘুমোটা টানিয়া পুরুষদিগের শিরস্ত্রাণশূন্যতার পরিশোধ লইয়াছেন। আবার পঞ্জাবী পুরুষদিগের মস্তকে স্থূল উষ্ণীষধারণের ঠিক বিপরীত, সে দেশীয় নারীদিগের অবগুণ্ঠনাদিবিবর্জ্জিত অনাবৃত মস্তক। কিন্তু এদিকে কলিকাতার রাজপথে ভদ্র মোসলমান পুরুষগণ ইজার চাপকান পরিধান ও মস্তকে ক্ষুদ্র টুপি ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন দৃষ্ট হয়, এবং অনেককে জম্‌কাল চোগা চাপকান পরিহিত দেখা যায়। অপিচ অনেক লোক হ্যাটকোট পরিয়া সাহেব সাজিয়া শাঁ শাঁ করিয়া চলিয়াছেন, ইহারও অভাব নাই। এখানে এরূপ পরিচ্ছেদের ভিন্নতা ও বিচিত্রতা। এজন্য মনে হয় বাঙ্গালীর ভাবেরও ভিন্নতা বিচিত্র ঘটিয়াছে, তাহাদের একতার অভাব হইয়াছে। সর্ব্বত্র পঞ্জাবী পুরুষদিগের মুটে মজুর হইতে রাজা মহারাজ পর্য্যন্ত পরিচ্ছদাদিতে একতা ও জাতীয়তা লক্ষিত হয়।

রাউলপিণ্ডি শহর প্রাচীন, এই নগরে প্রায় লক্ষ লোকের বাস। এস্থানে বহু দূর বিস্তৃত বিবিধ পণ্যজাত পূর্ণ বিপণীশ্রেণী বিদ্যমান। ক্যান্টমেণ্টের লোক সকল

প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যাদি শহর হইতে লইয়া যায়। এখানকার গ্রীষ্মকালের প্রধান ফল খরমুজা, আলুচা ও খোর্ম্মাণী। আলুচা ও খোর্ম্মাণী ঈষদ্ অম্লস্বাদ "রসাল ফল, আকারে আমাদের দেশের কুলের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

এস্থানে শিখ সম্প্রদায়ের অনেক গুলি ধর্ম্মমন্দির বিদ্যমান। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ধনী সুজন সিংহের ধর্ম্মমন্দির বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। সুবিস্তৃত মনোহর উদ্যানের মধ্যে সেই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। শিখদিগের ধর্ম্ম মন্দিরে বেদীর উপর তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক "গ্রন্থসাহেব" স্থাপিত থাকে। উক্ত গ্রন্থসাহেব বিগ্রহ স্থানীয় হইয়াছেন। গ্রন্থ সাহেবের নিকটে "কড়া প্রসাদ" (মোহনভোগ) উৎসর্গীকৃত হয়; রবাবসংযোগে কলকণ্ঠ গায়কগণ ভজন গান করে, পাঠক গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। প্রাতে ও সায়ংকালে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ যাইয়া তাহাতে যোগ দান করে। অমৃতসরের বিখ্যাত ভজনালয়ে প্রতিদিন দিবা রাত্রি মহোৎসব ও স্ত্রী পুরুষের ভিড় হয়। তাহাকে গুরুদরবার বা দরবার সাহেব বলে। রাউলপিণ্ডির সুজন সিংহের ধর্ম্মমন্দিরে শিব ও কৃষ্ণমূর্ত্তির যোগ হইয়াছে। এক পার্শ্বে এক প্রকোষ্ঠে কৃষ্ণমূর্ত্তি, মন্দিরের মধ্যস্থলে সুসজ্জিত গ্রন্থসাহেব অপর পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে শিবলিঙ্গ স্থাপিত, এই রূপে সিংহজি শিখ ধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং শৈব ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। যাত্রিকগণ যাইয়া সকল দেবতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। উক্ত উদ্যানে বৃহৎ টাউনক্লক মিয়ুজিয়ম লাইব্রেরী ইত্যাদি আছে। সেই স্থানে একটি বৃহৎ মন্দিরে বলরামের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। যাহা হউক শিখদিগের ধর্ম্মোৎসাহ দেখিয়া আনন্দ হয়। পঞ্জাবের স্থানে স্থানে বিষয় কর্ম্মাদি উপলক্ষ বহু বাঙ্গালী বাবু বাস করেন। প্রায় সকলেই ধর্ম্মবিষয়ে নিস্তেজ নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম, তাঁহারা অবসরকাল তাস পাশা ক্রীড়ায় বৃথাগল্প ও পরচর্চ্চায় যাপন করেন। রাউল পিণ্ডিতে শতাবধি বাঙ্গালী বাস করিয়া থাকেন। ক্যান্টমেণ্টের দুইটী পল্লীতে বহু বাঙ্গালী স্থিতি করেন। একটী পল্লীর নাম শশিভূষণচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট। সেই পল্লীতে শশিভূষণ বাবুর বাস। নানা দেশহিতকর কার্য্যে তাঁহার উৎসাহ ও অনুরাগ দৃষ্ট হইল। উক্ত পল্লীতে বাঙ্গালীদিগের জ্ঞানচর্চ্চার জন্য একটি লাইব্রেরী স্থাপিত। কয় জন বাঙ্গালী বাবু তাস পাশা ও গল্প ছাড়িয়া ভাল ভাল গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাঠ করেন, জানি না।

বিগত ২০শে জ্যৈষ্ঠ সায়ংকালে রাউলপিণ্ডি নগরে ডাক্তার কালীনাথ রায় মহাশয়ের উদ্যানপ্রাঙ্গণে "আস্রারে এত্তাহাদ" (একতাতত্ত্ব) বিষয়ে উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা হইয়াছিল। কতিপয় ভদ্র সম্ভ্রান্ত মোসলমান ও মৌলবি এবং অপর শ্রেণীর পঞ্জাবী ও বাঙ্গালী ভদ্রলোক শ্রোতৃরূপে উপস্থিত ছিলেন। মৌলবী ওলফোদ্দিন সাহেব সুমিষ্ট উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতার পোষকতা ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বিধায়ক নববিধানের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও অনুরাগ প্রকাশ করিয়া নিজ মন্তব্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

২৯শে তারিখ অপরাহ্নে ক্যাণ্টমেণ্টস্থ ডেবিস্ হাইস্কুল গৃহে "আমাদের জীবন" বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষায় বক্তৃতা হয়। কতিপয় বাঙ্গালী বাবু উপস্থিত ছিলেন। পরে উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ধন্যবাদ দান করিয়া কিছু বলেন।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্নে ডাক্তর কালীনাথ রায় রাউলপিণ্ডি সেনাবেশ প্রদর্শন করিবার জন্য আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। বৃহৎ যুড়ী গাড়ীযোগে ক্যাণ্টন্‌মেণ্টের ইতস্ততঃ ১১। ১২ মাইল পথ ভ্রমণ করা হইয়াছিল। রাউলপিণ্ডির সেনানিবেশ বহু বিস্তৃত। সেনাদিগের বাসস্থানাদির অতিশয় সুব্যবস্থা, সমুদায় সুশৃঙ্খল, পরিষ্কৃত পরিচ্ছিন্ন। শ্রুত হইল প্রায় দশ সহস্র গোরা সৈন্য সেখানে বাস করে, অল্প সংখ্যক দেশীয় সিপাহী স্থিতি করিয়া থাকে। তখন গ্রীষ্মকাল প্রযুক্ত প্রায় সমুদায় সৈন্য মরি পর্ব্বতে বাস করিয়া শীতল বায়ু সেবন করিতে ছিল। ক্যান্টনমেণ্টে সেনাদিগের গৃহাদি শূন্য, ইতস্ততঃ ২। ৪ জন সৈন্যমাত্র দেখিতে পাওয়া গেল। ভারতবর্ষের মধ্যে রাউলপিণ্ডিতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ Regiment এর স্থিতি। সীমান্ত প্রদেশ নিকটে বলিয়া শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা অধিক। উক্ত সেনানিবেশের ইতস্ততঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুপ্ত দুর্গ সকল বিদ্যমান। সেই সকল দুর্গ হইতে অলক্ষিত ভাবে গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া যেন সহসা শত্রুদিগকে পরাস্ত করা যাইতে পারে এই উদ্দেশ্যে সেইরূপ দুর্গের ব্যবস্থা। ক্যান্টমেণ্টের এক পার্শ্বে ৩। ৪ মাইল ব্যাপিয়া গুল্মজাতীয় ফলাইনামক তরুর নিবিড় বন। সেই কাননের মনোহারিণী গম্ভীর শোভা দেখিয়া প্রাণ পুলকিত হইয়াছিল। ফলাই কুসুম অতি সুন্দর ও সুগন্ধিযুক্ত, পুষ্পোদ্গমের সময়ে তাহার সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হয়। সে স্থানের এক পার্শ্বে এক উপশৈলের উপর সরোবরে নির্ম্মল জল রক্ষিত, তথা হইতে নলযোগে ইতস্ততঃ পানীয় জল সঞ্চারিত হয়। অপর এক স্থানে দৃষ্ট হইল যে, প্রাচীরে বেষ্টিত একটি সরোবর কলের নির্ম্মল জলে পূর্ণ রহিয়াছে, সরোবরটি দেখিতে অতি সুন্দর। ক্যাণ্টমেণ্টের পূর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে স্বল্পতোয়া সোওয়াসং নদী প্রবাহিত, রাউলপিণ্ডি শহরের পার্শ্ব দিয়া তাহার গতি হইয়াছে।

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে দিল্লী হইতে ভারতের সীমান্ত পেশওয়ার পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ পঞ্জাব লেপ্টনেণ্টগভর্ণরের শাসনাধীন ছিল। ভারত সাম্রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শাসনকর্ত্তা লর্ড কার্জ্জন মহোদয় রাউলপিণ্ডি পঞ্জাব লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণরের শাসননাধীন রাখিয়া তাহার পর হইতে পেশওয়ার পর্য্যন্ত কয়েকটি জিলা এক জন চিফ্ কমিশনরের শাসনাধীন করিয়াছেন। পঞ্জাবে এই নূতন বিভাগ কার্য্যে নূতন শাসনকর্ত্তার নিয়োগে কোনরূপ গোলযোগ ও উচ্চ বাচ্য হয় নাই। মহাতেজা পঞ্জাবী লোকেরা গভর্ণমেণ্টের এই বিধিতে সম্পূর্ণ বাধ্যতা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে লেখনী চালনা করিয়া একবিন্দু

মসীও ব্যয় করেন নাই, কোন বাগ্মীর রসনা বক্তৃতা করিয়া শ্রান্ত হয় নাই। পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসাম রাজ্য শাসনের জন্য একজন লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণরের নূতন নিয়োগ হওয়াতে রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে সমালোচনা ও নিন্দাবাদরটনায় অনেক বাঙ্গালীর লেখনী ক্ষয় ও পুঞ্জ পুঞ্জ মসী ব্যয় হইয়াছে, বাগ্মিগণ পুনঃ২ বক্তৃতা করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন,সকলই নিষ্ফল ও পণ্ডশ্রম হইয়া গিয়াছে। কয়েক খানা চরকা ও স্বদেশী তাঁতের বৃদ্ধি ভিন্ন আর কি বিশেষ লাভ হইয়াছে, বলিতে পারি না। অত্যাচার ও উৎপীড়ন এবং রাজবিধি অমান্য করার জন্য কতক গুলি যুবক ও বালকের চাকুরী পাওয়া ও লেখা পড়া শিক্ষার পথ বন্ধ হইয়াছে। মহামান্য রাজপ্রতিনিধি ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের প্রতি কটুক্তি ও দুর্ব্ব্যবহার করানিবন্ধন ইংরাজ রাজ পুরুষ ও ইংরাজ জাতিসাধারণের বিরাগভাজন হওয়াতে বাঙ্গালীর যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ইংরাজ রাজপুরুষদিষের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ ছিল, কতক গুলি ব্রাহ্ম এই ব্যাপারে মত্ত হওয়াতে সেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা টুকু ব্রাহ্মসমাজ হারাইয়াছেন। স্বদেশহিতৈষীদিগের দ্বারা প্রশ্রয় ও উৎসাহ পাইয়া স্কুল কলেজের বহু ছাত্র অশিষ্ট ও অবাধ্য হইয়া বাঙ্গালী জাতিকে কলঙ্কিত করিয়াছে। পৃথিবীতে ব্রীটিশ গভর্ণমেণ্ট হিমাচলের ন্যায় অটল, দুই চারি জন লোকের কলমের আঁচড়ে ও দুই চারি জনের বক্তৃতার ঝড়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবার নয়। ভেলায় চড়িয়া গিয়া জাহাজে ধাক্কা মারার ন্যায় ব্রীটিশ সিংহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ায় কেবল বালচাপল্য প্রকাশ পইয়াছে। যে বিশেষ রাজকীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল সেই ব্যবস্থাতে একটি অনুন্নত প্রদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সে প্রদেশে নানা প্রকার সুখ সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি—রেলওয়ে বিস্তার বাণিজ্যাদির বিশেষ প্রসার হইবে; বড় বড় বিচারালয় ও কার্য্যালয়াদি স্থাপিত হইতেছে, চাকুরী ভিন্ন যাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের অন্যতর উপায় নাই,তাহাদের চাকুরী পাইবার সুবিধা ও অন্নের সংস্থান হইতেছে, স্বদেশহিতৈষিতায় মত্ত হইয়া অনেকে তাহা ভাবেন না, কেবল আমরা পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত সকল লোক একত্র মিলিত হইয়া একতানে গভর্ণমেণ্টের বিধির বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও আন্দোলন করিয়া স্বদেশের হিত সাধন করিতে পারিব না, ইহাই ভাবেন। কেবল গভর্ণমেণ্টের দুরভিসন্ধিই দেখেন, সদভিসন্ধি ও সদুদ্দেশ্য কিছুই নাই, অতি বুদ্ধির জন্য ইহা ভাবিতে পারেন না। গভর্ণমেণ্ট হইতে অশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়া তাহা স্বীকার করা নাই, কৃতজ্ঞতা নাই; অন্যায় অত্যাচারের জন্য শাসন করিলে কেবল গভর্ণমেণ্টের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ হয়।

পুস্তক ও পত্রিকাসমালোচনা।

১। "অশোকা" ইহা একটি বৃহৎ পদ্য গ্রন্থ শিবপুরনগরস্থ শ্রীমতী সরোজ কুমারী দেবী কর্ত্তৃক প্রণীত। বিগত বৈশাখ

মাসে সরোজ কুমারী দেবীপ্রণীত "হাসি ও অশ্রুনামক" পদ্য গ্রন্থের সমালোচনায় আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে, গ্রন্থকর্ত্রীর কবিত্ব ও কল্পনাশক্তি অসাধারণ। তিনি এক জন স্বভাবকবি। পুনর্ব্বার মহিলাতে তাঁহার কবিত্বের বিশেষ পরিচয় দান অনাবশ্যক। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে কয়েকটী কবিতায় অশোকানাম্নী একটী কালগ্রস্ত শিশু কন্যার বর্ণনা হইয়াছে, তাহাতেই এই পুস্তক "অশোকা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। অশোকার অনেক গুলি কবিতা প্রসিদ্ধ উপন্যাসলিখক বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল ও কপাল কুণ্ডলা প্রভৃতি উপন্যাস পুস্তকের ভাবে রচিত। এই পুস্তকে শতাধিক কবিতা আছে। ২৭৪ পৃষ্ঠায় পুস্তক সমাপ্ত। পুস্তকের কাগজ, ছাপা ও বাইণ্ডিং অত্যুৎকৃষ্ট। গ্রন্থের তুলনায় মূল্য সামান্য, ১৷৹ টাকামাত্র।

অশোকা পুস্তক হইতে অন্ধের কাহিনী কবিতাটী এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

[কোন ইংরাজী কবিতার ছায়া অনুকরণে]

অন্ধ আমি, জানিনাক সুন্দর জগতে
দেখিবার কি আছে মাধুরী।
জানি না কি শোভা ফুটে উষার আলোতে
শান্ত শুদ্ধ নীলাকাশ'পার।
আমি আছি আপনার অন্ধকার মাঝে,
শুদ্ধতার শুনি মৃদু গান।
সৌন্দর্য্য শোভা যা কিছু নিখিলে বিরাজে,
তাহে মোর জুড়ায় না প্রাণ।
বলে সবে—শোভাময়ী শ্যামলা ধরণী,
বসন্তের বিকশিত ফুল।
দিন আসে হাসিময় কনকবরণী,
নিশীথের জোছনা অতুল।
স্নেহময় আপনার প্রিয় পরিজন,
মুখ গুলি শুধু হাসি মাখা।
জানি না তাদের মুখ, তাহারা কেমন,
এ জগতে আসিয়াছি একা।
ফেল না আমার তরে নয়নের জল,
কিছু দুঃখ নাহিক আমার।
আঁধার নয়নপ্রান্তে জাগিছে কেবল
নিশিদিন চির অন্ধকার।
সেই অন্ধকারে যেন দেখিতেছি, হায়,
কোন এক নবীন ভুবন।
জাগিছে শতেক সুখ আঁখির ছায়ায়,
নাহি কোন অভাববেদন।
জাগিতেছে গীতগুলি প্রাণের হরষে,
নাহি মোর নাহিক বেদানা।
নাহি দুখ, নাহি আশা, এ জগতে এসে
নাহি কোন অপূর্ণ বাসনা।
তোমরা মগন থাক আলোক আঁধারে,
আমি থাকি আপন ছায়ায়।
তোমরা সুন্দর ছবি দেখ রবি-করে,
বিশ্বরূপ আমার হিয়ায়।

——

২। "কাহিনী ও ক্ষুদ্র গল্প";—ইহা উপন্যাসবিশেষ, গদ্য গ্রন্থ। ইহাও উপরি উক্ত গ্রন্থকর্ত্রী কর্ত্তৃক বিরচিত। সরোজ কুমারীর পদ্য রচনায় যেমন অসাধারণ ক্ষমতা, গদ্য রচনায়ও তদ্রূপ। এই পুস্তকের গল্পগুলি বিশুদ্ধ ও মনোমুগ্ধকর। কাহিনী বা গল্পে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আভাস পাওয়া যায়। ভুল, বিসর্জ্জন,

অদৃষ্ট, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া, সন্দেহে বিভ্রাট, পরাজয়, প্রতিশোধ, পাপে জয়, হার জিত, মধুরেণ সমাপয়েৎ, প্রেমের জয়, এই পুস্তকে এই এগারটি কাহিনী বা গল্প আছে। পুস্তক ৩১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। নিম্নে বিসর্জ্জনকাহিনীর প্রথমাংশ এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—

"মা বড় আদর করিয়া মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন উমাশশী। কারণ উমা যখন নিতান্ত শিশু ছিল, তখন তাহার এক জন আত্মীয় রমণী আসিয়া বলিয়াছিলেন—বড় সুন্দর মেয়েটিত এবার হয়েছে, ঠিক যেন দুর্গা ঠাকরুণ—কেমন নাক, চোক, যেন কে তুলি দিয়ে এঁকে দিয়েছে। তা ভাই এর নাম দুর্গা রাখ।' উমার মা হাসিয়া বলিলেন—"তাও কি হয়, এখনকার দিনে সে নাম লোকে পছন্দ করবে কেন ? তা তোমারও ত কথা রাখা চাই, ওর নাম তবে উমাশশী রাখলুম।

"সেই অবধি সেই পর্ব্বতদুহিতা লোকমাতার নামেই উমা বাড়িতে লাগিল। কিন্তু সে নামের গুণে কি মানবের অদৃষ্টের বিপর্য্যয় হইতে পারে ? কিছু থাক বা না থাক, সেই সর্ব্বংসহা লোকমাতার মত তাহার কষ্টসহিষ্ণুতা গুণটি ছিল।

"উমা শৈশব হইতেই চিররুগ্না ও ভিরুস্বভাবা ছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভাই ভগিনীরা কখনও কখনও দ্রব্য ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা অপচয় করিলে দোষ পড়িত উমার উপর। সে পিতার অন্যায় বিচারের, আত্মীয়-স্বজনের নিষ্ঠুর ব্যবহারের মধ্যেই বাড়িতে লাগিল। সে কোন কথার প্রতিবাদ করিতে শিখে নাই, কেবল আকুল সজল চক্ষে লোকের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিত। তাহাতে সকলে বলিত 'হাবা মেয়ে' নহিলে এত কথা শুনেও 'ফ্যাল ফ্যাল' করে চেয়ে থাকে। পৃথিবীর নিয়মই এই রূপ। কত ক্ষুদ্র হৃদয়ের অমূল্য ভাব সকল লোকের কঠোর কথায় বিকশিত না হইয়া, অকালে দলিত হইয়া যায়। কত বন্য কুসুমের মধুর সৌরভ লোকচক্ষুর অগোচরে বনপথ সুরভিত করিয়া, আপনি ফুটিয়াই ঝরিয়া টুটীয়া পড়িয়া যায়।

"এইরূপে আপনার পুতুল খেলা লইয়া, খেলেনার বাক্স লইয়া জননীর স্নেহকোলে উমা বাড়িয়া উঠিল। দুর্ব্বল বোকা মেয়েটির প্রতি মাতার করুণ স্নেহদৃষ্টি সর্ব্বদাই স্থাপিত থাকিত।

"তাহার এগার বৎসর বয়স হইবার পরেই তাহার পিতা বিশেষরূপ না দেখিয়া শুনিয়াই পল্লীগ্রামস্থ এক গৃহস্থের পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। ছেলেটী বি এ পাশ করিয়া কলিকাতার মেসে থাকিয়া বি এল পড়ে। মাতার আদতে পল্লীগ্রামে বিবহ দিবার ইচ্ছা ছিল না, পিতা পাশ করা ছেলে শুনিয়া আপনার জিদ বজায় রাখিয়া শুভ কর্ম্মে আর বিলম্ব করিলেন না।

"বিবাহের দিন উমার জননী ও আত্মীয়া রমণী সকলে জামাইয়ের আনন মলিন শুষ্ক দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। সকলেরি মনে হইল, বোধ হয় পাত্রটি পীড়িত। বাঙ্গালীর কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা কি এখন

তাহা দেখেন? কোন প্রকারে সস্তা দরে কন্যা পার হইয়া গেলে গঙ্গা স্নান করিয়া বাঁচেন। আমার মতে তার চেয়ে যদি সূতিকাগারে লবণের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে অনেক নিরীহ বালিকা নানা কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইত।”

৩। আচার্য্য কেশবচন্দ্র, অন্ত্যবিবরণ—চতুর্থ অংশ। নববিধানসমাজের উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় কর্তৃক সঙ্কলিত। আচার্য্যের এই সুবৃহৎ জীবনচরিত একাদশ অংশে অর্থাৎ একাদশ খণ্ডে ডিমাই ৮ পেইজি দুই সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। আদি বিবরণ এক খণ্ড, মধ্য বিবরণ ৬খণ্ড, অন্ত্যবিবরণ চারি খণ্ডে পূর্ণ। এই জীবন চরিত পুস্তকে বহু রত্ন ও বহুবিধ জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয় সকল আছে। মহিলারা তাহা পাঠ করিলে অশেষ উপকার ও আনন্দ লাভ করিতে পারেন। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১৲, নগদ মূল্যে সমগ্র একাদশ খণ্ডের মূল্য ৮৲ মাত্র।

৪। মহাপুরুষ মোহম্মদ ও তৎপ্রবর্ত্তিত এস্‌লাম ধর্ম্ম;—এই পুস্তকে মহাপুরুষ মোহম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, এবং মোহম্মদীয় মূল ধর্ম্ম শাস্ত্র কোরাণ ও হদিসের সার সংগ্রহ হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠ করিলে মোসলমান শাস্ত্রের মোটা মোটি সমুদায় তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। ইহাতে অনেক শিক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। মূল্য ৸৹ মাত্র।

৫। উপাসনা;—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী; শ্রাবণ মাস, প্রথম বর্ষ ও ১২শ সংখ্যা। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। বর্ণবিজ্ঞান, শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, চিনপাত্র বা কড়ির বাসননির্ম্মাণ, অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, মানসশিল্পতত্ত্ব, দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নাইটিঙ্গেলের প্রতি, আত্মহত্যা। এই কয়টি প্রবন্ধ আছে।

সম্প্রতি গত শ্রাবণ মাসের পত্রিকামাত্র আমরা পাইয়াছি। তৎপর ছয় মাসের মধ্যে আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে কিনা জ্ঞাত নহি।

৬। অঙ্কুর;—প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা। মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল ঘোষ। ভিন্ন ভিন্ন উপযুক্ত লোক অঙ্কুরে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন; এই দ্বিতীয় সংখ্যার নিম্ন লিখিত প্রবন্ধ সকল আছে।—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, ভূস্বর্গ, শিপ্রাতীরে, সম্বোধন (কবিতা), শ্রীকৃষ্ণের জন্ম (কবিতা) ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য, ধর্ম্মবিজ্ঞান, প্রান্তরে পূর্ণচন্দ্র দর্শনে (কবিতা), আর্য্য আহারবিধি, গীতাধর্ম্ম, সংবাদ ও নিবেদন।

এইরূপ অঙ্কুরে ঐতিহাসিক তত্ত্ব ধর্ম্ম ও নীতি এবং বিজ্ঞানাদি নানা উপকারী বিষয়ে প্রবন্ধ সকল লিখিত হইতেছে। ইহা সুপাঠ্য শিক্ষাপ্রদ পত্রিকা। ৪নং ভুবন চাটুর্য্যের লেন, শিমলা কাঁসারি পাড়া হইতে প্রকাশিত।

অসভ্য কাছাড়ী নারী।

কাছাড়ের উত্তরাংশ সম্পূর্ণরূপে

পর্ব্বতাকীর্ণ। মানচিত্র দেখিলে শৈল-শ্রেণী ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্ত্তমান সব্‌ডিভিশন হাফ্‌লং পর্ব্বতোপরি স্থিত, পূর্ব্বে সব্‌ডিভিসন গুণ্‌জং নামক স্থানে ছিল, বর্ত্তমান সবডিভিশন হইতে সেই স্থান ৮ মাইল উত্তরে। আশাম বেঙ্গল রেলওয়ের হাফলং ষ্টেশন হইতে বর্ত্তমান সব্‌ডিভিশন ৩ মাইল দূরে অবস্থিত, ষ্টেশন হইতে পর্ব্বোতোপরি ক্রমোন্নত রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল পাহাড়ে নাগা, কুকী, কাছাড়ী, এবং মিকির, এই চারি জাতীয় পার্ব্বত্য লোক বাস করে। তাহারা এক স্থানে অধিক দিন বাস করে না, পাঁচ ছয় বৎসর এক স্থানে অবস্থিতি করে। এই সকল লোক কৃষিকার্য্য করিয়া জীবীকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহারা পর্ব্বতের কোন স্থান কৃষিকার্য্যের জন্য মনোনীত করে, বৃক্ষাদি কর্ত্তন করিয়া স্থান পরিষ্কার করে, পরে অগ্নি দ্বারা সমস্ত জঙ্গল ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, তৎপর সামান্য মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহাতে কুমড়, কচু, ধান্য ইত্যাদি রোপণ করে। এই প্রকার কৃষিকার্য্যকে জুম্ করা বলে, এক স্থানে তাহারা তিন বৎসরের অধিক কাল জুম্ করে না।

কাছাড়ীদিগের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ উপাধি গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা হিন্দু আচার নিয়মানুসারে চলে, আর যাহারা অসভ্য প্রথানুসারে চলে, তাহাদিগকে কাছাড়ী বলে। ইহারা উভয়েই হেড়ম্ব-বংশ বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

কাছাড়ী মেয়েদিগের বিবাহ ১৫।১৬ বৎসরের সময় হইয়া থাকে, বিবাহের পূর্ব্বে পিত্রালয়ে থাকিবার কালীন তাহারা খেস্ (তাহাদের পরিবার এবং গায়ে দিবার মোটা কাপড় বিশেষ) অপিচ এড়ী সূতা প্রস্তুত করে, এবং সাংসারিক অন্যান্য কাজ করিয়া থাকে। পিত্রালয়ে অবস্থান করিবার সময় তাহারা জুমের কাজ অধিক করে না। কিন্তু স্বামীর বাড়ীতে গেলে জুম অর্থাৎ কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। মেয়ের মা বাপ বিবাহের সময় সামান্য পণ গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং জামাতা বিবাহের পর এক বৎসর শ্বশুর বাড়ীতে থাকিয়া জুমের কাজ করে। তখন সে ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবনের আবশ্যকীয় জিনিস পত্র সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। কারণ বিবাহ হইলে পর পুরুষেরা পিতা মাতা, এবং ভ্রাতৃগণ হইতে পৃথক হইয়া অবস্থান করে। স্বামী বর্ত্তমান থাকিতে তাহারা অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে না। তাহাদের দাম্পত্য জীবন বেশ শান্তিপ্রদ, প্রত্যেক পুঞ্জীতে (পাহাড়ীয়া জাতিরা যে স্থানে একত্র বাস করে তাহার নাম পুঞ্জী) মেয়েরা বেশ সদ্ভাবে জীবন যাপন করে, এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাহায্য প্রাপ্ত হয়। কোনও বাড়ীতে এক জনের পীড়া হইলে অন্য বাড়ীর মেয়েরা আসিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করে। কোন শিশু মাতৃহীন হইলে তাহার আত্মীয় নারীরা তাহাকে মাতৃবৎ লালন পালন করে। তাহাদের স্বাভাবিক লজ্জাশীলতা যথেষ্ট, তাহারা অবগুণ্ঠনবতী না হইলেও তাহাদের ব্যবহার অতিশয় ভদ্রতাসূচক।

সরলতা তাহাদের চরিত্রের আভরণ। পুঞ্জীতে কোন নূতন লোক আসিলে তাহারা সাধ্যানুসারে আথিত্য সৎকার করে। চরিত্রের কলঙ্ক তাহাদের মধ্যে বড় দেখা যায় না। প্রত্যেক পুঞ্জীর অবিবাহিত পুরুষেরা এক বিশেষ ঘরে রাত্রিতে অবস্থান করে, সেই ঘরকে ডেকাচাঙ্ বলে। ডেকা অর্থে অবিবাহিত পুরুষ, ডেকী অবিবাহিতা স্ত্রীলোককে বলে। অবিবাহিতা স্ত্রীরাও রাত্রিতে ডেকীচাঙ্গে থাকে। তাহাদিগকে রাত্রিতে দেখিবার জন্য একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রহরী থাকে। এই প্রকার নিয়ম থাকাতে চরিত্রের শিথিলতা ঘটিতে পারে না। প্রত্যেকের বাড়ীতে একখানা ঘরমাত্র। মেয়েরা স্বীয় স্বীয় পুঞ্জীতে স্বাধীন ভাবে চলাফিরা করে, এবং অন্য নিকটবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইলে স্বামী অথবা অন্য আত্মীয়ের সঙ্গে গমন করিয়া থাকে। মেয়েরা কেহই কোন প্রকার লেখা পড়া জানে না। সমস্ত সবডিভিশনে তিনটী পাঠশালা আছে। তাহাতে পাহাড়িয়া বালকেরা অধ্যয়ন করে, পুরুষদিগের মধ্যে অনেকে, সামান্য লেখা পড়া জানে। বিধবাবিবাহ তাহাদের প্রচলিত আছে। কাছাড়ীদিগের ভাষা একপ্রকার দুর্ব্বোধ্য। কাছাড়ী, নাগা, কুকী, মিকির প্রত্যেকের ভাষা সম্পূর্ণরূপে পৃথক্. কিন্তু কাছাড়ী ভাষা জানিলে অন্য অন্য পাহাড়ীদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলা যায়। ভাষা শুনিতে সুশ্রাব্য নয়। নিম্নে কতক গুলি কাছাড়ী শব্দ এবং বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া গেল।

বাঙ্গলা।	কাছাড়ী।
আম,	টাইগুজু।
কাঁঠাল	টাহি পিযু
চমৎকার	গাবাং শিশি
জননী	বুমা
সূর্য্য	সাংং
হস্তী	মিযুং
রামধনু	জেংগলং মাওের
ময়ূর	ডাউ ডাই
মনুষ্য	মুবুং
তুমি কে	মুসেরে
এখন যাও	ডুহাটাং
চল আমরা যাই	ঠা জিঙ্গ টাংনাং
কেন	সম্মুগেম্বে
ভিতরে যাও	বিসিংহা টাং

মহিলাদিগের রচনা।

উৎসব।

মাননীয়া ভগিনী যখন আমাকে প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই "উৎসব" এই শব্দটি আমার হৃদয় হইতে উত্থিত হইল। "উৎসব" এই বিষয়ে কিছু লিখিব স্থির করিলাম। কিন্তু চিন্তা করিবার অবসর পাই নাই, ভাষা শুদ্ধ করিয়া লিখিবারও অবসর পাইলাম না। তাই প্রথমেই ভগিনীদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আমার লেখায় ও ভাবে যেখানে, যেখানে দোষ আছে দয়া করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিবেন।

আমাদিগের পারিবারিক জীবনে ও সামাজিক জীবনে নানা প্রকার উৎসব হইতেছে। সকলেই জানেন উৎসবের অর্থ আনন্দজনক ব্যাপার। যে কোন উৎসব হউক না কেন তাহাতে প্রাণ

আনন্দরসে অভিষিক্ত হয়। হৃদয় সেই আনন্দে উদ্বেলিত হয়।

আজ আমাদিগের এই উৎসবের নেতা কে? কাহাকে লইয়া আমাদের উৎসব? সকল উৎসবের মূলাধার পরম উৎসবময় দেবতা যিনি, আজ তাঁহাকে লইয়া আমাদিগের উৎসব। আজ আমাদিগের কি সৌভাগ্যের দিন!

আবার বলি আজ আমাদিগের কি সৌভাগ্যের দিন! সেই উৎসবময় দেবতা আজ আমাদের প্রত্যেককে ডাকিয়া লইয়া আসিয়াছেন। যেমন ছোট শিশুর হাত ধরে তার মা নিয়ে আসেন, তেমনি আজ পরম দেবতা আমাদের হাত ধরে ডেকে নিয়ে এসেছেন। কোথায় আমাদের ডেকে এনেছেন? কোথায় আজ আমরা উপস্থিত হইয়াছি? তাঁর স্বর্গধামে, তাঁর অমৃত সদনে, যেখানে বসিয়া আর মনে হইতেছে না আমি সংসারের একটি ক্ষুদ্র জীব। মনে হইতেছে আমি ব্রহ্মকন্যা, আমি অমৃতের অধিকারী। মনে হইতেছে আমার জন্যও প্রেমময়ের অক্ষয় ভাণ্ডারের অনন্ত বিভব রহিয়াছে।

ভগিনি! আজ এই উৎসব। যিনি আমাদের ডাকিয়া লইয়া আসিয়াছেন, যিনি আজ এখানে এই ভাবে আমাদিগকে একত্রিত করিয়াছেন, যিনি আজ আমাদিগের মলিন অন্ধকার হৃদয় আলোকিত করিয়া তাঁর প্রেমমুখ প্রকাশিত করিলেন, যিনি আমাদিগের মৃত অবসন্ন প্রাণকে জাগাইয়া কত উৎসাহ উদ্যমে পরিপূর্ণ করিয়া কত আনন্দ, কত সুখ শান্তি দান করিতেছেন, আজ শুভ দিনে আমরা তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করি; আজ আমরা চিরদিনের মত তাঁর চরণে প্রাণ মন বিসর্জ্জন করি।

ভগিনি! তুমি শুনিয়াছ, হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী তীর্থযাত্রিগণ ঠাকুর দর্শনের পর কোন একটি আহার্য্য বস্তু পরিত্যাগ করেন। জীবনে কখনও আর সেই আহার্য্য জিনিষটী আহার করেন না। আমরা আজ স্বর্গধামের যাত্রী এখানে সম্মিলিত হইয়াছি, আমরাও আজ তবে সেই রূপে পরম দেবতার চরণতলে তাঁর প্রেমমুখ দর্শনের জন্য আসিয়াছি, আমরাও তবে আজ সংসারের বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া জীবন মন তাঁর চরণে সমর্পণ করি। আজ তিনি আমাদের শ্রবণে তাঁর যে মধুর বাণী শুনাইতেছেন তাহা ভাল করিয়া শুনি!

উৎসব আসিয়াছে, উৎসব চলিয়া যাইবে, এই আমরা মনে করি। উৎসব আসে আর চলে যায় ইহা সত্য, কিন্তু কিছু কি রেখে যায় না? বন্যা আসে, আবার চলে যায়, থাকে কি? যত দূর বন্যা আসিয়া থাকে, তত দূর ভূমি উর্ব্বরা করে দিয়ে যায়। তেমনি উৎসব এসেছে, চলে যাবে, কিন্তু আমাদের শুষ্ক কঠিন হৃদয়কে সরস করে দিয়ে যাবে। আজ তবে আমাদের জীবন সরস সঞ্জীবিত হউক। আমাদের জীবনে স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হউক। ভগিনি! তুমি আমার মুখে সেই স্বর্গরাজ্যের ছবি দর্শন কর, আমি তোমার মুখে সেই ছবি দর্শন করি। ভগিনি!

আমার প্রাণের ভিতরে তুমি তাঁর মধুর বাণী শ্রবণ কর। আজ আমি তোমার পিতার সেই বাণী শ্রবণ করি। আজ ভগিনি! তুমি আমি কেহই কিছু নই. আজ উৎসবময় পরম দেবতা, আমা দিগকে লইয়া উৎসব করিতেছেন। আজ কেবল তিনিময় সকল। তবে ভগিনি! আবার বলি এস। অনন্ত অক্ষয় ধামের যাত্রী আমরা সেই দিকে অগ্রসর হই, আজ যাহা পশ্চাতে ফেলিয়া এখানে আসিয়াছি, আর সে দিকে চাহিব না, সেই ধ্রুব জ্যোতি ধ্রুব তারা সম্মুখে দাঁড়াইয়া. তাঁর প্রেমমুখ পানে চাহিয়া আমরা অনন্ত অক্ষয় ধামে অগ্রসর হই।

কটক। শ্রীমতী রে—

——

নারী-পূজা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আমেনা। অবোরোধ প্রথা জঘন্য হইলেও উহা আমাদের হাড়ে মাংসে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে। পরুষেরা যত দিন ভদ্র শিষ্ট হইতে না শিখেন, ততদিন এ পরদা ছাড়া সহজ নহে। পুরুষসমাজ যদি ললনাদের প্রতি উপযুক্ত সন্মান প্রদর্শন করিতে শিখিতেন, তবে আর দুঃখ ছিল কি?

কসুম। আমি শুনিয়াছি যে, অন্যান্য মুসলমান প্রধান দেশে নাকি ঈদৃশ অন্তঃপুরপ্রথা নাই। তবে ভারতবর্ষে মুসলমানেরা কেন এরূপ পর্দার সৃষ্টি করিয়া নিজদের স্ত্রীকন্যার সহিত আমাদিগকেও বন্দিনী করিলেন?

জমিলা। পর্দার আদিস্রষ্টা কে, তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। কোন মোস্‌লেম ভ্রাতা যখন অবরোধের অনুকূলে কিছু লিখেন, তখন তিনি বলেন, "আমরাই পর্দার স্রষ্টা; হিন্দুভ্রাতৃগণ যে পর্দার আবিষ্কারক বলিয়া দাবী করেন. তাহা ঠিক নহে।" আবার যে মুসলমান ভাইটি পর্দার প্রতিকূলে কিছু লিখেন, তিনি নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন, "পর্দার প্রথা মুসলমানেরা বিধর্ম্মীদের নিকট শিখিয়াছে।" যাহা হউক এই প্রথার স্রষ্টা যিনি হউন, ভোগটা আমাদিগকে ভুগিতে হইতেছে!

আমি। আপনারা ধীরে ধীরে পর্দা ছাড়েন না কেন? আমরাত ছাড়িয়াছি।

জমিলা। আপনারা পর্দাত্যাগে খুব ভাল আদর্শ দেখাইতে পারিয়াছেন কই? যে ভাবে পর্দা ছাড়িয়াছেন, তাহাতে আপনাদিগকে অনেক নিন্দা সহিতে হইতেছে।

আমি। নিন্দাকে ভয় করিবার প্রয়োজন?

আমেনা। ভয় না করুন,—কিন্তু অনেকে প্রকৃত পর্দার সীমালঙ্ঘন করিয়াছেন, এবং অনেক স্থলে পবিত্রতা নষ্ট—

আমি। থামিলেন কেন? বলুন,—

আমেনা। আমি একটা অপ্রিয় কথা বলিতে যাইতেছিলাম,যাহা হউক, সমাজের প্রতিও আমাদের কতক গুলি কর্ত্তব্য আছে, কেবল ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার জন্য আমরা সে কর্ত্তব্য অবহেলা করিতে পারি না।

আমি। হিন্দুরা ব্রাহ্মসমাজের অযথা নিন্দা করিয়া থাকে, তাহাতে কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন দেখি না।

কুসুম। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ যে পরিমাণে পর্দাত্যাগে নিন্দা করেন, তাহা শুনিয়া সাবধান হওয়া উচিত। আমেনাদিদি হয়ত ব্রাহ্মসমাজে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই বলিতে যাইতেছিলেন।

আমেনা। আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন।

আমি। কিন্তু মোটের উপর মোসলেম সমাজে যেরূপ রমণী-পীড়ন হয়, সেরূপ আর কোথাও হয় না। আপনারা খনার মৃত্যুর কথা বলিলেন, কিন্তু লাহোরের "আনারকলির" সমাধি মন্দিরের ইতিহাস জানেন? সম্রাট্ আকবরের আদেশে আনারকলিকে জীবন্ত প্রোথিত করা হইয়াছিল!! পরে সম্রাট্ জাহাঁগীর অনারকলির শবের উপর সেই সুন্দর সমাধিভবন নির্ম্মান করিয়াছেন! পরন্তু তাজমহলের অভ্যন্তরেও কোন বিষাদের ইতিহাস লুক্কায়িত আছে কি না কে জানে?

জমিলা। মুসলমানেরা রমণীদলন করে সত্য; কিন্তু তাহারা প্রকাশ্যে "নারীপূজা করি" বলিয়া ছলনা করে না। বরং এ দেশের কাট মোল্লারা মনে করে যে, অবলাপীড়ন করাই তাহাদের ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য!

আমেনা। আমার মনে হয়, হিন্দুরা আমাদের নিকট অবরোধপ্রথা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং কাটমোল্লারা হিন্দুর নিকট নারীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন। নতুবা কোরাণ শরীফের বিধান মানিলে অবলা পীড়নও চলে না, অন্যায় অন্তঃপুরপ্রথাও চলে না!

আমি। আপনারা কি মনে করেন, কাটমোল্লারা অন্যায় পর্দার পক্ষপাতী?

জমিলা। দেখ ভাই আমেনা! এখন আবার মোল্লাদের মৌচাকে ঢিল ছুড়িও না!

আমেনা। হাঁ ঠিক বলিলেন! এখন আমি মোল্লাদের মৌচাকে লোষ্ট্র নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত নহি! মোল্লাদের কথা ছাড়ুন, মিসেস চাটার্জ্জি!

আমি। মৌমাছিকে ভয় করিলে আপনারা মধু আহরণ করিবেন কিরূপে?

জমিলা। মধুলুণ্ঠন করিবার সময়ত পূর্ব্বেই সাবধানে যথেষ্ট ধূম অগ্নি লইয়া যাওয়া হয়; এবং সে সময় দুই একটা মৌমাছির দংশন বরং সহ্য হয়! কিন্তু মধু লইতে প্রস্তুত না থাকিয়া অনর্থক মৌচাকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা বালকোচিত মূর্খতা হইবে! এখানে কথা হইতেছে—অবলাপীড়নের, তাহাই বলুন।

আমি। তাহাত আপনারা বলিবেন, আমি শুনিব!

আমেনা। বলিবার ত অনেক ছিল; সে সব মর্ম্মভেদী কাহিনী কি বলিয়া শেষ করা যায়? তবে, আজি আর সময় নাই; এখন উঠি কুসুম দিদি!

অতঃপর আমরা স্ব স্ব ভবনে ফিরিলাম। আর, এস্, হোসেন।

(মোসলমানকন্যা)

—

কুটীর *।

নিরঞ্জন শান্ত নদীতটে
আছে মম নির্জ্জন কুটীর
নাই সেথা বিলাসার কোন
সুখ সেবা তুচ্ছ আড়ম্বর,
শান্তিময় সে কুটীরমাঝে,
শান্তি প্রীতি সদা উছলিত।
সম্মুখে বহিছে নদী
শান্ত কল্লোলিনী, মরি
উল্লাসে ছুটিয়া যায় সাগরের
পানে, চুমি তার ক্ষুদ্র পাদদেশ,
পশ্চাতে ভূধরমালা, নাম
হিমাচল, শুভ্রজটাধারী
যোগী, শান্ত ধ্যানমগ্ন, বসি
যোগাসনে যেন, বৃদ্ধ যোগী
কোন, নিমিলিত আঁখিদুটী
শিরে শুভ্রজটাভার
বামে নিবিড় বন ঘন তমাচ্ছন্ন
হিংস্র জন্তু কোলাহলে
কম্পিত কানন সদা
ভীতিকর ভয়ঙ্কর, ভীষণ
মূরতি, হেরি প্রাণে লাগে ত্রাস।
দক্ষিণে শ্যামল ক্ষেত্র আঁখি তৃপ্তিকর
নধর নধর শস্য—শোভে চারি ধারে
হেরিয়া সরল প্রাণ কৃষক
উল্লাসে, গাহিছে কতই গান
হরষের ভরে, বাঁধিতেছে
কত আশে হৃদয় আপন
তারি মাঝে শোভে সে কুটীর
নিরঞ্জন শান্তির আলয়
শান্তি, প্রেমে, সদা উছলিত
ভক্তি নদী সদা প্রবাহিত।

* পূর্ব্বে অনেক সঙ্খ্যায় যে বালিকার কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাও সেই বালিকাকর্ত্তৃক বিরচিত।

——

প্রার্থনা।

চলেছে দিন চলেছে রাত
কোথায় তোমার লুকান হাত
আমার শিরে মঙ্গল ভরে
করিছে আশীর্ব্বাদ।
নিয়ত তাহা খুঁজিয়া আমি
শ্রান্ত হইনু হৃদয় স্বামী
তবু হে প্রভু, হোলনা কভু
পূর্ণ আমার সাধ।
বুঝেছি শেষে এ পথে তোমা
খুঁজিলে কভু যায় না জানা
এ শুধু খেলা ভ্রমের মেলা
অসার বিড়ম্বনা।
শুনেছি তুমি, আঁধারে আলো
"অন্ধ নয়নে নিয়ত জ্বালো
দাও হে কুল, ঘুচায়ে ভুল
আমি যে অকিঞ্চনা।

শ্রীপ্রি—

——

সংবাদ।

মহিলাতে মহিলাদিগের রচিত কবিতাই প্রকাশিত হয়, পুরুষদিগের রচিত কবিতা প্রকাশ করার স্থান হইয়া উঠে না। সময় সময় অনেক পুরুষ কবিতা লিখিয়া আমা-

দের নিকট পাঠাইয়া থাকেন, আমরা তাহা প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হই।

মহিলার একাদশ বর্ষের অষ্টম মাস অতীত হইল। বর্ষ পূর্ণ হইবার আর চারি মাসমাত্র অবশিষ্ট আছে। এক্ষণ বর্ত্তমান বৎসরের মূল্য প্রার্থনা করা অসময়োচিত নহে। পত্রিকার বৎসরারম্ভে অগ্রিম মূল্য প্রদান করাই নিয়ম। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক গ্রাহক গ্রাহিকার নিকট হইতে দুই তিন বৎসরের মূল্যও পাওয়া যায় নাই। পুনঃ পুনঃ সানুনয়ে তাকিদ পত্র লিখিয়াও তাঁহাদের দয়া আকর্ষণে অসমর্থ হওয়া গিয়াছে। তাঁহারা নিষেধ লিখিলেই তাঁহাদের নামে মহিলা প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারে। প্রাপ্য মূল্য প্রদান না করিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত না দেওয়া কিরূপ নীতি ও ভদ্রতা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সময়ে মূল্য পাঠাইবেন ভাবিয়া পরিচিত আত্মীয় লোকদিগের নিকট তাঁহাদের সম্মতিক্রমে আমরা পত্রিকা পাঠাইয়া থাকি। কিন্তু পরে অনেকের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতে হয়। যাঁহাদের মহিলা গ্রহণে ইচ্ছা নাই, তাঁহারা নিজেদের দেয় মূল্য পরিশোধ করিয়া তাহা বন্ধ করিতে লিখিলেই আমরা বন্ধ করিব। এ বিষয়ে অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার ব্যবহারও বড় দুঃখজনক।

টাঙ্গাইল উপবিভাগের অধীন আন্দরা গ্রামে একজন বৈদ্য মহিলা ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে দুইটি শিশু পুত্র লইয়া বিধবা হন, এবং দরিদ্রতাপ্রযুক্ত অতি কষ্টে সন্তান দুইটিকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করেন। গ্রামের প্রতিবেশিগণ তাঁহার দুঃখের সময় যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি প্রকাশ করিত। ভগবানের কৃপায় তাঁহার পুত্র ঈশানচন্দ্র সেন ও শম্ভুচন্দ্র সেন শিক্ষা লাভ করিয়া বেশ উপযুক্ত হইলেন। একজন জজ কোর্টের উকীল ও অন্যজন অপর কোন উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেন, এবং প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ধনসম্পদ এবং মানমর্য্যাদার অবধি ছিল না। পুত্রদ্বয়ও বেশ উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। যখন তাঁহারা দুর্গোৎসবোপলক্ষে বাড়ীতে আসিতেন, তখন নিজ গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলের জন্য নূতন কাপড় লইয়া আসিতেন। কিন্তু তাঁহাদের জননী আরও অধিকতর কোমলহৃদয়া ছিলেন। প্রতিদিন গ্রামস্থ দুঃখী দরিদ্র লোকদিগকে ভোজন না করাইয়া তিনি আহার করিতেন না। প্রত্যহ তাঁহার আহার করিতে প্রায় দিবাবসান হইত। পুত্রগণ জিজ্ঞাসা করিতেন "মা তুমি কি এখন একটু সকালে খেতে পার না? এখন আর তোমার অভাব কি?" মা বলিতেন "বাবা, আমি কি তা পারি? যে সকল লোক আমার দুঃখের সময় কত সাহায্য করিয়াছে, আর যে সকল দীন দুঃখী রীতিমত খাইতে পায় না, তাহাদিগকে না খাওয়াইয়া কি আমি খাইতে পারি?" আহা কি আশ্চর্য্য প্রেম ও কৃতজ্ঞতা! এ নারী কি স্বর্গের দেবী নহেন? এই হিন্দু মহিলার পবিত্র দৃষ্টান্ত কি অনুকরণীয় নহে?

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

"সাধু ফ্রান্সিস"।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ফ্রান্সিসের মা যখন মারা যান, তখন ওঁকে ডেকে পাঠান। ক্যাথলিকদের নিয়ম আছে যে, শেষ সময় সব পাপ স্বীকার করিতে হয়। তখন ওঁর কাছে সব স্বীকার করিলেন। ফ্রান্সিসের বাবার ইচ্ছা ছিল না যে, তিনি ধর্ম্মের দিকে যান, ওঁর ধর্ম্মপথে যাওয়াতে ওঁর বাবা বিরক্ত হন, শেষ কালে ফ্রান্সিসের গুণে মুগ্ধ হয়ে ওঁর কাছে পাপ স্বীকার করেন। বাড়ীর কাছে যাঁরা থাক্‌তেন, তাঁরা ওঁর জীবন দেখে মুগ্ধ হয়ে ওঁকে ধর্ম্মপিতা বলিত, সহায় ও উপকারী বন্ধু বলিয়া জানিত। পাড়ার কারও পয়সার দরকার হলে, বা ব্যামো হলে, বা গোলমাল হলে তা মিটাবার জন্য ফ্রান্সিসের কাছে আস্‌ত। এদিকে তাঁর সব বড় বড় লোকের সঙ্গে, রাজার সঙ্গে কারবার করিতে হইত, তাঁদের সব চিঠিতে উপদেশ দিতে হত, এ রকম অনেক মেয়েদেরও লিখিতে হইত। ফ্রান্সিসের সহকারী বিশপ্ ভেলিন ছিলেন, তিনিও খুব ভাল লোক ছিলেন, ফ্রান্সিসকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁর খুব কৌতূহল হইল। তিনি ফ্রান্সিসকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলেন, তাঁকে একটা ঘর দিলেন। বিলাতে এ রকম কেহ আসিলে তাঁকে ঘর দিতে হয়, এমন কি পড়বার ঘরও দিতে হয়। তিনি সেই ঘরে, অনেক ফুটো করে রাখলেন, অর্থাৎ সব দেখবার জন্যে, কখন কি রকম থাকেন; যখন একলা থাকেন, তখন কি করেন। তিনি এই ফুটো দিয়ে তাঁকে সর্ব্বদা দেখতেন, কি দেখতেন যে সব সময় একটা সমান ভাব। শোয়ার সময় উঠবার সময় প্রার্থনা করিতেন। বিশপ্ ভেলিন প্রায় ১০০ খানা বই লিখে যান, ফ্রান্সিসের বিষয়ে যে বই খানা লেখেন, সেই খানা এখনও আছে। তিনি লিখিয়াছেন, এ রকম সাধু আর কখনও দেখি নাই। এক দিন একটি বড় মানুষের মেয়ে আসেন, অনেক ক্ষণ ধরে বলেন। শেষ কালে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার আর কিছুত বলবার নাই, তখন সেই মেয়েটী বলিলেন, আপনারা কেন বিবাহ করেন না? এটা কিন্তু ভাল নয়, আমি এ রকম জীবন ঠিক মনে করি না। তখন ফ্রান্সিস হেসে বলিলেন, আচ্ছ আমি যদি বি াহ করিতাম, তাহা হইলে, আপনি যে আমার এত ক্ষণ সময় কথা বলে নিলেন, তা পার্‌তেন্ না, তাহা হইলে আমি এত সময় আপনাকে দিতে পারিতাম না! ইহাতে তিনি চুপ করিয়া গেলেন। এ প্রকার অনেক মেয়ে তাঁর কাছে আসতেন, কথা বলতেন। ফ্রান্সিসের সাধন ছিল, কথা বলিতে যেন রাগ না হয়। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কোন্ জিনিষটা তাঁর বেশী সাধন করিতে

হইয়াছে, তিনি বলেন প্রেম সাধন ও রাগ দমন করা। তাঁর খুব রাগ ছিল, কিন্তু তিনি তাহা দমন করিয়াছিলেন। তিনি যখন মারা যান, তখন তাঁর শরীর কাটা হয়, তাতে দেখা যায় তাঁর খুব রাগ ছিল। সুমিষ্ট কথা বলতেন, তাই বলে মিছে কথা বলতেন না, খুব স্পষ্ট ভাবে সত্য বলিতেন। এক দিন, বিশপ্ ভেলিন এসে বলিলেন, লোকে আমার ভয়ানক নিন্দা করে, আমি তাহা সহ্য করিতে পারি। তখন ফ্রান্সিস বলিলেন, সহ্য গুণ ত সেরূপ নয় যে, আবার অন্যের কাছে প্রকাশ করিতে হয়, বলতে হয়, সইলাম বলে মনেই থাকে না। বিশপ্ ভেলিন উচ্চ দরের লোক ছিলেন, তবুও ফ্রান্সিসের মত ছিলেন না। ফ্রান্সিস বলতেন সহ্য প্রকাশ করিব না, স্বাভাবিক হবে। সে বিষয় বড়াই করব না। এ কথা শুনে তিনি অপ্রস্তুত হলেন। তিনি বলেছিলেন, আমার শরীরটা যে সব ছেলেরা ডাক্তারি পড়ে তাদের দিও। কারণ তখন, ডাক্তারী শিখিবার জন্য মৃত দেহ পাওয়া বড় শক্ত ছিল, ছেলেরা ইহা লইয়া বড় কাড়াকাড়ী করিত। কখনও বা ভয়ানক কাজ করিত, অর্থাৎ গোর খুড়ে মৃতদেহ লইয়া আসিত, ইহাতে তাহাদের আত্মীয়েরা ভয়ানক বিরক্ত হইতেন। তিনি আগেই সেই জন্য বলিয়া যান, আমার শরীরটা তাদের দিও। একবার যখন তাঁর খুব ব্যামো হয়, তখন তিনি ঐ কথা বলেন। সকলে তাহা শুনে অবাক হলেন। উনি বলিলেন, ছেলেরা যখন এরূপ দেহ লইয়া মারামারি করে তাদেরই দিও। এই রকম অনেক গল্প আছে, তাঁর লিখিত চিঠি পত্র, (যাহা তিনি, বড় লোক ছোট লোক সকলকে লিখিতেন) পড়িলে জানা যায়। তাঁরা সকলেই বলেছেন, তাঁদের যে চিঠি লিখেছেন, তাহা ঠিক তাঁদের মনের মত হয়েছে। তিনি কাহাকেও ভয় করিতেন না, মুক্তভাবে সত্য কথা ভাল বেসে লিখিতেন। সরল ভাবে ঠিক কথা বলিলে, তাদের ঠিক ঔষধের মত হত। সকলের সঙ্গে সরলতার সম্বন্ধ ছিল। তাঁর সকলের সঙ্গেই আলাপ ছিল, যেমন রাজা ডিউক ইত্যাদি, তেমনি এ দিকে মুদি পসারি, মাঝি মুটে সকলের সঙ্গে খুব আলাপ ছিল। একবার বোটে করে এক জায়গায় যাচ্ছেন, ওঁর কাছে টিকিট ছিল না। এক জন বুড় মাঝি এসে বলিল, তোমার টিকিট নাই? অন্যলোকে এ কথা শুনে চটে গেল, বলিল, তুমি জান না ইনি কত বড় লোক? তখন ফ্রান্সিস বলিলেন, তোমরা কেন উঁহাকে বকিতেছ, ও আপনার কাজ করিতেছে। তাঁর মস্ত পদ ছিল, মস্ত বাড়ীতে থাকিতে হইত, অনেক চাকর রাখিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা রাখিতেন না। এক দিন এক জন কর্ম্মচারী বলিলেন, এত চাকর কেন, মিছা মিছি, এদের ছাড়িয়া দেওয়া হোক, চাকরেরা তখন ফ্রান্সিসকে বলিল, আমরা আপনার কাছে থাকব, আপনারে ছেড়ে কোথাও যাব না। তখন তিনি বলিলেন, এরা যখন আমাকে ছাড়িতে চায় না, আমিই বা কেন এদের ছাড়িব, আমি যত দিন খাব' ততদিন ইহারাও খাইতে পাইবে। চাকরদের প্রতি অন্যায় অবিচার হলে, তারা একেবারে ফ্রান্সিসের কাছে আসিত, জানিত যে, ফ্রান্সিস কখনও অন্যায় করিবেন না। (ক্রমশঃ)

কেবল ভদ্র মহিলাদিগের জন্য।

ভদ্র স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানে সোণা রূপা

ও

জহরতাদির দোকান।

অন্তপুর বাসিনী নারীগণের আপন আপন পছন্দ ও রুচিমত আপনাদের সাধের বস্তু অলঙ্কারাদি স্বচক্ষে দেখিয়া ক্রয় করিতে পারেন, কলিকাতা নগরিতে কি দেশী কি বিদেশী কোন দোকানে এরূপ সুব্যবস্থা নাই। অনেক দিন হইতে এই অভাব দূর করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। বিধাতার কৃপায় আমাদের সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে। আগামী ৬ই কার্ত্তিক হইতে আমাদের দোকান বাটীর দ্বিতল গৃহে প্রতিদিন বেলা ১টা হইতে ৪টাপর্য্যন্ত মহিলাদিগের জন্য দোকান খোলা থাকিবে যাহাতে বঙ্গকুলবধুগণের লজ্জা ও সম্ভ্রম রক্ষার কোন ত্রুটী না হয়, তাহার বিশেষ বন্দবস্ত করা হইয়াছে। মহিলাদিগকে সাদরে গাড়ী হইতে উক্ত গৃহে লইয়া যাইবার জন্য একজন পরিচারিকা সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবে। যে মহিলার উপর উক্ত দোকানের ভার থাকিবে তিনি আগ্রহ ও যত্ন সহকারে সমস্ত জিনিষ দেখাইবে, বিক্রয় করিবেন ও আবশ্যক হইলে অর্ডারও লইবেন। সাধামত সোণা রূপার, জড়োয়া অলঙ্কার ও নানা বিধ ঘড়ি এবং উপহার দিবার উপযোগী, বিবিধ জিনিষে দোকান সজ্জিত করা হইয়াছে। বঙ্গললনাগণ একবার পরীক্ষা করুন।

ঘোষ এণ্ড সন্স্।

সোণা রূপার অলঙ্কার ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা।

৭৪নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।

স্থাপিত সন ১২৮২সাল।

"ব্রহ্মচারী প্রদত্ত" **লক্ষ্মীবিলাস তৈল।** "ব্রহ্মচারী প্রদত্ত"

লক্ষ্মীবিলাসের পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে কি? অতুল ধন সম্পত্তিশালী—রাজাধিরাজ হইতে সামান্য কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই লক্ষ্মীবিলাসের পরিচয় বিদিত। লক্ষ্মীবিলাসের গুণে ও গন্ধে সকলে মোহিত। কেবল বিলাসের সামগ্রী নহে, বিবিধ শারীরিক এবং মানসিক পীড়া দূর করিতে অমোঘ মহৌষধ। বলবৃদ্ধি করিতে, উৎসাহ আনিতে, শ্রীবৃদ্ধি করিতে চর্ম্মের মসৃণতা উৎপাদন করিতে লক্ষ্মীবিলাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এমন অপূর্ব্ব সামগ্রীর আদর করুণ। বঙ্গের সর্ব্বস্থানে এই তৈলের আদর। মূল্য প্রতিশিশি ৸৹ আনা বোতল ২৲ টাকা।

স্বদেশজাত স্বদেশীয় ফুলের—সুগন্ধ বা সেণ্ট।

আমরা বিশেষ যত্নে, বহু অর্থব্যয়ে, বিলাতি প্রথায় কয়েকটী ভারতীয় ফুলের নির্য্যাসে "সুগন্ধ বা সেণ্ট" প্রস্তুত করিয়াছি। প্রত্যেকটীর সজীব তাজা টাট্‌কা ফুলের গন্ধে প্রাণ মন বিমোহিত হয়। ইহাদের মিষ্ট সুগন্ধ বাতাসে উড়িয়া যায় না। রুমাল বস্ত্রাদিতে বহুদিন স্থিতি করিয়া প্রাণে বিমল আনন্দ দান করিতে থাকে।

বেলা, সেফালিকা, চম্পক, মালতি, জেস্‌মিন বোকে, লিলি অব দি ভ্যালি, একবার ব্যবহার করিলে আর বিলাতি সেণ্টের দিকে ধাবিত হইবেন না।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা। তিন শিশির সুন্দর বাক্স প্রিয় জনকে উপহার দিবার উপযুক্ত, মূল্য ২৷৹

মতিলাল বসু এণ্ড কোং

ম্যানিফ্যাকচারীং পারফিউমারস্।

১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার কলিকাতা।

সূচী।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

কলিকাতা

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১১শভাগ] চৈত্র, ১৩১২; এপ্রিল, ১৯০৬। [৯ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমন্দির গিরজাতে সাপ্তাহিক সামাজিক উপাসনার সময় জননীর সঙ্গে শিশু বালক বালিকারা যাইয়া শান্তভাবে উক্ত উপাসনায় যোগদান করে। উপাসনার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহারা অতিশয় বিনীত ও শিষ্টভাবে বসিয়া থাকে, কোনরূপ গোলযোগ ও চঞ্চলতা প্রকাশ করে না, এইরূপ শিষ্টতা ও বিনয় তাহারা জননীর নিকটে শিক্ষা করিয়াছে, বলিতে হইবে। সচরাচর আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম পূজো পোসনাদিতে অনেক বালক বালিকা গোল যোগ ও হৈ চৈ করিয়া তাহার ব্যাঘাত করিয়া থাকে, তাহারা অনেক সময় অনিবার্য্য হয়, কোন বাধা মানে না। বালক বালিকাদের এরূপ অবিনয় ও অশিষ্টতা অতিশয় দুঃখের কারণ। জননীর উপেক্ষা ও তাঁহার নিকটে সুনীতি শিক্ষা না পাওয়া ইহার মূল। ধর্ম্মের প্রতি মাতার শ্রদ্ধা ভক্তি থাকিলে তিনি এই প্রকার ধর্ম্মাবমাননার কার্য্যে সন্তানকে শাসন না করিয়া থাকিতে পারেন না।

শৈশব কালে সন্তানকে ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ কথা—উপাসনাপ্রার্থনার গভীর তত্ত্ব সকল শিক্ষা দান জননীর পক্ষে সমুচিত নয়। উহা তাহারা ধারণা করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে শুক পক্ষীর রাধাকৃষ্ণ বুলি শিক্ষার ন্যায় হয়। ছোট বেলায় অনেক বড় বড় কথা শিক্ষা হইলে ইচড়ে পাকা কাঁটালের ন্যায় বালক বালিকার মন বিকৃত হইয়া যায়। তিনি তাহাদিগকে ঈশ্বরের বিদ্যমানতা, পরলোকের অস্তিত্ব এবং আত্মার অমরত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব সকল শিক্ষা দান করিবেন বিনয়, শিষ্টতা ও সত্যপালনাদি শিশুদিগের প্রথম শিক্ষণীয় হইবে। সুনীতিরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর যৌবনে উচ্চ ধর্ম্মপ্রাসাদস্থাপনে যত্ন করা আবশ্যক।

শিশু বালক বালিকার চরিত্রগঠনের জন্য জননী বিশেষরূপে দায়ী, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। বালক বালিকাগণ যাহাতে অশিষ্ট ও দুর্নীতিপরায়ণ না হয়, অপিচ তাহারা ইচড়ে পাকা কাঁটাল সদৃশ হইয়া না উঠে, জননী সর্ব্বদা এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

—

রমণীর পরসেবা।

রমণী-হৃদয় স্বভাবতঃ কোমল ও প্রেমার্দ্র। ভগবান্ কোমল উপাদানে তাঁহার হৃদয় গঠন করিয়াছেন। প্রেম কষ্টসহিষ্ণু; প্রেম ভিন্ন সেবাব্রত হইয়া উঠে না; সেবাতে আত্মত্যাগ ও প্রভূত ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। ভগবান্ নারীজাতিকে সেই-রূপ স্বর্গীয় উচ্চ গুণে ভূষিত করিয়াছেন। সন্তানপালনে এক একটী রমণী কেমন অসাধারণ আত্মত্যাগ ও ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার পরিচয় দান করেন সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তিনি নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন করিয়া শিশু সন্তান-দিগকে সুখী ও স্বচ্ছন্দ রাখিতে প্রাণপণে যত্ন করেন। সন্তানের পীড়া হইলে মার আহার নিদ্রা বন্ধ হয়। জননী অক্ষুব্ধ মনে সন্তানের চাকরাণীর কাজ ও মেথরা-ণীর কাজ পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত করিয়া থাকেন; তাঁহার ঘৃণা বিরক্তি কিছুই নাই, বরং এরূপ কার্য্যেও হৃদয় প্রেমার্দ্র নয়নে স্নেহ-জ্যোতি মুখমণ্ডলে প্রসন্নতা লক্ষিত হয়। কোন্ পুরুষ, কোন্ পিতা একদিনও এই রূপ প্রসন্নমনে অবিরক্তচিত্তে সন্তানসেবা করিতে পারেন? পুরুষের কঠোর মন সহজেই ধৈর্য্য-শূন্য হইয়া পড়ে। লোকে রমণীকে অবলা বলে, কিন্তু রমণীর ন্যায় স্বর্গীয় বল কি পুরুষের আছে? এক একটী সতীকন্যা দুশ্চরিত্র-দুর্দ্দান্ত পতির হস্তে পতিত হইয়া কেমন অপরিসীম অত্যাচার বহন করেন! কেমন ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার পরিচয় দান করিয়া থাকেন! অপমান অত্যা-চার ও নিয়ত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া অক্লান্ত ভাবে সেই দুর্বৃত্ত পতির সেবা করেন, তাহার গুরুতর রোগযন্ত্রণার সময় সকল অত্যাচার ভুলিয়া গিয়া তাহার সেবাতে শরীর মন সমর্পণ করেন, কে না ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন?

বাইবেল পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "ঈশ্বর প্রীতিস্বরূপ, অতএব যে প্রীতিতে অধিবাস করে সে ঈশ্বরে অধি-বাস করিয়া থাকে, এবং ঈশ্বর তাহাতে অধিবাস করেন। যে প্রীতি করে না সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রীতি স্বরূপ। হে শিশু সন্তানগণ, আমরা যেন মুখে প্রীতি না করি, কিন্তু কার্য্যেতে ও সত্যেতে।" সত্য প্রীতি, পূর্ণ প্রেম আত্ম-পর বিচার করে না। কাহারও দুঃখ দেখি-লেই প্রীতিমান্ কাতর হন, দুঃখনিবৃত্তি ও অভাবমোচনের জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকেন। যদি তুমি আমাকে ভাল বাস তবে আমি তোমাকে ভাল বাসিব, ইহা প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত ভালবাসা নহে; ইহা এক প্রকার বণিগ্বৃত্তি প্রকৃত প্রেম বিনিময় প্রত্যাশা করে না। তুমি আমাকে ভাল না বাসি-লেও আমি তোমাকে ভাল বাসিব। আমি দুঃখী হই, ক্ষতি নাই, তুমি সুখী হও, তোমাকে সুখী করিবার জন্য আমি দুঃখ ব্রত গ্রহণ করিব। প্রকৃত প্রেম ইহাই বলে। ইহা আত্মপর বিচার করে না, সাধু মহাজনেরা দুঃখী পাপীর দুঃখ পাপ-মোচন, জগতের সুখবর্দ্ধন ও কল্যাণের জন্য দুঃখব্রত গ্রহণ করেন, এমন কি তজ্জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, এই

কারণে নবযুবক শ্রীচৈতন্য সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসী হইলেন, শ্রীশাক্য সিংহ রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন, শ্রীযিশু ক্রুশে আত্মবলিদান করিলেন। তাঁহারা প্রেমদানের বিনিময়ে নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞ সংসারের নিদারুণ অত্যাচার মস্তকে বহন করিয়াছেন।

ঈশ্বর সাধু অসাধু জ্ঞানী মূর্খ ধনী দরিদ্র সকলকে প্রেম করেন, যাহারা তাঁহাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করে ও তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকে তিনি অপমানিত হইয়াও তাহাদিগকে প্রেম দান করেন, সকলের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রেমে কোন রূপ স্বার্থসম্বন্ধ নাই। পরসেবাপ্রিয় সাধু সাধ্বী নরনারী তাঁহারই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। প্রকৃত প্রেমে স্বার্থ নাই, স্বর্গীয় প্রেমে—পরসেবায় আত্মদান আত্মসুখবিসর্জ্জন হয়। পরসেবাপ্রিয় অনেক সাধ্বী রমণীর জীবনে সেই স্বর্গীয় জ্বলন্ত প্রেমের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া দেবী বলিয়া তাঁহাদের চরণে আমরা প্রণত হইয়া থাকি।

পরসেবাব্রতধারিণী বহু খ্রীষ্টীয় সাধ্বী রমণীর পবিত্র জীবন খ্রীষ্টজগতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। সম্প্রতি পাঠিকাগণ মহিলাতে সাধ্বী কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গলের পবিত্র পরসেবার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন। এইরূপ বহু খ্রীষ্টীয় সাধ্বী কন্যা বিশেষতঃ রোমাণ কাথলিক সমাজের সাধ্বী কন্যাগণ চির কৌমার্য্যব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার সুখ বিলাস বিসর্জ্জন করিয়া পর সেবাতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কুমারী সাধ্বী ক্যাথরাইণের পবিত্র জীবনকাহিনী অনেকে পড়িয়া থাকিবেন। তিনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ছিলেন। পিতা মাতা এবং আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া ভগবদ্‌গতপ্রাণা ক্যাথারাইণ সর্ব্ববিধ সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলী দিয়া যৌবনের প্রারম্ভেই পরসেবার জন্য চির জীবন দুঃখব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একটী চিকিৎসালয়ে রোগীদের সেবাতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক দিন একজন ক্ষত রোগাক্রান্ত রোগীর পচা দুর্গন্ধ ক্ষত ধৌত করিতে যাইয়া তাঁহার মনে ঘৃণার উদয় হইয়াছিল, পবিত্র সেবাব্রতে আমার ঘৃণা হইল; ইহা মনে করিয়া পরক্ষণেই তাঁহার অনুতাপ হয়, তৎক্ষণাৎ তিনি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ উক্ত দুর্গন্ধ ক্ষতস্থান চুম্বন করেন; ইহা সামান্য প্রেমের আকর্ষণে করেন নাই। ইয়ুরোপের শত শত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা সাংসারিক সুখবাসনা বিসর্জ্জন এবং পারিবারিক মায়াবন্ধন ছেদন করিয়া দেশ দেশান্তরে পর্ব্বত ও অরণ্যভূমিতে অসভ্য বর্ব্বর জাতির সেবাতে কায়মনঃপ্রাণে চিরজীবন নিযুক্ত আছেন, মাতৃস্থানীয় হইয়া কুলিমজুর শ্রেণীর পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় বালক বালিকাদিগকে সযত্নে সেবা করিতেছেন। ইহা কি সামান্য প্রেমের নিদর্শন। রোগীর সেবা, দুঃখীর দুঃখমোচন অজ্ঞানকে জ্ঞান দান করিয়া তাঁহারা বিমলানন্দ সম্ভোগ করেন। আমাদের একটি যুবাবন্ধু ইয়রোপ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া সুইজারল্যাণ্ডে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি গুরুতর নিউমোনিয়া রোগে

আক্রান্ত হইয়া এক চিকিৎসালয়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রায় সপ্তাহকাল তাঁহার চৈতন্য ছিল না। উক্ত চিকিৎসালয়ে শুশ্রূষাকারিণী নারীগণ এমন সযত্নে প্রাণপণে এই ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অজ্ঞাতকুলশীল যুবার সেবা করিয়াছিলেন যে, বলিতে কি তাঁহাদের যত্নেই তিনি সেই দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহা কি সামান্য প্রেমের দৃষ্টান্ত। Little sister of the poors (গরিবদের ক্ষুদ্র ভগিনীদল) নামে কয়েক জন সেবাব্রতধারিণী ইয়ুরোপীয় মহিলা এই মহা নগরীর একটী বাড়ীতে বাস করিতেছেন, তাঁহারা দুরারোগ্য নিরাশ্রয় রোগীদিগকে সেখানে আশ্রয় দান করিয়া দিবারাত্রি পরম যত্নে তাহাদের সেবা করেন, তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দান, ঔষধ পথ্যাদি প্রদান এবং তাহাদের মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিয়া থাকেন। সেই পুণ্যবতী রমণীগণ রোগীদিগের ঔষধ পথ্যাদির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দ্বারে দ্বারে যাইয়া অর্থ ভিক্ষা করিয়া থাকেন, অথবা কোন শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাহা বিক্রয় করেন। সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থে সেবা কার্য্যের সাহায্য হইয়া থাকে। একদা ডাক্তার আসিয়া একটি রোগীকে দেখিয়া বলিলেন, উৎকৃষ্ট মাংসের জুস ইহাকে খাওয়াইতে হইবে, নতুবা এ রোগী বাঁচিবে না। একটী প্রেমার্দ্রহৃদয়া ভগিনী একজন কসাইয়ের দোকানে যাইয়া উভয় করতল যোগে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া সবিনয়ে কসাইকে বলিলেন, "আমার রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা, সুপ পান করিলে তাহার প্রাণ বাঁচিতে পারে। সুপের জন্য আমাকে কিছু ভাল তাজা মাংস প্রদান কর।" তিনি দুই তিন বার এইরূপ মিনতি করিয়া বলিলেন; নিষ্ঠুর কসাই সেই পুণ্যবতী মহিলার বাক্যে প্রথমতঃ দৃক্‌পাত করে নাই, পরে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া তাঁহার করতলে কতকগুলি থুথু নিক্ষেপ করে। মহিলা তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া বলিলেন, "ইহাতো আমার জন্য হইল, আমার রোগীর প্রাণ ওষ্ঠাগত. দয়া করিয়া তাহার জন্য কিছু ভাল মাংস দাও।" সেই দেবীর প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ দেখিয়া নিকটস্থ ভদ্র লোক সকল উক্ত দুরাত্মা কসাইকে উপযুক্ত শাসন করেন, এবং অপর একজন কসাই দয়া করিয়া মাংস দান করে। মহিলা হৃষ্টচিত্তে চলিয়া যান। পরসেবাপ্রিয়া ঈদৃশ পুণ্যবতী মহিলা ইয়ুরোপীয় খ্রীষ্টীয়সমাজের অলঙ্কার।

আমাদের জননীস্বরূপা দয়ার্দ্রহৃদয়া-রাজরাজেশ্বরী স্বর্গগতা ভিক্টোরিয়া দেবীর পরসেবায় অনেক আশ্চর্য্য কাহিনী আছে। এস্থানে কয়েকটী কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। তাঁহার কোমল হৃদয় সর্ব্বদা দুঃখীর দুঃখে অতিশয় কাতর হইত। তিনি সময়ে সময়ে নগরের বাহিরে সামান্য পল্লীতে যাইয়া বাস করিতেন। তখন দুঃখী দরিদ্র প্রতিবাসীদের গৃহে স্বয়ং যাইয়া তাহাদের কোন বিশেষ অভাব আছে কি না তাহার সংবাদ লইতেন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র অর্থহীনকে অর্থ দান করিয়া আসিতেন। একদা একটী প্রতিবেশিনী দুঃখিনী বৃদ্ধা নারীর অন্তিম কাল উপস্থিত শুনিতে

পাইয়া রাজ্ঞী তাহার কুটীরে উপস্থিত হন, এবং তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া বাইবেল পুস্তক হইতে পারলৌকিক আশাপ্রদ সান্ত্বনাজনক বচন সকল তাহাকে পড়িয়া শুনাইতে থাকেন। ইতিমধ্যে একজন পাদ্রি (পুরোহিত) আগমন করেন, তিনি সেই মুমূর্ষু দরিদ্রা নারীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া ধর্ম্মপুস্তক পড়িতেছেন ইংলণ্ডেশ্বরীকে এরূপ দেখিয়া চমৎকৃত হন। পাদ্রী সাহেবকে দর্শনমাত্র রাজ্ঞী গাত্রোত্থান করিয়া বলেন, "আসুন,আপনি নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করুন।" একদা অপরাহ্নে রাজ্ঞী শকটারোহণে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, পথে একজন শ্রমজীবী বৃদ্ধকে দেখেন যে, কাষ্ঠভার পৃষ্ঠে বহন করিয়া শ্রান্ত ক্লান্তভাবে অতি কষ্টে চলিয়া যাইতেছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া রাজ্ঞীর বড় দয়া হয়। তিনি গাড়ী রাখিয়া সেই ক্লান্ত বৃদ্ধকে গাড়ীর এক পার্শ্বে উঠাইয়া লইলেন, গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে তাহার কাষ্ঠভার রাখিতে দিলেন, বৃদ্ধকে তাহার গন্তব্যস্থানের নিকটে পঁহুছাইয়া বিদায় দান করিলেন। সেই বর্ষীয়ান্ পুরুষ "তুমি বড় দয়ালু মহিলা" বলিয়া রাজ্ঞীর করমর্দ্দনপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতাবনত মস্তকে ধন্যবাদ করিতে করিতে কাষ্ঠভার সহ স্বস্থানে চলিয়া গেল। সে প্রথমতঃ বুঝিতে পারে নাই, তিনি যে জগন্মান্যা মহারাণী ভিক্টোরিয়া; পরে জানিতে পারিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়। এক দিন রাজ্ঞী শকটারোহণে যাইতেছেন, পথপ্রান্তে একটী এদেশীয় নারীকে দেখিতে পান যে তাহার পদতল অনাবৃত। ইহা দেখিয়াই তিনি গাড়ী রাখিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন,"তুমি কে? তুমি জুতা মুজা ব্যবহার কর না কেন?" সে বলিল, "আমি একজন হিন্দুস্থানী আয়া, অমুক সাহেবের সঙ্গে এখানে আসিয়াছি। জুতা মুজা সর্ব্বদা ব্যবহার করি, আমার এরূপ অর্থ কোথায়? আমি সামান্য মাহিয়ানা পাইয়াথাকি।" ইহা শুনিয়া প্রেমার্দ্রহৃদয়া রাণী বলিলেন, "ইংলণ্ডে বড় শীত, শূন্যপদে চলিলে তোমর অসুখ হইবে। ইহা বলিয়া তিনি জুতা মুজা ক্রয় করিবার জন্য নিজের পকেট হইতে কয়েকটী টাকা উক্ত আয়ার হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই পুণ্যবতী রাজ্ঞীর এরূপ অনেক পরোপকারের বা পরসেবার কাহিনী আছে, তাহা লিখিতে গেলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়ে।

ইংলণ্ডেশ্বরীর কন্যা জার্ম্মণীর রাজমহিষী কিয়ৎকাল হইল পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি চিকিৎসালয়ের রোগীদিগের সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক দিন সায়ংকালে তথায় যাইয়া দেখেন যে, একজন নিম্ন শ্রেণীর দুঃখিনী নারী একটি শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া শয্যাশায়ী রুগ্ন স্বামীকে দেখিতে আসিয়াছে। স্বামীর নিকটে তাহার কিছু কথা বলিবার ছিল,কিন্তু শিশুটি অত্যন্ত ক্রন্দন করিতেছিল বলিয়া তাহা বলিতে পারিতেছিল না। পীড়িত ব্যক্তিও শিশুর ক্রন্দনে অতিশয় ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা দেখিয়া রাজমহিষী উক্ত স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন,"তোমার এই রোরুদ্যমান সন্তানটিকে আমার ক্রোড়ে অর্পণ কর, আমি যে উপায়ে হউক ইহাকে সান্ত্বনাদান করিব, তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে যত ক্ষণ

ইচ্ছা হয় নিশ্চিন্ত মনে কথোপকথন কর।" ইহা বলিয়া রাজ্ঞী শিশুকে নিজের ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক নানা প্রকার আমোদচ্ছলে তাহাকে শান্ত করিলেন। পরম সেবক যিশুর পবিত্র চরিত্রের ছায়া জীবনে পড়িয়াছে বলিয়াই রাজরাজেশ্বরী পর্য্যন্ত দীন দুঃখীদের সেবা করিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন।

পুরাণে বর্ণিত পাণ্ডব রাজমহিষী দ্রৌপদী দেবীর পরসেবায়, আতিথ্যসৎকারে কিরূপ আশ্চর্য্য নিষ্ঠা ছিল, পাঠিকাগণ পড়িয়া থাকিবেন। সাধারণতঃ প্রাচীন শ্রেণীর হিন্দু মহিলাদিগের অন্তরে পরসেবানুরাগ প্রবল দেখা যায়। কিন্তু তাঁহাদের তাদৃশ সুযোগ ও সুবিধা এবং সেবাকার্য্যে উপযুক্ত শিক্ষা নাই। এদিকে অবরোধপ্রথা ও সমাজ প্রবল প্রতিবন্ধক। বাল্যকাল হইতেই বিবাহিতা হইয়া তাঁহারা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ হন। মুক্ত ভাব ও স্বাধীনতা না পাইলে, প্রেম প্রশস্ত হয় না, পরসেবা যথোপযুক্তরূপে হইয়া উঠে না, দয়াবৃত্তি পূর্ণরূপে চরিতার্থ হয় না। আতিথ্যসৎকারে আত্মীয় প্রতিবেশীর দুঃখমোচনে প্রেমার্দ্র হিন্দু মহিলাগণ যত দূর সুযোগলাভ করেন যত্ন পরিশ্রম করিয়া থাকেন। টাঙ্গাইলের কায়স্থকুলোদ্ভবা হরিভক্তিপরায়ণা স্বর্গগতা গা র্ব্বা দেবীর আতিথ্যসৎকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি গৃহে সমাগতা সজাতীয়া বা নিম্ন শ্রেণীর অভ্যাগতদিগকে স্বহস্তে সযত্নে রন্ধন পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতেন, নিজে কুটন কুটিয়া মসলা বাটিয়া সরোবর হইতে জল আনয়ন করিয়া অতিথির জন্য রন্ধনাদিকার্য্য করিতেন। ব্রাহ্মণ অতিথির জন্য রন্ধনাদির আয়োজন করিয়া দিতেন। গৃহাগত শ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত অতিথিকে দুগ্ধদানে বঞ্চিত করিয়া নিজের সন্তানদিগকে দুগ্ধ পান করাইতেন না। এই পবিত্র আতিথ্যসৎকার তাঁহার নিত্য ব্রত ছিল। প্রতিবেশীদিগের রোগ শোক দুঃখ বিপদ ঘটিলে তিনি প্রাণপণে তাহাদের সেবা করিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার নিত্য সাধন ভজন নাম জপ গ্রন্থ পাঠাদি ছিল। নব্য শ্রেণীর অনেক মহিলাই এক জন শ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত অতিথিকে গৃহে উপস্থিত দেখিলে জঞ্জাল বোধ করেন, কিরূপে তাহাকে বিদায় করিবেন তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন। অনেক প্রাচীন শ্রেণীর গৃহিণী প্রত্যহ স্বহস্তে রন্ধন পরিবেশনপূর্ব্বক পরিবারস্থ সকলকে এমন কি চাকর চাকরাণীকে পর্য্যন্ত তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া পরে নিজে ভোজন করেন।

পূর্ব্ব বঙ্গের একটী পল্লীতে একজন নিঃস্ব ভদ্রলোকের স্ত্রীবিয়োগ হয়। গৃহিণী দীর্ঘকাল শয্যাশায়িনী হইয়া রোগ যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হন। প্রত্যহ প্রতিবেশিনী হিন্দু নারীগণ আসিয়া তাঁহাকে সযত্নে ঔষধ পথ্যাদি যোগাইয়াছিলেন, তাঁহার সন্তানদিগের সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইবামাত্র এক এক জন প্রতিবেশিনী আসিয়া তাঁহার এক একটী শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া যান, নিজ সন্তানের ন্যায় তাহাদের সেবা করেন, এক একজন প্রতিবেশিনী নারীবাইয়া

উক্ত বিপত্নীক দুঃখী গৃহস্বামীকে দুই বেলা রন্ধন করিয়া দেন, তাঁহার গৃহকর্ম্মাদি সম্পাদন করেন। কি সুন্দর ভালবাসা ও দয়ার ব্যাপার! ইহার বিপরীত দৃশ্য দর্শন কর। কয়েক বৎসর হইল কলিকাতার সন্নিহিত একটী পল্লীতে আমাদের একটি আত্মীয় যুবার মৃত্যু হয়। তাঁহার তরুণবয়স্কা পত্নী দারুণ শোকাঘাতে ক্রন্দন বিলাপ করিতে থাকেন। তাঁহার দুই তিনটী শিশু সন্তান ক্ষুধায় আকুল হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া অন্নের জন্য কাঁদিতে থাকে। জননী শোকাকুলা, তিনি আপনাকে স্থির রাখিতে পারিতেছিলেন না, ক্ষুধার্ত্ত শিশুদিগকে রাঁধিয়া খাওয়াইবেন কি? এদিকে শোকার্ত্তা নব বিধবা ও ক্ষুধার্ত্ত বালক বালিকার খাওয়া হইল কি না, একটী প্রতিবেশিনী নারী আসিয়া তাহার কোন সংবাদ লইল না। কোন পরিবারে কাহারও মৃত্যু হইলে সেই দিন বা তৎপর দুই তিন দিন পর্য্যন্ত কোন প্রতিবেশী যাইয়া সেই পরিবারের সেবা করিলে তাহার অমঙ্গল হয়, এই কুসংস্কার তাহাদিগকে সেই নিদারুণ নিষ্ঠুরাচরণে বাধ্য করিয়াছিল।

সুপ্রসিদ্ধ সিবিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত ডাক্তর রসিক লাল দত্ত মহাশয়ের স্বর্গগতা বৃদ্ধা জননী হাবড়া নগরস্থ তাঁহার পৈতৃক বাসভবনে বাস করিতেন। তিনি প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণে দুঃখী দরিদ্র প্রতিবেশীদিগের বাড়ীতে যাইয়া কাহারও কোন দুঃখ কষ্ট ও অভাব আছে কি না সংবাদ লইতেন। কাহারও অর্থাভাব এবং অন্ন বস্ত্রাদির অভাব দেখিলে, তাহার সেই অভাব মোচন করিতেন। এই রূপে পল্লী ভ্রমণপূর্ব্বক দুঃখী দরিদ্রদিগের দুঃখমোচনের উপায় করিয়া মধ্যাহ্নে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া হবিষ্যান্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হইতেন। পুত্র প্রতিমাসে যে টাকা পয়সা দিতেন, সেই পরদুঃখকাতরা বন্দনীয়া মহিলা এই রূপে প্রায় তাহা পরসেবায় ব্যয় করিতেন।

মোসলমান মহিলাদিগের মধ্যে কাহারও জীবনে পরসেবার উচ্চ দৃষ্টান্ত আছে কি না তাহা আমরা অবগত নহি। দুঃখী দুর্ব্বল নিরাশ্রয় জনের প্রতি তাঁহাদের হৃদয়ে যে দয়া প্রেম ও স্নেহের উত্তেজনা হয় না, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু তাঁহাদের স্বর্গীয় ভাব সকল প্রকাশ করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ বড়ই কম। কঠিন পর্দায় সমুদায় চাপা পড়িয়া আছে, সমাজ বিষম প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে। মোসলমান সাধুপুরুষদিগের পরসেবা ও দয়ার কার্য্য অতুলনীয়, তাহার সুদৃষ্টান্তের অভাব নাই।

এক্ষণ ব্রাহ্মিকাদিগের কথা হইতেছে; তাঁহাদের বাধা বিঘ্ন কম, কিন্তু বিলাসিতা ও সাংসারিকতার দিকে তাঁহাদের অধিকাংশের মন আকৃষ্ট। সেবাব্রতপরায়ণা খ্রীষ্টীয় মহিলাদিগের কথা দূরে থাকুক, সেবা পরায়ণতায় তাঁহারা প্রাচীন শ্রেণীর হিন্দু মহিলাদিগের পার্শ্বেও দণ্ডায়মান হইতে পারেন না। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ১৮৭২ সনে ভারতাশ্রম স্থাপন করেন। উহার প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের স্ত্রী পুরুষ এক বাটীতে বাস করিয়া ধর্ম্মসাধন করিবেন; এক পরিবার

অন্য পরিবারের সেবা করিবেন, এক স্ত্রী অপর স্ত্রীর পুত্র কন্যাপালনে রত থাকিবেন, ভিন্ন পরিবারের মহিলারা ভিন্নতা ভুলিয়া গিয়া ধর্ম্মেতে এক পরিবার হইয়া স্বর্গের দৃশ্য প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু স্বার্থপরতা ও সাংসারিকতা প্রবেশ করিয়া সমুদায় ব্যর্থ করিয়া ফেলিয়াছিল।

বাঁকিপুরের স্বর্গগতা অঘোর কামিনী দেবীর পরসেবাব্রতের অনেক প্রশংসা শুনা গিয়াছে। নগরে কোথাও রুগ্ন ও দুঃখভারাক্রান্ত বিপন্ন লোকের সংবাদ পাইলে তিনি সেই স্থানে দৌড়িয়া যাইয়া সযত্নে তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেন। বস্ত্রালঙ্কার ভোগ বিলাসাদিতে তাঁহার বীত রাগ ছিল। তিনি সামন্য বেশে থাকিতেন। স্বামী ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট একজন উদার প্রকৃতি ব্রাহ্ম। বোধ হয় তাঁহার উপার্জ্জিত অধিকাংশ অর্থ অঘোর কামিনী পরসেবাতে ব্যয় করিতেন। পুত্র কন্যাদিগের বিলাসিতার পথে তিনি প্রতিবন্ধক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় উল্লেখযোগ্যা সেবাপরায়ণা ব্রাহ্মিকা মহিলা আর কে আছেন, জানি না। এক বার কুমিল্লানগরে সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটী আত্মীয়া ব্রাহ্মিকা বধুর দয়া ও উচ্চভাব দেখিয়া আমাদের মনে বড় আনন্দ হইয়াছিল। সেই নগরের অন্যতর পল্লীস্থিত একজন ব্রাহ্মের পত্নী সন্তান প্রসব করেন: বোধকরি যমজ সন্তান হইয়াছিল। প্রসব বেদনার উপক্রম হইতে উক্ত দয়ার্দ্র বধূ দিবা রাত্রি সেই প্রসূতির সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত ছিলেন। প্রসূতির জীবন রক্ষা পায় নাই। একটী সন্তান জীবিত থাকে, তিনি সেই শিশুটীকে বক্ষে ধারণ করিয়া নিজগৃহে লইয়া আসেন, জননী অপেক্ষা অধিক স্নেহ যত্নে শিশুটিকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার সমুদায় যত্ন বিফল হয়, শিশুর প্রাণরক্ষা হয় না। তাহাতে তিনি কয়েক দিন এরূপ শোকার্ত্তা ছিলেন যে, মাতা নিজ গর্ভজাত সন্তানবিয়োগে সে প্রকার শোকাকুলা হন না। শিশুর পিতা বলিয়াছেন, "আমি কখনও কোন মহিলার এরূপ স্নেহ দয়া দেখি নাই। আমার চক্ষে ইহা স্বর্গীয় দৃশ্য। আমি পিতা, আমার অশ্রুপাত হইতেছে না, এই দেবীপ্রকৃতি মহিলা অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। উপরি উক্ত দয়ার্দ্র হৃদয়া বধূটী দুই জন ক্ষত রোগাক্রান্ত রোগীর শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে রূপ সেবা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া আমাদের মনে শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে। সেই রোগী দুই জন তাঁহার গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, এক জনের ক্ষত রোগ গুরুতর ছিল, বধূ প্রতিদিন দুই বেলা সেই ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া, তাহাতে স্বহস্তে ব্যাণ্ডিজ বাঁধিয়া দিতেন। মাসাবধি কাল সেই রোগীর সেবা করিতে হ য়াছিল।

আবার ব্রাহ্মিকা মহিলাদের পরসেবায় উপেক্ষার কথা কিছু বলিতেছি; একজন পরিণতবয়স্কা মণ্ডলীর মাতৃস্বরূপা বন্দনীয়া সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মিকা মহিলা কিয়ৎকাল হইল বিধবা হইয়া অত্যন্ত শোকার্ত্তা হইয়াছেন। তাঁহার স্বর্গগত ভক্তিভাজন প্রিয়তম স্বামী কর্ত্তৃক নববিধান সমাজের বহু নরনারী বিশেষরূপে উপকৃত ও তাঁহার নিকটে ঋণী।

কয়েকদিন হইল সেই শোকার্ত্তা বিধবা মহিলা অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিয়াছেন, "আমি একটী বড় বাড়ীতে একা বাস করিতেছি, দিবা রাত্রি শোকাচ্ছন্ন ও অস্থির আছি। আমার কথা কহিবার সঙ্গী কেহ নাই, এমন অনেক দুঃখিনী বিধবা ব্রাহ্মিকা কন্যা আছেন যাঁহাদের এক প্রকার মাথা রাখিবার স্থান নাই, অতিশয় দুঃখ ক্লেশের অবস্থা। আমি তাঁহাদের দুই একজনকে মিনতি করিয়া বলিয়াছি,আমার কাছে থাক,আমি থাকিবার ও সকল বিষয়ের সুবিধা করিয়া দিব। আমি তোমার সঙ্গে উপাসনা করিয়া ও ধর্ম্মকথা কহিয়া এবং তোমার মুখে ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ শ্রবণ করিয়া অনেক সান্ত্বনা পাইব। আমি তাঁহাদের নিকট বহু কাকুতি মিনতি করিয়াও এই সহানুভূতিটুকু পাইলাম না সপ্তাহান্তে এক দিন অনেক মেয়েকে ডাকিয়া গৃহে ধর্ম্মালোচনার ব্যবস্থা করা গিয়াছিল তাহাতেও প্রায় কেহ যোগ দান করেন না।" শোকার্ত্তা বন্দনীয়া মহিলার প্রমুখাৎ এ সকল দুঃখ কাহিনী শুনিয়া আমাদের মনে অতিশয় দুঃখ হইয়াছিল।

অনেক ব্রাহ্মিকা কন্যা লেখা পড়া শিখিয়া পরসেবা ও নানা প্রকার দেশহিতকর কার্য্য করিবেন বলিয়া গদ্যে পদ্যে প্রবন্ধাদি লিখিয়া লোকদিগকে অনেক আশা দান করেন। বিবাহ হইলে অপিচ দুই একটী সন্তান হইলে তাঁহারা গভীর সংসারকূপে নিমগ্ন হন। তখন সপ্তাহের মধ্যে একটি দিনও কোন সৎকার্য্যে যোগদানে তাঁহাদের একটুকু সময় হইয়া উঠে না, তাঁহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহারা আত্মসেবায় ও সংসারসেবায় এত ব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, কাগজ কলমের সঙ্গেও আর সম্পর্ক রাখেন না। তাঁহাদের মুখমণ্ডল নিরাশা ও নিরুদ্যমের কালিমায় আচ্ছন্ন হয়। এইরূপে সংসারে ডুবিয়া সাংসারিক সুখবিলাসে মগ্ন হইয়া তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবন যাপন হয়। তাঁহারা এরূপ শীতল ভাব ধারণ করেন যে, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কার্য্যে আশা ভরসা থাকে না।

আমরা বলি মাতৃগণ, ভগিনীগণ, পরদুঃখমোচন ও সুখবর্দ্ধন করিয়া জগতে নিঃস্বার্থ প্রেমের পরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক ধরাধামে পুণ্যবতী দেবী বলিয়া গণ্য হইবে, সেই জন্য পরম জননী তোমাদিগকে দয়া স্নেহের ভাণ্ডার কোমলপ্রকৃতি দিয়াছেন। তাঁহার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া ধন্য হও, এই প্রার্থনা।

হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ।

সঙ্কীর্ণভাবাপন্ন হিন্দু সমাজে পিতা মাতা স্বীয় বালিকাকে বয়ঃপ্রাপ্তা না হইতেই একটি বালক বা যুবকের সঙ্গে বিবাহ দেন। বিবাহে পাত্র পাত্রীর মতামত নির্ভর করে না। পিতামাতা সচরাচর পাত্রপক্ষের কুল ও অর্থসম্পত্তির প্রতি অধিক দৃষ্টি করেন। বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রী বা পাত্রপক্ষের অভিভাবক পাত্রের বা পাত্রীর রূপ গুণাদি সমুদায় নিজে দেখিয়া শুনিয়া যে প্রস্তাব ধার্য্য করেন প্রায় তাহা হয় না। তাঁহারা একজন লোক বা চাকর চাক-

স্ত্রীরকে কন্যার বা পাত্রের পিত্রালয়ে পাঠাইয়া তাহাদের প্রমুখাৎ পাত্রপাত্রীর রূপ গুণাদির কাহিনী শুনিয়া সম্বন্ধ ধার্য্য করেন। ভবিষ্যতে সুখদুঃখে সম্পদ্ বিপদে-সৌভাগ্যে দুর্ভাগ্যে যে দুই জন যে সূত্রে সংসারক্ষেত্রে পরস্পরের জীবনের চিরসঙ্গী হইয়া থাকিবে, পরস্পরের জন্ত দায়ী হইবে, এই রূপ গুরুতর ব্যাপারে তাহাদের মতামত একেবারে উপেক্ষিত হয়। বিবাহ যেন বাল্যক্রীড়া। বালক বালিকা বুঝে বা কি? তাহাতে তাহাদের মতামতই বা কি হইতে পারে? পিতা মাতা শুভদিনে শুভ লগ্নে আত্মীয় কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আমোদ আহ্লাদ ও ঘটা করিয়া এই রূপে বালিকার বিবাহ দেন। পুরোহিত ঠাকুর সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্র পড়েন, তাহা সাপের মন্ত্র না ভূতের মন্ত্র অনেক পুরোহিত ঠাকুরও ভাষাজ্ঞানের অভাবে তাহার অর্থ বুঝেন না, বর কন্যা আর বুঝিবে কি? মন্ত্রে আদিত্য দিক্ পালাদি হিন্দু দেবতার নাম উচ্চারিত হয়। সাক্ষিরূপে শালগ্রাম বিগ্রহ বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকেন, হোমাগ্নি প্রজ্বলিত এবং অগ্নি দেবতার পূজা হয়। এই রূপে একটি অবোধ বালকের মস্তকে একটী অবলা বালিকার জীবনের গুরুভার স্থাপন করিয়া তাহাকে সংসারকূপে ডুবাইয়া পিতা মাতা কন্যাদায় হইতে মুক্ত হন, এবং বিবাহোৎসব সমাপ্ত হয়। কখন কখন বৃদ্ধ পুরুষের সঙ্গেও বালিকার বিবাহ হয়। অনেক পুরুষ বহু বিবাহ করিয়া কৌলীন্য-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলে বিবাহে বরকে কন্যা পণ দা[ন] করিতে হইত। এক্ষণ সচরাচর নগদ ২।। হাজার টাকা বরদক্ষিণাদানে পিতামাত[া] কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। হিন[্দু] সমাজে বালবিধবারও বিবাহ হইতে পা[রে] না। সে চির জীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাব্রত পালনে বাধ্য হয়। পুরুষ পুনঃ পুনঃ স্ত্রী বিয়োগের পর বৃদ্ধ বয়সেও বিবাহ করেন তাহাতে বাধা নাই। হিন্দুসমাজে অসব[র্ণ] বিবাহ নিষিদ্ধ।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহপ্রণালী হিন্দুসমাজের বিবাহপ্রণালীর অনুরূপ কেবল হিন্দু বিবাহপদ্ধতি হইতে পৌত্ত[-]লিকতার অংশ পরিত্যক্ত। উপবীত ধারী ব্রাহ্মণ সংস্কৃত ভাষায় বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করেন। উক্ত সমাজের নেতার মতে কন্যার বাল্যকালে বিবাহ হয় না; বিধবা বিবাহ বা অসবর্ণ বিবাহ হইতে পারে না। আদিসমাজ রক্ষণশীল ব্রাহ্মসমাজ বা সংস্কৃত হিন্দুসমাজ।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজে পাত্র বা পাত্রীর বাল্যকালে বিবাহ হইতে পারে না। পাত্রের অষ্টাদশ বর্ষ পাত্রীর চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া নিষিদ্ধ। বিবাহের জন্য পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন কেবল অভিভাবকদের মতের উপর নির্ভর করে না। পাত্র ও পাত্রী উভয়ের পরস্পর সম্মতির প্রয়োজন। তাঁহারা পরস্পর মনোনয়ন না করিলে পিতামাতা তাহাদিগকে বিবাহিত করিতে নূতন আইনানুসারে অক্ষম। পাত্র ও পাত্রী উভয়ে

পরস্পরকে দেখিয়া মনোনীত করিলে অভিভাবক তাহাদিগকে উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু অনেক স্থলে পরিণয়ার্থী তরলমতি যুবক যুবতী বাহ্যিক ভাবে আকৃষ্ট হইয়া উপযুক্তরূপে মনোনয়ন করিতে পারে না। পাত্রীর সৌন্দর্য্যকে বা পাত্রের বারিষ্টরী বা হাকিমী পদকে সর্ব্বোপরি প্রাধান্য দেওয়া হয়। একবার একটি ধর্ম্মপরায়ণ যুবকের পাত্রীমনোনয়নে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। তিনি পাত্রীর কি প্রকার রূপ এবং কিরূপ গুণ আছে, উহা দেখিতে ও জানিতে চাহেন নাই। কেবল তাঁহার ভগবানে ভক্তি আছে কি না, তিনি উপাসনাশীলা কি না ইহাই জানিতে চাহিয়াছিলেন। পাত্রীর অষ্টাদশ বর্ষ এবং পাত্রের এক বংশতি বর্ষ পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহ হইলে সেই বিবাহে তাহাদের অভিভাবকের সম্মতির বিশেষ প্রয়োজন। তদূর্দ্ধ বয়সে পাত্র ও পাত্রী ইচ্ছা করিলে অভিভাবকের মতাপেক্ষা না করিয়া স্বাধীনভাবে বিবাহ করিতে পারে। এই উন্নতিশীল সমাজে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ। কোন বিধবা বিবাহার্থিনী হইলে বিবাহ করিতে পারেন। অসবর্ণ বিবাহে কোন বাধা নাই। ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব পাত্র কায়স্থকুলোদ্ভবা বা ও তদপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর পাত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে। উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের অনেকেই বর্ণ বিচার করেন না। পূর্ব্বে কর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণে আর্য্যজাতি বিভক্ত হইয়াছিল। পরে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের সঙ্গে বৈশ্যাদি নিম্ন বর্ণের বিবাহসম্বন্ধসঙ্ঘটন হওয়াতে অনেক বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ণ বিচার করিলে উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজে দিন দিন বর্ণসঙ্করের বাহুল্য হইতেছে। ব্রাহ্মমাত্রই হিন্দুকুলোদ্ভব, তাঁহাদের পিতাপিতামহ হিন্দু ছিলেন। কিন্তু উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজে উচ্চ বর্ণ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব ব্রাহ্ম পাত্র অত্যন্ত নিম্ন বংশোদ্ভব ব্রাহ্মের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, বা উচ্চ কুলসম্ভূতা পাত্রী নিম্ন শ্রেণীর পাত্রের সঙ্গে পরিণীত হইয়াছেন। হিন্দু সমাজে যে সকল নিম্ন শ্রেণীর লোক উচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণাদির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে সঙ্কুচিত হয়, তাহারাও বিবাহসম্বন্ধযোগে সেই উচ্চ শ্রেণীতে উন্নত হইতেছে। কেবল এইরূপ যে বর্ণসঙ্করের বাহুল্য হইতেছে তাহা নয়। হিন্দুসমাজে এক বাঙ্গলা দেশেই পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগের সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গবাসিগণ উদ্বাহাদিসম্বন্ধে বদ্ধ হইতে চাহিতেন না। পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গকে "বাঙ্গাল" বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখে। পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ হিংসা বিদ্যমান। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে উদ্বাহসূত্রে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব্ব বঙ্গ দুই একাকার হইয়া গিয়াছে, আর ভিন্নতা নাই। পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের কথা ছাড়িয়া দি, বাঙ্গালী কন্যা মাদ্রাজী বা পঞ্জাবী পাত্রের হস্তে ন্যস্ত হইতেছেন, বিহারী কন্যার সঙ্গে বাঙ্গালী পাত্রের, বাঙ্গালী পাত্রের সঙ্গে উৎকলকন্যার বা উৎকল পাত্রের সঙ্গে বাঙ্গালী কন্যার বিবাহ হইয়াছে ও হইতেছে। এমন কি ইয়ুরোপীয় কন্যাকে বাঙ্গালী পাত্র ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিয়াছেন। এইরূপ পরিণয়সূত্রে ভারত-

বর্ষে এক অভূতপূর্ব্ব বর্ণসঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইতেছে। এই প্রকার পরস্পর বিবাহ-যোগে বিভিন্নদেশীয় নরনারীর শারীরিক মানসিক বল ও উন্নতি, এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে একতা বৃদ্ধি হইতেছে, আরও হইবে, আশা করা যায়। এই স্রোত আর বন্ধ হইবার নয়। কেশবচন্দ্র এদেশে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত মোসলমান ব্রাহ্মের সঙ্গে হিন্দুকুলোদ্ভব ব্রাহ্মের বিবাহসম্বন্ধ হয় নাই। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে সম্ভ্রান্ত পরিবারের, সামান্য পরিবারের সঙ্গে সামান্য পরিবারের উদ্বাহাদিসূত্রে ঘনিষ্ঠতা ও কুটুম্বিতা হওয়া স্বাভাবিক ও সমুচিত। কিন্তু নিতান্ত অসমাবস্থাপন্ন দুই পরিবারের সঙ্গে উদ্বাহবন্ধনে পরস্পর কুটুম্বিতা হইলে অনেক বিষয়ে অকুশল হইয়া থাকে। তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক। কোন পরিবারের সম্বন্ধে বা পাত্র কিংবা পাত্রীসম্বন্ধে গুরুতর অপবাদ ও কলঙ্ক রটনা থাকিলে সাবধান হইতে হইবে। পাত্র ও পাত্রী উভয়ের শারীরিক ও মানসিক অবস্থাও বিশেষ বিচার্য্য। অনেক স্থলে তৎপ্রতি লক্ষ্য হয় না।

পাত্র ও পাত্রী বুঝিতে পারে এরূপ প্রচলিত ভাষায় বিবাহপ্রতিজ্ঞা ও মন্ত্রাদি তাহাদিগকে পড়ান হয়। বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য ও পৌরোহিত্য যে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ব্রাহ্ম করিবেন এরূপ কোন নিয়ম নাই। ব্রাহ্মণের জাতীয় বা পৌত্তলিকতার চিহ্ন যজ্ঞসূত্রের এস্থলে কোন প্রভাব নাই। শূদ্রাদি যে কোন শ্রেণীর ব্রাহ্ম হউন না কেন তিনি বিবাহানুষ্ঠান সম্পাদন করিতে পারেন। এরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, একজন ব্রাহ্মের কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী গফুর মিয়া পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন। কোন কৌমার্য্যব্রতাবলম্বী পুরুষ কোন বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়া নবদম্পতীকে দাম্পত্য প্রেম বিষয়ে উপদেশ দান করিয়াছেন। ইহা অস্বাভাবিক বলিয়া অনেকের আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়।

ব্রাহ্ম বিবাহের মন্ত্রাদি এবং পাত্র পাত্রীর সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা অতিশয় বিশুদ্ধ ও আধ্যাত্মিক। ক্রিয়াসমাপ্তির পর নবদম্পতীর প্রতি আচার্য্যের উপদেশ গভীর ধর্ম্মভাব পূর্ণ হয়। অনেক পাত্র পাত্রী বিবাহের পর আর সেই সকল প্রতিজ্ঞা ও উপদেশের সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক রাখেন না, উদ্বাহক্ষেত্রেই উহা বিসর্জ্জন করিয়া সভা হইতে গৃহে চলিয়া যান। পরে তাঁহারা ঘোরতর বিলাসী ও সংসারী হইয়া উঠেন। উভয়ে তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইবেন, জীবনের সমুদয় কার্য্য পরব্রহ্মে উৎসর্গ করিবেন, আপনার বলিয়া আর কিছুই রাখিবেন না; পতি পত্নীর এবং পত্নী পতির ধর্ম্মপথে সহায় হইবেন, সংসারাসক্তিকে দূরে পরিহার করিবেন, সর্ব্ববিষয়ে সংযমী হইবেন, আত্মায় আত্মায় মিলিত হইয়া ভগবান্‌কে প্রীতি দান ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবেন। বিবাহের পর অনেকের পক্ষে এ সকল উচ্চ উপদেশ উচ্চকথা বহু দূরে পড়িয়া থাকে। এমন কি অনেক পরিবারে ব্রহ্মোপাসনা পর্য্যন্ত হয় না, পতি পত্নী মিলিত হইয়া সদালোচনা সৎপ্র-

সঙ্গাদি করেন না। কেবল শারীরিক ও সাংসারিক সুখ বিলাস এবং বাহ্যিক আমোদ উল্লাসের কথা হয়। ধর্ম্মার্থ নিয়মিত দান হয় না। আমাদের প্রস্তাব ছিল যে, মাসে মাসে সিকি বা আট আনা ধর্ম্মার্থ দান করা কষ্ট বোধ হইলে, সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য টাকা ভাঙ্গাইয়া আনিয়া গৃহিণী যেন উহা হইতে দুইটী বা একটী পয়সা, রন্ধনের সময় এক মুষ্টি চাউল উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত একটী ভাণ্ডে রাখিয়া দেন, মাসান্তে উহা দান করেন। বিবাহ হইয়া গেলে পর পাত্র পাত্রী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ঈশ্বর বিস্মৃত হন, সাংসারিক সুখামোদে মত্ত হইয়া উঠেন, সকল দম্পতীসম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু অনেকের সম্বন্ধে ইহা পূর্ণ সত্য। "আমাদের উভয়ের হৃদয় মিলিত হইয়া ঈশ্বরের হউক।" বিবাহ সভায় উচ্চারিত এই পবিত্র সঙ্কল্প বচন বিবাহের পরক্ষণেই হয়তো অনেক নবদম্পতী সম্পূর্ণ ভুলিয়া যান। তাঁহাদের দ্বারা বিবাহের আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতা এবং গাম্ভীর্য্যরক্ষা হয় না। তাঁহারা নিতান্ত বাহ্যিক ভাবে পরিচালিত হন।

উদ্বাহানুষ্ঠান কালে এমন সকল লোক সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আসে যে, তাহারা নীচভাবে নানা প্রকার গোলযোগ ও ব্যঙ্গোক্তি করিয়া এই পবিত্রানুষ্ঠানের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়া থাকে। অধিক পরিতাপের বিষয় এই যে, উদ্বাহ সংক্রান্ত ব্রহ্মোপাসনার সময়েও অনেকে চঞ্চলতা প্রকাশ এবং হাস্য গল্প করিয়া থাকে। এইরূপ চঞ্চলপ্রকৃতি লোকের বিবাহসভায় উপস্থিত নাহওয়াই প্রার্থনীয়। ব্রাহ্মদিগের বিবাহভোজে অত্যন্ত আড়ম্বর ও বিলাসিতা হয়, প্রচুরার্থের অপব্যয় হইয়া থাকে। অথচ অনেক স্থানেই দুঃখী কাঙ্গালীরা এক মুষ্টি অন্ন পায় না। অপিচ এই আনন্দোৎসবপোলক্ষে সৎকর্ম্মে দান হয় না।

পাত্র ও পাত্রীগণ যে মণ্ডলীর বক্ষে লালিত পালিত হইয়াছেন, যে মণ্ডলী হইতে আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক নানা উপকার লাভ করিয়াছেন, যে মণ্ডলীর যত্ন সাহায্যে তাঁহারা উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হইলেন, বিবাহের পর অনেকেই সেই পরমোপকারী মণ্ডলীর সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করেন না। অর্থ সামর্থ্য সত্বেও মণ্ডলীর অভাব মোচনে ও উন্নতি-সাধনে তাঁহাদের শুভবুদ্ধি হয় না। তাঁহারা মণ্ডলীর অন্তর্গত উপকারী সেবকদিগকে স্মরণও করেন না। তাঁহাদের দুঃখ ক্লেশে সহানুভূতি দান করিতে চাহেন না, ইহাতে তাঁহাদের ঘোরতর কৃতঘ্নতা প্রকাশ পায়।

হিন্দু বিবাহের আনুষঙ্গিক "গা হলুদ", ও "বৌভাত" হয়, অনেক ব্রাহ্মবিবাহেও তাহা হইয়া থাকে। কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন বাধা বাধকতা নাই। এরূপ বহু ব্রাহ্ম বিবাহ লক্ষিত হইয়াছে যে, বিবাহরাত্রির অনুষ্ঠান ব্যতীত তাহার অন্তর্গত অন্য কোন-রূপ অনুষ্ঠান হয় নাই। "গা হলুদ" ব্রতাভিষেকবিশেষ। বিবাহের দুই এক দিন পূর্ব্বে পাত্র ও পাত্রী পেষিত হরিদ্রা অঙ্গে ম্রক্ষণ করিয়া স্নান করেন। স্নানান্তে বিশেষ উপাসনা হয়, সেই উপাসনাতে

পিতৃপুরুষদিগকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। এই ব্যাপারকে আয়ুর্ব্বর্দ্ধন শ্রাদ্ধ বলা যায়। কিন্তু বর কন্যার উক্ত অভিষেকের সময় আত্মীয় স্বজনেরা হরিদ্রা বর্ণে রঞ্জিত জল পরস্পরের শরীরে ও বস্ত্রে নিক্ষেপ করিয়া যেরূপ উপহাস বিদ্রূপ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহারা এই অনুষ্ঠানটি লোকের চক্ষে অত্যন্ত হেয় করিয়া তোলেন। এইরূপ বালচাপল্য প্রকাশ করাতে উদ্বাহ ব্রতানুষঙ্গিক পবিত্র অভিষেক ক্রিয়ার প্রতি লোকের মনে আর শ্রদ্ধার উদয় হইতে পারে না। সে দিন অভিষেক সম্বন্ধীয় সামগ্রী সকল পাত্রপক্ষ পাত্রীকে উপহার দিয়া থাকেন, এই উপহার দানকে তত্ত্বপাঠান বলে। উদ্বাহ ক্রিয়ার দ্বিতীয় দিবসের রাত্রিতে পাত্রীপক্ষ পাত্রকে ফুল শয্যার উপহার দিয়া থাকেন। পূর্ব্ববঙ্গে তাহাকে শুভ রাত্রির উপহার বলে। বাহুল্য রূপে নানা প্রকার খাদ্য সামগ্রী ও মিষ্টান্নাদি সেই উপঢৌকনের অন্তর্গত থাকে। বিবাহ একটি সর্ব্বপ্রধান পারিবারিক অনুষ্ঠান। কন্যাকর্ত্তার গৃহে—তাঁহার পরিবারমধ্যে তাহা সম্পাদিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কোন কোন ব্রাহ্মপাত্র খ্রীষ্টবাদীগের অনুকরণে ব্রহ্মমন্দিরে যাইয়া বিবাহ করেন। আহূত আত্মীয় কুটুম্বগণ পরে নিজ নিজ গৃহে যাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। এক দিকে যেমন বিবাহের বিলাসভোজনে বিপুলার্থের অপব্যয় হয়, অপর দিকে কেবল বায়ুভক্ষণ হইয়া থাকে। বিবাহরূপ জীবনের উচ্চতম ব্রতগ্রহণের দিন সংযম করা—অনশন থাকা বা ফল মূলাদি লঘু বস্তু আহার করা পাত্র ও পাত্রীসম্বন্ধে বিধি। কিন্তু সে দিন একজন কৃতবিদ্য ব্রাহ্ম পাত্রকে দৃষ্ট হইয়াছে যে, তিনি মৎস্য মাংস ও পলান্নযোগে পূর্ণ মাত্রায় উদরকে তৃপ্ত করিয়াছেন। স্বাধীনতা রাজ্যের লোক! গুরুজন এরূপ ভোজনে নিষেধ করিলেও মানিবেন কেন?

আর্য্য পূর্ব্ব পুরুষদিগকে ধর্ম্ম দীক্ষা গ্রহণানন্তর ধর্ম্মসাধন করিয়া দারপরিগ্রহ ও গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইত। কেশবচন্দ্র ভগবৎপ্রেরণায় নবসংহিতা পুস্তকে এইরূপ বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইবার পূর্ব্বে রীতিমত ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ ও ধর্ম্মসাধনপূর্ব্বক জীবনকে গৃহস্থাশ্রমের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। নববিধানমণ্ডলীর পুরোহিত উপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্মদীক্ষাগ্রহণ না করিয়া বিবাহ করা নবসংহিতার বিধিবিরুদ্ধ জানিয়া অদীক্ষিত পাত্র পাত্রীদিগের বিবাহে আচার্য্য ও পৌরোহিত্যের কার্য্য করেন না। যাঁহারা কেবল বিবাহের অনুরোধে বিবাহের প্রাক্‌কালে দীক্ষিত হইতে চাহেন, উপাধ্যায় তাঁহাদিগকে দীক্ষা দানে প্রস্তুত হন না। পরে বিবাহে কোনরূপ বিঘ্ন হওয়ার উপক্রম দেখিলে বিবাহানুষ্ঠানের প্রাক্‌কালে অনেকে দীক্ষিত হন, কিংবা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাসজ্ঞাপনপূর্ব্বক নববিধান মণ্ডলীভুক্ত হইলেন, এরূপ লিখিয়া দিয়া থাকেন। অপর কোন প্রচারক দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। উদ্বাহসংস্কার অতি পবিত্র ও দায়িত্ব পূর্ণ। ইহা নরনারীর নানা

প্রলোভন ও পরীক্ষাপূর্ণ গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশের সর্ব্বোচ্চ অনুষ্ঠান। ইহাতে কেবল বাহ্যিক আমোদ ও চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ না হয়, এই শুভানুষ্ঠান পবিত্র গম্ভীর ভাবে স্বর্গীয় ভাবে সম্পাদিত হয় নিতান্ত প্রার্থনীয়।

সাধারণতঃ বিবাহিত হইয়া ব্রাহ্মদম্পতী গার্হস্থ্য জীবনের উচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইতেছেন না, ইহা দুঃখের বিষয়। কোথায় তাঁহাদের আদর্শ জীবন হইবে, না অনেক স্থলে ঠিক বিপরীত লক্ষিত হই তেছে। তাদৃশ উচ্চভাবে বিবাহ করাতে কি ফল হইল? প্রাচীন শ্রেণীর নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলাদিগের দ্বারা পরিবারমধ্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্বামী ও পুত্রকন্যাগণ ধর্ম্মপথে চালিত হইয়াছেন। পূর্ব্ব প্রবন্ধে (পরসেবা প্রবন্ধে) উল্লিখিত টাঙ্গাইলের বন্দনীয়া গান্ধর্বী দেবী বিবাহিতা হইয়া পতিগৃহে আসিয়া নূতন ধর্ম্মালোক বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণব পরিবারের কন্যা তাঁহার পিতৃদেব ভক্তিপথাবলম্বী ছিলেন। গান্ধর্ব্বী দেবী পিতা হইতে ভগবদ্ভক্তি ও পর সেবা জীবনে লাভ করিয়াছিলেন। স্বামী শাক্ত ছিলেন, পত্নীর প্রভাবে তিনি ভক্তির ধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্ম আশ্রয় করেন, পরিবার হইতে মূর্ত্তিপূজা বলিদান ইত্যাদি উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন। উক্ত দেবীর দুই পুত্র বিদ্যমান, জ্যেষ্ঠ পুত্র ওকালতী করিতে ছিলেন, সেই কার্য্যে বিবেকানুযায়ী চলিতে পারা যায় না—ধর্ম্মরক্ষা হয় না বলিয়া প্রচুর অর্থলাভের ওকালতী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৈন্যব্রত গ্রহণে কষ্টে জীবন যাপন করিতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্র বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নববিধান প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। পবিত্র মাতৃজীবনের প্রভাবে পুত্রদ্বয় যে, এরূপ উচ্চ জীবন লাভ করিয়াছেন, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? ভক্তিমতী সুপত্নীর জীবনপ্রভাবে শাক্ত স্বামীর জীবনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, সংসার ধর্ম্মের সংসার হইয়াছিল। একটী নারীর জীবনের বল কি সামান্য? ব্রাহ্মিকা কন্যাগণ বিবাহিতা হইয়া স্বামিগৃহে যাইয়া তদ্রূপ পবিত্র দৃষ্টান্ত কোথায় প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন? কেবল ব্যাকরণানুসারে ব্রাহ্মের স্ত্রী ব্রাহ্মিকা হইলে চলিবে না। শুষ্ক হৃদয় সংসারাসক্ত ঈশ্বরবিমুখ পুরুষকে ভক্ত, এমন কি দুশ্চরিত্র দুর্ব্বৃত্ত কুলাঙ্গার পুরুষকে সাধু যদি কেহ করিতে পারে, সুপত্নী স্বর্গীয় বলে করিতে পারেন। তাঁহার প্রেমের শাসনে ও পবিত্র জীবনের সুদৃষ্টান্তে বিপথগামী স্বামীর জীবনের পরিবর্ত্তন নিশ্চিত হয়।

আর্য্যনারীসমাজের উদ্দেশ্য।

১৮০১ শকে ২৭শে বৈশাখ শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক আর্য্যনারীসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মৈত্রেয়ী গার্গী প্রভৃতি আর্য্যনারীগণের জীবনে সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্পর্কীয় যে সমস্ত উচ্চতম ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, সেইগুলি যাহাতে বর্ত্তমান শিক্ষিতা মহিলাগণের জীবনে প্রতিফলিত হয় তজ্জন্য এই সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এই সভা হইতে

ব্রত নিয়ম সাধন ভজন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে স্থির হইয়াছিল। সভার প্রথম অধিবেশনে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দান ও সাধনবিষয়ে যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল।

১। বঙ্গীয় নারীসমাজের পরিবর্ত্তন ও উন্নতিসাধন প্রয়োজন।

২। প্রাচীনকালের আর্য্যনারীগণের বিশুদ্ধ আচারব্যবহারের অনুসরণপূর্ব্বক সংস্কারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

৩। শরীর, মন ও আত্মা তিনেরই সংশোধন প্রয়োজন।

৪। এ কথা সত্য, পুরুষ ও নারী উভয়েই এক মানবজাতির অন্তর্ভূত, তথাপি উভয়ের প্রকৃতির ভিন্নতা আছে। তাঁহাদের কতকগুলি সাধারণ কর্ত্তব্য থাকিলেও তাঁহাদের আপনার আপনার অপর কতকস্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। পুরুষের অনুকরণ নারীর ধর্ম্ম নহে।

৫। হিন্দুনারীসমাজের সংস্কারকার্য্যে বিদেশীয় আচার ব্যবহারের অনুকরণও উচিত নহে। আমাদের দেশীয় যে সকল মঙ্গলকর আচার ব্যবহার আছে তাহা রক্ষা করা উচিত।

৬। সামাজিক ধর্ম্মসংস্কারের মূলে ধর্ম্ম থাকা চাই। সভ্যতা বা আমোদের অনুরোধে দেশীয় আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করা অন্যায় ও অমঙ্গলকর। ধর্ম্মভাবোপরি সমাজরূপ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা উচিত।

৭। ধর্ম্ম ও দেশীয় আচার ব্যবহার মূল করিয়া বিদেশ ও বিদেশীয় জাতি হইতে যাহা কিছু মঙ্গলকর তাহা উদার ভাবে গ্রহণ করা হইবে।

৮। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে স্ত্রীজাতির প্রকৃতি যাহাতে উৎকর্ষ লাভ করে তজ্জন্য যত্নই প্রধান উদ্দেশ্য।

শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন।

১। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই গুলি প্রতিপালন করিতে হইবে; নিত্য স্নানাবগাহন, নিয়মিত পরিমিত ভোজন, বিশুদ্ধ বায়ুসেবন, পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান, যথাসময় নিদ্রা।

২। (ঈশ্বরের জ্ঞান ও করুণা প্রকাশক) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট নারীগণের জীবনচরিত, উপদেশ, নীতিবিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, গণিত, এই সকল অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হইবে।

৩। দৈনিক উপাসনা, সামাজিক উপাসনা, সৎসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ, নির্জ্জনচিন্তা, এই সকল দ্বারা আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে।

সামাজিক ও পারিবারিক কর্ত্তব্য।

১। এ সংসারে পতিসেবা নারীগণের উচ্চতম ধর্ম্ম, অতি বিশ্বস্ততা ও শ্রদ্ধা সহকারে এই পবিত্র কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

২। অপরিমিত ব্যয় দ্বারা পতিকে ঋণগ্রস্ত করা অন্যায়। আয় অনুসারে নিয়ত ব্যয় হইবে।

৩। ধর্ম্মনিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কোথাও যাওয়া বা কোন প্রকার আচরণ করা উচিত নহে। সৎসঙ্গে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করা যাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে যে স্বাধীনতা তাহাই অভিলষণীয়।

৪। মন্দিরে বা অন্য ধর্ম্মোদ্দেশ্যে যাই-বার সময় পরিচ্ছদের আড়ম্বর পরিহার করিতে হইবে।

৫। সন্তানগণকে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দান করিতে হইবে।

৬। রন্ধন প্রভৃতি সমুদায় সাংসারিক কার্য্যে নিপুণা হইতে হইবে।

৭। সঙ্গতি অনুসারে অর্থ, বস্ত্র বা অন্যবস্তু দরিদ্রগণকে দান করিতে হইবে।

৮। কোন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় লক্ষ্যসাধনের জন্য সময়ে সময়ে ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

পত্নী আত্মার প্রতি পতি আত্মার উক্তি *।

প্রিয়ে, তুমি আমার নিকটে এক বুদ্ধির অগম্য বস্তু, যখন তোমাকে বিবাহ করি তাহার পূর্ব্বে তুমি আমার নিকটে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলে, কিন্তু এক্ষণ তুমি আমার একজন বন্ধু। আমি তোমাকে চিনিতাম না, তুমি আমাকে চিনিতে না। তোমার বাড়ী এক স্থানে ছিল, আমার বাড়ী আর এক স্থানে। এক্ষণ যাহা আমার বাড়ী, তাহা তোমার বাড়ী, এবং আমার সমুদায় দ্রব্যাদি তোমার। আমার সন্তা-নেরা তোমাকে মা বলিয়া ডাকে, এবং আমাকে পিতা বলিয়া ডাকে। প্রিয়ে, আমরা ছিলাম দুই জন, এক্ষণ হয়েছি এক জন; অর্থাৎ একের ভিতরে দুই জন। ইহা আশ্চর্য্য এবং বুদ্ধির অগম্য ব্যাপার। কে ইহার অর্থ করিবে? পরস্পর অপরিচিত বলিয়া যে দুই হৃদয় অতিশয় বিচ্ছিন্ন ছিল, তাহাদের মধ্যে এ প্রকার নিকট সম্পর্ক এবং যোগ কে নূ শক্তি সংস্থাপন করিল? সত্যই সেই অনাদি অনন্ত পুরুষ যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চালাইতেছেন তিনিই আমা-দিগকে মিলিত করিয়াছেন। যদি বল কেন? তাহা আমি জানি না। যদি বল কিরূপে? তাহাও আমি জানি না। যাঁহাকে লোকে দয়াময় বলে, তাঁহার কার্য্য সকল কে বুঝিতে পারে? তাহা অনুসন্ধা-নের অতীত। হে প্রিয় আত্মা, কেন এবং কিরূপে আমি বিবাহ করিয়াছি, আমি যথার্থই জানি না। আমার মনে হয় কে যেন তোমাকে ঈশ্বরের দয়ার পক্ষপুটে আরোহণ করাইয়া হঠাৎ আমার নিকটে লইয়া আসিয়াছে। এলোকটা কে আমি আমার মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভিতর হইতে একটি শব্দ বলিয়া উঠিল, তোমার জীবনের কার্য্যে তোমাকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য এবং তোমায় সাহায্য করিবার নিমিত্ত ইনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। তোমরা আনন্দে ও দুঃখে সমভাগিনী হইবার জন্য ইনি স্বর্গ হইতে প্রেরিত। ইহাকে গ্রহণ কর, ইহাকে প্রণাম কর, এবং ইহাকে তোমার আপনার করিয়া লও। আমি ইহা শুনিলাম ও সেইমত কার্য্য করিলাম। কিন্তু আমার বুদ্ধি ব্যাপা-রটি বুঝিতে পারিল না, এবং অদ্যাপিও বুঝিতে পারে নাই। তোমার মুখপানে যখন আমি প্রথম দৃষ্টিপাত করিলাম তখন আমার ভিতরে বিচিত্র ভাব সকল উত্তে-

* আচার্য্য প্রণীত "Husband soul to Wife soul" নামক পুস্তিকার অনুবাদ।

জিত হইয়া আমার হৃদয় তোমার দিকে আকৃষ্ট হইল। নিশ্চয়ই যিনি তোমাকে পাঠাইয়াছেন তিনি তোমাকে যে আকর্ষণ (গুপ্ত চুম্বকমণি) প্রদান করিয়াছেন, তুমি তাহা দ্বারাই আমাকে টানিয়া নিলে। নতুবা আমি কেন উক্ত প্রকার ভাব সকল অনুভব করিলাম। মনের এই ভাবকে লোকে প্রণয় বলে। প্রণয়, ইহা কি? আমি ইহা মনে মনে জানি কিন্তু ইহা যে কি তাহা বলিতে পারি না। আমি তোমাকে ভালবাসি, অর্থাৎ তোমার প্রতি একটি গভীর ভাব অন্তরে অন্তরে পোষণ করি, ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানি না। প্রশস্ত ভূমণ্ডলমধ্যে আমি তোমাকে যে প্রকার ভালবাসি কেনই বা অন্য কাহাকে সে প্রকার ভালবাসি না। তোমার মত কি আর কেহ উৎকৃষ্ট নাই? আর কেহ কি এমন গুণসম্পন্ন নহে? তবে তুমি আমার হৃদয়ের আনুগত্য এবং অনুরাগকে যত আকর্ষণ কর, কেন অন্য কেহ সেরূপ পারে না? বলিতে কি আমাকে ভাল বাসিয়া বাঁধিয়া রাখিবার এবং হৃদয়কে টানিবার ভার তোমাকে দান করা হইয়াছে। নতুবা তুমি তাহা কখনই পারিতে না। তোমার ঈশ্বরই তোমাকে আমার উপর এই গূঢ় শক্তি ও কর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছেন। হে স্বর্গের সুন্দর সন্তান, তোমার পিতা আমার হৃদয়রজ্জুতে তোমাকে দৃঢ় করিয়া বন্ধন করিয়াছেন সুতরাং স্বর্গীয় ভালবাসাতে আমি তোমার এবং তুমি আমার। কি বলিলাম, স্বর্গীয় ভালবাসা? হাঁ। পৃথিবী যাহা ইচ্ছা বলুক না, বিবাহসম্বন্ধীয় যথার্থ প্রণয় তাহা একটি পবিত্র ভাব। স্বামী এবং স্ত্রীর প্রণয় ইহা স্বর্গীয় আসক্তি। কে এ বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারে? যাহারা ইহাকে শারীরিক রিপু পার্থিব প্রবৃত্তি স্বীকার করে তাহারা পরম পবিত্রপুরুষকে অপমান করে। হে প্রিয় আত্মা, ইহা কি হইতে পারে আমার মধ্যে যে পশুপ্রকৃতি আছে তাহা তোমাকে ভাল বাসে? কখনই নয়। একটি অমর আত্মার আর একটির সঙ্গে স্বর্গীয় সংযোগ কেবল স্বর্গের আসক্তিতে সে ভাব নিষ্পন্ন করিতে পারে। হে বন্ধু, আমাদের প্রণয়ের স্বর্গীয় ভাবসম্বন্ধে তুমি সাক্ষ্য দান কর; সে বিষয়ে সঙ্কুচিত হইও না। এই সংশয়প্রবল কাল, এই কুপথগামী বংশ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ বাক্য শুনিতে চায়। আমরা এ বিষয়ে কোন দ্বিধা ও অস্পষ্ট ভাব রাখিব না। ঈশ্বরের আদেশ না হইলে আমি তোমাকে ভাল বাসিতাম না। ঈশ্বর যদি আমাকে ভাল বাসিবার ক্ষমতা না দিতেন, আমি তোমাকে ভালবাসিতে পারিতাম না। দাম্পত্যপ্রণয়সম্বন্ধীয় কর্তব্য, আনন্দ সকলই স্বর্গীয়। যখন তুমি প্রথমে আমার নিকটে আসিয়া বিবাহের পিঁড়িতে বসিলে তখন আমি তোমার শরীরের গলায় পুষ্পমালা পরাইয়া দি নাই, কিন্তু তোমার আত্মার গলায় মালা পরাইয়া দিয়াছিলাম। হে নারি, আমি তোমার দেহকে বিবাহ করি নাই, কিন্তু তোমার আত্মাকে বিবাহ করিয়াছি। আমি আমোদ প্রমোদের জন্য বিবাহ করি নাই, কিন্তু এই জন্য করিয়াছি যে, তুমি আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত এবং পরলোকের পথে সহযাত্রী হইবার

নিমিত্ত স্বর্গ হইতে নিয়োগপত্র লইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলে। সংসারের ব্যবসায় বাণিজ্য এবং প্রলোভনের মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্মপরায়ণ ফকির ও বৈরাগী লইয়া একটি স্বর্গের গৃহ, একটি প্রেমের পরিবার গঠন করিবার জন্য আমরা পরমেশ্বরের নিকট হইতে সুগম্ভীর এবং সাক্ষাৎ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার প্রার্থনার প্রিয় সঙ্গিনীরূপে, আধ্যাত্মিক জগতে আমার বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে, স্বর্গের অদৃশ্য মণিমাণিক্যে বিভূষিত একটি আত্মা, এই ভাবে তুমি আমার নিকটে দণ্ডায়মানা। এই জন্য তোমার স্বামী তোমাকে আধ্যাত্মিক প্রেমে ভাল বাসিতে এবং তোমার সঙ্গে ধর্ম্মের সখ্যভাবে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছেন। যখন আমরা নিত্য গৃহধর্ম্মপালন করি, তখন আমরা ভগবানের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে সহকর্ম্মিরূপে অবস্থান করিয়া থাকি। আমাদের ধর্ম্মের প্রেম, ইহা কি কম উদ্দীপ্ত অনুরাগ? প্রার্থনার সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া কি ইহা কম উৎসাহজনক? না, সত্য সত্য এমন লোক আছেন যাঁহারা বৈরাগীর ভাবে ঈশ্বরকে পূজা করিবেন মনে করিয়া আপনাদের স্ত্রীকে ঘৃণা করেন। আবার এ প্রকার লোকও আছে যাহারা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট এবং সেবা করিবে বলিয়া ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে উপেক্ষা করে। কিন্তু হে প্রিয় অর্দ্ধাঙ্গ, আমি এ সকল মত পোষণ করি না। এ প্রকার বাতুলতার সহিত আমার যোগ নাই। আমার মত উচ্চতর। যখন তুমি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছ তখন আর আমি তোমাকে ঘৃণা করিতে পারি না। তোমাকে ঘৃণা করা পাপ। তোমাকে ভালবাসা পুণ্য। ঈশ্বরের সমক্ষে আমি তোমার সঙ্গে প্রার্থনা করিব, ঈশ্বরের সমক্ষে তোমার সঙ্গে আমি বসিব। তুমি তোমার সুমধুরস্বরে তাঁহার নাম সঙ্গীত করিবে, এবং আমার হৃদয়কে মোহিত করিয়া তুলিবে। তুমি সমুদায় সাংসারিক ভাবনা অপবিত্র চিন্তা রাগদ্বেষাদি সমস্ত মন্দ প্রবৃত্তি, লঘুতা, অর্থের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিবে, এবং বৈরাগীর ন্যায় দরিদ্রতা ও বিনয়ের ব্রত গ্রহণ করিবে। স্বর্গীয় প্রভুর আরাধনা, সেবাতে, জীবনের মহৎ কর্ত্তব্য সকল পালনে তুমি সর্ব্বদা আমার সঙ্গে যোগদান করিবে। এইরূপ ইহ কাল ও অনন্তকালের জন্য আমরা ঈশ্বরেতে একাত্মরূপে সংযুক্ত হইয়া যাইব। এবং নিত্য পুণ্য শান্তি লাভ করিব। আমাদের ভালবাসা পৃথিবীর অতীত। বৈরাগীর প্রেমে নিত্য আধ্যাত্মিক সখ্যভাবে পরিগণত হউক। সাসারিক ও শারীরিক ভাবাসক্ত স্বামী যে আপনার স্ত্রীকে ভাল বাসে, তাহা নহে। সংসারবিরাগীই কেবল প্রকৃত প্রণয় এবং জলন্ত অনুরাগে ভাল বাসিতে পারেন, কারণ তাঁহার ভাল বাসা ঈশ্বরের নিকট হইতে আইসে। এই প্রকার ভালবাসা আমাদের হউক। হে আত্মা, যেমন আমি লিখিতেছি লিখিতে লিখিতে তোমার শরীর ও সাংসারিক বিষয় সকল যেন সমস্ত অন্তর্হিত হইল, এবং একটী আধ্যাত্মিক স্ত্রী ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। পরম মাতার ক্রোড়ে প্রার্থী ও ঋষির ভাবে একটি আত্মার স্বামী

একটী আত্মার স্ত্রী বসিয়া আছে, ইহা কি মনোহর স্বর্গীয় দৃশ্য। হে প্রিয়ে, ঈশ্বর তোমকে আশীর্ব্বাদ করুন।

কুচবিহারের মহারাণীকে সংবর্দ্ধনা *।

মহামান্যা শ্রীল শ্রীযুক্তাকুচবিহার মহারাণী
সি, আই, মহাশয়া শ্রীকর কমলে!

যাঁহার অমৃত পরশে আজিগো
জাগিয়া নবীন জীবনে,
ধরেছে ভুবন মধুর মূরতি
নব সাজে নব বরণে।
দেবি, তব দূর প্রবাসের মাঝে
তাঁহারি কোমল হাত,
সকল শ্রান্তি ভয় অবসাদ
হরুক দিবস রাত।
বহুক হৃদয়ে বহিছে বাহিরে
যেমন সুখদ বায়,
অম্বর ঘেরি থাক শুভ গান
যেমন পাপিয়া গায়।
ওই যে বিমল মোহন শোভায়
সাজিয়াছে ঋতুরাজ
তার রাজা যিনি তাঁহারি কৃপায়
লভি তাহা হৃদিমাঝ;
সবার উপরে তাঁহার আশীষ
রাখিয়া মাথার পরে,
নবীন স্বাস্থ্যে নবীন জ্ঞানে
ফিরে এসো তব ঘরে।
এই ইচ্ছা রাখি তাঁহার চরণে
কে পুরায় তিনি বিনে,—
তব দয়া দেবি, যাদের তরে
রেখেছে জ্ঞানের আলোক ধরে—
হরষে বিষাদে করে প্রণিপাত
তারা এ বিদায় দিনে।

* স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য মহারাণী ইয়রোপ যাত্রা করার পূর্ব্বে ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রিগণ উডল্যাণ্ড রাজপ্রাসাদে যাইয়া তাঁহাকে এই কবিতাটী উপহার দিয়াছিলেন।

মহিলাদিগের রচনা।

তোমারে চাহি।

আছে দূর দূরান্তরে, ধরণীর শতধারে
কত কিছু অপূর্ব্ব রতন।
থাকি না তার আশে, যাই নাক তার পাশে
করিতে গো তাহা আহরণ।
যা তুমি দিয়াছ মোরে, তাই লয়ে আছি ঘরে
তাহাতেই তৃপ্ত মম মন।
তাহাতেই কত সুখ, তাই বিনা মোর দুখ
তারি খোঁপে জীবন যাপন।
থাকুক তোমার ধরা, অগণিত সুধাভরা
থাক আলো ভরিয়া গগন।
সে সব চাহি না আমি, যা তুমি দিয়াছ স্বামী
তৃপ্ত মোর তাহাতে জীবন।
তার বর্ণ তার গন্ধ, হৃদে দেয় পূর্ণানন্দ
সে যে মোর নয়ন মোহন।
কিন্তু ওহে প্রাণ নাথ, তোমার লুকান হাত
কেন মোরে করেগো লোভন।
কোথা তুমি আছ সখা, কেন প্রাণ চায় দেখা
কেন মাগি তোমার চরণ।
কভু তোমা দেখি নাই, কভু তোমা জানি নাই
তবু প্রাণে কেন আকর্ষণ।

এ মলিন মন মাঝে,নাথ তোমা মিলে না যে
জানি তাহা তবু কি কারণ।
তোমারে করিতেআমা,আমারেসঁপিতে তোমা
প্রাণ হয় এত উচাটন।
তোমাতরে কিছু কভু, ত্যাগ করি নাই প্রভু
তথাপিও বলি প্রিয়তম।
যদিও তোমারে আমি, তেয়াগি হৃদয়স্বামী
নিত্য করি দূরে পলায়ন।
তথাপিও শত বার, ফিরে আসি তব দ্বার
মাগি আমি তোমার চরণ।
কেনগো কিসের লোভে, তোমাতে পরাণ
মোহে ও আমার অদৃশ্য রতন।
বিপথে ভ্রমে য সদা, সেই হবে অনুরতা
একি কভু হয় গো কখন।
তোমার কৃপায় হরি, সকলি সম্ভব করি
মরুভূমে উৎস নিঃসরণ।
চির বিমুখিত প্রাণ, সেও পায় তব দান
সেও নাথ তব কৃপাধীন।
জানি ইহা নিরবধি, আজ নাহি পাই যদি
পাব আমি শেষের সে দিন।
আমার এ গৃহতলে, মলিন হৃদয় দলে
আছ তুমি নিয়ত আসীন।
জানি তুমি মোর মুখে,খাদ্য তুলি দাও সুখে
আতপেতে কর ছায়াদান।
এই শশী এই রবি, মহান্ প্রকৃতি ছবি
অগণিত গ্রহ তারাগণ।
এই নগণ্যের তরে, তাহাদিগে এ সংসারে
তুষিতে করিছ নিয়োজন।
একি তব লীলা নাথ! এ দীন কাঙ্গাল সাথ
লাজে যে গো মরি অনুক্ষণ
পাষাণ সমান হিয়া, এমন গলায়ে দিয়া
হইয়াছ আকাঙ্ক্ষিত ধন!
তাই বুঝি ওহে সখা, চাহে প্রাণ তব দেখা
অন্ধকারে আলোর মতন
চির বিমুখিত প্রাণ, চাহে ও চরণে স্থান
যত হও দুর্লভ রতন।
খেরওসা। শ্রী প্রি।

জীবনান্তে।

তুমি আজি চলে গেছ নাই এ ধরায়।
কত দূরে, দূরে,—দূরে
কি ক্ষিপ্র চরণ ক্ষেপে
যেতেছ চলিয়া,
লোক হ'তে লোকান্তরে
গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে
ঊর্দ্ধ, ঊর্দ্ধ, আরো ঊর্দ্ধ দিয়া।
চরণ বিন্যাস শব্দ কাণে যেন আসিতেছে,
রক্তের ভিতরে যেন ধ্বনি তার বাজিতেছে,
—বিরাম, বিশ্রাম তার নাই।
... ...
কোথায় যেতেছ তুমি অমর আত্মাটি অগ্নি?
—মুক্ত আজি পিঞ্জর দুয়ার।
কোথায় চলেছ তুমি? কতদূরে—কতদূরে?
কোথায় কোথায় শেষ তার?
থামিবে কি কোন কালে?
ক্লান্ত কি পড়িবে হয়ে?
বিরাম কি মাগিবে আবার?
একি অফুরন্ত পথ!
একি নিদারুণ খেলা!
নাই কোথা শেষ কি ইহার?
... ...
আছে কি স্মরণে এবে একটুও এ ধরণী?
এত শীঘ্র ভুলেছ কি তায়?
এতই সহজ ইহা হায়?

অনন্ত কালের মাঝে
যে ক্ষুদ্র সময় টুকু
পড়েছিল বাঁধা
সে কি হায় কিছু নয় ?
তার সেই ইতিহাস
শুধু মিথ্যা গাথা ?
অনন্ত হইতে তব, তারে কি ডুবায়ে দিবে
বিস্মৃতির মাঝে ?
—এত দূরে দূরে এবে চলিয়া গিয়াছ তুমি,
—প্রশ্ন আসে ফিরে মোর কাছে।

আলিপুর। শ্রীমতী মৃ—

আশীর্ব্বাদ।

ওহে রাজ অধিরাজ!
দশ বৎসরের স্মৃতি মনে পড়ে আজ।
দরিদ্রের কুটিরেতে সম্রাটের মত
আসি করেছিলে দূর দুঃখ ব্যথা যত
সেই শুভ "শ্রীপঞ্চমী" আজি সুপ্রভাত
তোমাদের দুজনাকে করি আশীর্ব্বাদ।
এ দশ বৎসর মাঝে কত দুঃখ তাপ,
পাতিয়া লয়েছি বুকে ভীম বজ্রাঘাত।
তবু আজ ঠাঁই নাই রাখিবারে সুখ,
শুধু মনে পড়িতেছে তোমাদের মুখ।
হে মোর তপের নিধি ধন সাধনার,
তোমার পরশে ধন্য সংসার আমার।
তোমারি আলোকে মোর ক্ষুদ্র মণি কণা,
শোভে জ্যোতির্ম্ময়ী হয়ে আজি অতুলনা।
আমার সে ক্ষুদ্র মণি উজ্জ্বল মধুর,
করেছে তোমার ঘরে অন্ধকার দূর।
তুমিই করুণা করি শত গুণ তার,
বাড়ায়ে দিয়াছ শোভা করুণা আধার।
হে মোর রাজার রাজা সরবস্ব ধন,
আজিকার দিনে স্মরি বিধাতা চরণ।
তোমাদের দুজনাকে করি আশীর্ব্বাদ,
সেই "শ্রীপঞ্চমী" মোর আজি সুপ্রভাত।

গাজীপুর। শ্রীমতী উ—

শিখি নাই * ।

১

শিখি নাই প্রাণ ভরে ডাকিতে তোমারে।
জানি শুধু দাও দাও, "মোর দুঃখ ব্যথা লও,
সুখেতে ভাসিতে দাও সতত আমারে।
দয়াময় শিখি নাই ডাকিতে তোমারে।

২

আজ আমি আসিয়াছি চরণের তলে,
জানাতে হৃদয়ব্যথা "মরমের শতকথা,
চরণে ঠেলো না দেব অভাগিনী বলে।
আসিয়াছি বড় আশে চরণের তলে।

৩

কি সুখে রেখেছ, পিতা জগতে আমায়।
রাজভোগ অভিলাষ, নাহি কোন হৃদে আশা
জনম দুঃখিনী আমি এসেছি হেথায়।
চাহিতে প্রাণের প্রাণ প্রেমপ্রতিমায়।

৪

না চাহিতে পাইয়াছি প্রেমলতিকায়।
বালিকা হৃদয়ে মম, দীপ্ত রবি কর সম,

---

* "শিখি নাই" শীর্ষক এই কবিতাটীর অনেক স্থলে পরস্পর কথার মিল ও অর্থ বোধ হয় না। রচয়িত্রী ভবিষ্যতে সহজবোধ্য কবিতা লিখিয়া পাঠাইলে আমরা অনুগৃহীত হইব। তিনি নিরুৎসাহ না হন, এজন্য এই কবিতা এবার প্রকাশ করা গেল।

নবীন প্রভাতে এসে জাগালে আমায়।
মরি সে কণককলতা শুকাতেছে হায়।

৫

হায় সে ফুটন্ত ফুলে নাহি, কোনো পাপ
তোমারি সে হাতে গড়া দেখে নাহি কভু ধরা
সহি নি কোমল দেহে এ দারুণ তাপ।
তোমারি প্রসাদি ফুলে নাহি দেব পাপ।

৬

অভাগিনী আমি তার দুঃখিনী জননী,
সমস্ত হৃদয় ভরে, রাখিতে পারিব তারে,
যদিও এ দুরাকাঙ্ক্ষা সদা মনে জানি।
তবু কৃপা দৃষ্টি কর দাও মোর মণি।

৭

জানি দেব শুনিয়েছ করুণ আহ্বান।
তাই শুষ্ক তরু শাখে,আজিকে কোকিলা ডাকে
মঞ্জরিত লতা ফুল সে তব কল্যাণ
আমার এ শুষ্ক হৃদে তাই তার স্থান।

৮

অধমতারণ তুমি অনাথ শরণ।
অনাথিনী আসিয়াছে চাহিতে তোমার কাছে
প্রাণের পুতলী তার হৃদয় রতন
পিতা হয়ে রাখ প্রভু তনয়ার ধন।

৯

তোমার যা ইচ্ছা নাথ হউক পূরণ
দুঃখ ব্যথা সহিবারে দাও বল হৃদিপরে
সহজে কাতর যেন না হয় এ মন।
দাও দেব ভগ্ন প্রাণে সুধাসঞ্জীবন।

সম্বলপুর। শ্রীস

—

সংবাদ।

ডেনমার্কের সিসেসম্যান নাম্নী এক জন ধনী জমীদার কন্যা ধর্ম্মপ্রচারার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল তাহার অধিকাংশ বিক্রয় করিয়া তিনি একখানি জাহাজ ক্রয় করতঃ তাহাতে আরোহণ করিয়া নানা দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। পনেরটী দেশের ৫৭টী নগর পরিভ্রমণ পূর্ব্বক নাবিক ও দরিদ্রদিগের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন। ইংলণ্ডে ও আমেরিকাতে ইনি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পত্রিকা প্রচার করিয়াছেন। তিনি তিন জন দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ নামে অভিহিত করিয়াছেন। অবশ্যই এই ধনী মহিলার আত্মীয়বর্গ ইঁহার অর্থব্যয়-প্রণালী অনুমোদন করেন না। কিন্তু ভগবান্ ইঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিবেন। এরূপ উচ্চ স্বার্থত্যাগ ও পরপোকারব্রত কি ভারতীয় মহিলাগণ প্রশংসা করেন না? কবে ভারতে আমরা এ প্রকার সাধ্বী জনহিতৈষিণী মহিলা দেখিতে পাইব?

কুচবিহারের মহারাণী বিশেষ অসুস্থ হওয়াতে, চিকিৎসকের উপদেশানুসারে বায়ুপরিবর্ত্তন ও সুচিকিৎসার জন্য গত ১৫ চৈত্র ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি স্বাস্থ্যলাভের অনুরোধ কয়েক মাস সেখানে স্থিতি করিবেন। বিগত ১৩ই চৈত্র তাঁহার উডলাণ্ডস্থ প্রাসাদে ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্রী, এবং দুই জন শিক্ষয়িত্রী যাইয়া তাঁহাকে বিদায়দানসূচক সংবর্দ্ধনা ও অভিনন্দন করিয়াছেন। উক্তবিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে একটী ছাত্রী একটী পদ্য পড়িয়াছিলেন। কবিতাটী স্থানান্তরে প্রকাশিত

হইল। মহারাণী আদর ও আহ্লাদ সহকারে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রত্যেক ছাত্রী তাঁহার কণ্ঠদেশে এক এক ছড়া কুসুমহার পরাইয়া দিয়াছেন। তখন জ্যোষ্ঠারাজকুমারী সুকৃতি দেব এবং ময়ূরভঞ্জের মহারাণী এবং মহারাণীর অন্য কোন কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদ করুন যেন মহারাণী সুস্থ ও সবল শরীরে অচিরে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া বঙ্গ মহিলাদিগের হিতসাধনব্রতে সমধিক উৎসাহসহকারে প্রবৃত্ত হন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এম্ এ বহুকাল জ্ঞানগর্ভ সদুপদেশাদিদানে ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের সেবা করিয়াছেন, এবং উক্ত বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন কল্পে নানা প্রকার যত্ন পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি প্রায় ৮ মাস কাল ইয়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ ও নববিধান প্রচার করিয়া সে দেশের লোকের আদর শ্রদ্ধা প্রীতিলাভপূর্ব্বক ঈশ্বরকৃপায় মঙ্গল মতে বিগত ১২ই চৈত্র প্রাতঃকালে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। এখানকার আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়াছেন। প্রায় একশত বন্ধু হাবড়া ষ্টেশনে যাইয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভরসা করি এক্ষণ হইতে তিনি দ্বিগুণ উদ্যম উৎসাহ সহকারে প্রিয় জন্মভূমির সেবা বিশেষতঃ মহিলাবিদ্যালয়ে উন্নতি সাধনে যত্ন করিবেন। দীর্ঘকাল ইয়ুরোপ ও আমেরিকাতে অবস্থান জন্য বিনয়েন্দ্রনাথের কোনরূপ ভাবের বিপর্য্যয় ঘটে নাই। দেশী ও জাতীয় পরিচ্ছদ এবং নিরামিষ ভোজন তাঁহাকে একদিনের জন্যও পরিত্যাগ করিতে হয় নাই। ইহাতে আমাদের মনে অতিশয় আনন্দ হইয়াছে।

বিগত ১৮ই চৈত্র অত্রত্য রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত যাওয়ায়। পথের বিবরণ ছাত্রদিগের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন বিনয়েন্দ্র নাথ ইংলণ্ড হইতে আমেরিকাতে যে জাহাজে গিয়াছিলেন, তাহাতে পনের শত যাত্রিক চলিয়াছিল, তদ্ভিন্ন জাহাজের কর্ম্মচারী দুই এক শত ছিল, প্রতিদিন পাঁচ বার করিয়া সুনিয়মে যাত্রিকদিগের পর্য্যাপ্ত আহার হইত ভাবিয়া দেখ,জাহাজখানি কত বড় একটা জলাকার্ণ গণ্ড গ্রামের মত বলিতে হইবে। এত লোকের আহারের সুব্যবস্থা আশ্চর্য্য। জাহাজে তারশূন্য টেলিগ্রাফ ছিল, সেই টেলিগ্রাফযোগে অন্য জাহাজের ও পারের লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিত। অদ্ভুত ব্যাপার। বিজ্ঞানে অসম্ভব সম্ভব অসাধ্য সাধন হইতেছে।

অনেক গ্রাহক গ্রাহিকার নিকটে মহিলার ২। ৩ বৎসরের মূল্য প্রাপ্য, মূল্য পাঠাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে উত্তর পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, ভিঃ পিঃ করিলে ভিঃ পিঃ ফেরত আইসে। আমাদের রেঙ্গুণস্থ একটী কন্যা প্রতি বৎসর মূল্যদানের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। সম্প্রতি তিনি লিখিয়াছেন, "আমার নিকট হইতে কি মহিলার মূল্য আদায় করেন নাই। যদি না করিয়া থাকেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী মাসের মহিলা ভিঃ পিঃ যোগে পাঠাইয়া লইবেন।" এইরূপ গ্রাহিকা সকল হইলে আমাদের কোন ভাবনা থাকে না।

মহিলাদের অনেকগুলি রচনা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, স্থানাভাবে এবার প্রকাশিত হইতে পারিল না।

— —

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

"সাধু ফ্রান্সিস"।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ইউরোপের সমস্ত জায়গায় ইন্‌ অর্থাৎ ছোট রকমের হোটেল আছে, সেখানে অল্প পয়সায় খেতে পায়। এরকম জায়গায় প্রায়ই অনেক মাতাল জোটে। ফ্রান্‌সিস এরকম জায়গায় প্রায় থাকতেন, ও বেশী করে পয়সা দিতেন। তিনি বলতেন এদের কত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়, কত লোকের সেবা করে। এরা যে উপকার ও সেবা করে, তার তুলনায় পয়সা কিছুই নয়। এদের বেশী করে দিতেন বলে চাকরেরা চটে যাইত, বলিত যে আমাদের পয়সা দিন, আমরা দিচ্ছি। তিনি কিন্তু কখনও চাকরদের হাতে পয়সা দিতেন না, জানিতেন যে উহারা কখনও সব পয়সা দেবে না, এজন্য তিনি নিজে হাতে করে দিতেন।

লুথরের পর খ্রীষ্টধর্ম্মে একটা বিভাগ হল। প্রোটেষ্টাণ্ট চর্চ্চের লোকেরা মনে করতেন, রোমাণ ক্যাথলিক চর্চ্চ ভ্রম কুসংস্কারে পূর্ণ। প্রোটেষ্টাণ্ট এবং রোমাণ ক্যাথলিকদের মধ্যে খুব ঝগড়া ছিল। অনেক সময় ফ্রান্সিসকে প্রোটেষ্টাণ্টদের মধ্যে প্রচার করিতে হইত। এ সময়ও ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে হইত। দুইদলের মধ্যে ভয়ানক ঝগড়া ছিল, এবং প্রচার করিতে গিয়ে ভয়ানক মুস্কিলে পড়িতে হইত। অনেক সময় হয়তো তিনি জানিতেন যে, সেখানে গেলে খুব বিপদ হতে পারে, অন্য লোকে তাঁকে যাইতে বারণ করিত, তবুও যখন উচিত মনে হত তখন কোন কথাও শুনিতেন না, সেখানে গিয়া প্রচার করিতেন। তাঁর উপদেশে, অনেক প্রোটেষ্টাণ্ট ক্যাথলিক হইয়াছিল। মন্দিরে উপদেশ দিতে হত, অনেক সময় মাত্র ৫।৬ জন লোক থাকিত, তবুও তিনি উপদেশ দিতেন, তিনি বলতেন একজন থাকিলেও উপদেশ দিব। একদিন এই রকম খুব কম লোক হয়েছে আর তিনি উপদেশ দিচ্ছেন, উপদেশের মাঝখানে একজন লোক খুব কাঁদিতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, হয়ত তার কোন ব্যামো হয়েছে। তাকে আস্তে আস্তে বলিলেন, আমার আর দেরী নাই তুমি কেঁদো না। সে লোকটি বলিল না আপনি চলিয়া যান, আমি সেজন্য কাঁদছি না। তার পর উপদেশ হয়ে গেলে সেই লোকটি গিয়ে তাঁর পায়ে পড়ে বলিল, আমি ভাবিয়াছিলাম আমি এ ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিব, বিরোধী হইয়া দাঁড়াইব, কিন্তু আপনার উপদেশ শুনে আমার মনে খুব লাগিল। তিনি তাই বলতেন যে, একজন লোক হলেও বলা উচিত, কারণ কখন কে আসে, কার কখন উপকার হয়

তারতো ঠিক নাই। বিলাতে যেমন একদিকে বড় বড় সহরে মন্দিরে ৮০০।১০০০ লোক হয়, তেমনি এমন জায়গা আছে যেখানে ৫।৬ জনের বেশী লোক হয় না। ফ্রান্‌সিস বলিতেন,কম লোক থাকাই ভাল, বেশী লোক থাকা তত ভাল নয়। একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনার উপদেশের নিয়ম কি, তার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, যত সংক্ষেপ হবে ততই ভাল। একটা কথা বার বার বলবে যাতে কথাটা মনে মুদ্রিত হয়ে যায় ও তাতেই কাজ হয়। এই জন্য কম লোক থাকা ভাল, কারণ বেশী লোক থাকলে বেশী কথা বলিতে হয়। একদিন বিশপ বিলিন বলেন, এরকম হওয়া কিন্তু উচিত নয়, এক কথা বোঝাতে হলে বেশী কথা বলিতে হয়। কত সাধুরা কত কথা দিয়ে বোঝান। তখন ফ্রান্‌সিস ব'ললেন,আচ্ছা তুমিত এত বল,তাতে কই কারও জীবনতো ভাল হলো না। তখন তিনি বুঝতে পারিলেন, যে ইহাই ভাল। ফ্রান্সিসের জীবন ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট দুদলের লোকেই লিখিয়াছেন। প্রটেষ্টাণ্টেরা উহাঁকে আপনার দলের লোক মনে করিত বিরুদ্ধ ভাব ছিল না। ক্যাথলিকেরাতো জীবন লিখিলেনই কারণ ওদেঁরই তিনি লোক ছিলেন, কিন্তু প্রটেষ্টাণ্টগণ বলিয়াছিলেন, আমরাও না লিখে থাকিতে পারি না। সুতরাং তাঁরাও লিখে ছলেন। এঁর অসাধারণ গুণ ছিল, মনে হয় এমন কারও থাকে না ; যেমন প্রশস্ততা তেমনি গভীরতা তেমনি ঔদার্য্য।

অবিশ্বাসী লোকদের বুঝাতে হইলে খুব পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে হয়। তিনি খুব পণ্ডিত লোক ছিলেন, ছেলেবেলায় যে অধিক পড়েছিলেন তাহা বড় হলে খুব কাজে এসেছিল। যদিও খুব পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেন, কিন্তু মনে একটুও অহংকার ছিল না। বড় মানুষ, গরিব লোক, সাধুরা, মেয়েরা সকলেই উহাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন, ও ওঁর কাছে পরামর্শ ও উপদেশ চাইতেন। ছোট বড় মেয়ে পুরুষ ধনী নির্ধন সকলেই ফ্রান্‌সিসকে ভালবাসিতেন। এরকম সাধু প্রায় দেখা যায় না ; এদেশে কি ও দেশে কোন খানেই প্রায় দেখা যায় না। এক দিকে বিদ্যা ও আর একদিকে ধর্ম্মের কোমলতা, একদিকে সত্যানুরাগ উৎসাহ অন্যদিকে বিনয় সাহস ছিল। ফ্রান্‌সিসের জীবন পড়িলে এই দেখতে পাই যে,একটা ভাব আছে আর একটা নাই, এ রকম তাঁতে নাই। খুব পড়া শোনা করে কি করে তার সঙ্গে ধর্ম্মভাব, সাহস, বিনয় থাকিতে পারে তিনি তার আদর্শ স্থান। উহাঁকে দেখে আমাদের আশা হয়। ভগবান্ যেমন সাহায্য করেন তেমনি সাধুরাও আমাদের ভাব পূর্ণ করিতে সাহায্য করেন।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

[১০শ ভাগ] বৈশাখ, ১৩১৩; মে, ১৯০৬। [১০ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

আমরা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, হিন্দু পরিবারের ও ব্রাহ্ম পরিবারের বালক বালিকাগণ পূজা স্থানে ও উপসনাক্ষেত্রে যাইয়া অতিশয় অশিষ্টতা প্রকাশ করে ও নানা প্রকার গোলযোগ করিয়া পূজার ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। জননী কর্তৃক তাহাদের নীতিশিক্ষা না হওয়াই উহার কারণ। এ বিষয়ে বালক বালিকা দিগের অধিক দোষ কি দেওয়া যায়, অনেক মাতা ও আত্মীয়া মহিলা বালক বালিকাদিগকে কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

কলিকাতায় মাঘমাসে ও ভাদ্রমাসে ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মদিগের মাঘোৎসব ও ভাদ্রোৎসব হয়। সমস্ত দিবস ব্যাপী উৎসবের দিন ব্রাহ্ম ও হিন্দু পরিবারের শত শত মহিলা শিশু বালক বালিকা সহ সহ উপস্থিত হইয়া থাকেন, প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ৯। ১০ টা পর্য্যন্ত স্থিতি করেন। শিশুদিগের ক্রন্দন ও চিৎকারের কথা এস্থানে আমরা উল্লেখ করিতেছি না, বহু বয়ঃস্থা মহিলার অশিষ্টতা ও গোলযোগে যাঁহারা উপাসনা করিতে আইসেন তাঁহাদের উপাসনায় অত্যন্ত বিঘ্ন হয়। এক এক সময় এরূপ বোধ হয় যেন ব্রহ্মমন্দিরে মেছুনীদের হাট বসিয়াছে। উপসনা সঙ্গীত হইতেছে, বা শাস্ত্রপাঠ, ধ্যান হইতেছে, এমন সময়ও দুই চারি জন যুবতী পরদার অন্তরালে বসিয়া পরস্পর গল্প ও হাস্যমোদ করেন। যে সকল মহিলা উপাসনা করিতে আইসেন তাঁহারা এইরূপ কথা বার্ত্তা ও গোলযোগের জন্য উপাসনাদিতে মনঃসংযোগ করিতে না পারিয়া আপনাদিগের অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করেন, তাঁহারা বাড়িতে যাইয়া আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট এজন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বয়ঃস্থা মহিলারা ধর্ম্ম মন্দিরে যাইয়া অশিষ্টতা প্রকাশ করেন, উপাসক ও উপাসিকাদিগের উপাসনার ব্যাঘাত করিয়া থাকেন, পবিত্র মন্দিরের মর্য্যাদা রক্ষা

করেন না, বড় দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া বালক বালিকারা আর কেমন করিয়া শিষ্ট ও নীতিপারায়ণা হইবে।

সাধ্বী কুমারী ক্লেয়ার।

সাধ্বী কুমারি ক্লেয়ার ইটালী দেশস্থ একজন সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা ছিলেন। এলুসিস ও ব্রিটিসনাম্নী তাঁহার দুই ভগিনী ছিল। ক্লেয়ার বাল্যকাল হইতে অতিশয় ধর্ম্মানুরাগিণী ছিলেন। স্বভাবতঃ সংসারের প্রতি তাঁহার বিরাগ ও শারীরিক সুখ বিলাসে নিতান্ত বিতৃষ্ণা ছিল। বিবাহের প্রস্তাব করিলে তিনি বলিতেন আমি যিসুখ্রীষ্টকে বিবাহ করিয়াছি, অন্য পুরুষের সঙ্গে আমার বিবাহ হইতে পারে না। সেই সময়ে সুবিখ্যাত সাধু ফ্রান্সিস স্বীয় পবিত্র জীবনের প্রভাব ইয়ুরোপের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি ইটালিতে বাস করিতেন। সাধু ফ্রান্সিসের জলন্ত বৈরাগ্য ও ঈশ্বরপ্রেমের জীবন দর্শন করিয়া এবং তাঁহার মুখে সংসারের অনিত্যতা ও অসারতার কথা শ্রবণ করিয়া সাধ্বী ক্লেয়ারের জীবনের পরিবর্ত্তন হয়। তিনি সংসারে থাকিয়া উচ্চ ধর্ম্মসাধন অসম্ভব ভাবিয়া একদিন গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া চলিয়া যান ও সাধু ফ্রান্সিসের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হন এবং নিজের বহুমূল্য বস্ত্র অলঙ্কার বেদীতে উৎসর্গ করিয়া মস্তকমুণ্ডনপূর্ব্বক বৈরাগ্য বস্ত্র পরিধান করেন। তখন তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম ছিল। ফ্রান্সিস তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র আশ্রম নির্দ্দিষ্ট করেন, তিনি সেখানে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ক্লেয়ারের এই অবস্থা দেখিয়া আত্মীয় স্বজন ও সংসারের সকল লোক অতিশয় দুঃখিত ও বিষণ্ণ হয়। তাহারা তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, এবং তাঁহার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করে। আত্মীয়বর্গ আশ্রমে যাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে চাহে। তিনি তাহাদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন, এবং দুই হস্তে বেদি জড়াইয়া ধরিয়া থাকেন, টানা টানীতে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন হইয়া যায়, অর্দ্ধবসন মাত্র পরিধানে থাকে। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকেন, যিসু ব্যতীত আমার অন্য স্বামী নাই, আমি যিসুর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। অনেক ক্লেশ স্বীকার ও সংগ্রামের পর ক্লেয়ার জয়লাভ করেন। তদনন্তর তাঁহার পঞ্চদশবর্ষ বয়স্কা কনিষ্ঠা ভগিনী এলুসিস তাঁহার অনুসরণ করেন। তাহাতে স্বজনবর্গ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। ১২ জন মল্ল যাইয়া ফ্রান্সিসের আশ্রম আক্রমণ করে; তাঁহাকে গালি দেয় ও ভৎর্সন করে, এবং কুমারীকে ধরিয়া মাটীর উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে থাকে। তখন উক্ত উৎপীড়িতা কন্যা "ভগিনি, তোমার প্রেমপূর্ণ সহবাস হইতে আমাকে ইহারা বিচ্যুত করিতেছে, তুমি আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। পরিশেষে স্থিরনিষ্ঠা ও দৃঢ়সংকল্পবশতঃ তিনি জয়লাভ করিলেন।

তৎপর কুমারী এল্‌সিস মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক সেণ্ট ফ্রান্‌সিস কর্ত্তৃক বৈরাগ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ধর্ম্মনিষ্ঠার পবিত্র দৃষ্টান্তদর্শনে আকৃষ্ট হইয়া অল্প দিনের মধ্যে ক্লেয়ারের মাতা এবং সেই বংশের ১৬ জন মহিলা ক্লেয়ারের অনুগমন করেন। পরে আরও বহু নারী ফ্রান্‌সিসের আশ্রমে শরণাপন্ন হন। তখন ফ্রান্‌সিস একটী Nunnery (তপস্বিনী দিগের আশ্রম) প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্লেয়ার তাঁহার অধ্যক্ষ পদ নিযুক্ত হন। অবশেষে কুমারী ক্লেয়ারের পবিত্র দৃষ্টান্তে কোন কোন রাজকন্যাও বস্ত্রালঙ্কার ও রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জীবনের অনুসরণ করেন। তাঁহার আশ্রমের অনুরূপ ইয়রোপের নানা স্থানে শাখা আশ্রম সকল স্থাপিত হয়।

ক্লেয়ারের অনুগামিনী মহিলাগণ পাদুকা ব্যবহার করিতেন না, অনাবৃত ভূতলে শয়ন করিতেন; বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কাহারও সঙ্গে কথা কহিতেন না। তাঁহারা সময়ে সময়ে নিরম্বু উপবাস করিয়া ভয়ানক কৃচ্ছ্রসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন। কৃচ্ছ্রসাধনে ক্লেয়ারের শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কিন্তু তাঁহার আত্মা অলৌকিক বল লাভ করে। তাঁহার মুখমণ্ডলে মধুর হাস্য প্রকাশ পাইত। তিনি রিপুদমনে ও সংসারাসক্তিবর্জ্জনে অহংবিনাশ, ধৈর্য্য ও চিত্ত সংযমকে প্রধান উপায় বলিয়া জানিতেন। ক্লেয়ার দুঃখ দারিদ্র্যকে বহু মূল্য সম্পত্তি মনে করিতেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রভূত সম্পত্তির অধিকারিণী হন, সেই সমস্ত ধন দরিদ্রদিগকে মুক্তহস্তে বিতরণ করেন। তাঁহার ধনসম্পত্তিতে অণুমাত্র আসক্তি ছিল না। পোপ গ্রেগরি তাঁহার সম্পত্তির কিয়দংশ তাঁহার আশ্রমের জন্য ব্যয় করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। দেবী ক্লেয়ার আকাশের পক্ষীর দৃষ্টান্তে জীবন যাপন করেন। তিনি দারিদ্র্য, দীনতা ও বৈরাগ্যে অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করিতেন। উক্ত সাধ্বী কুমারী আশ্রমবাসীদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি আপনাকে দাসী অপেক্ষা কখনও শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন না। আশ্রমের দাসী হওয়া আশ্রমবাসিনীদিগের সেবা করা তাঁহার হৃদয়ের একান্ত আকিঞ্চন ছিল। তিনি এই দাস্যবৃত্তিকে পবিত্র কার্য্য মনে করিতেন; স্বহস্তে আশ্রমবাসিদিগের চরণ ধৌত করিতেন, ভিক্ষোপজীবিনী আশ্রমবাসিনীগণ ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিলে সাদরে তাঁহাদের মুখচুম্বন করিতেন, পরিবেশনাদি করিয়া আশ্রমবাসিনীদিগকে ভোজন করাইতেন; সর্ব্বদা রোগীদিগের সেবা করিতেন, তাহাদের মল মূত্রাদি পরিষ্কার করিতে কোনরূপ ঘৃণা বোধ করিতেন না। তিনি কোন দাস দাসীকে এ সকল কার্য্য করিতে দিতেন না। নীচতা ও দীনতায় তিনি অপূর্ব্ব সুখ বোধ করিতেন, পরসেবার জন্য তাঁহার মন সর্ব্বদা লালায়িত থাকিত। তাঁহার নিজের ইচ্ছা সম্পূর্ণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। গুরুজন ও আচার্য্যের আদেশ পালন যত কঠিন ও কষ্টসাধ্য হউক না কেন, তিনি আনন্দে তাহা পালন করি-

তেন। দেবী ক্লেয়ার আচার্য্য ফ্রান্সিসকে বলিতেন, "যে প্রকার কার্য্য হউক না কেন তাহাতেই আমাকে নিযুক্ত করুন, আমি সম্পূর্ণরূপে আপনারই। ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিয়া আমি আর নিজের নতি।"

উপাসনাতেই ক্লেয়ারের আন্তরিক বল ও স্ফূর্ত্তি ছিল। তিনি পুনঃ পুনঃ ভূতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইতেন, বারংবার মৃত্তিকা চুম্বন করিতেন, এবং নয়নজলে অভিষিক্ত হইতেন। প্রত্যুষে সর্ব্বাগ্রে জাগরিত হইয়া আশ্রমবাসী সকলকে জাগরিত করিবার জন্য স্বহস্তে ঘণ্টা বাজাইতেন। তিনি যখন উপাসনালয় হইতে বাহির হইয়া আসিতেন তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে আশ্চর্য্য জ্যোতি প্রকাশ পাইত। যিনি দেখিতেন তিনিই বলিতেন, "জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শনলাভ করিয়া ইনি এই রূপ জ্যোতির্ম্মতী হইয়াছেন।"

দেবী ক্লেয়ার ১৮ বৎসরকাল অসহ্য রোগযাতনা ভোগ করিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষাবস্থায় তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি ঈশ্বরকে অভিবাদন করি যে তিনি আমাকে দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। পৃথিবীতে রোগ দুঃখ কখনই আমাকে যাতনা দান করিতে পারে নাই। যে ঈশ্বরকে ভাল বাসে তাহার নিকটে কিছুই ক্লেশজনক নহে, কিন্তু যে হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রেম নাই, তাহার নিকটে সকলেই অসহ্য।" ক্লেয়ার স্বর্গের অনুপম শোভা ও আকর্ষণের কথা সকল বলিয়া শোকাচ্ছন্ন জননী ও অনুগামিনী প্রভৃতিকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক ঈশ্বরধ্যান, প্রার্থনা ও উপাসনা নন্তর সকলের নিকটে বিদায় গ্রহণ করি করিয়াছিলেন। তিনি ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই আগষ্টে দিব্যধামে যাত্রা করিয়াছিলেন।

মাতৃপূজা।

ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত খ্রীষ্টবাদিগণ যিশুজননী মেরী দেবীকে পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধর্ম্মমন্দিরে যিশু মূর্ত্তির সঙ্গে মেরী দেবীর মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত। সেই মূর্ত্তির সম্মুখে আলো প্রজ্বলিত থাকে, ধূপ ধুনার গন্ধ বিকীর্ণ করা হয়। মেরী দেবীর নামে স্তব স্তুতি বন্দনা হইয়া থাকে। গিরজাতে God's Mother (ঈশ্বর জননী) বলিয়া তিনি পূজিত। বলিতে কি ক্যাথলিক সম্প্রদায় যিশুখ্রীষ্ট অপেক্ষা মেরী দেবীকে অধিকতর ভক্তি করেন।

এদেশের হিন্দুসম্প্রদায়ের মাতৃপূজাতে যেরূপ আড়ম্বর হয় আর কোন সম্প্রদায়ের মাতৃপূজায় সেরূপ হয় না। তাঁহারা পুরাণে বর্ণিত দুর্গা কালী লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করেন, এবং ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকেন। দুর্গা ও কালীর অন্যতর নাম শক্তি। তাঁহাদের উপাসকদিগকে শাক্ত বলে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক তন্ত্র শাস্ত্রেই শক্তি পূজার মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত। দুর্গা ও কালী বঙ্গীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান উপাস্য দেবতা। লক্ষ্মী দেবী বিষ্ণুর পত্নী, তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আরাধ্যা। দুর্গা ও কালী পাপাসুর দলন করিয়া ভক্তদিগকে নিরাপদ করেন,

লক্ষ্মী দেবী ধন সম্পদ বিধান করিয়া থাকেন, এরূপ বর্ণিত। ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ও কল্যাণ গুণ প্রথমতঃ দুর্গা ও কালী এবং লক্ষ্মীরূপে বর্ণিত হয়, পরে কবি শাক্ত ও পরাক্রমের ভাব উজ্জ্বলরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য উপমাতে সিংহারূঢ়া দশভূজা ও অসুর মর্দ্দিনী বলিয়া দুর্গার এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণা করালবদনা অসিধারিণী ও মুণ্ডমালিনী বিলিয়া কালী দেবীর, অপিচ শ্রীসৌন্দর্য্যের আধার ধনসম্পদবিধায়িনী বলিয়া লক্ষ্মী দেবীর বর্ণনা করেন। লক্ষ্মীর আভিধানিক অপর নাম "মা" ও "লোক মাতা।" কবি কর্ত্তৃক বর্ণিত ও উপমিত এই সকল দেবীকে ভক্ত মা বলিয়া সম্বোধন এবং হৃদয়ের ভক্তি অর্পণ করেন। পরিশেষে উপমা প্রতিমার আকারে প্রকাশিত হয়, এবং প্রতিমার পূজা হইতে থাকে। এক্ষণ বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে ঘরে দুর্গা কালী এবং অন্যান্য কল্পিত দেবীর মৃৎপ্রস্তর ও ধাতু নির্ম্মিত প্রতিমা মাতা বলিয়া পূজিত হইতেছে; স্থানে স্থানে মন্দিরে সেই সকল প্রতিমা পূজার জন্য প্রতিষ্ঠিত আছে। বিশেষ পর্ব্বাহে প্রতি গৃহে লক্ষ্মীমূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে।

আচার্য্য কেশব চন্দ্র পরম মাতৃ ভক্ত ছিলেন। তিনি ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিদিন মাতৃ পূজা করিতেন, এবং মাতৃনাম গুণ কীর্ত্তন মত্ত হইতেন। তাঁহার মা মৃৎপ্রস্তরাদিতে নির্ম্মিত প্রতিমা নয়, কোনরূপ পরিমিত আকার বস্তু নয়। তাঁহার মা নিরাকারা চিন্ময়ী অনন্তরূপিণী জগজ্জনী ঈশ্বর স্বীয় পুণ্য, শান্তি প্রেম ও কল্যাণগুণ উজ্জ্বলরূপে তাঁহার অন্তরে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সেই পুণ্যময় প্রেমময় চিৎস্বরূপ অনন্ত ঈশ্বরকে ভক্তি বিগলিত হৃদয়ে মা বলিয়া ডাকিয়াছেন ও পূজা করিয়াছেন। তিনি নববিধানে নূতন আকারে মাতৃপূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার মা হস্ত নির্ম্মিত কালী মা নয়, বিশ্ব বিধাত্রী সত্য মা। নববিধানাশ্রিত উপাসকগণ ভক্তিপূর্ব্বক সেই চিন্ময়ী মাতার পূজা করেন এবং তাঁহার লাবণ্যময় অরূপ রূপ দিব্যনেত্রে উজ্জ্বলরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

অধুনাতন জ্ঞানী সভ্য শ্রেণীর লোকেরা এদেশে এক নূতন প্রকার মাতৃপূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহারা কেশব চন্দ্রের ন্যায় চিন্ময়ী মাতার পূজা করেন না, কোন বিশেষ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকেও মা বলিয়া বন্দনা করেন না। কিন্তু তাঁহাদের মাও স্থূল ভৌতিক পদার্থ বৃহৎ মৃত্তিকাখণ্ড মাত্র কোন রূপ আধ্যাত্মিক নহে। তাঁহারা মাতৃভূমি ভারতভূমির বা বঙ্গভূমির পূজক। বক্তৃতার আকারে বা সঙ্গীতের আকারে কতকগুলি বাহ্যিক সামান্য কথায় তাহার পূজা হয়। সেই পূজায় তাঁহারা দল বদ্ধ ভাবে বিশেষ মত্ততা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন কালে পুরোহিত ঠাকুর পূজার বিশেষ বিধি দিবেন, ভারত মাতার বা বঙ্গ মাতার মূর্ত্তি গঠিত হইয়া পূজা হইবে, আশ্চর্য্য নাই! বৎসরান্তে ভারতবর্ষের কোন প্রধান নগরীতে শীত ঋতুতে নির্দ্দিষ্ট দিনে ভারতের নানাস্থান হইতে স্বদেশ

হিতৈষী জ্ঞানী বাগ্মী লোকেরা বিশেষ ভাবে রাজনৈতিক আলোচনার জন্য সমবেত হন। মহাঘটা ও সমারোহ সহকারে তাঁহাদের সভা হয়। এই জাতীয় সমিতকে কংগ্রেস বলে। এই কংগ্রেসের সপক্ষ সংবাদ পত্র এই ব্যাপারকে মাতৃপূজা বলিয়া থাকে। কোন প্রধান বাগ্মী এই পূজাতে পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পাদন করেন। ভারতের দিগ্‌দিগন্তর হইতে প্রধান প্রধান লোকেরা কংগ্রেস উপলক্ষে বিশেষ উদ্দেশ্যে কয়েক দিনের জন্য এক স্থানে সমবেত হন, ইহা মঙ্গলজনক। এতদুপলক্ষে দূর প্রদেশস্থ লোকদিগের সঙ্গে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় এবং আত্মীয়তা হয়, ইহা জাতীয় সম্মিলন ও একতা এবং শক্তিবৃদ্ধির যে একটি প্রধান উপায় কে অস্বীকার করিবে? রাজকীয় শাসন বিধিতে যে সকল ভ্রম ত্রুটি, অভাব ও অপূর্ণতা আছে তাহার আলোচনা ও তৎসংশোধনের জন্য যথাবিধি যত্ন হয়, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়, এইরূপ রাজনৈতিক আলোচনায় মঙ্গল হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্বেষ ভাবে আলোচনাদি হইলে অশেষ অকল্যাণ। রাজবিধির ত্রুটি ও অপূর্ণতা সংশোধনের জন্য বিনীত ও সদ্ভাবে প্রার্থনা করিলে সেই প্রার্থনা অপূর্ণ থাকিবে ইহা কখনও সম্ভব নহে। গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা না করিয়া কার্য্য করিলে মাতৃপূজা নিশ্চয় বিফল হইবে, বরং বিপরীত ফল ঘটিবে, তাহাতে স্বদেশের দুঃখবৃদ্ধি ও ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী, মাতৃভূমির গৌরব ও উন্নতির আশা সুদূর পরাহত হইবে। ব্রীটিশ শাসনাধীন হওয়াতে এদেশের যে সকল উন্নতি ও উপকার হইয়াছে কংগ্রেসাদিমহাসমিতিতে অন্যান্য আলোচনার সঙ্গে উহার কিছু কিছু আলোচনা করিলে নানাদেশ হইতে সমাগত ভদ্র সম্ভ্রান্ত লোকদিগের মান্ গর্ভণমেণ্টের প্রতি সদ্ভাব সঞ্চারিত হইতে পারে, সকলে রাজা ও রাজপ্রতিনিধি প্রভৃতির প্রতি ভাল ভাব অন্তরে পোষণ করিয়া স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারেন। গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে সর্ব্বত্র রেলওয়ে বিস্তার হওয়াতে ভারতের সীমান্ত প্রদেশ হইতে সভ্যগণ অত্যল্পসময়ের মধ্যে অনায়াসে এক স্থানে যাইয়া সমবেত হইতেছেন, স্বাধীন ভাবে সভা সমিতি করিয়া বিশুদ্ধ ইংরাজী বক্তৃতায় নিজেদের মতামত মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছেন, ইহাতে কি উদার ও অনুকূল গবর্ণমেণ্টের কৃপা লক্ষিত হয় না। অন্য শত উপকারের কথা দূরে থাকুক অন্ততঃ এজন্য কি অন্তরে কৃতজ্ঞতা স্বীকার হইবে না। এইরূপ সুখ সৌভাগ্য এ দেশীয় লোকের পক্ষে কবে কোন্ রাজার শাসনকালে হইয়াছে? রাজভক্ত কৃতজ্ঞ জাতি বলিয়া যেন আমরা পরিচিত হই। গত কংগ্রেস সভা হইতে একজন বন্ধু ফিরিয়া আসিয়া দুঃখের সহিত আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, কেবল দোষ চর্চ্চা হইয়াছে, গুণচর্চ্চা প্রায় কিছুই হয় নাই। বিশেষতঃ গবর্ণর বিশেষের কুৎসা নিন্দা যথেষ্ট হইয়াছে। ইহা দেখিয়া শুনিয়া বড়ই ক্লেশ পাইয়াছি।

এই সকল কারণে কংগ্রেসের প্রতি

গবর্ণমেণ্টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে, সতর্ক ভাবে পুলিস অনুসন্ধান লইয়া থাকে। এমন কথা ও দুর্ঘটনা কখনও ঘটিত পারে যে, গবর্ণমেণ্ট সেই জন্য এই সভা হইতে দিবেন না। আমরা অনেক উচ্চ অধিকার পাইয়াও নিজেদের ত্রুটিতে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছি, তাহা রক্ষা করিতে পারিতেছি না। যাঁহা হইতে স্বাধীনতা পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে স্বাধীনতার অযোগ্য ব্যবহার করিলে সেই স্বাধীনতার চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকার বিষয়ে গভীর সন্দেহ।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন একজন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক রাজভক্ত প্রজা ছিলেন। বাস্তবিক তিনিই মাতৃভূমির পূজা করিয়াছেন, মাতৃভূমির গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। আজ ব্রাহ্মসমাজের লোক যদি তাঁহার ভাবের অনুসরণ করিয়া চলিতেন, ব্রাহ্মগণ গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন ও অবিশ্বাসভাজন হইতেন না। ব্রীটিশ গবর্ণমেণ্টের ব্রাহ্মদিগের প্রতি নানা কারণে পূর্ব্ববৎ আস্থা বিশ্বাস নাই। যখন স্বায়ত্ত শাসন ও ইলবার্ট বিল সম্বন্ধীয় ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, স্বার্থপর ইংরাজজাতি ভারতবর্ষীয় লোকদিগের বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা বিষদৃষ্টিতে এদেশীয় লোকদিগকে দেখিতেছিলেন, তাঁহাদিগকর্ত্তৃক সম্পাদিত পত্রিকা সকল বিদ্বেষ বিষ বিকীর্ণ করিতেছিল, ভারত সম্রাজ্যের শীর্ষস্থানে তখন ভারতহিতৈষী মহাত্মা লর্ড রিপণ ছিলেন। তখন তিনিও স্বজাতি ইংরাজগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আপনার পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; পরাক্রান্ত ইংরাজজাতির প্রতিকূলতা বশতঃ সেই মহাত্মার একটি স্মৃতিচিহ্ন পর্য্যন্ত এদেশে রক্ষিত হইতে পারে নাই। সেই সময় স্বদেশ প্রেমিক কেশবচন্দ্র সদ্ভাব ও শান্তিস্থাপনের জন্য যেরূপ যত্ন চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয়। তিনিই রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণ মহোদয়কে কার্য্য বিধানের তীব্রতা হ্রাস করিবার জন্য পরামর্শ দান করেন। তাঁহার পরামর্শ গৃহীত হয়। পরে একটি বড় সভাতে একজন বিখ্যাত সাহেব বলিয়াছিলেন, "সেই সময়ে কেশব চন্দ্রের যত্ন চেষ্টা না হইলে এদেশে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। তাহা মনে করিলেই কেশবচন্দ্রের প্রতি হৃদয় কৃতজ্ঞতাভারে অবনত হয়।" বহু ব্রাহ্ম স্বদেশ প্রেমিক রাজভক্ত কেশবচন্দ্রের ভাব ও বিশ্বাসকে জীবনে নেতৃত্ব করিতে না দিয়া বর্ত্তমান গুরুতর ব্যাপারে অন্য ভাবের নেতৃত্বে নীয়মান হইয়া অত্যন্ত অনিষ্টসাধন করিয়াছেন। তখনকার আন্দোলনে তিনি যে কিরূপ ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার লেখাতে সেই ভাব কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে। অন্ত্য জীবন হইতে তাঁহার কয়েকটী কথার অনুবাদ এস্থলে প্রকাশ করা গেল ?

"কার্য্যবিধান ব্যবস্থা লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত, তাহাতে আমার ইচ্ছা হয় যে, সম্পূর্ণরূপে ইয়ুরোপীয় সমাজের সংস্রব ত্যাগ করি, আর কখনও ইহার সঙ্গে যোগ না রাখি। – সৎপরামর্শ—(এরূপ) করিও না।

"এই পাণ্ডু লিপির বিরোধী সংবাদ পত্রগুলি দেশীয় সমাজের জঘন্য কুৎসা নিন্দায় এমনই পরিপূর্ণ যে, আমার প্রবৃত্তি হয় আমার টেবিল হইতে উহাদিগকে সরাইয়া রাখি। উহাদের গ্রাহক শ্রেণী হইতে নাম উঠাইয়া লই।—(এরূপ) করিও না।

"আমার চিত্ত এমনি বিরক্ত ও খিট্‌খিটে হইয়াছে যে আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি আমাকে জন বদ্বেষী সংশয়ী করিয়া তুলি।—(এরূপ) করিও না।

"সমুদায় উন্নতি বন্ধ হইয়া গেল, দেশীয় সমাজ শতবর্ষ পিছাইয়া গেল, আমি উন্নতি সম্বন্ধে আর আশা করি না।—(এরূপ) করিও না।

"আমি ক্রোধন খিট্‌খিটে ও বিদ্বেষী হইয়া পড়িতেছি, এবং আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ক্ষমা হারাইয়া ফেলিতেছি। (এরূপ) করিও না।

"ইয়ুরোপীয় এবং দেশীয়দিগের মধ্যে মিল হইতেছিল, এখন উভয়ের মধ্যে ব্যবধান এত বাড়িয়া গেল যে, ভারতের ইতিহাসে ঈদৃশ দুই বিরোধী জাতির কোন কালে মিলন হইতে পারে না।আমি এই দর্শন রাজনীতি ও ধর্ম্মসঙ্গত সিদ্ধান্ত করিতেছি। করিও না।" ইত্যাদি।

কেশবচন্দ্রকে প্রকৃত মাতৃপূজক বলা যায়। তিনি শান্তি সদ্ভাব স্থাপন করিয়া মাতা জন্মভূমির গৌরব বর্দ্ধন ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে মাতৃপূজার নামে অনেকে মাতার অবমাননা ও ক্ষতি করিতেছেন। তখন রাজজাতি ও এদেশীয় বিজিত প্রজাবর্গের সঙ্গে সংঘর্ষণ ঘটিয়াছিল, এবার প্রবল রাজার সঙ্গে দুর্ব্বল প্রজার সংঘর্ষণ ও বিবাদ, গুরুতর ব্যাপার। উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব বহু দূরে, এদেশের উন্নতি শতবর্ষ পশ্চাতে পড়িল। ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়। রাজা ও রাজবিধি বেআইনী বলিয়া অমান্য করিয়া চলার জন্য অনেক সম্মানিত সম্ভ্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোক শাসিত দণ্ডিত ও পুলিশ কর্ত্তৃক অপমানিত হইতেছেন। ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়। যেখানে গোলযোগ ঘটিয়াছে, হুকুম অমান্য করিয়া চলার জন্য ঘটিয়াছে, রাজকীয় সারকুলার মান্য করিয়া চলিলে এরূপ কখনও হইত না, এপ্রকার অশান্তি ও গোলযোগ ঘটিত না। মাতৃবন্দনাসূচক "বন্দেমাতরম্" অতি ভাল কথা। কিন্তু সাহেব বিবীদিগকে বিদ্রূপ করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে তাহা বলিয়া তাঁহাদিগকে তাড়া করিয়া যাইবার জন্য ব্যবহার করিলে অতিশয় দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। অবোধ বালক ও উচ্ছৃঙ্খল যুবকদিগের দ্বারা এই শব্দের অতিশয় অপব্যবহার হইতেছে, ইহাতে বঙ্গমাতার অবমাননাই হইতেছে বলা যায়। কোচবিহার বিবাহের আন্দোলন ও উত্তেজনায় পড়িয়া বহুলোকের ও বহু যুবার ক্ষতি হইয়াছে, অনেক বুদ্ধিমান লোক হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ও মতিচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই ক্ষতির পূরণ এক্ষণও হয় নাই। এবার মাতৃপূজার উত্তেজনা ও আন্দোলনে সাধারণ বালকও যুবা বৃদ্ধ যেরূপ মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন ইহার পরি-

শায় ভাবিয়া আমাদিগকে হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। ইহা আমাদের অতিশয় দুর্ভাগ্য। আমাদের মনের ক্লেশ অনেকেই বুঝেন না, হিত কথায় বিপরীত ফল হয়। ক্রোধ ও উত্তেজনার অবস্থায় প্রবীণ লোকেরও হিতাহিত বিবেচনা বিলুপ্ত হয়। এই রূপ রাজা ও প্রজায় পরস্পর সংঘর্ষণে রাজার ক্ষতি কি? প্রজারই বিশেষ ক্ষতি। স্বদেশহিতৈষিগণ স্বদেশের যে কত ক্ষতি করিয়াছেন এখন বুঝিতেছেন না, পরে বুঝিবেন। দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন হয় ইহা কাহার না প্রার্থনীয়। বিদেশীয় উপকারী লোকদিগের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করিয়া তাহা উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে। যে স্থানে দ্বেষ হিংসা বিবাদ বিসংবাদ সেস্থানে আমরা নই, আমাদের সহানুভূতি নাই। মন্দভাবে রাগদ্বেষ হিংসায় মাতৃ-পূজা অসম্ভব। প্রীতিফুলে পূজা না করিলে পূজা হয় না। অমুকে আমার আপনার, অমুকে পর এরূপ ভাব পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়কে প্রশস্ত ও উদার না করিলে মাতৃপূজা ঠিক হইয়া উঠিবে না।

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

(মরিপর্ব্বত।)

মরিপর্ব্বত শিমলা দার্জ্জিলিঙের ন্যায় গিরিরাজ হিমালয়ের একটি অংশ। পূর্ব্বে পঞ্জাবের ছোটলাট সাহেবের বার্ষিক শৈলবিহার মরিতেই হইত। কতিপয় বৎসর যাবৎ তিনি শিমলাশৈলে বড়লাট সাহেবের প্রতিবেশী হইয়া গ্রীষ্মকাল যাপন করেন। মরি এক্ষণ Military Mountain এ (সৈনিকপর্ব্বতে) পরিণত হইয়াছে। গ্রীষ্ম কালে হাজার হাজার গোরা সৈন্য মরি গিরিতে যাইয়া স্থিতি করে। সেনাসংক্রান্ত বড় আফিস সকল মরিগিরিতে স্থাপিত হয়। পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় মরির পথে সেনাশ্রেণী ছুটাছুটি করে। মরিপর্ব্বতের উচ্চতা সম্ভবতঃ সাড়ে সাত হাজার ফিট। উহা রাউলপিণ্ডি হইতে ৩৯ মাইল দূরে। তথা হইতে টঙ্গা বা টম্‌টমারোহণে যাইতে হয়। টঙ্গার উপর তিন জন আরোহী বসিয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক আরোহীকে ৫৲ ভাড়া দিতে হয়। ৬ ঘণ্টায় মরিতে পঁহুছান যায়। অনেক যাত্রিক অপেক্ষাকৃত অল্প ভাড়ায় এক্কাগাড়ী আশ্রয় করিয়া মরিতে আরোহণ করে। নববিধানসমাজের প্রেরিত স্বর্গগত সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত কিয়ৎকাল মরি পর্ব্বতের রমণীয় নিভৃত প্রদেশে বাস করিয়া যোগসাধন করিয়াছিলেন। তিনি আহার্য্যাভাবে অনেক দিন ক্লেশ পাইয়াছিলেন। গাঁধাফুল সিদ্ধ করিয়া খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন।

বিগত ২২শে জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ণ দশটার সময় ভোজনান্তে টঙ্গারোহণে আমাদের মরিপর্ব্বতে যাত্রা করা স্থির হইয়াছিল। ডাক্তার কালীনাথ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্র নাথ আমাদিগের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। যাত্রার নির্দ্দিষ্ট সময়ে টঙ্গার পরিবর্ত্তে ঠিকাদার আমাদের জন্য একখানা বড় ফিটন গাড়ী পাঠাইয়াছিলেন। ফিটন গাড়ী দেখিয়া মনে বড় আহ্লাদ হইয়া-

ছিল। আমরা গাড়ীতে আরোহণ করিতে যাইয়া দেখি মরির যাত্রী দুইটি গৌরাঙ্গ পুরুষ অর্থাৎ দুই জন গোরা সিপাহী বসিয়া আছেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া আমাদের হর্ষ বিষাদে পরিণত হইল। ভাবিতে লাগিলাম, এই হিংস্র পশুর তুল্য দুই গৌরাঙ্গ পুরুষের সঙ্গে এক গাড়ীতে বসিয়া ৬।৭ ঘণ্টার পথ যাইতে হইবে, না জানি পথে কি বিপদ্ ঘটে। ভাড়া দেওয়া হইয়াছে, কি করা যায়। আমরা ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া ফিটনে আরোহণে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। ডাক্তার কালী নাথ বাবু আমাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য গাড়ীর পার্শ্বে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাদের ভাব দেখিয়া বলিলেন, "কোন ভয় করিবেন না, আরোহণ করুন। সুরেন্ সঙ্গে থাকিবে, কোন ভাবনা নাই।" সুরেন্ একজন মহাসাহসী বলবান্ যুবা, তিনি আমাদিগকে বলিলেন, "এ দুই গোরাকে ভয় করিবেন না; কোন রূপ অভদ্রতা করিলে একা আমি এই দুই জনের হাড় চূর্ণ করিব।" আহ্লাদের বিষয় যে, তাহারা আমাদের সঙ্গে পথে কোনরূপ অশিষ্টাচরণ করে নাই। এক স্থানে রাস্তার পার্শ্বে একটি বড় হোটেল দেখিয়া তাহারা তথায় যাইয়া মদ্য পান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু সুরেন্ নানা কথায় ভুলাইয়া তাহাদিগকে গাড়ী হইতে নামিতে দেন নাই।

আমরা অর্দ্ধপথ সমতল প্রান্তর পার হইয়া ক্রমোন্নত ভূমির উপর ক্রমে আরোহণ করিতে লাগিলাম। অবশেষে নিবিড় পাদপাবলীরূপ সবুজ পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত গিরিরাজের বিশাল দেহ আমাদের নয়ন মনকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সম্মুখেই দেখি অভ্রস্পর্শিশীর্ষ বিরাটমূর্ত্তি নগাধিরাজ আমাদের গম্যপথ যেন অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। চক্রবৎ বক্র ক্রমোন্নত পথে সানুদেশে আরোহণ করিতে হইয়াছিল। তখন ২।৩ মাইল পথ যাইয়াই অশ্বদ্বয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে দিয়া তাহাদের স্থানে অপর অশ্বিনীনন্দনযুগলের যোজনা করিতে হইয়াছিল। গভীর গিরিকন্দর ও সমুচ্চ অধিত্যকার এক এক স্থানে পরম শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্বর্গের সৌন্দর্য্যরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছেন। এসকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দর্শনে পরম সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের আধার ভগবানের দিকে মন আকৃষ্ট হয় বলিয়া পূজ্যপাদ তপোধনবৃন্দ সংসারের সকল আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া তপস্যার জন্য এরূপ স্থানকে মনোনীত করিতেন। এক্ষণ আর এরূপ পবিত্র দেবভূমির মর্য্যাদা নাই। ইহা ইন্দ্রিয়াসক্ত সংসারী লোকদিগের বিলাসক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। তথায় যোগধ্যানের পরিবর্ত্তে কেবল আমোদ কোলাহল ও ভূতের নৃত্য হইয়া থাকে। পথে দৃষ্ট হইল টঙ্গারোহণে দলে দলে গোরা সিপাহী মরিতে আমোদ করিবার জন্য যাইতেছে। আমরা গন্তব্য স্থানের নিকট পঁহুছিবার অর্দ্ধ মাইল দূরে গাড়ী হইতে নামিতে বাধ্য হই, তখন সুরেন্দ্রের সঙ্গে ক্রমোন্নত পথে কিয়দ্দূর উঠিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমরা

দের গন্তব্য স্থানে গাড়ীর গতি হয় না, গাড়ীতে চড়িয়া যাইতে হইলে কিছু ভাড়া অধিক দিতে হয়।

রাউলপিণ্ডির Executive Engineer শ্রীযুক্ত বাবু কালী কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মরি পর্ব্বতে এক মণিহারি দোকান ও ছাপাখানা স্থাপন করিয়াছেন। সুরেন্দ্র নাথ আমাদিগকে তাঁহার বিপণীতে লইয়া যান। কালীকৃষ্ণ বাবু তাঁহার Rest house এ আমাদের অবস্থিতির বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য স্বীয় পুত্র কমলকৃষ্ণকে পত্র লিখিয়াছিলেন। কমলকৃষ্ণ এম এ উপাধিধারী একজন সুশিক্ষিত যুবা, ইতি পূর্ব্বে কলেজে প্রফেসরী করিয়াছিলেন,ভাল বোধ না হওয়াতে তাহা পরিত্যাগ করিয়া মরিপর্ব্বতে মণিহারি দোকান ও ছাপাখানা খুলিয়া বসিয়াছেন, একখানা ক্ষুদ্র পত্রিকাও চালাইতেছেন। তিনি তথায় একজন বন্ধুর পরিবারের মধ্যে স্থিতি করেন, সকালে বিকালে কার্য্যক্ষেত্রে কাজ করিয়া থাকেন। সেই বন্ধুর আবাস কিয়দ্দূর নিম্ন স্থানে, সেখানে অবতরণ ও তথাহইতে আরোহণ বয়োবৃদ্ধ দুর্ব্বল লোকদিগের পক্ষে বড় কষ্টসাধ্য। ইঞ্জিনিয়ার বাবুর রেষ্ট হাউসে থাকিতে গেলে একাকী থাকিতে হইত, আমাদের ন্যায় নিরামিষভোজী লোকের দুই বেলা আহারাদির ব্যবস্থা হওয়াও দুঃসাধ্য ছিল। যে দুই তিন দিন মরিতে বাস করিব, নানা বিষয়ে সুবিধার জন্য আমরা উক্ত বন্ধুর পরিবারমধ্যে বাস করাই স্থির করিলাম। সেখানে যাইবার সময় নীচে নামিতে অধিক কষ্ট নাই, পদব্রজে উপরে উঠিতে বিশেষ কষ্ট।

আমরা যে আবাসে যাইয়া অবস্থিতি করিলাম, উহা কলিকাতা গড়পারনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র গুপ্তের আবাস। নিবারণ বাবু যুবা পুরুষ, সৈন্যসংক্রান্তকার্য্যালয় বিশেষে কাজ করিয়া থাকেন। তিনি সপরিবারে বাস করিতেছেন; তাঁহার পত্নী শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গগত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের দৌহিত্রী। সেখানে আমরা সাদরাতিথ্যগ্রহণে উপরের ঘরে স্থিতি করিয়াছিলাম। সেই স্থান হইতে উত্তর ও পূর্ব্ব প্রান্তের সুদূরব্যাপিনী গিরিমালার শোভা নয়নগোচর হইত, আমরা নির্জ্জনে বসিয়া তাহা দর্শন করিতাম আর ভাবে পুলকিত হইতাম। ইঞ্জিনিয়র বাবুর Rest House বড় রাস্তার পার্শ্বে, সেখানে স্থিতি করিলে দিবারাত্রি কেবল গোরাঙ্গমূর্ত্তি দেখিতে হইত। সেই পথ দিয়া দলে দলে ইয়ুরোপীয় সৈনিক পুরুষেরা অশ্বারোহণে বা পদব্রজে সর্ব্বদা ছুটাছুটি করিয়া থাকে। সেই ভীমদৃশ্য বীর পুরুষগণকে না দেখিয়া আমাদিগকে যে অনুক্ষণ গিরিরাজের বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিতে হইয়াছিল ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। কিন্তু দার্জ্জিলিং. শিমলা ও নৈনিতাল এবং মসুরি পর্ব্বত হইতে যেমন চির তুষারাবৃত রজতনিভ অভ্রস্পর্শী উত্তুঙ্গ হিমাচলশিখর দর্শন করিয়া প্রাণ পুলকিত হইয়াছে, মরি হইতে সেই স্বর্গের সুন্দর দৃশ্য নয়ন গোচর হয় নাই। এই একটি অভাব ছিল।

এরূপ প্রবাদ যে মরি পর্ব্বতের উপর দিয়াই পঞ্চপাণ্ডব স্বর্গারোহণ করিতে গিয়াছিলেন।তাঁহারা মরির উত্তর পশ্চিমপ্রান্তে এক স্থানে শিলাপট্টে বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন।পঞ্চপাণ্ডবের শিলা বলিয়া এক্ষণও সেই শিলাপট্ট চিহ্নিত আছে। তাঁহাদের লক্ষ্য স্বর্গধাম হিমাচলের উত্তর প্রান্তস্থ বৃষভবাহন ভূতনাথের বিহারভূমি সুশোভন কৈলাসগিরি হইতে পারে। এরূপ জনশ্রুতি যে, ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি চারি ভ্রাতা স্বর্গে পঁহুছিতে পারেন নাই, পথেই তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবল সত্যব্রত সর্ব্বাগ্রজ যুধিষ্ঠির অনেক ক্লেশে সশরীরে তথায় পঁহুছিতে পারিয়াছিলেন।

মরিতে যাওয়ার পর ঠাণ্ডা লাগিয়া আমাদের সর্দ্দি কাসী হইয়াছিল। সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় আমরা ঔষধস্বরূপ গরম চা কখন কখন পান করিয়া থাকি। তরুণ সর্দ্দিনিবারণের জন্য চা পান আবশ্যক হওয়াতে আমরা গৃহস্বামীর নিকট তাহার প্রার্থী হই। তিনি বলিলেন "আমাদের পরিবারে চায়ের ব্যবহার নাই। সর্দ্দি কাসী হইলে আমরা বনফশা ব্যবহার করি, তাহাতে আশু উপকার হয়।" তাঁহার কথানুসারে আমরা চায়ের পরিবর্ত্তে বনফ্শা ব্যবহার করিয়া বাস্তবিক উপকৃত হইয়াছিলাম। বনফ্শা এক প্রকার উদ্ভিদ পদার্থ, উহা লতিকাবিশেষ। সেই লতার শুষ্ক পত্র ও ফুল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইয়ুনানী হাকিমদিগের উহা প্রধান ঔষধ। অর্দ্ধ তোলা বনফ্শা এক পোয়া জলে কিঞ্চিৎ চিনি বা মিশ্রীর সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া জল অবশিষ্ট থাকিতে তাহা ছাঁকিয়া লইয়া গরম গরম পান করিলে তৎক্ষণাৎ সর্দ্দি কাসীর উপশম হয়। আমরা বনফ্শার উপকারিতা বোধ করিয়া মরি হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় তাহা কিছু ক্রয় করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলাম, এবং কলিকাতায় আসিয়া অনেক আত্মীয়বন্ধুকে সর্দ্দি কাসীতে উহা ব্যবহার করিতে দিয়াছিলাম। কলিকাতায় সিন্দুরিয়াপটী পল্লীতে হাকিমী ঔষধের দোকানে বনফ্শা পাওয়া যায়।

আমরা শিমলা পর্ব্বতে যাইয়া অনেক যুবককে চা পান করিতে দেখি নাই। মরি পর্ব্বতে দেখিলাম, একটি পরিবারে সম্পূর্ণ রূপে চা ব্যবহৃত হয় না। হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় শীতপ্রধান স্থানে কোথায় লোকে গ্লাশ গ্লাশ ও বাটী বাটী পুনঃ পুনঃ চা পান করিবে, দুরন্ত শীতের সময়ও অনেকে একবিন্দু চায়ের জল পান করে না, এদিকে কলিকাতার তীব্র গরমের সময় যুবক যুবতীগণ দিনে ২।৩ বার চা পান করেন, প্রত্যহ চা পান না করিলে অনেকের যেন জীবন ধারণ দুষ্কর হয়। ইহা ভাবিয়া আমরা আশ্চার্য্যান্বিত হইয়াছি। পুরুষের কথা দূরে থাকুক বাঙ্গলাদেশের অনেক পল্লীবাসিনী নারী পর্য্যন্ত ঘোরতর চা-পানাসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিবাহাদি উৎসবে দধি দুগ্ধাদি যেরূপ খরচ হয়, অনেক পরিবারে চায়ের খরচ তদপেক্ষা বড় কম হয় না। কিয়দ্দিন হইল আমরা একটি পল্লীগ্রামে বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছি-

লাম, কন্যাকর্তার বাড়ীতে দুই তিন দিন থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সেখানে সকালে বিকালে চা-পানের মহাঘটা দেখা-গিয়াছিল, বাড়ীর প্রাঙ্গণে দীর্ঘাকার টেবিল স্থাপিত ছিল, তাহার চারি পার্শ্বে সারি সারি চেয়ারে পানাসক্ত বাবুগণ চাম্‌চা ও পানপাত্র সম্মুখে করিয়া উৎসাহ সহকারে বসিয়া যাইতেন। চা পানের সঙ্গে পাউরুটী বিস্কুটাদি ভক্ষণ হইত। কোন কোন স্বদেশ-প্রেমিক যুবা বিস্কুট স্বদেশী নয়, বিলাতী জিনিষ বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে মুড়ি সেবন করিতেন। চাও তো সাহেবদের হস্তে প্রস্তুত, সাহেবেরা তাহার উপস্বত্ব প্রাপ্ত হন, এবং এদেশীয় লোককে চা খাওয়াইয়া কোটি কোটি টাকা বিলাতে লইয়া যান। আমরা ঘোরতর স্বদেশী, অন্য বাবুদিগের ন্যায় চা পান করিতাম না, এক প্যালা দুগ্ধ-পান ও কিছু মুড়ি ভক্ষণ করিতাম। বিবাহে চা-পানের ঘটার গল্প লিখিতে যাইয়া একটী মজার কথা মনে হইল, এস্থানে উল্লেখ করা সুসঙ্গত না হইলেও তাহা উল্লেখ করিতে বাধ্য হওয়া গেল। পাঠিকাগণ মাপ করিবেন। পল্লীগ্রামে আমাদের পৈতৃক বসত বাড়ী। আমাদের গ্রামের ক্রোশান্তর পল্লীবিশেষে আমা-দিগের একটি সমৃদ্ধ কুটুম্ব পরিবার স্থিতি করেন। ইতিপূর্ব্বে সেই পরিবারের সমস্ত লোক ঘোরতর মদ্যপায়ী ছিলেন। বিবাহাদি উৎসবোপলক্ষে বাড়ীর প্রাঙ্গণে গৃহস্বামী চৌবাচ্চা পুরিয়া মদ্য রাখিয়া দিতেন। সমাগত পানাসক্ত আত্মীয় কুটুম্বগণ স্বেচ্ছাক্রমে চৌবাচ্চা হইতে মদ্য তুলিয়া পান করিতেন, কেহ কেহ চৌবা-চ্চাতে নল সংলগ্ন করিয়া সুরারস চোষণ করিয়া লইতেন। চায়ের সঙ্গে সুরাবিষের তুলনা হয় না। সকলেই বুঝিতে পারেন এই তুলনা খাটে না। তবে এস্থলে ইহার উল্লেখ এজন্য করা গেল যে, বিবাহাদিতে, আজকাল যেরূপ চাপ্রিয় লোকের সমাগম হয়, এবং যেরূপ প্রচুর চায়ের কাটতি হইয়া থাকে, চৌবাচ্চা পুরিয়া চায়ের জল রাখিলে, এবং তাহা উষ্ণ রাখিবার ব্যবস্থা করিলে চাপায়ীরা স্বেচ্ছাক্রমে যখন তখন পর্য্যাপ্ত পান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন। তাহা হইলে কন্যাকর্ত্তা তাঁহাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হন। ভাল মনে হইল, এদেশের সমুদায় চা বাগিচা সাহেবদিগের এক চেটিয়া। চার ব্যবসায়ে এত লাভ হয় যে, এক এক জন গরিব ইংরাজ চায়ের বাগান করিয়া ৫।৬ বৎসরের মধ্যে লক্ষপতি হই তেছেন। সাহেবেরা এদেশে চায়ের ব্যবসায় চালাইয়া কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী বাবুরা চা কিরূপ বস্তু চক্ষে দেখেন নাই, তাহার নাম কাণেও শুনেন নাই, এক্ষণ সাহেবদিগের কৌশলচক্রে পড়িয়া বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষ চাপানে মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। সাহেবেরা বাঙ্গালীদিগকে চা খাওইয়া তাহাদের শোণিতস্বরূপ রাশি রাশি টাকা শোষণ করিতেছেন। চায়ের ব্যবসায়ের অবনতি হইলে সাহেবেরা অত্যন্ত জব্দ হন। আমরা বলি স্বদেশপ্রেমিকগণ চা পান পরিত্যাগ করুন। চায়ের জন্য মাসে মাসে যত টাকা খরচ হয়, তাহা

নিজেদের ঘরে থাকিবে, বিলাতে যাইবে না। অপিচ নিজেরা উদ্যোগী হইয়া স্বদেশে চা বাগিচা করিয়া সাহেবদিগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করুন, এবং বিলাতে লক্ষ লক্ষ মন চায়ের রপ্তানি করিয়া লক্ষপতি হইয়া সাহেবদিগকে জব্দ করুন। স্বদেশী ও বিলাতী লবণ বিচার করিয়া মারামারি কাটাকাটি করিলে কোন ফল নাই। এদেশের সমুদায় লবণ গবর্ণমেণ্টের অধিকারে সাহেবদিগের হস্তে। এদেশীয় লবণের ব্যবসায়ে যে অর্থলাভ হয়, তাহা দেশীয় লোকেরা প্রাপ্ত হয় না। এ দেশীয় লবণে গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ৬কোটি টাকা আয় হয়। লবণ বাণিজ্য গবর্ণমেণ্টের এক চেটিয়া। কিয়দ্দিন হইল, আমরা রাজপুতনার প্রসিদ্ধ লবণের হ্রদ দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রতিবৎসর সেই হ্রদে দুই কোটি টাকার লবণ উৎপন্ন হয়। মোটা মোটা বেতনে নয় জন সাহেব সেই লবণপ্রস্তুতির কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। খেওড়ার লবণই সৈন্ধব লবণ। পঞ্জাবে এই সৈন্ধব লবণের পাহাড়। উহা সম্পূর্ণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারে। এই লবণের কার্য্যে কেবল কতকগুলি মুটে মজুর এবং কয়েক জন এদেশীয় সামান্য কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রতিপালিত হয়। লিবার পুল হইতে আনীত লবণপুঞ্জের ব্যবসায় করিয়া এদেশীয় অনেক মুদি দোকানদার লাভবান্ হইয়া থাকে। স্বদেশ প্রেমিক বালকগণ পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, বিলাতী লবণ স্পর্শ করিবে না। ইতিপূর্ব্বে আমরা একদিন পল্লীগ্রামের এক উদ্যানে উৎসব করিতে গিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে কয়েক জন বালকও আমাদের সঙ্গে গিয়াছিল। উৎসবে সমাগত যাত্রিকদিগের জন্য পাচক ব্রাহ্মণ খিচড়ী রন্ধন করিতেছিল। তিন চারি জন ক্ষুদ্রবালক অনুসন্ধান করিয়া জানিল যে খিচড়ীর জন্য বিলাতী লবণ আনা হইয়াছে, তখন তাহারা খিচুড়ীর সঙ্গে বিলাতী লবণের যোগ হইলে তাহা খাইবে না বলিয়া রৌদ্রের উত্তাপকে অগ্রাহ্য করিয়া এক মাইল দেড় মাইল দূরে বাজারে দেশী লবণ খরিদ করিবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া যায়। বাজারে দেশী লবণ তাহারা পাইয়াছিল কি না, তাহাদের খাওয়া হইয়াছিল কি না পরে জানিতে পারা যায় নাই। বহু পল্লীগ্রামে দেশীয় লবণ সৈন্ধবলবণাদি দুর্ঘট, সংরেরও বহু পরিবারে বিলাতী লবণ ব্যবহৃত হয়। এই সকল ক্ষুদ্র বালক যে, কত দিন প্রতিজ্ঞাপালন করিতে পারিবে জানি না, বিশেষতঃ সৈন্ধব লবণের মন ন্যূনকল্পে ৫৲ মূল্যে বিক্রয় হয়, বিলাতী লবণের মন তিন টাকা, সৈন্ধব লবণ অপরিষ্কার, প্রস্তরবৎ জমাট বাঁধা, তাহা পেষিয়া চূর্ণ করিয়া লইতে হয়। বিলাতী লবণের মূল্য কম ও তাহা পরিষ্কৃত,পরিশ্রম করিয়া চূর্ণ করিয়া লইতে হয় না। অনর্থক গরীব লোকেরা এই সুবিধা কেন ছাড়িবে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হিন্দুসমাজে কেহ সুরাপায়ী ব্যভিচারী হইলে এক ঘরে হয় না, কিন্তু কেহ বিলাতী লবণ খাইলে শুনিয়াছি কোন কোন স্থানে এক ঘরে হয়, তজ্জন্য দলাদলি ও সভা

সমিতি হইয়া থাকে। অনেক ব্রাহ্মও দেশী লবণের পক্ষ হইয়া দলাদলি করেন, লজ্জার কথা। আমরা গোঁড়া স্বদেশী, সাহেবদিগের অনুকরণে জীবনে কখনও মদ্যপান বা চুরুট সিগারেটের ধূম পান করি নাই, কুক্কুটাণ্ড ও কুক্কুটমাংস ভক্ষণ করি-নাই; ঔষধার্থ ব্যতীত চা পান করি না। আমাদের মত স্বদেশপ্রেমিক কে? তবে আমরা রাজভক্ত স্বদেশ প্রেমিক। দ্বেষ হিংসা ও নিন্দাবাদের বিষম বিরোধী।

আমরা শিমলা ও মরি পর্ব্বত বাসীদের অনেকে চাপান না করার প্রসঙ্গোপলক্ষে প্রবন্ধের লক্ষ্য ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছি। এক্ষণ প্রকৃত পথ আশ্রয় করা যাইতেছে। বিগত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ সায়ংকালে গৃহস্বামী নিবারণ বাবু আমাদের ইঙ্গিতক্রমে ধর্ম্মালোচনার জন্য মরি পর্ব্বতস্থ বাঙ্গালী বাবুদিগকে নিজগৃহে আহ্বান করেন। সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতে থাকে। এক জন ছাড়া দূর হইতে অন্য কোন বাবু আসিতে পারেন নাই। পাঁচ ছয় জন বাবুকে লইয়া আলোচনা করা যায়। হিমালয়শিখর উচ্চ ধর্ম্মসাধনের স্থান, এস্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সকল সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের আকর যিনি তাঁহার দিকে হৃদয়কে আকর্ষণ করে। এরূপ স্থানে স্থিতি করিয়া পরমার্থ ভুলিয়া কেবল সংসার ও অর্থের উপাসনা করিলে বড় দুঃখের বিষয়! এই ভাবের আলোচনা হইয়াছিল। আমরা নিবৃত্ত হইলে পর একজন বন্ধু বলিলেন, "আমার বড়ই কঠিন হৃদয়, আমার মনে কখনও ভক্তি প্রেমের সঞ্চার হয় না। আমার মনে হয় ধর্ম্ম কর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইলেই ভাল। আমাদের পৈতৃক বাড়ীতে বিগ্রহ স্থাপিত, আমি কোন কোন দিন রাত্রিতে ঠাকুর ঘরে যাইয়া ঠাকুরকে ঠেঙ্গাইয়াছি।" তৎপর উক্ত বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেন, "আমি যখন ব্রাহ্ম প্রচারক বা থিয়োসাফি কিংবা হিন্দুপ্রচারকদিগের বক্তৃতা শ্রবণ করি তখন ভাল লাগে, পরে আর ভাল লাগে না। সে সকল যেন জঞ্জাল। এরূপ বোধ করি, ধর্ম্মমন্দির গুলি চূর্ণ হইয়া যায় আমার এরূপ ইচ্ছা হয়।" আমাদের ধর্ম্মালোচনার এই পরিণাম হইল। প্রবাসে স্থানে স্থানে এই প্রকার বাঙ্গালী বাবুর ছবিই দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা ২৭শে জ্যৈষ্ঠ মাধ্যাহ্নিক ভোজনান্তে রাউলপিণ্ডিতে ফিরিয়া যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলাম। কমলকৃষ্ণ আমাদের অনুরোধমতে টঙ্গা স্থির করিলেন, সেই টঙ্গাতে কোন গোরা সিপাহীর সংস্রব থাকিবে না, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন। তিনি নিজে সঙ্গে যাইয়া আমাদিগকে টঙ্গায় তুলিয়া দিয়া আসিলেন। দুই জন পঞ্জাবী ভদ্রলোক সহযাত্রী হইয়াছিলেন। অপরাহ্ণে নির্ব্বিঘ্নে রাউলপিণ্ডীতে ফিরিয়া আসা গেল।

প্রাপ্ত।

রমণী—আদ্যাশক্তি।

কি লিখিতে বসিলাম! কত লোকে লাজলজ্জার মাথা খাইয়া পিতামাতাকে

বন্ধুবান্ধবের দ্বারা জানাইল যে, আমার সংসার করা বড়ই আবশ্যক হইতেছে ; এ সংসারে নীতি চরিত্র বজায় রাখিয়া ভগবানের অভিপ্রেত পথে যদি আমাকে চালাইতে চাও, তবে আর পারি না, অনন্ত অসংখ্য প্রলোভনে এ ক্ষীণ তনু ক্ষীণতর, আমার বিবাহের উদ্যোগ কর ! কিন্তু হা অদৃষ্ট! যে মিলনের প্রথম পরিচ্ছেদে কত আবেগ কত পিপাসা, কত উত্তেজনা, কত ব্যাকুলতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, যে জীবনের প্রারম্ভে এ জগৎ সংসার চির মধুময়রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, বেশী দিন নয়, মাত্র পাঁচ বৎসর পরে, সেই হাসি সেই কান্না, সেই মান সেই অভিমান, সেই স্নেহ সেই প্রীতি, সে সমস্ত বুদ্বুদের মত কোথায় মিশিয়া গিয়াছে! যে জন মনে করিয়াছিল, সচ্চিদানন্দ মহাপুরুষের সহিত সম্মিলিত হইতে হইলে অন্ততঃ আশা করিতে আরম্ভ করিলে, 'প্রথমে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রেম অর্পণ করিতে হইবে,'—যে মনে করিয়াছিল, প্রণয় প্রথমে একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয়, স্বভাবসিদ্ধ হইলে শতপাত্রে ন্যস্ত হয়, পরিশেষে সাগরসঙ্গমে লয় প্রাপ্ত হয়, সংসারস্থ সর্ব্বভাবে বিলীন হয়,'—যে এই অবাবাধি পরিপূর্ণ সংসারে স্বীয় জীবনে অনুভব করিয়াছিল ;—

লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে,
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শত গুণে বাড়ে।

যে অন্তর্জগতের নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছিল বলিয়া বুঝিয়াছিল। 'যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা।' তাহার যৌবনজীবন অবসান হইতে না হইতেই, এ বৈরাগ্য বিতৃষ্ণা, এ ক্ষোভ এ দুঃখ, এ যাতনা যন্ত্রনা জ্বলিয়া উঠিল কেন? কেন কি জানি, জলিয়া উঠে ; প্রাণান্তপণে শতচেষ্টা করিয়া কত লোককে দেখিয়াছি যে, আমিত্বকে ভুলিয়া পরের কারণে জীবন উৎসর্গ করিতে চায়, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে না। দৃঢ়তার বর্ম্ম পরিয়া ভগবানের নামে কত লোককে এ সংসারসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে দেখিয়াছি, কিন্তু যে আশায় ঝাঁপ দিয়াছিল সে আশা পূরে নাই, অকালে অকূলে তরী ডুবিয়াছে! তাই বলিয়া কি বলিব সংসার করিও না? যে সংসারে এত গ্লানি এত নিন্দা, এত পাপ, এত প্রলোভন এত ঘৃণা এত বিদ্বেষ, সে সংসারে ঘর করিও না ; সে সংসারে গৃহিণী আনিও না? কবি বলিতেছেন।

কহিল গভীর রাত্রে সংসারবিরাগী
গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছ এখানে!
দেবতা কহিল "আমি" শুনিল না কাণে!
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা!
দেবতা কহিল "আমি!" কেহ শুনিল না!
ডাকিল শয়ন ছাড়ি তুমি কোথা প্রভু!
দেবতা কহিল "হেথা।" শুনিল না তবু!
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি,
দেবতা কহিল "ফির" শুনিল না বাণী।
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়!

যে যত আলায় অবুক না কেন, যে

যত দুঃখের ভয় করুক না কেন, যে যত সাবধান হইতে প্রয়াসী হউক না কেন, কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকিতে সকলকে সংসার করিতে হইবে, সকলকে গৃহধর্ম্মের আশ্রয় লইতে হইবে, নহিলে বনবাসে ধর্ম্ম স্বভাবসিদ্ধ ও অনেকের পক্ষে সহজসাধ্য হইত; এতদিনে এই জন্মমৃত্যুভরা বিরাট ধরিত্রী স্বর্গে পরিণত হইত! অন্ততঃ প্রবন্ধ লেখকের এই রূপ বিশ্বাস।

তাই বলিতেছিলাম, কি লিখিতে বসিলাম! যদি লিখিতে আরম্ভই করিয়াছি, এবং আপনারা পাঠক পাঠিকা এত দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তবে পাগলের প্রলাপ শেষ হয় নাই, এখনো শুনিতে হইবে। না হয় অপনারা বিশ্বাস করিলেন বা খাতিরে শুনিলেন যে, সংসার ধর্ম্ম গ্রহণ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু রমণী আদ্যাশক্তি কিরূপে? যে রমণী নবম কি দশম বর্ষে সংসার কার্য্য করিতে স্বামিগৃহে আগমন করে, যে রমণী কেবল গর্ভধারণ ও সন্তানপালনের জন্য সৃষ্ট, যে রমণী অবিশ্বাসী সুরাপায়ী স্বামীর পাদুকাপ্রহারেও সন্তুষ্ট থাকিয়া তাহার প্রাণবিনোদন করিতে বাধ্য, সে আবার আদ্যা শক্তি হইল কিরূপে? দেশের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এ কথার মীমাংসা হইবে কি না সন্দেহ। তাই জাতীয় অবনতি জাতীয় অবনতি করিয়া দেশ হাহাকারে পরিপূর্ণ—রাজনীতি রাজনীতি করিয়া স্কুল কালেজ সভাসমিতি প্রতিধ্বনিত প্রকম্পিত; কিন্তু জাতীয় এবং সামাজিক,আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক উন্নতির মূল কোথায়? তাহা কেহ জগতের সম্মুখে প্রকাশিত করিতে আজও প্রয়াস পাইতেছেন না; কেহ কেহ যদি বা বুঝিয়াছেন; কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহাদের বিশ্বগ্রাসিনী আকাঙ্ক্ষা কোথায়? সুদূরগামী যাহার লক্ষ্য নয়, অনন্ত যাহার ক্ষুধা নয়, জীবনসংগ্রাম যাহার জীবনের ধর্ম্ম নয়, তাহার বাঁচিয়া সুখ কি? বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন এক দিন বলিয়াছিলেন।

I venture to say that the question of national progress is intimately dependent upon the question of female progress, and that if we wish to see our country great and prosperous, we must begin by directing our efforts to raise the condition of our woman.—কিন্তু আমরা বঙ্গবাসী, আমরা বাক্য ও কার্য্যের একতা দেখিতে ভালবাসি না, আমরা এ কার্য্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিব কেন? যাহা হউক রমণী আদ্যা শক্তি কিরূপে?

আমাদের ক্রন্দনসম্বল বাল্যজীবনের উপর মাতার আধিপত্যের কথা এক মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিলে সকল গোল মিটিয়া যাইবে। দুর্দ্দান্ত প্রতাপ বৃটিশরাজের কোন প্রতিনিধি রোষকষায়িত লোচনে বজ্রগম্ভীরস্বরে কোন শিশুকে ডাকিলে, তখন সে তাহার মাতার ছিন্ন অঞ্চল ধরিয়া বৃটিশরাজকেও তাচ্ছিল্য তুচ্ছ জ্ঞান করে; বুঝি মনে করে যখন মার আঁচল হাতে তখন আমি এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কাহাকে ভয় করিব? এ কথা কাহার প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই? আমাদের কি তেমন দিন ছিল? হায়! সে

দিন কি আর হইবে না? সে প্রশস্ত, সে পবিত্র, সে নির্ম্মল, সে শুভ্র বিশ্বাস কি আর এ হৃদয়কে আকুল করিবে না? জগজ্জননীর বুকের উপর বসিয়া আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া আছি, এক দিন কি তেমন কিছু আসিবে না যে দিন আমাদের হৃদয়তল তাঁহার অঞ্চলের জন্য ভূমিকম্পে ধরিত্রীর বক্ষের মত কাঁপিয়া উঠিবে? কিন্তু কি বলিতেছিলাম,—মা না হইলে শিশুর চলে না। তার পর?—ত'র পর মাতৃচরিত্র সন্তানের শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে প্রতিবিম্বিত হয়। ইহার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রমাণ স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে বর্ণিত রহিয়াছে। যোশেফ ম্যাট্‌সিনীর বাল্যজীবনগ্রন্থে মাতৃচরিত্রের উচ্চ আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছিল বলিয়াই ইটালি এক দিন স্বাধীনতার অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। বীরাগ্রগণ্য নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট যে, একদিন সমগ্র জগতের সম্রাট্ হইতে যাইতেছিলেন, তাহার মূলে যে সত্য লুক্কায়িত তাহা কাহার অবিদিত আছে? ডিউক্ অফ্ ওয়েলিংটন্ ও তাঁহার ভ্রাতা ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণরজেনেরল্ ওয়েলেশ্‌লি প্রভৃতির জীবনালোচনা করিলে আমরা এই এক সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করি।

তাই বলিতেছিলাম—রমণী আদ্যাশক্তি। ব্যক্তিগত জীবনের দ্বারা এই অনন্ত বিস্তৃত দিগন্ত প্রসারিত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মহোপকার সংসাধিত হইতে পারে হইয়া থাকে, ইহা যাঁহাদের জানা আছে তাঁহাদিগকে আর বেশী কিছু বলিতে হইবে না। কিন্তু জীবনের যে পরিচ্ছেদে ভাল মন্দ কোন কিছু এক দিন আঁকিয়া দিলে আজীবন তাহা মানবপ্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, আমাদের সেই জীবনে সেই অঙ্কের যষ্টি কোথায়? এক দিন আমাদের দেশে সীতা সাবিত্রী ছিলেন, এক দিন চিন্তা দময়ন্তী এ দেশের অঙ্ক শোভিত করিয়াছেন; এখন আমাদের সেদিন কোথায়? লোকে বলে কোন দূর কল্পনার রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল জগৎ, আজ কালকার দু'একটা ঘটনা দেখিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রাণ স্বতঃই নাচিয়া উঠে। সে সকল ঘটনা আজ এখানে বিবৃত করিব না। কিন্তু সকলে আজ শুনুন্ বঙ্গললনা আবার স্বীয় ক্ষমতায় জাগিয়া উঠিতেছেন, সন্তানের আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উন্নতির জন্য আবার এখন তাঁহারা নিভৃত হৃদয়তলে উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, আবার বঙ্গরমণীগণ পরের কারণে, পথিপার্শ্বস্থিত জরাজীর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর কারণে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আজ হে স্বদেশবাসী! আমি তোমাদিগকে এই শুভ সংবাদ জানাইতেছি যে, যে কার্য্য কবিকল্পনায় ছিল তাহা এই কয় দিনের যত্নে বাস্তব জীবনে সংমিশ্রিত হইয়াছে, এবং ক্রমে যদি তোমরা তাহার শ্রীবৃদ্ধি করিতে চাও, তবে স্ত্রীচরিত্র উন্নত করিতে প্রাণ মন চিরজীবনের জন্য উৎসর্গ কর। যাঁহাদের নিকটে আমরা সরলতা কোমলতা বিনয় নম্রতা ইত্যাদি জগতের যাবতীয় উচ্চ পদার্থের জন্য ঋণী, যাঁহারা জগতের সুখ

শান্তি মহিমা গৌরব, তাঁহাদিগের উন্নতি যাহাতে হয়, তাহার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। তবে এই উত্থানশক্তিহীন জাতির প্রকৃত উন্নতি হইবে, তবে এই চলচ্ছক্তিবিহীন তন্ত্র মন্ত্রসংহিতায় বিজড়িত লোকাচারজীর্ণ দেশের কপাল ফিরিবে, তখন দেখিবে, বুঝিবে রমণী আদ্যাশক্তি কি না। আজ আসি।—শ্রী বী—

মহিলাদিগের রচনা।

রাজভক্তি ও স্বদেশপ্রেম।

বর্ত্তমান সময়ে "স্বদেশপ্রেম" লইয়া যে মহা আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে আমার মত এক জন সামান্য স্ত্রীলোকের কিছু বলা না লেখা অযুক্তিকর হইতে পারে, কিন্তু এই মহা আন্দোলনের আরম্ভ হইতে আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে ভাব উত্থিত হইয়াছে, তাহাই কেবল সরল ভাবে ব্যক্ত করিতেছি। পাঠক পাঠিকা! ত্রুটি থাকিলে বুঝাইয়া দিবেন।

প্রথমে রাজভক্তির কথা বলি, বহু পূর্ব্বকাল হইতে শাস্ত্রকারগণ রাজাকে 'দেবতা' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্র বলেন, "ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, সূর্য্য, অগ্নি, এবং কুবের এই সমস্ত দেবতার অংশে রাজা নির্ম্মিত।" যদিও এই বাক্যটি সত্য নহে, তবু রাজাকে এরূপ বলিবার কারণ আছে। দেশে রাজা না থাকিলে প্রজাগণ কখনই সুখে ও শান্তিতে কাল কাটাইতে পারিত না। দেশে রাজা না থাকিলে দুঃখী, দীনহীন, দুর্ব্বল প্রজাগণ ধনীদিগের দ্বারা সর্ব্বদা উৎপীড়িত হইত; দস্যুগণ অনায়াসে পরস্ব লুণ্ঠন করিতে ভয় করিত না। সে যাহা হউক, যিনি যাহাই বলুন, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতা পুরুষের উপরে কোন বিধাতা নাই। তিনি রাজমুকুট, রাজদণ্ড প্রদান করিয়া যখন যাহাকে যেদেশে প্রেরণ করেন, তিনি তখন সেই দেশের রাজা হন। একথা সত্য যে, রাজা যখন বিধাতার বিধি লঙ্ঘনপূর্ব্বক তাঁর প্রদত্ত রাজমুকুট ও রাজদণ্ডের অবমাননা করিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, বিধাতা তাঁহার নিকট হইতে সেই রাজমুকুট ও রাজদণ্ডের সহিত সকল কর্ত্তৃত্ব কাড়িয়া লন।

যখন পরসীয়ানগণের নির্য্যাতনে শান্তপ্রকৃতি ষোড়শ লুইর পুরুষানুক্রমিক রাজসিংহাসন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াগেল, তখন কেহই মনে করে নাই, ফ্রান্স আবার জীবিত হইয়া পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার নামকে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিবে। কর্ণধারহীন তরণীর মত ফ্রান্স যখন অরাজক হইয়াছিল, তখন বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্সিকা হইতে একজন সামান্য যুবা ফ্রান্সকে রক্ষা করিতে আসিলেন। ফ্রান্স তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল। তিনি নেপোলিয়ন, যাঁহার শৌর্য্য, প্রতাপ ফ্রান্সকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যখন বিধাতার বিধিকে লঙ্ঘন করিয়া "অহং" এর বশীভূত হইলেন, আপনাকে জগতের মধ্যে একজন বলিয়া জ্ঞান করিলেন, তখন এক অপ্রতিহত মহাশক্তি আসিয়া নেপো-

লিয়নের সমস্ত কর্ত্তৃত্বের সহিত রাজসিংহাসন কাড়িয়া লইল।

অতএব যাঁহারা বিধাতার বিধাতৃত্বকে স্বীকার করেন, তাঁহার মঙ্গলময় বিধানকে স্বীকার করেন, তিনি অবশ্য ইহাও স্বীকার করিবেন যখন পৃথিবীর পক্ষে এবং যে দেশের পক্ষে যাহা প্রয়োজন বিধাতা তখন তাহা বিধান করিতেছেন। ইহার ভিতরে কোন ক্ষুদ্র শক্তি নিহিত নাই। যদি আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে এসব হইত তবে তুমি আমিও এক এক জন রাজা মহারাজ হইতে পারিতাম।

কেহ স্বীকার করুন আর না করুন, ইহা সত্য যে, ভারত যদি ইংরাজের অধীনে না থাকিত, তবে আজ ভারতমাতার সন্তান এই জাতীয় প্রেমের মহা আন্দোলনে মাতিতে পারিতেন না; আজ ভারতসন্তানগণ জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক লাভ করিয়া আপনাকে শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেন না। আমি বলি, ভারতের মঙ্গলের জন্য, ভারতের উন্নতির জন্য ইংরাজ এদেশে রাজা হইয়াছেন। যত দিন ভারতের জন্য ইংরাজ রাজার প্রয়োজন, তত দিন এদেশে ইংরাজ রাজা থাকিবেন। তত দিন আমরা এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের শ্রদ্ধা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, ইংরাজ রাজার উদ্দেশ্যে অর্পণ করিব।

কেহ কেহ বলিবেন, ইংরাজরাজ অন্যায় করিতেছেন, তাহাতে ভারতের ক্ষতি হইতেছে। অন্যায় যদি হইতেছে, দেশের ক্ষতি হইতেছে, সে বিচারও বিধাতার হাতে হইবে। সে জন্য আমাদের ভাবিতে হইবে না। রাজভক্তি-বিষয়ে আর বেশী কিছু বলিব না।

আমার দ্বিতীয় কথা স্বদেশপ্রেম। প্রত্যেক দেশের পক্ষে, সেই সেই দেশের লোকদিগের স্বদেশানুরাগ যে স্বাভাবিক ইহা বলা বাহুল্য। যে দেশের লোকদিগের স্বদেশানুরাগ যত কম, সে দেশ সেই পরিমাণে তত অবনত।

সেই জন্য, তিনি সৌভাগ্যবান্ যিনি দেশের মঙ্গলের জন্য জীবন দান করিয়াছেন। নিজের স্বার্থটুকু ত্যাগ না করিলে কেহ অপরকে প্রেম করিতে পারে না। স্বার্থত্যাগ করা সাধনসাপেক্ষ। এত স্বার্থপর আমরা, এত হিংসা, দ্বেষ আমাদের মধ্যে রহিয়াছে যে, যাঁহাদিগকে প্রাণের ভাই ভগিনী বলি অনেক সময় তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য কিছু করা দূরে থাক তাঁহাদের মঙ্গলে তাঁহাদের উন্নতিতে আমরা সুখ, আনন্দ পাই না। প্রেম মানব-হৃদয়ের একটী পবিত্র মহতী শক্তি। সেই শক্তির বিকাশ যদি আমরা সাধন দ্বারা করিতে পারি, কাহার সাধ্য তাহাতে বাধা দেয়? প্রেমময় পরম দেবতা যে শক্তির পরিচালক, পৃথিবীর কোন শক্তি, পৃথিবীর কোন রাজার হস্ত সে শক্তিকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না। আমরা দেশের সন্তানকে ভাই ভগিনী বলিয়া স্নেহ করিব, তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিব, ইহাতে কে বাধা দিতে পারে?

তাই আবার বলি রাজভক্তির সহিত স্বদেশপ্রেমের কোন সংস্রব নাই। দেশের উন্নতির জন্য, ভাই ভগিনীর মঙ্গলের জন্য,

সুখ সুবিধার জন্য আমরা যাহা করিব তাহাতে কেহ বাধা দিতে পারে না।

স্বদেশপ্রেমিকগণের অনেকে মনে করিতেছেন যে, রাজভক্তি করিতে হইলে স্বদেশপ্রেম থাকে না, স্বদেশপ্রেম করিতে হইলে রাজভক্তি হয় না। বিলাতী দ্রব্য ক্রয় না করিলে যে রাজভক্তি হবে না, ইহা কখনই নহে। আমরা যে বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার ছাড়া থাকিতে পারি না, ইহা আমাদেরই দোষ। আমরা দেশের মঙ্গলের জন্য দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিব, ইহাতে কেহ বাধা দিতে পারিবে না। রাজার যে সম্মান ভক্তি আমাদের নিকট হইতে পাইবার বিধিনির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা তিনি পাইবেন, দেশের ভাই ভগিনীর জন্য আমাদের যাহা দেয় বিধাতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা পাইবেন।

আমি অবশ্য এত দিন সাধারণের মত সমুদায় বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিতাম, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের দিন হইতে যে সকল স্বদেশী দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে, তাহা বিলাতী ক্রয় করি না, কিন্তু বিদেশী বলিয়া ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করি নাই, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত এই ভাবিয়াই করিয়াছি। ইহা ইংরাজ রাজার প্রতি কোনরূপ ঘৃণা বা বিদ্বেষ জন্য হয় নাই।

আর বেশী কিছু লিখিব না। আমার ভাব যা তাই সরল ভাবে ব্যক্ত করিলাম। ত্রুটি থাকিলে বুঝাইয়া দিবেন।

কটক। শ্রী রে—।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

স্বামীর সুখ শান্তি স্ত্রীর প্রতি অনেক নির্ভর করিয়া থাকে, স্ত্রী ইচ্ছা করিলে স্বামীকে পরম সুখে ও শান্তিতে রাখিতে পারেন। অনেক বিষয়ে স্ত্রীর কর্ত্তব্য আছে। কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিলে স্বামীকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করা হয়। কর্ত্তব্য পরায়ণা স্ত্রী থাকিলে স্বামীর কোন কষ্টই থাকিতে পারে না।

শৈশবে পিতা এবং মাতা যাহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন, পরে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবা মাত্র স্ত্রীর যাহা কর্ত্তব্য তাহা তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি? আমরা স্ত্রী জাতি আমাদের আবার কর্ত্তব্য কি? ইহা যেন হৃদয়ে কখনও স্থান না পায়। আমি স্ত্রী আমার উপর এক জন মনুষ্যের সকল সুখ শান্তি নির্ভর করিতেছে। মানুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকা উচিত। সে যাহা হউক স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি? স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী, স্ত্রী স্বামীর আনন্দদায়িনী, স্ত্রী স্বামীর একমাত্র সঙ্গিনী। যেমন অনেক দুশ্চরিত্র স্বামীকে স্ত্রী ইচ্ছা করিলেই চরিত্রবান্ করিতে পারে, তেমনি স্ত্রীর ব্যবহারে আবার স্বামীর চরিত্রও কলুষিত হইতে পারে। স্ত্রী কর্ত্তব্যপরায়ণা হইলে স্বামী কত সুখী হন। স্বামী যাহা চান স্ত্রী তৎসমুদায়ই দিতে সমর্থ হন। স্ত্রী স্বামীর সুখের জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিতা হইতে পারেন না। স্ত্রী স্বামীর আহারে মাতৃস্থানীয়া, সেবাতে আজ্ঞাবহ দাসী, রোগে

শুশ্রূষাকারিণী, সম্পদে বিপদে সাহায্যকারিণী, আরাম বিরামে আনন্দদায়িনী, ভক্তিতে স্ত্রীর নিকটে স্বামী দেবতা।

ঈশ্বরকে আমরা কখনও দেখি নাই, কেবল তাঁহার করুণারাশি দেখিতে পাই, স্ত্রীলোকের স্বামীই ঈশ্বরের প্রতিনিধি, প্রীতি এবং ভক্তিরূপ পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা স্বামীর সন্তোষবিধান করিতে পারিলে ঈশ্বর প্রসন্ন হন।

পাঁচদোনা। শ্রীমতী সু।

আক্ষেপ *।

বলিতে গেলে যে বুক ফেটে যায়,
দুই বছরের শিশু পিতৃহীন হায়।
সে সকল দিন চলিয়া গেছে
সে সুখের দিন ভাঙ্গিয়া গেছে।
এ যেন মনে হয় স্বপন ঘোর,
অবোধের মত রয়েছি বিভোর।
সে দিন কি আসিবে না আর,
সে সকল দিন করিলে স্মরণ
মানুষের মত থাকিনে যে আর।
আজি শুধু তাহার কথা পড়িছে মনে,
সে যখন পিতার সহিত খেলিত বাগানে
অতৃপ্ত নয়নে দেখিতাম তারে
সে দিন কি ফিরে আসিবেনা আর।
যখন সকল, ছোট শিশু বলে আমায়,
পিসীমা এ আমার পিতার জিনিষ।
হৃদয়ের ধন বকুল আমার,
ছল ছল নেত্রে চারি দিকে চায়।

* এই কবিতার স্থানে স্থানে সুসঙ্গতি হয় নাই। বালিকার প্রথম রচনা ভাবিয়া তাহার উৎসাহের জন্য প্রকাশ করা গেল।

তুমি মা হরি দয়ার সাগর
এই কি বিচার তোমার প্রভু।

গাজীপুর। শ্রীমতী মু—।

ভ্রমসংশোধন।

আমরা বিগত চৈত্র মাসে "হিন্দু বিবাহ ও ব্রাহ্মবিবাহ" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষভাগে লিখিয়াছিলাম, "গান্ধর্ব্বী দেবী পিতা হইতে ভগবদ্ভক্তি ও পরসেবা জীবনে লাভ করিয়াছিলেন। স্বামী শাক্ত ছিলেন, পত্নীর প্রভাবে তিনি ভক্তির ধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্ম আশ্রয় করেন"ইত্যাদি। পিতা শাক্ত ছিলেন এই কথায় আমাদের ভুল হইয়াছে বলিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হরিনাথ নিয়োগী মহাশয় পিংনা হইতে নিম্ন লিখিত কয়েক পঙ্ক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

"পিতৃদেব শাক্ত ছিলেন না, ইহারা বংশপরম্পরা বৈষ্ণব, শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশীয় গোস্বামিগণের শিষ্য। বৈষ্ণব না হইয়া শাক্ত হইলে বৈষ্ণধর্ম্মে পরমনিষ্ঠান্ ভক্তবর রামগোবিন্দ বসু মহাশয় কখনও তাঁহার স্নেহের কন্যা ভক্তিমতী দেবী গান্ধর্ব্বীকে ইহার সঙ্গে বিবাহ দিতেন না। বেড়াবাঁচনার নিয়োগী পরিবার যদিও বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী বটেন, কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণবাচারসম্পন্ন তাঁহাদের প্রায় কেহই ছিলেন না। প্রকৃত বৈষ্ণব বলিতে পূজার্চ্চনা, নামসঙ্কীর্ত্তন, এবং ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতপ্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও যথারীতি শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সেবা; এসব প্রায় কিছুই ছিল না। অনেক

বাটীতে দুর্গোৎসবাদি বলিদান পর্য্যন্ত হইত, বৈষ্ণব মতের বিরোধী শ্যামাপূজাও কোন কোন বাড়ীতে হইতে দেখা গিয়াছে। গান্ধর্বীর আগমনে আমাদের বাড়ীতে প্রকৃত বৈষ্ণবভাব প্রবেশ করে, এবং গান্ধর্ব্বীর ধর্ম্মজীবনের বিকাশসহকারে উক্ত গ্রামে অন্যান্য বাড়ীতেও অল্পাধিক প্রবেশ করে। প্রধানতঃ মাতৃদেবীর জীবনপ্রভাবে এবং তাঁহার আগ্রহাতিশয়ে পিতৃদেব নিত্যপূজা ও নামজপ নানা ধর্ম্মোৎসাহ পরোপকার অতিথিসেবা জলাশয়খনন ইত্যাদি সৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গান্ধর্বীর আগমনে যে নিয়োগী পরিবারস্থ জনগণের এক অভিনব জীবনপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া পুরাতন রীতি এবং আচার ব্যবহার অনেক উলট পালট করিয়া দিয়াছে, অপিচ অনেকের জীবনে প্রকৃত ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

সংবাদ।

ময়ূরভঞ্জের মহারাজ স্বীয় রাজধানী বারিপদ নগরে নিজের স্বর্গগতা সদ্‌গুণালঙ্কৃতা প্রিয়তমা কন্যা শ্রীপাদমঞ্জরী দেবীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাঁহার নামে একটি অনাথাশ্রমস্থাপনে সমুদ্যোগী হইয়াছেন।

কটক নগরস্থ দেশীয় খ্রীষ্টান কুলোদ্ভবা শ্রীমতী ইসাবিলা এম্ এ শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার পিতার অবস্থা স্বচ্ছল নহে, অনেকগুলি অল্পবয়স্ক ভ্রাতা ভগিনী। তিনি নিজের উপার্জ্জিত অর্থে পিতার সাহায্য এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীদিগকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করিবেন, এই উদ্দেশ্যে বিবাহ করার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইসাবিলার পিতৃস্বসাও ভ্রাতৃ পরিবারের সেবা ও সাহায্য করার উদ্দেশ্যে অবিবাহিতাবস্থায় আছেন। দেরাদুনগরস্থ খ্রীষ্টবাদী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বসু মহাশয়ের কয়েকটী কন্যা সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া উপার্জ্জনশীলা হইয়াছেন, তাঁহারা বিবাহিতা না হইয়া অসচ্ছল বৃদ্ধ পিতাকে এবং ব্রাহ্ম পিতৃব্যকে সপরিবারে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য প্রতিমাসে মুক্ত হস্তে অর্থদান করিয়া থাকেন। ভুবনবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বেথুন কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি পরিণত বয়সে পেন্‌সন্ গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। তথাপি পিতা ও পিতৃব্যকে সাহায্য দানে বিরত নহেন। এরূপ সেবার সুদৃষ্টান্ত কেবল খ্রীষ্টসমাজের মহিলাদিগের মধ্যেই দৃষ্ট হয়।

সম্প্রতি কটকনগরে শ্রীযুক্ত দেওয়ান জগন্নাথ রাওয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রেবাদেবী কর্ত্তৃক একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে ভদ্রসম্ভ্রান্ত পরিবারের ৩৫।৩৬টী বালিকা সুনিয়মে শিক্ষা পাইতেছে। দিন দিন ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। শিক্ষাদান এবং এই বিদ্যালয় পরিচালনার সমুদায় কার্য্যভার উক্ত দেবী স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে পুরুষের কোনরূপ যোগ নাই। তিনি নিজের পাকা বাড়ী ও নিজের গাড়ী এই বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। ছাত্রীদিগকে উড়ে, বাঙ্গাল ও

ইংরাজী ভাষা এবং গীতবাদ্য সিলাই শিক্ষা অপিচ গল্পচ্ছলে নীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইতিমধ্যে ময়ুরভঞ্জের মহারাজ এই বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং উৎকৃষ্ট মন্তব্য লিখিয়াছেন। রেবা দেবী বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য অসাধারণ যত্ন পরিশ্রম করিতেছেন, অর্থব্যয় করিতেও ত্রুটি করিতেছেন না। তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে অর্থসাহায্য গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে বিদ্যালয়ের কার্য্য চালাইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছু। তবে রাজা, মহারাজ ধনী বড়মানুষগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে সাহায্যদান ও সহানুভূতি করিলে, তিনি উৎসাহিত ও কৃতার্থ হইবেন। তাঁহার নিজের এমন অর্থ স্বচ্ছলতা নাই যে, তিনি নিজে বিদ্যালয়ের আবশ্যকীয় সমুদায় ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন। আপাততঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণা এমন একজন শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। তজ্জন্য রেবা দেবী মাসিক ২৫৲ বেতনদানে প্রস্তুত, বেতন ছাড়া তিনি শিক্ষয়িত্রীর আহার ও থাকিবার ব্যবস্থা নিজ হইতে করিয়া দিবেন। তাঁহার সঙ্গে একত্র বাস করিতে প্রস্তুত, ব্রাহ্ম সমাজের এমন কোন মহিলা এই পদের প্রার্থিনী হইলে আবেদন করিতে পারেন। শ্রীমতী রেবা রায় নূতন বালিকা বিদ্যালয়, কালীগলি, পোঃ চাঁদনি চক, কটক, এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

বাঙ্গালাদেশে পর্য্যুষিত অন্নের বা পান্তভাতের আদর নাই। ছোট লোকেরাই পান্তভাত খায়, বড় লোকেরা প্রায় তাহা খায় না। কিন্তু উড়িষ্যা দেশে প্রায় সকলেই এক বেলা পান্তভাত খায়। রাজা রাণী পর্য্যন্ত পান্তভাতের ভক্ত। সে দেশে পান্তভাতকে "পখালভাত" বলিয়া থাকে। পখালভাতের অর্থ প্রক্ষালিত অন্ন। বঙ্গের পান্তভাত আর উড়িষ্যার পখালভাত এই দুইয়ে অত্যন্ত প্রভেদ। বাঙ্গালা দেশে রাত্রিকালে ভাতে জল ঢালিয়া রাখিয়া দেয়, পর দিন উহাকেই পান্তভাত বলিয়া থাকে। শ্রমজীবী লোকেরাই যৎসামান্য উপকরণ দ্বারা বা কেবল লবণ, লঙ্কা বা পলাণ্ডু যোগে সেই পান্তভাত উদরপূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু উড়িষ্যার ভদ্র পরিবারে পখালভাত নানাপ্রকার মসলাযোগে অনেক প্রণালীতে প্রস্তুত হয়, তাহা সুখাদ্য হইয়া থাকে। আমরা স্বদেশে পান্তভাত কখনও খাই য়াছি স্মরণ হয় না। কিন্তু উড়িষ্যা প্রদেশে যাইয়া সে দেশের মহিলাগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত পখালভাত অনেক বার ভক্ষণ করিয়াছি। অপিচ উড়িষ্যাবাসিনী আমাদের কোন কোন স্নেহের কন্যা সে দেশে প্রচলিত অনেক প্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে খাওয়াইছেন। বাঙ্গালাদেশে সেরূপ ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আর এক মাসান্তে অর্থাৎ আগামী আষাঢ় মাসে মহিলার একাদশবর্ষ পূর্ণ হইবে। যে সকল গ্রাহক গ্রাহিকা এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান বর্ষের এবং পূর্ব্ব বৎসরের মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহাদের নিকটে সানুনয়ে নিবেদন যে অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিলম্বে তাহা পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করিবেন। অধিকাংশ গ্রাহকের নিকট হইতে বর্ত্তমান বৎসরের মূল্য পাওয়া যায় নাই।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও বাল্মীকি *।

আজ ওয়ার্ডওয়ার্থ ও বাল্মীকির বিষয় কিছু বলিব। সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের জীবনের কি সম্বন্ধ তাহা আমরা বুঝিতে পারি, এঁদের বিষয় আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিব। আমাদের দেখা উচিত মহাকবিদের কবিতা কেমন করে পড়লে আমাদের উপকার হয়। ইংলণ্ডের একজন চিত্রকর তাঁর নাম বার্ণস্‌জেম্‌স। তাঁর নাম আপনারা অনেকে শুনে থাকিতে পারেন। ইঁনি অনেক গুলি নারীচিত্র করেছেন। সে ছবি গুলি রিভিয়ু বলে বিলাতের এক খানা কাগজে বাহির হইয়াছিল। সেই কাগজের সম্পাদক সাহেব বলেন যে, ইংলণ্ডের আজ কালকার মেয়েদের আকার প্রকার প্রকৃতি স্বভাব সে রকমে গঠিত। সেই সব ছবি আঁকার পর থেকে যে সব মেয়েরা বিলাতে জন্মিতেছেন, তাঁহাদের চেহারা ভাব সব সেই আদর্শে গঠিত। লণ্ডনে গিয়ে সেখানকার মেয়েদের দেখলে স্বতঃই এই ভাব মনে আসবে। যে সব ভাব চরিত্র ছবিতে প্রকাশ পাইয়াছে এখন তাহা মেয়েদের মধ্যে প্রকাশ হচ্ছে। সে সব ছবি রক্তমাংসে পরিণত হয়ে কি রকম হয় তাই দেখাছেন যেমন সেই সব মেয়েদের দেখলে বোঝা যায় জেম্‌সের ছবি মেয়েদের মধ্যে কত প্রভাব বিস্তার করেছে; তেমনি বড় কবিদের কবিতা পড়লে সে সব ভাব শরীর মনের মধ্যে অবয়ব ধারণ করে। চিত্রকরেরা যেমন মনের উচ্চ ভাব সব ছবিতে প্রকাশ করেন তদ্রূপ কবিরা তাঁদের মনের উচ্চ ভাব সব কবিতায় প্রকাশ করেন। সে সব ভাব হয়ত তাঁরা পুরুষ ও স্ত্রীর প্রকৃতির মধ্যে যাহা দিখেছেন তাই প্রকাশ করেছেন। সে সব ভাব যখন ভাষায় নিবদ্ধ হয় তাহা দেশের সম্পত্তি হয়। আমাদেশের কবিদের কথা বলতে গেলে, বাল্মীকির কথা না বলা ভাল দেখায় না। সর্ব্বপ্রথমে তাঁর নাম করিতে হয়। এদেশের প্রাচীন কবিদের কথা বলিতে গেলে যেমন বাল্মাকির নাম প্রথমে করিতে হয়, তেমনি ইংলণ্ডের আধুনিক কবিদের কথা বলিতে গেলে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নাম আগে করিতে হয়। আপনারা জিজ্ঞাসা করিবেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে আর বাল্মীকিকে এক জায়গায় আনিবার উদ্দেশ্য কি? এই দুইটি কবির মধ্যে কি সাদৃশ্য ও মিল আছে যে, এদেঁর দুই জনকে একজায়গায় আনা হয়েছে? আমি এই টুকু বলিতে পারি উভয়েই খুব উচু দরের কবি। বাল্মাকি তাঁর মনের ভাব কাব্যে যে রকম প্রকাশ করেছেন, এখনকার ইংরাজ কবিদের মধ্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সেরকম করে প্রকাশ করেছেন। তবুও এঁদের দুজনকে

* ৭ই জুলাই সোমবার শ্রীযুক্ত প্রমথলাল সেনের বক্তৃতা মূলক।

একজায়গায় আনিবার উদ্দেশ্য কি? এক জন বিজ্ঞানবিদ্ সমালোচক ও গভীর চিন্তাশীল লোক বলেছেন, যে সব কবি নারী জাতির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত পাবনী শক্তি আছে তাহা বুঝে চিত্রিত করিতে পারেন, তাঁরাই হলেন উচ্চদরের কবি। সংসারে পরিবারের মধ্যে নারীর যে প্রভাব আছে, এটা তাঁরা বুঝেছিলেন। এ বিষয়টা যে তাঁরা তখনকার সংসারে দেখেছিলেন, শুধু তা নয়, কিন্তু অতীতের গল্পের মধ্যে দেখিয়াছিলেন। অনেকে আবার অতীতের চিত্রিত চরিত্রেই এই গুণ লক্ষ্য করে ছিলেন, তাঁরা সে সব ছবিতে ও পদ্যেতে বেশ করে প্রকাশ করেছেন। সে ছবিগুলি আদর্শ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অর্থাৎ সে গুণ স্ত্রী পুরুষ সাধারণ সকলের অনুকরণীয়, এই ভাবটা তাঁরা কবিতায় প্রকাশ করেছেন। বাল্মীকি যেমন দুএকটা চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, ওয়ার্ডওয়ার্থ অনেকগুলি ছোট ছোট চিত্র চিত্রিত করেছেন। আপনারা কেহ মূল রামায়ণ পড়েছেন কিনা জানি না। কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ পড়িলে যে ধরাণা হয় তাহা ঠিক নয়। অল্প সংস্কৃত জানা থাকলে মূল রামায়ণ পড়া ভাল, সহজেই বোঝা যায়। তাহা পড়িলে ধারণা বদলাইয়া যায়। যদি সম্ভব হয় সংস্কৃত খানা পড়াই ভাল, ইহার বাঙ্গালা অনুবাদও আছে। কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ সাধারণ লোকের মধ্যে কাজ করেছে, তারা সমস্ত দিন খেটে খুটে বাড়ীতে এসে একটু রামায়ণ পড়ে, তেমনি ভদ্রলোকের বাড়ীর মেয়েরা যে রামায়ণ মহাভারত ছাড়া আর কিছু বেশী পড়েন তাও নয়। আমার ইচ্ছা করে মূল রামায়ণ পড়া বা তার বাঙ্গালা অনুবাদ পড়া, তাহা হইলে রামায়ণের প্রতিভা প্রবেশ করিবার অধিকার হবে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব আমাদের প্রাচীন কবি কি রকম করে ভেবেছিলেন। যাঁরা সীতার চরিত্র ভাল করে জানেন তাঁরা বুঝবেন যে বাল্মীকি একজন উচ্চদরের কবি। যাঁরা ভাল করে রামায়ণের আস্বাদন পেয়েছেন, তাঁরাই একথা স্বীকার করিবেন। ইংরেজেরা অনেকে রামায়ণ মহাভারত পড়েছেন, ম্যাক্সমুলার তার মধ্যে একজন। এরাঁ কতটা এর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন জানি না, মনে হয় ততটা পারেন নাই। আর একজন ইংরেজ বলেছিলেন যে, বাঙ্গালীরা এর এত প্রশংসা করেন কেন? এর ভিতর এমন কি আছে যার জন্য তাঁরা একে খুব উঁচুদরের কাব্য বলেন? তাহা সীতার চরিত্র। আমি বলেছি যে নারী জাতির মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত পাবনী শক্তি আছে, যার জোরে শুধু যে তাঁরা নিজেরা ভাল থাকেন, ঠিক থাকেন, তা নয়; কিন্তু পুরুষদিগকেও ঠিক রাখেন, ভাল রাখেন। জগতের ইতিহাসের মধ্যে দেখা যায় তাঁরা জগতের অনেক উপকার করেছেন। যে সব কবি এই ভাবটা নিজেরা বুঝেন, তাহা প্রকাশ করিতে বা লোককে বোঝাতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের কবিতা পড়িলে বিশেষ উপকার হয়। এই রকম কবি বাল্মিকি এই রকম ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ। তিনি ১৭৭০ সালে জন্মেন ও ১৮৫০ সালে পরলোকগত হন। বাল্মীকি বিষয় কিছুই ঠিক করে জানা যায় না। ওয়ার্ডস্-

ওয়ার্থ ৮০ বছর বাঁচেন। ইহাঁর পরে অনেক বড় বড় কবি ও চিন্তাশীল লোক বিলাতে আসিয়াছেন, যেমন ব্রাওইণ টেনিস ইত্যাদি। ইহাদের কবিতা পড়িলে বুঝা যায় যে, তাঁরা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাছ থেকে সব ভাব পেয়েছেন। তেমনি আমাদের দেশের বড় বড় কবিরা বাল্মীকির কাছে ঋণী। অনেকে বলেন, যদি বাইবেল না থাকিত, তাহাতে যদি বড় বড় রাজার, বীরের, মহাত্মা জ্ঞানী লোকের কথা না থাকিত, তাহা যদি তাঁরা না পড়তেন তবে নিজেরা কখনও বড় হতে পারতেন না; যেমন আল্‌ফ্রেড রাজা, সেকস্‌পিয়ার কবি; যোদ্ধা ও রাজা এ সব ইউরোপে হইত না। এঁরা অনেক সময় এসব বিষয়ে বাইবেল থেকে অনেক উপকার পেয়েছেন, জ্ঞান পেয়েছেন। আমাদের দেশ তেমনি বাল্মীকির কাছে ঋণী। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কথাও তেমনি বলা যায়। যদিও তিনি আধুনিক লোক। তবু তার পরে বিলাতে যে সব বড় কবি হয়েছেন, তাঁদের ভিতর তাঁর প্রভাব বোঝা যায়। কালিদাস ও বাল্মীকি বীরনারীর মধ্যে কাজ করেছেন। যে সব চরিত্র তাঁরা অঙ্কিত করিয়াছেন তা'র প্রভাব আমরা অনেকটা অনুভব করি। সীতার চরিত্র প্রকাশের পর আমাদের দেশে সীতার আদর্শে কত স্ত্রী চরিত্র গঠিত হইয়াছে। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিতেছি যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের জীবনের কত সম্বন্ধ। একজন কবি লিখে চলে গেলেন, যিনি পড়লেন, তিনি উচ্চ ভাব পেয়ে তাহা সাধন করিতে আরম্ভ করিলেন। মেয়েদের মধ্যে স্বভাবতঃ তাহা প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। সীতার মত হওয়া মেয়েদের আদর্শ হয়েছে। ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের ছোট ছোট কবিতা পড়ে, মেয়েদের তেমনি স্বভাব হয়েছে, তিনি যেসব বীরনারীর ছবি চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা মেয়েদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এই যে সীতার চরিত্র যাহা এখন আমরা অনুবাদ হইতে পড়িলাম, সীতাকে হনুমান রাবণের অন্তঃপুরে লইয়া আসিলে পর, যখন রাম তাঁকে ত্যাগ করিতে চাহিলেন, বাস্তবিক সেখানে সীতার যে উচ্চ চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে তাহা পড়িলে অনেক উপকার হয়। সীতার কাছে হনুমান গিয়ে যখন তাঁকে শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসিল তখন যে রাম বলিলেন, আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি না, সে সময় সীতা নারীর কোমল ভাব ও তার সঙ্গে একটা অন্তর্নিহিত পাবনী শক্তি প্রকাশ করিলেন। তিনি যে উত্তর দিলেন, তাতে নিজের ভিতরকার বেশ ধর্ম্মভাবের পরিচয় দিলেন। ইহাতেই বোঝা যায় যে, বাল্মীকির নারীজাতির বিষয়ে কত উচ্চ ভাব। আর আমরা যে এখন বলি, এদেশের লোকেরা স্ত্রীজাতির সম্মান জানেন না, তাহাও দূরে যায়। নারীজাতিসম্বন্ধে রামেরও যে উচ্চ ভাব ছিল তাহা বোঝা যায়। বাল্মীকি এই চিত্র চিত্রিত করিয়া দেশের কত উপকার করিলেন, এই আদর্শে কত চিত্র চিত্রিত হল। দেখতে পাই যে, জীবনের কত উপকার হয়, উচ্চ ভাব আস্তে আস্তে প্রবেশ করে, জীবন ক্রমে ক্রমে ভাল হয়। এখনকার মধ্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ

তেমনি করেছেন। মানবপ্রকৃতির মধ্যে যে সব উচ্চ ভাব আছে, তিনি একথা সাহস করে বলিয়াছেন। তাঁর কবিতার মধ্য হইতে ভাল ভাল কবিতা জড় করে বড় বই হইয়াছে। অনেকে অনেক রকম পছন্দ করিল কারণ সকলের নির্ব্বাচন সমান নয়। কবিতা পড়াসম্বন্ধে লঘুভাব রাখা উচিত নয়, বসে আছি কোন কাজ নাই, আলস্য বোধ হচ্ছে তখন একটু পদ্য পড়িলাম। যখন খুব ব্যাকুল গম্ভীর হই তখন কবিতার দরকার হয় না। এই জন্য আমাদের কবিতা পড়ে উপকার হয় না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যে সব চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা তাঁহার চারি দিকে যে সব ভাল লোক দেখেছেন তাহা দেখিয়া ; সেকস্‌পিয়ার ও গেট এই দুজন কবির ভিতর ও এরকম দেখা যায়। তাঁরা তাঁদের সমসাময়িক লোকের মধ্যে যে সব উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা দেখেছেন, চিত্রের মধ্যে এই দেখান যে, তাহার উৎকৃষ্ট সাধন করিলে কিরূপ সুন্দর হয়। প্রাচীন কালের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া প্রায় তাঁরা লেখেন নাই, সেকস্‌পিয়ার ইতিহাসের ঘটনা লইয়া লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু গেট, তিনি যে সব লোকের সঙ্গে আলাপ করিতেন, তাদের মধ্য হইতে সব চরিত্র বাহির করিয়া লইতেন। একবার কাহারও সঙ্গে আলাপ হইলে তখনই বুঝিয়া লইতে পারিতেন, তার ভিতর কি গুণ আছে। একথা সমালোচকেরাও বলেন, আমারও মনে হয়। আমরা এই এত বড় হয়েছি আমাদের মধ্যে কার কি গুণ আছে দেখা দরকার। আমরা যে এখানে, এই পৃথিবীতেই উচ্চ হতে পারি, তা আমাদের মনে হয় না। কিন্তু তা না হইলে সকলই কল্পনা হয়। যাদের সঙ্গে আছি, যাদের সঙ্গে আলাপ আছে, তাদের মধ্যে যে গুণ যে দেবদত্ত জিনিষ আছে তা দেখিতে হইবে, কবিরা লোক দেখেই অমনি তার গুণটা বাহির করেন, আর তাহা কবিতায় প্রকাশ করেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নারীজাতির মধ্যে সেই পাবনী শক্তি আছে তা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে উচ্চ ভাব মেয়েদের আছে বলে সংসারে পরিবারে ধর্ম্মভাব থাকিতে পারে। লোকে এই ভাব যত বুঝিতে পারে, জানে, তত উপকার হয়। ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থের একটী পদ্য এখানে * * * উক্ত হইল, এর মধ্যে কত কথা আছে, একটী মেয়ের কথা বলছেন যে, এঁর মুখ দেখিয়া কত ভাল কাজ করেছেন, কত করবেন, বোঝা যায়। আদর্শনারীর কাজ কি, ইনি সতর্ক করে দেন, শাস্তি দেন, ধর্ম্মভাব আছে যাহাদের তাহাদের সকলকে চালাতে পারেন, সকলকে হুকুম করিতে পারেন। মানুষের অদৃশ্য আত্মা আছে। সেই আত্মা রক্ত মাংসের শরীরে আসিয়াছে। আর একটী পদ্য মেয়ে দেখে লিখেছেন, মেয়েটী ১৪ বছরের, তাকে দেখে বলেছেন সে কি হতে পারে। ইত্যাদি হাইল্যাণ্ড জায়গাটা সহর নয়, বেশ নির্জ্জন জায়গা। স্কটলেণ্ডের মধ্যে এখানকার লোকদের স্বভাব আলাদা, একটা বিশেষত্ব আছে। * লিখিছেন যে, প্রকৃতির সঙ্গে মেয়েটীর সঙ্গে এত মিশে গেছে, যেন আমার কাছে স্বর্গপুরের

মত মনে হচ্ছে। ইহার মধ্যে সহজভাব ও নির্দ্দোষ স্বভাব দুটী মিলিয়া একটী রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছে, দুটী ভাব কেমন সুন্দর পরিপক্কতালাভ করিয়াছে। যখন আমি চলে যাব, এই হ্রদ জল গাছ পালার সঙ্গে একটী অমরাত্মা মিশে আছে মনে করব। এই ভাবটা মেয়েরা পড়লে, তাঁদের মনে ইহা স্থায়ী হইয়া যাইবে, কারণ তাঁহারা ইহা নিজেরাও দেখিয়াছে। সে বিষয় এইরূপে ক্রমে তাঁদের চরিত্রে প্রবেশ করে। কবিরা আমাদের উচ্চ চরিত্র গঠন করিতে সহায়তা করেন, এজন্য তাঁরা আমাদের উপকারী বন্ধু। কারণ তাঁরা যে সব ভাব কবিতায় রেখেছেন, তাতে এখন চরিত্র গঠন হচ্ছে। বাল্মীকিও এই রকম উপায়ে করে গেছেন। ইহা দেখিলে জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সঙ্গে কত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে তাহা বোঝা যায়। অনেকে আবার ছাই চরিত্র আঁকেন সেইদিকেই তাঁদের একটা কেমন প্রবৃত্তি।

কিন্তু বড় বড় কবিরা যেমন দেখাইতেছেন ধর্ম্ম নীতি ছাড়লে কত বিপদ হয়, তাঁরা বিপদে পড়ে নিজেদের কেমন ঠিক রাখেন এসব চরিত্র তাঁরা বানিয়ে লেখেন নাই, কিন্তু এরূপ তাঁরা দেখিয়াছেন ও পড়িয়াছেন। সাধারণ লোকের মধ্যে এরকম লোক লুকিয়ে আছে আমরা বুঝিতে পারি না। কবিতা পড়বার জন্য সরল অনুরাগ থাকা দরকার। যেমন যদি কেহ একটা ফুলের ছবি আঁকে তার পূর্ব্বে হইতে ফুলের প্রতি অনুরাগ ছিল। কবিরা তেমনি পুরুষের ও স্ত্রীর চরিত্র দেখিয়া তাহা তুলিকা দিয়া না আঁকিয়া কথা দ্বারা আঁকিলেন। কোন ভাল জিনিষ দেখলে স্বভাবতঃ তাঁদের মনে মুদ্রিত হয়ে থাকে, সেটা প্রকাশ না করে তাঁরা থাকতে পারেন না। চিত্রকর যেমন একটা কোন সুন্দর জিনিষ দেখিলে তাহা না আঁকিয়া থাকিতে পারেন না কবিরা যা বলে যান তাহা অমূল্য জিনিষ। তাঁরা সত্য কথা সরল ভাবে বলে যান, তা একটা সম্পত্তি হয়ে থাকে। তা অবসর সময়ে পড়বার নয়। তাহা আমাদের উপকারের জন্য দিয়া গিয়াছেন। মনোযোগের সহিত ভাল করে পড়লে অনেক উপকার হয়। কেহ কেহ বলেন, আমার জীবন অমুকের প্রবন্ধ পড়ে বদলাইয়া গিয়াছে। কিম্বা বাইবেল পড়ে আমার এই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যেমন লেখা দেখে লেখা করে, তেমনি, এক এক জনের চরিত্র এক এক জনের আদর্শে গঠিত। তাঁরা দেশের ভাল ভাল কবির উচু চরিত্র পড়েন, তার পর ভালবাসেন, ক্রমে সেইরূপে হয়ে যান। এই রকমে ইহা কত উপকার করে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

	৯বম বৎসর।	
শ্রীমতী রায়,	কাশীপুর	২৲
শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন,	যশোহর	২৲
	১০ম বৎসর।	
শ্রীমতী রায়,	কাশীপুর	২৲
„ নীরদাসুন্দরী দত্ত,	কুমিল্লা	২৲
„ নির্ম্মলা সুন্দরী বসু,	কলিকাতা	২৲
„ কিরণ বালা সেন,	ঢাকা	১৲
„ প্রিয়বালা রায়,	খিরোওয়া	২৲
„ মনোরমা মজুমদার,	দিনাজপুর	২৲
„ তরঙ্গিণী,	কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রাও,	বোধ	২৲
„ বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন,	যশোহর	২৲
„ রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর,	কুচবেহার	২৲
„ প্রসন্নকুমার চৌধুরী,	কিশোরগঞ্জ	২৲
	১১ শবৎসর।	
শ্রীমতী রায়,	কাশীপুর	২৲
শ্রীমতী লক্ষ্মীমনি সেন,	ভাগলপুর	২৲
„ সরোজিনী দেবী,	বাঁকা	২৲
„ সুরমা দত্ত,	কলিকাতা	২৲
„ কিরণ বালা সেন	ঢাকা	১৲
„ বিনোদমণি গুপ্ত,	দার্জ্জিলিং	২৲
শ্রীযুক্ত কালীমোহন মুখোপাধ্যায়,	লক্ষ্ণৌ	২৲
" ভুবন মোহন রায়,	"	২৲
"খগেশ্বর দাস,	বালিমান	১৲
রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরি,	কাকিনা	২৲
" আবুদুল মজিদ সাহেব,	ঢাকা	২৲
" মহীন্দ্র চন্দ্র সেন,	তিব্রগড়	২৲
	১২ শবৎসর	
শ্রীযুক্ত খগেশ্বর দাস,	বালিমান	১৲

মহিলার নিয়মাবলী।

মহিলা পত্রিকা প্রতিমাসে সংক্রান্তি দিবসে প্রকাশিত হয়। ডাকমাশুলসহ ইহার বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ মহিলার মূল্য ও অর্থসম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকটে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক প্রকাশিত হইবে। কাহারও প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া যাইবে না।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"

২১শ ভাগ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩ ; জুন, ১৯০৬। [১১শ সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

রাজ্যশাসন, দুষ্টদমন এবং প্রজাদের স্বত্বাদিরক্ষার জন্য রাজ্যে আদালত ফৌজদারীর বিচারক নিযুক্ত। প্রত্যেক গৃহস্থের পরিবার এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য;সেই রাজ্যে সাধারণতঃ অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণ উচ্ছৃঙ্খলপ্রজা,একা গৃহিণী জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট; তাঁহাকে আদালত ও ফৌজদারীসংক্রান্ত উভয় বিচারকের কার্য্য করিতে হয়। ননী আসিয়া নালিশ করিল, "মা, বড় খোকা আমার জায়গায় বসিয়াছে, সে আমাকে বসিতে দেয় না, তাহাকে তুমি সেখান হইতে উঠাইয়া দাও।" কমল আসিয়া কাঁদিয়া বলিল, "মেঝো খোকা আমার পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, এবং আমাকে চড় মারিয়াছে ও চিমটি কাটিয়াছে।" এইরূপ প্রত্যহ নানা প্রকার নালিশ মায়ের নিকটে উপস্থিত হয়। গৃহিণী সমুদায় আবেদন প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া উকিল মোক্তারের সাহায্যব্যতীত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে বাধ্য হন। তাহা না হইলে গৃহরূপ রাজ্যে কিছুতেই শান্তিরক্ষা পায় না। গৃহকর্ত্রীর উচিত যে, সকল বিষয় জানিয়া শুনিয়া শান্তভাবে বিচার করেন, ক্রোধ বিদ্বেষের অধীন হইলে রাজ্যের জজ ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা যেমন সুবিচার হয় না, তদ্রূপ গৃহকর্ত্রী দ্বারাও হয় না।

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রজাকে সামান্য চুরী ইত্যাদি লঘু পাপে শারীরিক দণ্ড বেত্রাঘাত করিয়া থাকেন। কিন্তু বালক বালিকার কোন অপরাধের জন্য তাহাদের সুকোমল দেহে কোন রূপ আঘাত করা গৃহকর্ত্রীর পক্ষে সমুচিত নয় তাহাতে অপরাধী বালক বালিকার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হয়, পরে তাহারা সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া থাকে।

মায়ের শাসন প্রেমের শাসন হইবে, তাহা অপরাধী সন্তানের মঙ্গলের জন্য হইবে। তিনি তাহার অপরাধ তাহাকে বুঝাইয়া শান্তভাবে শাসন করিবেন, শারীরিক দণ্ড ব্যতীত আবশ্যক মতে অন্য কঠিন দণ্ড বিধান করিতে পারেন। শিশু বালক বালিকাদিগকে প্রহার না করিয়া মাতা নীতির সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন।

হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় রমণীদের ব্রহ্মচর্য্য এবং পরসেবা।

হিন্দুসমাজে বিধবাকে নিয়মিতরূপে আজীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে হয়। বালিকা বিধবাও অনিচ্ছাসত্বে সামাজিক শাসনে বাধ্য হইয়া প্রত্যহ একাহার হবিষ্যান্ন ভোজন করে, একাদশীপ্রভৃতি তিথিবিশেষে দিবারাত্রি অনশন থাকে, সাদা কাপড় পরে, আভরণাদি পরিধান, কোন রূপ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিলাস দ্রব্য ব্যবহার করে না। সেই বালিকা সর্ব্বদা দুঃখিনীর বেশে থাকিত বাধ্য হয়। ব্রহ্মচর্য্যপালনে বয়ঃস্থা বিধবাদের সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। ইচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্মানুরোধে যে সকল পতিপ্রাণা বিধবা দুঃখব্রতগ্রহণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন করেন তাহাতে তাঁহাদের পুণ্যবৃদ্ধি হয়, কল্যাণ হইয়া থাকে। কিন্তু বলপ্রয়োগে বালিকা বিধবাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের অধীন করিয়া রাখা কোনরূপে সঙ্গত নয়। এবিষয়ে বাধ্যবাধকতায় তাহাদের কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণই হইয়া থাকে। যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যে স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়, দেহ রোগের আধার ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহা কাহারও পক্ষে অবলম্বন বিধাতার বিধি নয়। হিন্দুসমাজে সধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যাদির নিয়মপালনে বিশেষ কোন বিধি দেখা যায় না। তাঁহারা ও পুরুষমাত্রই ব্রহ্মচর্য্যাদি কোন নিয়মের অধীন নহেন। সাধারণতঃ তাঁহারা পূর্ণমাত্রায় বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিয়া থাকেন। বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হইলেও অনেক পুরুষ একটী বালিকাকে বিবাহ করিয়া সাংসারিক সুখের নূতন আয়োজন করেন। এক দিকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও তৎপালনে শাস্ত্রীয় বিধি ও সামাজিক কঠিন শাসন, অপর দিকে চূড়ান্ত অসংযত ভাব ও বিলাসিতা, ঠিক বিপরীত। ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য আত্মসংযম, দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতাসাধন; ইহা কেবল বিধবার জন্যই প্রয়োজন, সধবার জন্য বা পুরুষের জন্য তাহার কোনরূপ উপযোগিতা নাই, এরূপ বলা যায় না। অবস্থাভেদে তাহার তারতম্য হইতে পারে মাত্র। কাহারও পক্ষে অস্বাভাবিক ব্রহ্মচর্য্য কল্যাণজনক নহে। আন্তরিক উত্তেজনায় ও আধ্যাত্মিক আবেগে যাঁহারা বিশেষ ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহাদেরই কল্যাণ হয়, বলপ্রয়োগে কাহাকে সেই ব্রতপালনে বাধ্য করিলে উভয় পক্ষের অকল্যাণ।

ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী হিন্দুবিধবাগণ সুযোগ পাইলেই তীর্থপর্য্যটন করেন, এবং পরসেবায় নিযুক্ত হন। প্রাচীন হিন্দুবিধবাদের প্রধান সেবাব্রত আতিথ্যসৎকার এবং আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিবেশীদিগের রোগ শোক বিপদাদিতে সেবা পরিচর্য্যা করা। ভোগানুরক্তা সধবাদিগের দ্বারা অন্যের সেবা পরিচার্য্য প্রায় হইয়া উঠে না। তাঁহারা নিজের স্বামী ও পুত্রকন্যাদির সেবা করেন। তাঁহাদের সেবাকার্য্য সচরাচর সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে সম্বদ্ধ থাকে, প্রায়ই স্বার্থকে অতিক্রম করে না।

খ্রীষ্টবাদী ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এক শ্রেণীর রমণী উচ্চ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন করেন। তাঁহাদিগের ব্রহ্মচর্য্য হিন্দু

বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য্যের অনুরূপ নহে। হিন্দু সমাজের নারীগণ বিধবা হইলে চিরজীবন উক্ত ব্রত পালন করেন, কিন্তু খ্রীষ্টবাদী রমণীগণ বিবাহিতা না হইয়া কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক সেই পবিত্র ব্রতপালনে জীবন যাপন করিয়া থাকেন। তাঁহারা হবিষ্যান্ন গ্রহণ বা নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকেন, তাহা বলা যায় না। তবে তাঁহারা মিতাহার এবং সকল বিষয়ে মিতাচার রক্ষা করিয়া চলেন, বিলাসবাসনা পরিত্যাগ করেন, আত্মসুখ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পরসেবায় প্রাণপণ যত্ন করিয়া থাকেন। বিবিধ ব্রত নিয়ম উপবাসাদি তাঁহাদের জীবনে পুনঃ পুনঃ প্রতিপালিত হয়। তাঁহারা কোন প্রকার সামাজিক নিয়মে বাধ্য হইয়া নয়, ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করেন। সেই সকল ব্রতধারিণী নারী আধ্যাত্মিক ভাবে ঈশাকে স্বামিরূপে বরণ করিয়া, অন্য কাহাকে আর বিবাহ করিবেন না, এরূপ প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় বদ্ধ হন, পুণ্যাত্মা ঈশার ভাবে জীবন যাপন করিতে থাকেন। ঈশা স্বীয় জীবনে প্রেম ও পরসেবার উজ্জল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সকল পুণ্যবতী ব্রতধারিণী নারীও দুঃখী জনকে ভাল বাসিতে, প্রাণপণ যত্নে সেবা করিয়া তাহাদের দুঃখ মোচন করিতে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেবার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে বদ্ধ নয়, বহু প্রশস্ত। তাঁহারা কোন বাধা বিঘ্ন না মানিয়া দেশ-দেশান্তরে যাইয়া এমন কি ভয়ানক সমর ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া সঙ্কটাপন্ন রোগী ও অস্ত্রাহত বিপন্ন লোকদিগের সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। পাঠিকাগণ সাধ্বী কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, কুমারী কাথ রাইণ এবং কুমারী ক্লেয়ারের অসাধারণ ব্রহ্মচর্য্য ও পরসেবার বৃত্তান্ত মহিলায় ইতি-পূর্ব্বে পাঠ করিয়া থাকিবেন। হিন্দু মহিলাদিগের ন্যায় গৃহাগত দুই এক জন অতিথির আতিথ্যসৎকার এবং ২। ১ জন দুঃখী আত্মীয় প্রতিবেশীর সেবা পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে চরিতার্থ করিতে পারেন নাই। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের এই সকল ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী সেবাপ্রিয়া রমণী-দিগকে "নন্" বলিয়া থাকে। কেবল ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মহিলাদিগের মধ্যে যে এরূপ উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বহু রমণীও তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী হইয়া জীবনে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় বিধবা রমণীগণ হিন্দু বিধবাদিগের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন না। তাঁহারা পুনর্ব্বার বিবাহিতা না হইলে কতক বিষয়ে সংযত ও মিতাচারিণী হইয়া চলেন। স্বর্গগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া দেবী স্বামিবিয়োগের পর ব্রহ্মচর্য্যের ভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যে নিরামিষ ভোজী হইয়াছিলেন এরূপ নহে। রাজ্ঞী বিধবা হওয়ার পর অনেক সুখসম্ভোগ ও আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বেশ ভূষা পরিচ্ছদাদিতে মিতাচারিণী হইয়াছিলেন। সধবা থাকিয়াও অনেক ইয়ুরোপীয় মহিলা জীবনে সেই উচ্চ ব্রত পালন করেন। আমাদের সম্মুখে বিবী লী দৃষ্টান্তস্বরূপ আছেন। তিনি স্বামী সঙ্গে

বাস করিতেছেন, পার্থিব সুখ বিলাস বিসর্জ্জনপূর্ব্বক দুই তিন শত অনাথ বালক বালিকার প্রতিপালন ও সেবা পরিচর্য্যায় আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ অনেক বার তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, এবং তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের অনেক কন্যার বিবাহ হওয়া দুষ্কর হইয়াছে, তাঁহারা সাংসারিক সুখ বিলাসের পথ পরিত্যাগ করিয়া কৌমার্য্য ব্রত যথাবিধি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ও পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিলে তাঁহাদের ও জগতের বিশেষ কল্যাণ হইতে পারে।

উড়িষ্যার কতকগুলি পারিবারিক প্রথা।

মহান্তি, করণ এবং খণ্ডায়েতশ্রেণীর বড় লোকদিগের কন্যা বয়ঃস্থা হইলে প্রথম দিন হইতে সাত দিনপর্য্যন্ত প্রতিদিন সেই কন্যা তিন খানা করিয়া নূতন বস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; প্রথম দিন চেলির কাপড় লাভ করেন। কন্যা বয়ঃস্থা হইলে পর তাহার জন্য পাত্র অন্বেষণ করা হয়। অনেকের সতের আঠার বৎসর বয়সে বা তদধিক বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে। রাজ-পরিবারে বা উপরি উক্ত ভদ্র পরিবারে সচরাচর বাল্যকালে কন্যার বিবাহ হয় না।

উড়িষ্যার ভদ্র পরিবারের যে সকল কন্যার বাল্য কালে বিবাহ হয়, তাহাদের সেই বিবাহ বাগদানস্বরূপ হইয়া থাকে। বয়ঃস্থা হওয়া পর্য্যন্ত কন্যা পিত্রালয়ে বাস করে, স্বামিগৃহে যাওয়ার নিয়ম নাই। বয়ঃপ্রাপ্তির পর পাত্রী পতিগৃহে গমন করে। তখন বিবাহের পূর্ণতাস্বরূপ বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। তাহাকে পূর্ণ বিবাহ বলে। তদবধি পাত্রী পতিগৃহে বাস করে। এ পর্য্যন্ত কন্যা পিত্রালয়ে থাকিয়া বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহোপলক্ষে পতিগৃহ হইতে নানা প্রকার উপহার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পূর্ণ বিবাহ হইয়া গেলে কন্যার পিতা মাতা জামাতৃভবনে তত্ত্ব প্রেরণ করেন। পাত্রীর শ্বশুরালয়ে রীতিমত বাদ্যোদ্যম সংকারে পূর্ণ বিবাহ হয়। তখন কন্যার পিত্রালয় হইতে নানা প্রকার উদ্বাহযৌতুক চাউল ডাল তরকারি লবণ তৈল মসলা এমন কি খড়কে পর্য্যন্ত প্রেরিত হইয়া থাকে; বর কন্যার জন্য বস্ত্রালঙ্কার ও তৈজসদ্রব্যাদি এবং পাত্রীর শ্বশুরকুলের আত্মীয় স্বগণের জন্য বস্ত্রাদি প্রেরিত হয়। উদ্বাহবেদী স্থাপিত হইয়া থাকে। রীতিপূর্ব্বক হোম-ক্রিয়া ও মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া পুরোহিত পূর্ণ উদ্বাহানুষ্ঠান সম্পাদন করেন। সে দিন আত্মীয় কুটুম্বগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া প্রীতিভোজন ও আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকেন।

বঙ্গদেশের হিন্দু বালিকাদিগের বিবাহ-প্রণালী অপেক্ষা উড়িষ্যা দেশের এই বিবাহ পদ্ধতি যে উৎকৃষ্ট তাহা বলা বাহুল্য। এ দেশে আট দশ বৎসর বয়সের একটী বালিকা বিবাহ হইলেই পতি গৃহে যাইয়া পতির সঙ্গে একত্র বাস করিতে বাধ্য হয়। অতি জঘন্য প্রথা। উড়িষ্যাদেশের ভদ্রপরিবারের

কন্যা বাল্যকালে বিবাহ হইলেও বয়ঃস্থা হইয়া তাহার পূর্ণ বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত পতিগৃহে বাস করিতে পারে না।

বিবাহের পূর্ব্বে বাগ্‌দান হইয়া থাকে, তাহাকে "প্রসাদ" বলে। কন্যার পিতা অথব অন্য ঘনিষ্ঠ অভিভাবক কয়েক জন আত্মীয় কুটুম্বকে সমবেত করিয়া তাঁহাদের সাক্ষাতে এরূপ বলেন, "আমি জগন্নাথের প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, এই কন্যাকে অমুকের হস্তে সম্পর্ণ করিব।" এই বাগ্‌দান ক্রিয়া হইয়া গেলে কোন কারণে তাহার অন্যথা হইতে পারে না।

পূর্ণ বিবাহ সম্পাদিত হইয়া গেলে পর প্রতিবৎসর চারি পূর্ণিমাতে অর্থাৎ ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে, বৈশাখী পূর্ণিমায় ও আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতে সম্ভবতঃ মাঘী পূর্ণিমায় জামাতাকে শ্বশুর নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ভোজন করাইয়া থাকেন। পূর্ণ বিবাহের পর কন্যার পিত্রালয় হইতে জামাতৃগৃহে নানা প্রকার তত্ত্ব প্রেরিত হইয়া থাকে, তৎপূর্ব্বে নয়। বাগ্‌দান হওয়ার পর সময়ে সময়ে পাত্রপক্ষ হইতে পাত্রীর পিত্রালয়ে নববস্ত্র ও মিষ্টান্নাদি সামগ্রী প্রেরিত হয়। উড়িষ্যার রাজপরিবারে যে সকল কন্যার বিবাহ হয়, তাঁহারা চির-জীবন পতিগৃহে বাস করেন, পিত্রালয়ে ফিরিয়া যাইতে পারেন না। জন্ম গ্রহণের অব্যবহিত পর শিশুর জন্ম পত্রিকা হয়; তখন একবার নামকরণ হয়। সেই নাম ডাক নামস্বরূপ হইয়া থাকে। পরে যথা সময়ে রীতিপূর্ব্বক নামকরণ হয়।

মহান্তিপ্রভৃতি ভদ্র পরিবারে বালক বালিকার চূড়াকরণ অর্থাৎ কর্ণবেধানুষ্ঠান মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। চূড়াকরণকে উৎকলভাষায় 'নাউড়ি' বলে। এই অনুষ্ঠানোপলক্ষে কয়েক দিন আমোদ প্রমোদ ভোজাদি হইয়া থাকে। উড়িষ্যার মহান্তি জাতি বঙ্গদেশের কায়স্থ জাতির অনুরূপ। খণ্ডায়েত জাতি উড়িষ্যার পূর্ব্বতন রাজাদিগের খড়্গধারী সৈনিক পুরুষ ছিলেন।

উড়িষ্যার ভদ্রকুলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ বধূকে দেবর মাতৃতুল্য ভক্তি ও সম্মান করে। জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ সমবয়স্কা বা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও দেবরের নমস্যা। পূর্ব্ববঙ্গেও এই রূপ নিয়ম। দেবর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে "বধূঠাকুরাণী" বলিয়া সম্বোধন করে, এবং তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ দেবর হইতে "বৌ দিদি" সম্বোধন এবং তুল্য ব্যবহার প্রাপ্ত হন।

জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মৃত্যু হইলে উক্ত ভগিনীর স্বামীকে কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ করা এদেশে প্রচলিত আছে, উৎকলেও এই কুপ্রথা প্রচলিত। উৎকলে গোওয়ালা জাতিতে এবং অন্য কোন কোন নিম্ন শ্রেণীতে জেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রীকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিয়া থাকে। "উৎকলে দেবরঃ পতিঃ" প্রসিদ্ধ বাক্য। উড়িষ্যার গড়জাত অঞ্চলে এইরূপ বিবাহ বিশেষ প্রচলিত।

বিবাহক্রিয়াদি উপলক্ষে কেহ বর বা কন্যাকে যৌতুক দান করিলে, তদপেক্ষা অধিক মূল্যের সামগ্রী প্রতিদান্ করা বর কন্যার পক্ষে নিয়ম।

বঙ্গদেশে ভগিনীপতি পত্নীর কনিষ্ঠা ভগিনী ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে শ্যালী বলিয়া তুল্যরূপে উপহাস বিদ্রূপ করিয়া থাকে, উৎকলে সেরূপ করা হয় না। পত্নীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অতিশয় সম্মান। তিনি ভগিনীপতির নিকটে শ্বশ্রূমাতা অপেক্ষা সমধিক সম্মানভাজন। তাঁহাকে "দেড় শাশুড়ী" বলে। অর্থাৎ তিনি দেড়া শাশুড়ী। দেড় শাশুড়ীকে দেখিয়া ভগিনীপতির মস্তক অবনত করিতে হয় তাঁহার সঙ্গে শ্রদ্ধা ও সম্মান সহকারে কথা কহিতে হয়। তিনি দেড় শাশুড়ীর অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ শ্যালীর সঙ্গে কোন রূপ উপহাস বিদ্রূপ ও বাচালতা করিতে পারেন না। তাহা করিলে অতিশয় নিন্দা হয়। দেড় শাশুড়ী ভগিনীপতি নিকটস্থ হইলে শাশুড়ীর ন্যায় সঙ্কুচিত ভাবে কিছু দূরে থাকেন।

সধবা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, তিনি অতি ভাগ্যবতী বলিয়া তাঁহার শব জ্ঞাতি কুটুম্বগণ শঙ্খধ্বনি ও ঢোল সানাই বাদ্য সহকারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য শ্মশানে লইয়া যান। শব অলঙ্কৃত ও নববস্ত্রে আচ্ছাদিত এবং তাহার ললাটে সিন্দূর রঞ্জিত হয়। স্বামী লাজবিসর্জ্জন করত বাদ্যিত শবের অগ্রে২ গমন করেন। সম্প্রতি আমরা কটক নগরের যে বাড়ীতে বাস করিয়াছিলাম, এক দিন সেই বাড়ীর সম্মুখভাগ দিয়া একটি সধবার শব বাহিত হইয়াছিল। গৃহকর্ত্রী বাদ্যধ্বনি শুনিয়াই আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "এই দেখুন একটি সধবার শব দাহ করিবার জন্য তাহার স্বামী ও স্বামীর বন্ধুগণ মহাঘটা করিয়া শ্মশানক্ষেত্রে লইয়া যাইতেছে। এদিকে স্ত্রীর শবের প্রতি স্বামীর এত সম্মান ও সমাদর। কিন্তু উড়িষ্যাতে স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রী যত পরিত্যক্ত হয়, বোধ করি এরূপ অন্য কোন দেশে নয়। আমরা যে গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম, স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা দুইটী যুবতী নারী অনন্যোপায় হইয়া সেই ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে, একটী ভদ্র স্ত্রীলোক, একটী নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রী। গৃহকর্ত্রী তাহাদিগকে আশ্রয়দানে প্রতিপালন করিতেছেন, এবং তাহাদের জন্য বিশেষ বিশেষ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। অপর একজন ব্রাহ্মণ জাতীয়া বয়ঃস্থা মহিলা দুশ্চরিত্র স্বামীর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া উক্ত গৃহিণীর আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন।

পাঠিকে, তুমি কোন্ রাজ্যে বাস করিবে ?

উড়িষ্যার এক রাজা এক জন প্রজাকে হুকুম করিয়াছিলেন, তুই অঞ্জলি বাঁধিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়া দেখি প্রজা তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালন করিল। রাজা তাহার উভয় করতলে কতক গুলি কার্ব্বোলিক আসিড ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "তুই গালে মালিশ কর।" প্রজা তাহা করিল। তৎক্ষণাৎ গালে ও হাতে ফোস্কা পড়িয়া উঠিল, সে জ্বালায় চিৎকার করিতে লাগিল। রাজার অত্যন্ত আনন্দ হইল, তিনি হাসিতে লাগিলেন।

এক রাজা হুকুম করিয়াছিলেন, প্রজারা কাপড়ের ছাতি ব্যবহার করিতে পারিবে না। সেই হুকুম অনুসারে সকলেই

বাঁশের ছাতি ব্যবহার করিতেছিল। প্রাচীন মন্ত্রীর পরিবর্ত্তন হইলে পর নূতন মন্ত্রী যাইয়া রাজার এই হুকুম রহিত করেন। তিনি পুঞ্জ পরিমাণে কাপড়ের ছাতা আনাইয়া প্রজাদিগের মধ্যে বিলি করিয়া দেন। উক্ত রাজার একজন প্রজা নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক করদানে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত এক খণ্ড ভূমির স্বত্বাধিকারী ছিল। সে বহু পরিশ্রমে সেই ভূমি খণ্ডের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। অপর এক জন প্রজা সেই ভূমি নিজের দখলে রাখিবার জন্য রাজাকে সাত শত টাকা নজর দেয়, রাজা সেই টাকা পাইয়া উক্ত ভূমি হইতে পূর্ব্বস্বত্বাধিকারীকে বঞ্চিত করেন। প্রকৃত স্বত্বাধিকারী বহু কাকুতিমিনতি ও কাঁদা কাটি করিয়া ছয় শত টাকা পর্য্যন্ত নজর-দানে সম্মত হইয়াও নিরাশ হয়। পরে সে আট শত টাকাপর্য্যন্ত নজর দানে প্রস্তুত হইয়াছিল। কোন ফল হয় নাই। এদেশের রাজা জমীদারদিগের অনেকে অর্থ লোভে এই রূপ নিষ্ঠুরাচরণ ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে তাঁহারা পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে বিনা অপরাধে কর্ম্মচ্যুত করিয়া অর্থগ্রহণপূর্ব্বক তাহার স্থানে একজন নূতন লোক নিযুক্ত করেন। এরূপ সচরাচর হয়।

মোসলমান রাজার রাজত্বকালে এদেশে সর্ব্বত্র চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠনাদি হইত; দেশে ভয়ানক অরাজকতা ছিল। প্রবল দ্বারা দুর্ব্বল লোক সর্ব্বদা প্রপীড়িত হইতে-ছিল। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে লোকে প্রাণভয়ে কম্পিত হইত। পথে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বহু পথিক প্রাণে মারা যাইত। তখন অন্তঃপুরে বাস করিয়াও কুল কন্যাদিগের সতীত্বরক্ষা দুষ্কর ছিল। রাজা ও রাজপুরুষদিগের বিরুদ্ধে প্রজার একটী কথা বলা সাধ্য ছিল না, বলিলে তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদন হইত। ভারতের অনেক বড় বড় রাজার চরিত্র ভাবিলে প্রাণ আকুল হয়। কাহার কাহার চারি শত পাঁচ শত স্ত্রী। তাঁহারা রাজরাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বাই খেমটার নৃত্য গীতের আমোদে মত্ত। দুই চারি জন রাজা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শিক্ষিত ও শাসিত হইয়া ইংরাজ রাজ পুরুষদিগের অনুকরণে রাজকার্য্যাদি কথ-ঞ্চিৎ সুনিয়মে নির্ব্বাহ করিতেছেন, বিদ্যা-লয় চিকিৎসালয়াদি স্থাপন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু অনেক রাজার রাজ্যে ঘোরতর অরাজকতা। শ্রুত হইল উড়িষ্যার একজন চরিত্রহীন প্রজাপীড়ক রাজা কমি শনার সাহেব কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট শাসিত হইয়াও সাবধান না হওয়াতে এক্ষণ কটকে নজর বন্দী হইয়া আছেন, তিনি রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতে পারেন না বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অচিরে রাজ্য-চ্যুত হইবেন, এরূপ সম্ভাবনা।

ইতিপূর্ব্বে এদেশের স্বার্থপর কুচরিত্র জমীদারগণ সর্ব্বদা প্রজাপীড়ন এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা করিতেন। কেবল ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদিগের শাসনে বহু পরিমাণে তাঁহাদের অত্যাচার প্রশমিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বড় বড় উপাধি ও খেতাব দ্বারা উৎসাহিত করিয়া অনেককে অর্থের সদ্ব্য

বহারপূর্ব্বক দেশহিতকর সৎকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে আসামপ্রদেশে যখন স্বাধীন রাজা ছিলেন,তখন কোন প্রজা হাঁটুর নীচে কাপড় ঝুলাইয়া রাজপথে বাহির হইতে পারিত না। তাহা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার হাঁটু কাটা যাইত। রাজা "গিলা নাটিব লাগে" (হাঁটু কাটিতে হইবে,) এরূপ হুকুম করিতেন। রাজা ও তাঁহার পারিষদগণ যে পথে চলিতেন, সাধারণ প্রজার সেই পথে চলিবার সাধ্য ছিল না। তাহারা রাজপথের পার্শ্বস্থ খানা বা নিম্নভূমি দিয়া চলিতে বাধ্য ছিল। নিজের পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় ছাড়িয়া কোন প্রজা উন্নতব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিত না। মৎস্যজীবীর কপালে উল্কীযোগে মৎস্য এবং মেথরের ললাটে ঝেটা অঙ্কিত থাকিত। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, 'চিরকাল তাহারা স্বীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিবে। প্রজার কর্ণ নাসিকাদিচ্ছেদন এবং চক্ষু উৎপাটন সহজে হইত। আমরা যখন অপার আসামের অন্তর্গত নিগ্রিটিং নামকস্থানে গিয়াছিলাম তখন সেখানে শুনিতে পাইয়াছিলাম, আসামের শেষ রাজা পুরন্দর সিংহ যে একটি স্ত্রীলোককে অন্ধ করিয়াছিলেন সেই স্ত্রী জীবিত আছে। কুদৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় রাজাজ্ঞায় তাহাকে অন্ধ করা হইয়াছিল। আসামে অন্য বহু প্রকার লোমহর্ষণ অত্যাচার ছিল। আজ আসাম ইংরাজশাসনে যেন স্বর্গধামে পরিণত, প্রজাদের কত সুখসমৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়াছে।

প্রচারক বন্ধু প্রেমাস্পদ বলদেব নারায়ণ পারস্য রাজ্যের অন্তর্গত বসায়ার নগরে নববিধান প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তিনি পক্ষাধিক কাল থাকিয়া বহু চেষ্টায়ও প্রকাশ্যে প্রচার করিতে পারেন নাই। বলদেব সেই স্থান হইতে তুরস্কের সোল্‌তানাধিকৃত তুর্কিস্থানের অন্তর্গত বসোরা নগরে গিয়াছিলেন। সেখানেও তিনি প্রকাশ্যে প্রচার করিতে অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। বলদেব নারায়ণ বসোরা হইতে আমাদিগকে এরূপ লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, এই স্থান বড়ই বিপৎসঙ্কুল, এখানে জীবন সম্পত্তি নিরাপদ নয় বলিয়া আমি স্বতন্ত্র বাড়ীতে বাস করিতে পারিতেছি না। এ নগরের একজন বড় লোকের আশ্রয়ে আছি। তাঁহাকে স্থান দিয়াছেন বলিয়া হউক বা অন্য কোন কারণে সেই সম্ভ্রান্ত লোক অচিরে নিহত হন।

বলদেব নারায়ণ তথা হইতে বগ্‌দাদ নগরে চলিয়া যান। সে স্থানে যাইয়াই তিনি ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া অযত্ন ও অচিকিৎসায় গত বৎসর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এরূপ শ্রুত হওয়াগিয়াছে যে, বগ্‌দাদের লোকেরা তাঁহাকে কাফের বলিয়া ঘৃণা করিত, তাঁহার সংস্পর্শে অপবিত্র হইবে বলিয়া কূপ হইতে জল তুলিতে দিত না। এই তো স্বাধীন মোসলমান রাজ্যের অবস্থা. আমরা কতকগুলি করদ ও মিত্র রাজার এবং অধীন ও স্বাধীন রাজার রাজ্যের ছবি অঙ্কিত করিয়া উপস্থিত করিলাম। বলি পাঠিকে, তুমি কি বর্ত্তমান আন্দোলনের স্রোতে পড়িয়া নানা কথা

শুনিয়া ইংরাজরাজ্যে বাস এবং ইংরাজ রাজাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে কষ্ট বোধ করিতেছ? তবে তুমি সুখে থাকিবার জন্য উপরি উল্লিখিত কোন্ রাজ্যে যাইয়া বাস করিবে?

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

(পেশওয়ার।)

গত বৎসর ২৫শে জ্যৈষ্ঠ মরিপর্ব্বত হইতে রাউলপিণ্ডি নগরে প্রত্যাগমন করা যায়। আমরা ২৬শে শুক্রবার সায়ংকালে পেশওয়ার নগরে যাত্রা করি। ২৭শে প্রাতঃকালে পেশওয়ার ক্যাণ্টোন্‌মেণ্ট ষ্টেশনে উপনীত হওয়া যায়। তথাকার কমিসরিয়েটের হেড আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আবাসে আতিথ্য গ্রহণ করিব, এরূপ স্থির ছিল। ইতিপূর্ব্বে একদিন তিনি রাউলপিণ্ডিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে আমাদের আলাপ পরিচয় হইয়াছিল, এবং পেশওয়ারে যাইবার আমাদের যে সঙ্কল্প আছে আমরা ইহা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। রাউলপিণ্ডি হইতে ডাক্তার কালীনাথ রায় মহাশয় তাঁহার নামে পত্রও আমাদের সঙ্গে দিয়াছিলেন। পেশওয়ার ষ্টেশনে এক প্রকার টম্‌টমগাড়ী দৃষ্ট হইল, তাহা অতিশয় উচ্চ, তাহার উপর আরোহণ করা ও তাহা হইতে অবতরণ করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল, তদ্রূপ গাড়ী ব্যতীত অন্য গাড়ী সেখানে ছিল না। বেডিং ও ব্যাগ বহন করিবার জন্য এক জন মুটে সঙ্গে করিয়া প্রায় এক মাইল দূরে আশু বাবুর আবাসাভিমুখে চলিয়া যাওয়া যায়। তিনি অন্তঃপুরে ছিলেন, বাহির হইতে ভৃত্যযোগে তাঁহার নিকটে ডাক্তার বাবুর পত্র পাঠাইয়া দেওয়া যায়। তিনি পত্র পড়িয়া আমাদের নিকটে উপস্থিত হন, এবং আমাদের অবস্থানাদির ব্যবস্থা করেন।

পেশওয়ার মোসলমানপ্রধান স্থান। পারস্য ভাষাবিদ্ পাঠান জাতীয় বহু মোসলমান এনগরে বাস করে ভাবিয়া রাউলপিণ্ডি হইতে যাত্রা করার পূর্ব্বে পেশওয়ার বাসী মোসলমানদিগের সভায় পাঠ করার উদ্দেশ্যে জীবনের ক্রমোন্নতিবিষয়ে পারস্য ভাষায় একটি প্রবন্ধ লিখা গিয়াছিল। ডাক্তার কালীনাথ বাবু ইহা জানিয়া আমাদিগকে বারণ করিয়া বলিলেন, "পেশওয়ারে পাঠান জাতি ভয়ঙ্কর। তাহাদিগকে বক্তৃতা শুনাইবার প্রয়াস পাইবেন না। তাহাতে বিষম গোলযোগ ঘটিতে পারে। তথায় যে সকল বাঙ্গালী বাস করেন তাঁহাদিগকে এক দিন আহ্বান করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় কিছু বলিবেন।" তাঁহার অনুরোধ মতে কার্য্য করা যায়। ২৮শে তারিখ প্রাতঃকালে আশুবাবু নিজের বহির্ভবনে তত্রত্য বাঙ্গালী বাবুদিগকে সমবেত করেন। সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মবিষয়ে কিছু বলা যায়। দেখা গেল আশুবাবুর তাদৃশ সাহস ও প্রভাব নাই যে, তথাকার মোসলমান বড় লোকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া সভা করিতে পারেন। বাঙ্গালী বাবুরা সকলেই পেশওয়ারের পাঠানদের ভয়ে ভীত।

২৬শে অপরাহ্নে সেনানিবেশ প্রদর্শন করিবার জন্য আশু বাবু আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। পেশওয়ার সেনানিবেশে প্রায় সাত হাজার সৈন্য স্থিতি করে। সেই স্থান হইতে খাইবার গিরি ন্যুনাধিক ১৪ মাইল দূরে। দুরন্ত আফ্রিদি জাতি খাইবার সন্নিহিত পর্ব্বতশ্রেণীতে বাস করে। ১১ মাইলদূরে ইংরাজদিগের জম্রুদনামক সুদৃঢ় কেল্লা, উহাই সীমান্ত দুর্গ। এই দুর্গ হইতে তিন মাইল অন্তর পশ্চিমাংশে খাইবার পাশ। জম্রুদ পর্য্যন্ত লৌহবর্ত্ম প্রসারিত আছে। পেশওয়ার ক্যোণ্টোনমেণ্ট হইতে উক্ত কেল্লা ও খাইবার গিরি নয়ন গোচর হয়। দুর্দ্দান্ত অসভ্য খাইবারী ও আফ্রিদাদিগের ভয়ে ক্যাণ্টোনমেণ্টের লোক সকল সর্ব্বদা ভীত। গোরা সিপাহীদিগের উপর তাহাদের বিশেষ আক্রোশ ও আক্রমণ। কোন কোন দিন নিশাকালে তাহারা অকস্মাৎ দলবদ্ধ ভাবে আসিয়া সিপাহীদিগকে আক্রমণ করে, এবং তাহাদিগকে মারপিট করিয়া তাহাদিগগের ঘোড়া ও বন্দুকাদি অস্ত্র শস্ত্র অপিচ টাকা পয়সা কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করে। কেহ তাহাদিগকে ধরিতে পারে না। তাহারা দুরন্ত দুঃসাহসী লোক, তাহাদের প্রাণের ভয় নাই। ইংরাজ শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে কিছুতেই বশীভূত করিতে পারিতেছেন না। আমাদের পেশওয়ারে পঁহুছিবার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে আফ্রিদীরা এক দিন রাত্রিতে ক্যাণ্টোন্‌মেণ্ট রেলওয়ে ষ্টেশন আক্রমণ করিয়া ষ্টেশন ঘর হইতে সমুদায় নগদ টাকা অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। পোষ্টাফিস ও ব্যাঙ্ক আক্রমণ করিবে এরূপ জনরব শুনা গিয়াছিল। আশু বাবুর সঙ্গে ক্যাণ্টোমেণ্টের কিয়দ্দূর ভ্রমণ করিলে পর সূর্য্যাস্ত হয়, তখন দেখি স্থানে স্থানে বন্দুক সহ সৈনিক পুরুষ সকল পাহারার জন্য দণ্ডায়মান। যে সকল সিপাহীর ঘর খাইবার পাশের অভিমুখীন, সেই সমস্ত ঘরের সম্মুখভাগে প্রাচীর নির্ম্মিত দৃষ্ট হইল, এবং ভিতর হইতে গুলি চালাইবার জন্য সেই প্রাচীরের স্থানেং ছিদ্র আছে দেখা গেল। এই প্রাচীর স্থাপনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আশু-বাবু বলিলেন, "দুরন্ত খাইবারীরা হঠাৎ সিপাহীদগের গৃহ চড়াও করিতে যেন বাধা পায়, এই উদ্দেশ্যে এই প্রকার প্রাচীর স্থাপন করা হইয়াছে।"

পেশওয়ারে সেই পার্ব্বত্য দস্যুদিগের অনেক অদ্ভুত সাহসিক কাণ্ডের কথা শ্রবণ করা গিয়াছে। তাহার কিছু এস্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে। দশ জন গোরা সৈন্য পীড়িত হইয়া হাসপাতালে আশ্রয় লইয়াছিল। কয়েক জন খাইবারী দস্যু হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে উলঙ্গ করিয়া সমুদায় বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া যায়। তখন গোরারা ভয়ে জড় সড় হইয়া চুপ করিয়া ছিল। একদিন কয়েক জন উক্ত পার্ব্বত্য দস্যু বোর্কা-নামক অবগুণ্ঠনবিশেষে আচ্ছাদিত হইয়া স্ত্রীলোক সাজিয়া এক জন ভদ্রলোকের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, এবং অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগকে মার পিট করিয়া তাহাদের বস্ত্রালঙ্কার ধন সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া যায়। কমিসরিয়টে আশুবাবুর অধীনে একজন

খাইবারী পাঠান কাজ করিত। এক দিন সে তাঁহার নিকটে কয়েক দিনের জন্য ছুটীর প্রার্থী হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন ছুটী চাও।" সে বলিল, "আমার অমুক আত্মীয়কে আমার একজন প্রতিবেশী হত্যা করিয়াছে, আমি তাহাকে বধ করিয়া আসিব।" আশুবাবু বলিলেন, "তুমি তোমার শত্রুকে হত্যা করিতে যাইয়া নিজে তাহা দ্বারা হত হইতে পার।" তাহাতে সে বলিল, "আমি হত হইলেও আমার পুত্র বা ভ্রাতা তাহাকে বধ করিবে।" আশুবাবু এই কথা শুনিয়া তাহাকে ছুটী দিতে অসম্মত হন। তাহাতে পাঠান ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, চাকুরী রহিল, আমি চলিলাম, তোমার চাকুরী করিব না।" পুলিস সাহেব এক জন পাঠানকে পাহারার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন, কোন দিন তাহার কার্য্যশৈথিল্য দেখিয়া তিনি তাহাকে শাসন করেন, তাহাতে সে বিষম ক্রুদ্ধ হয়। পরে একদিন সেই সাহেব রাত্রিতে বাহির হইয়া ছিলেন, তখন পাঠান অন্ধকারে অতর্কিত ভাবে যাইয়া তাঁহার পদে গুরুতর লগুড়াঘাত করে। কঠিন আঘাতে সাহেব ভূতলশায়ী হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন, চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নীত হন। কে মারিল অনুসন্ধানে তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। সাহেব কয়েক দিন পরে আরোগ্য লাভ করিয়া হাসপাতাল হইতে গৃহে আসিয়া আশ্রয় লইলে উক্ত পাঠান একটি কৃষ্ণ সর্প এক জন সাপুড়ে হইতে সামান্য মূল্যে ক্রয় করিয়া আনিয়া অতর্কিত ভাবে সাহেবের ঘরে ছাড়িয়া দেয়। সাহেব ঘরে সাপ দেখিয়া ভয়াকুল হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকেন। তখন পাঠান যাইয়া বলে, "আমি বক্‌শিশ পাইলে এই সাপ ধরিয়া মারিয়া ফেলিব।" পরে সে দশ টাকা পুরস্কার গ্রহণ করিয়া সর্প বিভীষিকা হইতে সাহেবকে মুক্ত করে। সাহেবের প্রতি সে আরও নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করে। সাহেব স্থানান্তরে বদলি হইয়া তাহার অত্যাচার হইতে মুক্ত হন। আমরা গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ গৃহের দ্বারে পথ প্রান্তে খাটুলির উপর শয়ন করিয়া নিশা যাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কেহ কেহ বলিল, অকস্মাৎ কোন পাঠান আসিয়া শয্যা ও খাটুলি কাড়িয়া লইতে পারে। সেই ভয়ে আমরা ফটক বন্ধ করিয়া ভিতরের প্রাঙ্গণে শয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। একদা জম্‌রুদ দুর্গের অনতি দূরে ইংরাজসৈন্যের সঙ্গে আফ্রিদিদের যুদ্ধ হইয়াছিল। রণে বহু আফ্রিদী হতাহত হয়। সমরের নিবৃত্তি হইলে একটী আফ্রিদী নারী সমরক্ষেত্রে দৌড়িয়া আইসে, এক জন আফ্রিদী পুরুষ অস্ত্রাহত হইয়া অধোমুখে ধরাতলশায়ী হইয়াছিল, উক্ত নারী তাহার পৃষ্ঠে কয়েকটী পদাঘাত করে। একটি অস্ত্রাহত যুবা পুরুষ ঊর্দ্ধমুখে পতিত ছিল, সে তাহার মুখ চুম্বন করে। ইংরাজ জেনেরাল দূরবীণযোগে ইহা দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, যে ব্যক্তি অধোমুখে পড়িয়াছিল সেই ব্যক্তি সেই স্ত্রীর স্বামী, সে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবার সময় পৃষ্ঠে গুলির আঘাত পাইয়া অধোমুখে

পতিত হইয়াছিল, তজ্জন্য স্ত্রী তাহাকে ভীরু কাপুরুষ ভাবিয়া ক্রোধভরে পদাঘাত করে। যুবা সম্মুখ সংগ্রামে গুলির আঘাতে উর্দ্ধমুখে পড়িয়াছিল, সে তাহার পুত্র ছিল, বীরপুরুষ ভাবিয়া সাদরে তাহার মুখচুম্বন করে।

পেশওয়ারের সেনানিবেশ বহু বিস্তৃত, তাহা তিন চারি ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া হইতে পারে। ক্যাণ্টোন্‌মেণ্টের এক স্থানে ২০।২৫ হাজার অশ্বতর (খচ্চর) রক্ষিত দৃষ্ট হইল। সেই সকল অশ্বতর যুদ্ধের সময় খাদ্য দ্রব্যাদি বহন করিয়া সৈন্যদের সঙ্গে চালিত হইয়া থাকে।

২৮শে রবিবার অপরাহ্নে আশুবাবু পেশওয়ার নগর প্রদর্শন করিবার জন্য টঙ্গারোহণে আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ক্যাণ্টোনমেণ্ট হইতে নগরের দূরত্ব এক ক্রোশের অধিক হইবে না। রাউল পিণ্ডি হইতে পেশওয়ার যাইতে নগর অতিক্রম করিয়া ক্যাণ্টোন্‌মেণ্ট ষ্টেশনে পঁহুছিতে হয়। পেশওয়ার নগর অতি প্রাচীন। এরূপ জনশ্রুতি যে বীরাগ্রগণ্য পরশুরাম কর্ত্তৃক পেশওয়ার নগর স্থাপিত। এক সময় এই নগর কাবোল রাজ্যভুক্ত ছিল, পরে পঞ্জাবাধিপতি মহাপ্রতাপ রণজিৎ সিংহ তাহা অধিকার করিয়াছিলেন। এরূপ প্রবাদ যে এই নগরের অনতিদূরে এক স্থানে যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনাদি পঞ্চ পাণ্ডব কিয়দ্দিন বাস করিয়াছিলেন। সেই স্থান বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত। পেশওয়ার নগর সমৃদ্ধ ও জনাকীর্ণ, এই নগরে রাজপুত ও ক্ষত্রিয়প্রভৃতি অনেক হিন্দুজাতি ও মোসলমানের বাস। নগরের প্রায় সমুদায় গৃহ দারু নির্ম্মিত দ্বিতল ত্রিতল এবং ঘন সন্নিবিষ্ট। নানা পণ্য দ্রব্যে বিপণী শ্রেণী সজ্জিত। রাজপথে মহাজনতা দৃষ্ট হইয়াছিল। তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগ, বাঙ্গলা দেশে প্রচুর আম্রফল, কিন্তু পেশওয়ারের বাজারে একটি আমও নয়নগোচর হয় নাই। সে দেশে আম্র দুর্লভ। তদ্দেশজাত আলুচা ও খোর্ম্মাণীফলের প্রচুর আমদানি দেখা গেল। আলুচা ঈষদ্‌ অম্লাস্বাদ রসাল ফল, এবং খোর্ম্মাণীও রসনাপ্রিয় ফল। উভয় ফল দেখিতে কুলের ন্যায়, কিন্তু সাধারণ কুল অপেক্ষা আকারে বড়। পেশওয়ারের নিকটে এক ষ্টেশনে একজন ফেরিওয়ালার নিকটে দুইটি পাকা আম্র দৃষ্ট হইয়াছিল, একজন সে দেশীয় যাত্রিক চারি আনা মূল্যে একটি আম ক্রয় করিয়াছিল। নগরে আঙ্গুর বেদনা পেস্তা প্রভৃতি কাবোলী ফলের প্রচুর আমদানি। একজন তহসিলদারের উচ্চ আফিসঘরের ছাদে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ নগরের শোভা দর্শন করা গিয়াছিল। নগরের ভিতরে পূর্ব্ব প্রান্তে পুরাতন বৃহৎ দুর্গ। নগর প্রাচীরে বেষ্টিত, নগরে প্রবেশের জন্য কাবোলী দরওয়াজা দিল্লিদরওয়াজা প্রভৃতি পনেরটি ফটক বিদ্যমান। নগরাভ্যন্তরে অনেক দেবালয় আছে। তহসিলদারের কাচারী বাড়ীর পার্শ্বে গোরক্ষনাথ ঠাকুরের মন্দির, তাহাকে গোরখ খাটুলি বা গোরখ আস্তানা বলিয়া থাকে। নগর হইতে বাহির হইয়া আমরা শাহবাগনামক বিস্তীর্ণ উদ্যান দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, এই উদ্যান

মিয়ুনিসিপালিটী দ্বারা স্থাপিত ও রক্ষিত। পেশওয়ারনগরনিবাসী এক জন হিন্দু ভদ্র লোক আমাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন। অনেক দূর ভ্রমণ করিয়া সায়ংকালে আমরা গৃহে প্রত্যাগত হই।

পরদিন ২৯শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালের ট্রেণে রাউলপিণ্ডি নগরে যাত্রা করিব,এরূপ স্থির করা হইয়াছিল। আমরা নৈশিক ভোজনান্তে শয়ন করিতে যাইব,এমন সময় একটি বাবু আসিয়া বলেন,"আপনি আমার বিশেষ কুটুম্ব, কাল আপনি আমার গৃহে মাধ্যাহ্নিক ভোজন নাকরিয়া এস্থান হইতে যাইতে পারিবেন না, আমার স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধ, এই অনুরোধ রক্ষা করিতেই হইবে।" সেই বাবুটির নাম মনে হইতেছে যোগীন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত, ফরিদপুরের জিলায় নিবাস। আমার মাসতুতো ভ্রাতার পুত্র শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্র তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্র রঙ্গপুরের জিলার অন্ত র্গত কুড়িগ্রাম সব্‌ডিভিশনে বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত। শ্বশুর যোগীন্দ্রনাথ কিয়দ্দিন হইল পেশওয়ারে কমিসরিয়টের কাজে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। শ্বশুর ভারতের এক প্রান্তে, জামাতা প্রায় অপর প্রান্তে বাস করিতেছেন।জামাতার প্রমুখাৎ শ্বশুর শ্রবণ করিয়াছিলেন,আমরা আরব্য পারস্য ভাষার চর্চ্চা করি, এবং কোরাণাদি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছি। কোন বন্ধুর প্রমুখাৎ উহার সন্ধান পাইয়া তিনি আমাদিগকে কুটুম্ব বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, এবং ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন। আমরা বলিলাম, "নিমন্ত্রণগ্রহণে সাধ্য নাই, কাল প্রাতেই রাউলপিণ্ডি যাত্রা করা স্থির হইয়া গিয়াছে, তথায় পত্র লিখা গিয়াছে। তিনি দুঃখিত হইলেন, পরদিন প্রাতঃকালে ষ্টেশনে যাত্রা করিবার সময় উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার গৃহিণীর অনুরোধ জানাইলেন। কি করিব তাঁহাকে দুঃখিত করিয়াই আমা দিগকে ষ্টেশনে চলিয়া যাইতে হইল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশনে যাইয়া টিকিট ক্রয় করিয়া আমাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। মুটের চারিটী পয়সা বাঁচিল। কুটুম্ব বন্ধুই নিজে ব্যাগ ইত্যাদি বহন করিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। তিনি গাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন, ট্রেণ চলিলে পর বিষণ্ণ বদনে চলিয়া গেলেন। পেশওয়ারের পথের বিবরণ পরে বিবৃত হইবে।

"ভিখারিণী" স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরিকার প্রতি।

আমরা যখন গত বৈশাখ মাসে কটক নগরে বাস করিতেছিলাম, উক্ত মাসের মহিলার সমস্ত লেখা প্রস্তুত করিয়া মুদ্রাঙ্কনার্থে কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছি, তখন "ভিখারিণী," স্বাক্ষরিত স্বদেশী আন্দোলনপূর্ণ সুদীর্ঘ প্রেরিত পত্র প্রাপ্ত হই। সেই পত্রে আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশের লেপ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর মহোদয়ের সম্বন্ধে অসম্মানসূচক কথা এবং উক্ত প্রদেশের কোন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের তাঁহার প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের পোষকতা না থাকিলে পত্রের অন্য কোন কোন অংশে আমাদের মতের সঙ্গে অনৈক্য সত্ত্বেও তাহা এক বারে না

হউক দুই তিন বারে আমরা প্রকাশ করিতে যত্ন করিতাম। কিন্তু উক্ত বিশেষ আপত্তিজনক অংশ পরিত্যাগে পত্র প্রেরয়িত্রী সম্মতিদান না করিলে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। পত্রপ্রেরয়িত্রী মহিলা পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি জানেন, তাহাতে আমরা পুনঃ পুনঃ রাজভক্তি সমর্থন করিয়াছি। রাজভক্তি আমাদের ধর্ম্মের মূল, আমরা রাজা বা রাজপ্রতিনিধির অবজ্ঞা ও অবমাননাসূচক কোন কথা মহিলায় প্রকাশ করিতে একান্ত কুণ্ঠিত। অন্যায়াচারী দুশ্চরিত্র পিতা যেমন পুত্র কন্যার পিতৃভক্তিলাভে বঞ্চিত হইতে পারেন না, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ তাঁহার নিন্দা রটনা করা পুত্র কন্যার পক্ষে যেমন পাপ, রাজা বা রাজপ্রতিনিধিগণ দস্যু তস্কর ও অত্যাচারী লোক হইতে প্রজাবর্গের ধন মান জীবন রক্ষা করেন. তাহাদের শিক্ষাদান এবং নানা প্রকার কুশল কল্যাণ সাধন করেন বলিয়া তাঁহারা পিতৃস্থানীয় এবং প্রজাবর্গ পুত্রকন্যাতুল্য। রাজা ও রাজপ্রতিনিধিগণ অন্যায়াচরণ করিলেও পুত্রকন্যাস্থানীয় প্রজাগণ তাঁহাদের প্রতি অশিষ্ট ও অসঙ্গত ব্যবহার করিতে পারে না। অবিশ্বাসিগণ স্বীকার করুন বা না করুন, আমরা বিশ্বাস করি, পিতা যেমন আমাদের প্রতিপালনের জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত, রাজা ও রাজপ্রতিনিধি তদ্রূপ আমাদিগের শাসনসংরক্ষণের জন্য ভগবান্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত। তাঁহাদিগকে অবমাননা করা আর তাঁহাদের নিয়োগকর্ত্তা বিধাতাকে অবমাননা করা তুল্য। ছাত্রীদিগের অবিনয় ও অশিষ্ট ব্যবহারকে আমরা কখনও প্রশ্রয় দিতে পারি না। সেই সকল বালিকাই আবার রাজকীয় সাহায্যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, এবং রাজানুগ্রহে বৃত্তিলাভের আশা করিয়া থাকে, তাহাদের অবিনয় ও অকৃতজ্ঞতা ক্ষমার যোগ্য নহে।

মহিলা চিরকাল রাজভক্তির সমর্থন এবং বালক বালিকাদের দুর্ব্ব্যবহার ও অশিষ্টতার প্রতিবাদ করিয়াছেন; একজন নারীর সেই দুর্ব্যবহারের পোষকতাসূচক পত্র তাহাতে কেমন করিয়া স্থান পাইতে পারে? ইতিপূর্ব্বে "ভিখারিণী" স্বাক্ষরিত দুই একখানা দীর্ঘ পত্র মহিলাতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এপর্য্যন্ত তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হই নাই। তিনি আজও পরিচয় দান করিলেন না কেন? আমরা গত বারে একটী মহিলায় লিখিত "রাজভক্ত ও স্বদেশ প্রেম" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। তিনি সেই প্রবন্ধে নিজের পরিচয় দান করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধে কোন আপত্তিজনক কথা নাই, আমরা সাদরে তাহা প্রকাশ করিয়াছি। অতঃপর আমরা মহিলাতে এই দুঃখজনক বর্ত্তমান আন্দোলনবিষয় আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। ভিখারিণী নিজের পরিচয় দান করিয়া আমাদের আপত্তিজনক অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার অনুমতি দান করিলে আগামী বারে হইতে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার জন্য যত্ন করা যাইতে পারে।

ভিখারিণী ঘরে বসিয়া আন্দোলনকারী

সংবাদপত্র সকল পাঠ করিয়া নিজে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা একমাত্র সংবাদ পত্রের উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ং ঢাকা ময়মনসিংহ জামালপুর প্রভৃতি পূর্ব্ব বঙ্গের অন্তর্গত কয়েকটি নগর উপনগর ভ্রমণ করিয়া সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া আসিয়াছি তথাকার নিরপেক্ষ বিশ্বস্ত বন্ধুদিগের প্রমুখাৎ বিবরণ অবগত হই য়াছি। আন্দোলনকারী বহু পত্রিকাতে যে অনেক অমূলক কথা প্রকাশিত হইয়াছে, এবং আত্মপক্ষের প্রতিকূল সত্য সকল যে গোপন রাখা হইয়াছে, অপিচ আত্মপক্ষের অনুকূল। অনেক কথা যে অতিরঞ্জিত করিয়া বাড়াইয়া প্রচার করা হইয়াছে তাহা আমাদের জানিবার অবশিষ্ট নাই। ঢাকা নগরস্থ একজন বিশ্বস্ত সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বন্ধুর দুই তিন খানা পত্র ইতি পূর্ব্বে মহিলায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের উক্তির প্রমাণসূচক আন্দোলনের অনেক গূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত। এজন্য আমরা সেই সকল সংবাদপত্রের সমস্ত কথায় আস্থা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না।

যাহা হউক মহামান্য বৃদ্ধ দেশাধিপতিকে সামান্য প্রজাস্থানীয় বালিকারা অসম্মান করে বা করিতে চাহে ইহা অল্প দুঃখ ও লজ্জার বিষয় নহে। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের এ কিরূপ নীতি শিক্ষা হইতেছে। অল্পবুদ্ধি বালক বালিকাদিগকে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত করিয়া গালাগালদানে প্রবর্ত্তিত করা সহজ, উহা এক কথাতেই হইতে পারে। কিন্তু "এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে অন্য গণ্ডও ফিরাইয়া দিবে।" এই স্বর্গীয় প্রেম ও ক্ষমার নীতি কয় জন নেতা তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন? ভক্ত কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁহার কন্যার বিবাহের আন্দোলন তরঙ্গের অপমান ও নিন্দা এবং হৈ চৈ ব্যাপারে পড়িয়া বহু যুবকযুবতির এবং বালক বালিকার বিশেষ মানসিক ক্ষতি ও নৈতিক অবনতি হইয়াছে। আজও উহার সংশোধন হইয়া উঠিতেছে না। শুদ্ধ ভক্ত কেশবচন্দ্রকে গালি দিবার জন্য সেই সময় একখানা পত্রিকার সৃষ্টি পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ভগবান্ অমঙ্গল হইতে মঙ্গল সাধন করেন। তাহাতে বিশ্বাসীদিগের আত্মার প্রভূত কল্যাণ হইয়াছে। কতকগুলি লোকের যেন জন্ম হইয়াছে বড় লোকের নিন্দা এবং তাঁহাদের কাজের প্রতিবাদ ও আন্দোলনের জন্য। ইহাই যেন তাঁহাদের জীবনের প্রধান কাজ। বর্ত্তমান স্বদেশপ্রেমের আন্দোলনে এদেশের বহু যুবক যুবতীর ও বালক বালিকার নৈতিক অবনতি হইয়াছে আরও হইবে। কিন্তু পরিণামে ঈশ্বর প্রসাদে দেশের পক্ষে কল্যাণ হইবে, আশা করা যায়। দ্বেষ হিংসা বিবর্জ্জিত হইয়া প্রণয় ও সদ্ভাবে দেশের শিল্প বাণিজ্যাদির উন্নতিসাধন নিতান্ত প্রার্থনীয়। তাহা নানা উপায়ে হইতে পারে। বিলাতী কোন বিষয়ের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক রাখিব না, যাঁহারা এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বে রেলওয়ে ট্রামে গমনাগমন বন্ধ করা, টেলিগ্রাফ ও পোষ্ট আফিসের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করা, ডাক্তরী ঔষধ ও অস্ত্রাদির সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়িয়া দেওয়া, ইংরাজি ভাষার চর্চ্চা রহিত করা উচিত

ছিল। সে সকল রহিত করা দূরে থাকুক, অনেকে আবার নিজেদের সুখ সুবিধার জন্য নিজ নিজ গৃহে বৈদ্যুতিক আলোক ও বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন। চুরুট সিগারেটের ধূমেতো ট্রেণে চলা যায় না। এ সকল বিলাতী, এ সকল গ্রহণ করা ন্যায়তঃ তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত নয়। যে সকল বালক রাজকীয় সাহায্যে স্কুল কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটী ও সব্‌ডিপুটীর পদ পাইবার জন্য লালায়িত, তাহাদের আবার স্বাধীনতার মূল্য কি? উপকারী জনের প্রতি ক্রোধ বিদ্বেষ অবিনয় অকৃতজ্ঞতা কি এই স্বদেশ প্রেমের ভূমি নয়? আমরা স্বীকার করি নূতন প্রদেশের ছোট লাট সাহেব কতক গুলি প্রজার অনুচিত ব্যবহারে উত্তেজিত হইয়া তাহাদের শাসনের জন্য কোন কোন ব্যবস্থা অসঙ্গত করিয়াছেন, তিনি অন্যায় অত্যাচার ও নিজের প্রতি অবমাননা উপেক্ষা করিয়া শান্তভাবে বড়লাট সাহেবের ন্যায় আইনানুসারে কার্য্য করিয়া গোলযোগ নিবারণে যত্ন করিলে তাঁহার মহত্ব ও পদোচিত কার্য্য হইত। যদি কিছু অরাজকতা হইয়া থাকে এই অরাজকতার মূল কোথায় দেখিতে হইবে, কিরূপ ভূমি হইতে এই স্বদেশ প্রেমের উৎপত্তি হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, ভিখারিণীর এক বার ভাবিয়া দেখা উচিত। রাজপ্রতিনিধির নূতন রাজ্যশাসন ব্যবস্থাতে অসন্তুষ্টিবশতঃ তাঁহার প্রতি কতক গুলি প্রজার ক্রোধ বিদ্বেষ কি সেই ভূমি নয়? তৎপূর্ব্বে তো এইরূপ প্রেমের প্রকাশ পায় নাই? প্রজা ক্ষীণ লেখনী ও রসনাযোগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া রাজশক্তির বিরুদ্ধে কয় দিন দাঁড়াইতে পারিবে? রাজার হস্তে আইন ও সৈন্য বিদ্যমান। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অন্নে প্রতিপালিত হইতেছেন, গবর্ণমেণ্টের প্রধান পুরুষদিগের বিরুদ্ধে তাঁহাদের কুৎসা নিন্দা করিয়া বেড়ান, কিছু আশ্চর্য্যের বিষয়। নিন্দাপবাদ এবং বিদ্বেষ ভাববিস্তারে কখনও সুফল হয় নাই ও হইবে না! বরং তাহাতে বালক বালিকাদিগের হৃদয় পর্য্যন্ত বিষাক্ত হইয়া উঠে। ভিখারিণী জানিবেন প্রকৃত ধর্ম্ম, নীতি ও চরিত্র ব্যতীত কেবল বক্তৃতাদানে দেশীয় বস্ত্র ও লবণ ব্যবহারে কখনও জাতীয় উন্নতি দেশের উন্নতি হয় না। স্বার্থের জন্য দেশজয় ও রাজত্ব। পৃথিবীর বিজিত জাতির প্রতি বিজেতৃজাতির কিরূপ ব্যবহার হইয়া আসিয়াছে, ইতিহাস তাহার প্রমাণ। ইংরাজেরা নিঃস্বার্থ দেবতা নন।

আমরা বর্ত্তমান আন্দোলন বিষয়ে মহিলাতে আর কিছুই লিখিব না স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু ভিখারিণীর পত্রপাঠে ব্যথিত হইয়া এবার এত গুলি কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম। তিনি আমাদের ভাব কত দূর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন জানি না। একজন অবলা হইতে ঈদৃশ পত্র আমরা পাইব মনে করিতেপারি নাই।

নিন্দাকারীরা যেন মনে করেন, আমরা নিরবচ্ছিন্ন নির্দ্দোষ, অভ্রান্ত ও সর্ব্বগুণা-

ষিত। দোষ ঘোষণা করিয়া কুৎসা নিন্দা করিয়া জনসমাজে যাঁহাদিগকে ঘৃণিত ও অপদস্থ করিবার জন্য যত্ন করা হইয়াছে তাঁহাদের যেন উল্লেখযোগ্য কোন গুণ নাই। পূর্ব্ব বঙ্গের নূতনশাসনব্যবস্থায় এই গোল যোগের উৎপত্তি, কেহ কি মনে করিতে পারেন এই ব্যবস্থাতে পূর্ব্ব বঙ্গের সমৃদ্ধি ও তদ্দেশবাসীদিগের নানা বিষয়ে উন্নতি হইবে না, যাহার কখনও সম্ভাবনা ছিল না?

যশোহরের ন্যায় অনেক বড় বড় ডিষ্ট্রীক্ট সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীর শাসনকর্ত্তৃত্বাধীনে, তথাকার জজ মাজিষ্ট্রেটাদি প্রধান রাজপুরুষগণ বাঙ্গালী। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের ঠিক পরবর্ত্তী পদে এক জন বাঙ্গালী নিযুক্ত। তিনি অচিরে ছোট লাট হইবেন, এরূপ বাজারগুজব। এমন অবস্থায় কেমন করিয়া বলা যায় যে,কৃষ্ণাঙ্গে ও গৌরাঙ্গে সম্পূর্ণ প্রভেদ হইতেছে, পক্ষপাত হইতেছে, মহারাণীর ঘোষণাপত্রের সম্মান রক্ষা হইতেছে না।

ইংরাজেরা এদেশের সমুদায় অর্থ শোষণ করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইতেছে,এদেশ দিন দিন গরিব হইয়া পড়িতেছে, ইহা কি সত্য [illegible]? ভারতে ইংরাজ রাজত্বস্থাপনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মোসলমান রাজত্বের সঙ্গে তুলনা করিলে এদেশে কি অর্থাগমের দ্বার শতগুণ মুক্ত হয় নাই? এদেশে ধনী লোকের সংখ্যা কি শত সহস্র বৃদ্ধি পায় নাই? ইহা আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি, আর পুনরুক্তি করিতে চাহি না। আজ যদি ইংরাজজাতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিচারালয় কার্য্যালয় কল কারখানা রেলওয়ে ষ্টীমারাদি উঠিয়া যায়, এদেশের কি লক্ষ লক্ষ লোক বিষম অন্নকষ্টে পড়িয়া নিরুপায় হইবে না? এবং তাহাদের মধ্যে হাহাকারধ্বনি উঠিবে না? ভিখারিণী একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

"প্রেম আনন্দ শান্তি সহিষ্ণুতা সুকোমল ব্যবহার কল্যাণশীলতা বিশ্বাস বিনম্রতা ও মিতাচার এই সকল পবিত্রাত্মার ফল।" খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া উভয় পক্ষ চলুন। অচিরে শান্তি কুশল স্থাপিত হইবে।

এক্ষণ বহু উৎসাহী ভদ্র যুবক স্বহস্তে তাঁত চালাইয়া স্বদেশী বস্ত্রের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আহ্লাদের বিষয়। বস্ত্রের সূত্র পর্য্যন্ত যাহাতে বিলাত হইতে আনয়ন করা না হয়, এদেশে প্রস্তুত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। কল চালাইতে না পারিলে সূত্র ও স্বদেশী বস্ত্রের অভাব কিছুতেই দূর হইবে না। বস্ত্রের উপাদান সূত্র বিলাতী, বুনন স্বদেশী হইলে চলিবে না। ন্যায় ও ধর্ম্মপথে থাকিয়া উৎসাহী যুবকগণ স্বদেশের শিল্প বাণিজ্যাদির উন্নতিসাধনে যত্নবান্ থাকেন, ইহা আমারা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। স্বদেশের শিল্প বাণিজ্যাদির উন্নতি হউক, স্বদেশপ্রেমিকদিগের যত্ন চেষ্টা সফল হউক, তাহার সঙ্গে দ্বেষ হিংসা অভদ্রতা ও অকৃতজ্ঞতা কোন রূপ যোগ না থাকে, ভিখারিণী মনে করিবেন ইহাই আমাদের আকিঞ্চন।

ভিখারিণী জানিবেন,যাঁহারা বীর পুরুষের

ন্যায় বৃথা আস্ফালন করেন, বিপৎকালে তাঁহারা কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিয়া থাকেন, ইহা প্রমাণিত সত্য। অযথা ছিদ্রান্বেষণ পূর্ব্বক নিন্দা কটূক্তি না করিয়া রাজা ও রাজ প্রতিনিধিদিগের গুণগ্রহণ ও উপকারস্বীকার এবং নিজেদের প্রাপ্য অধিকার পাইবার জন্য তাঁহাদের নিকটে যথাবিধি প্রার্থনা করিলে দুর্ব্বল প্রজাবর্গের পক্ষে মঙ্গল হয়।

নারীহিতৈষী মোহিতচন্দ্র।

আমরা অতিশয় শোকসন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় নারীহিতৈষী সুপণ্ডিত ও সুবক্তা অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন এম্‌, এ ঐহিক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৭ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। প্রধানতঃ তিন চারি দিনের জ্বর ও উদরাময় রোগ তাঁহার দেহত্যাগের কারণ হইয়াছে। ২৩ বৎসরবয়স্কা সহধর্ম্মিণী এবং দুইটী শিশু কন্যাকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া তিনি ভগবানের আহ্বানে দিব্যধামে যাত্রা করিয়াছেন।

ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের সঙ্গে মোহিত চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে মনোবিজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দান করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ সরল ও সারগর্ভ এবং অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতা মহিলারা অত্যন্ত উৎসাহ ও আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিয়াছেন, তজ্জন্য সকলে তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। তাঁহার প্রদত্ত পুঞ্জীভূত বক্তৃতা লিপিবদ্ধ আছে, কিয়দংশমাত্র মহিলায় প্রকাশিত হইয়াছে। মোহিতচন্দ্র সেই সকল বক্তৃতা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন, এবং গ্রীষ্মাবকাশের পর উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইলে নূতন বিষয়ে ক্রমশঃ আরও অনেক বলিবেন এরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; এমন সময় বিধাতা তাঁহাকে ইহলোকের কার্য্যক্ষেত্র হইতে লইয়া গেলেন। তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় কে বুঝিতে পারে? এরূপ উৎসাহী পরিশ্রমী উপযুক্ত উপদেষ্টাকে হারাইয়া মহিলাবিদ্যালয় অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

মোহিত চন্দ্র নব বিধান মণ্ডলীর এক জন অগ্রগণ্য কার্য্যদক্ষ সভ্য ছিলেন। তিনি গত মাঘোৎসবের সময় ব্রহ্মমন্দিরে সাধকব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। মোহিত চন্দ্র সম্প্রতি ইংরাজী ভাষায় ব্রহ্মমন্দিরে ক্রমশঃ কয়েকটী বক্তৃতা দান করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। মোহিত চন্দ্রের যেমন চরিত্র নির্ম্মল এবং ধর্ম্মোৎসাহ প্রবল ছিল, তদ্রূপ ইংরাজী সাহিত্যে ও দর্শন শাস্ত্রাদিতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার ন্যায় দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত লোক এদেশে বিরল। তিনি অনেকগুলি গবর্ণমেণ্ট ও প্রাইভেট কলেজে অধ্যাপনার কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষাদাননৈপুণ্যে সকল কলেজের ছাত্রগণই বিশেষ সন্তুষ্ট ও উপকৃত হইয়াছে। তাঁহার রচিত একখান দার্শনিক পুস্তক বি, এ শ্রেণীতে পাঠ্য আছে। বিলাতের প্রধান প্রধান দার্শনিক পণ্ডিতগণ

সেই পুস্তক পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। এক জন বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা সামান্য গৌরবের কথা নহে।

মোহিতচন্দ্রের ন্যায় চরিত্রবান্ ধার্ম্মিক ও সুপণ্ডিত যুবককে হারাইয়া বিধানমণ্ডলী অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি নববিধানের কার্য্যক্ষেত্রে অনেক কার্য্য করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্কল্পমাত্রেই পরিণত রহিল। মহিলাবিদ্যালয়ে প্রদত্ত "গ্রহনক্ষত্র" বিষয়ের তাঁহার একটী বক্তৃতা এবার আমরা যথাস্থানে প্রকাশ করিলাম। মঙ্গলময় পরমেশ্বর দিব্যধামে তাঁহার আত্মাকে সমুন্নত ও আনন্দিত এবং তাঁহার বিরহশোকানলে দগ্ধা সহধর্ম্মিণীর অন্তরে শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

দেবী অঘোর কামিনী।

১লা আষাঢ় শুক্রবার সাধ্বী অঘোর কামিনী দেবীর স্বর্গারোহণের দিন। এবার তাঁহার স্বর্গগমনের দশম বৎসর পূর্ণ হইল। ব্রাহ্মসমাজে মহিলাদিগের মধ্যে তিনি যেরূপ সেবার সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ কেহই প্রদর্শন করেন নাই। দেবী অঘোর কামিনীর স্বামী শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় বাঁকিপুরে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কয়েকটি পুত্র কন্যা উক্তদেবীর নিকটে ছিল। এই রূপ সাংসারিক সুখের অবস্থায় তিনি বৈরাগিণীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন; শোক দুঃখ ভারাক্রান্ত নর নারীর সেবাতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি দুঃখীর দুঃখমোচনে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। সাংসারিক সুখ বিলাসের প্রতি তাঁহার অণুমাত্র স্পৃহা ছিল না। বাঁকিপুরস্থ অঘোর সমিতিনামক মহিলাসমিতি তাঁহার স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ আছে। তত্রত্য মহিলাগণ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করেন।

একদা দেবী অঘোর কামিনী শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের নিকটে যাইয়া তাঁহার প্রমুখাৎ আমাদের মধ্যে "Sister of Mercy"র (সেবার ভগিনীর) প্রয়োজন" এই কথা শ্রবণ করিয়া পরসেবার জন্য তিনি জীবন-উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মপরায়ণ স্বামীর সঙ্গে একাত্মা হইয়া ধর্ম্মসাধন করিতেন। কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার পবিত্র জীবন কাহিনী এবং লক্ষ্ণৌনগরে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাইয়া তিনি স্বামীকে যে সকল আধ্যাত্মিক পত্র লিখিয়াছিলেন তৎ সমুদয় মহিলাতে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণ এ বিষয়ে আর আমরা অধিক কিছু লিখিতে চাহি না। দেবী অঘোর কামিনীর স্বর্গারোহণের দিন নানা স্থানের ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকারা বিশেষ ভাবে প্রার্থনাদি করিয়া থাকেন। সম্প্রতি নব বিধানের প্রেরিতদিগের দরবারে এরূপ স্থির হইয়াছে যে, সেই দেবীর পবিত্র স্মৃতিস্বরূপ প্রতি বৎসর সেই দিনে বিশেষ ভাবে সকলে মিলিত হইয়া উপসনাদি করিবেন।

মহিলাদিগের রচনা।

ভগিনীদিগের প্রতি।

আমার দুর্ব্বল হস্তে রাখ ও শ্রীকর
পেয়ে নব বল
খাটিব তোদেরি তরে—তোদেরি কল্যাণে
সঁপিয়া সকল।

মম এ মস্তকে দাও তোমাদের ওই
শুভ্র পদধূলি,
তোদেরি কল্যাণে,—দুঃখ, অপমান
সব যাব ভুলি।
ঢাল এ নীরস প্রাণে পুণ্য প্রীতিভরা
স্নেহ সুধা রাশি,
জীবন-কুসুম মম লভি সরসতা
উঠুক বিকাশি।
লহ আজি এ জীবন কর বলিদান
(তোমাদের) উন্নতির পথে,
লাগে যদি 'কোন' কাজে, দাও তবে তারে
সে কাজ করিতে।
আজি দাও নাথ!
সঙ্কটসঙ্কুল ভবে চলিতে চলিতে
মম এ জীবন
হইলে কণ্টকবিদ্ধ, ধরে হাতে তারে
করিও গ্রহণ।
দুর্ব্বল হৃদয় মম এ সংসারভারে
হলে অবসন্ন
করিও সবল তারে—দিয়ে স্নেহপূর্ণ
প্রসন্ন নয়ন।
জীবন আঁধারে যবে, চাহি তোমার প'নে
কাঁদিব আকুলে
তখনি হে নাথ! তুমি মুছি আঁখি জল
বক্ষে লবে তুলে।
তুমি সুখে স্বর্গধামে, পড়ে আছি আমি
ধূলির জগতে
কত ব্যথা কত ভার কতই জঞ্জাল
দিয়েছ বহিতে
পারি নে "একাকী" আর দুর্ব্বল জীবন
ঢাল ঢাল তব—
স্বরগে সঞ্চিত নাথ! প্রেম, পুণ্য, জ্ঞান
নিত্য নব নব।
খাটিব উৎসাহভরে, হ'ব অগ্রসর
করিব বহন
যত ভার, যত কাজ, যে'কদিন আছে
এ ক্ষীণ জীবন।

কটক। শ্রীমতী রে—

প্রার্থনা।

১

অনাথের নাথ তুমি করুণা আলয়
আকুল প্রাণেতে নাথ ডাকিছি তোমায়
বিপদভঞ্জন তুমি দয়ার সাগর
দুঃখীরে করিতে দয়া আছ নিরন্তর।

২

(আজ) বিপদেতে পড়ি আমি হেরি অন্ধকার
নিরাশায় ডুবে নাথ কাঁদি বার বার
তোমা বিনা কোন পথ নাহি দয়াময়
তাই নাথ ডাকিতেছি কাতরে তোমায়।

৩

এ জগতে সুখ দুঃখ সমভাবে আছে
সুখপরে দুঃখ সাদা ঘোরে পাছে পাছে
অবোধ মানব মোরা না বুঝিয়া তাহা।
দুঃখেতে আকুল হয়ে করি শুধু আহা।

৪

বিপদেতে প্রাণভরে ডাকিলে তোমায়
নিশ্চয় হওহে প্রভু মোদের সহায়
এ জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে তাহা
কত বার দেখায়েছ অসম্ভব যাহা।

৫

জগতেতে লীলা খেলা কত খেলিতেছ
অধম মানবে প্রভু কত দেখাতেছ

এ জগতে তোমা ছাড়া কেহ কারো নয়
তবু কেন মন প্রভু ডোবে নিরাশায়।

৬

তোমা ছাড়া এ জগতে আর কেহ নাই
তুমি যা ঘটাও প্রভু শুধু হয় তাই
মোহেতে অজ্ঞান মোরা দেখিয়া দেখি না
তাইতো হৃদয়ে প্রভু না পাই সান্ত্বনা।

৭

তাই প্রভু বিপদেতে ধরি ও চরণ
বল ভিক্ষা শান্তি ভিক্ষা চাহি অনুক্ষণ
সর্ব্বদা হৃদয়ে যেন থাক হে আমার
তুমি হে আমার হরি আমি হে তোমার।

মণিরামপুর। অনাথিনী—

——

একাকিনী।

তোমারে হারায়ে জ্বলন্ত হৃদয়ে
এসেছি তোমার ঘরে;
এক এক করি যত পুরাতন
কেবল মনেতে পড়ে।
আকুল হইয়া কেবল বলিলে
বাড়ী নিয়ে চল মোরে
সে আশা উবিল আশা না মিটিল
রাখিয়ে এলাম ঘরে।
এ জনমে আর হবে নাক দেখা
আর না কহিবে কথা
স্মৃতি বুকে লয়ে সতত জ্বলিব
হৃদয়ে রহিবে ব্যথা।
তোমা ছাড়া আমি একাকী সহিব
জগতের দুঃখ ক্লেশ
জগতের কাজ ফুরাইয়া গেলে
সব হয়ে যাবে শেষ।
যত কাল ছিনু তোমার সাথেতে
ছিল না ভাবনা মোর।
আজ কত ভার দিয়েছ মাথায়
রয়েছি আঁধারে ঘোর।
পরলোকে গিয়া যদি দেখা হয়
ভুলিব সকল জ্বালা;
আবার দুজনে দুজনের গলে
পরাব মিলনমালা।
সে সুখের দিন কবে হবে মোর
ভাবিতেছি বসে তাই;
এখন আমার মনেতে কেবল
হইতেছে যাই যাই।
তোমার বিহনে যত সুখ আশা
সব দূরে গেছে চলে;
অশান্ত হৃদয় দিবানিশি হায়
কেবল যাইছে জ্বলে।
এক এক বার এ ভগ্ন হৃদয়
ব্যাকুল হতেছে বড়;
এক এক করি কত কথা মনে
কেবলি হতেছে জড়।
কত দিনে হায় এ দগ্ধ হৃদয়,
তোমায় নিকটে পাবে;
তোমায় দেখিয়ে সকলি ভুলিয়ে
হৃদয়েতে শান্তি পাবে।
ওহে ভগবান তুমি বিনা মোর
আর কে এমন আছে;
তাই দিবানিশি ডাকি দয়াময়
রাখিও আমারে কাছে।
কত দুঃখে তিনি ছিলেন ধরায়
বলিতে পারা যায় না;
তোমার নিকটে এখন যে তিনি
নাহি যে আর যাতনা।

মণিরামপুর। শোকার্ত্তা।

আগমন ও প্রত্যাগমন।

বহুদিন পরে ওগো এসেছি ফিরিয়া
আমার মায়ের ক্রোড়ে; ওগো স্নেহময়ি!
তোমার এ স্নেহ মাগো এ যে বিশ্বজয়ী;
তৃষিত হৃদয়ে মোর উচ্ছ্বসিত করে!
যদিও এসেছি আজি বহুদিন পরে।
তবু মনে জাগিতেছে ফিরে যেতে হবে,—
এ সুখ আনন্দ গীতি মনে জেগে রবে।
শুধু স্বপ্নসম হায় স্মৃতিটী অন্তরে!
পার্থিব বিরহে ক্লান্ত বিষণ্ণ হৃদয়,
জননীর তরে মোর কিন্তু যেই দিন—
এসেছিনু এ ধরায় সুখ দুঃখ হীন
বিশাল ধরণীতলে লইতে আশ্রয়।
সে দিন কি কঁদে নাই পরাণ আমার,
চির স্নেহময়ী বিশ্বজননীর তরে,
অবিরত স্নেহ বর্ষিছেন আমা পরে,
চারি দিকে শত দয়া প্রকাশিত তাঁর।
মায়ের কোলেতে মোর আসিতে যে কত
আনন্দ উচ্ছ্বাস; কবে আসিবে সে দিন—
সে চির আনন্দ ধামে যাইব যে দিন,
বিশ্বজননীর ক্রোড়ে জনমের মত।
কত সুখ কি আনন্দ অসীম আগ্রহে—
মগন হইব গিয়া মা তোমার স্নেহে!

গাজিপুর। শ্রীমতি সা—

আমার বাসনা।

১

আমার বাসনা নাথ! একাগ্র হৃদয়ে,
তোমার সুকাজ সাধি সকল সময়ে।
তোমার আশিষ বিনে,
নাহিক শকতি প্রাণে;
সাহস, শকতি মোরে কর অরপণ,
মনের বাসনা যেন হয় হে পূরণ।
পরদুঃখ হেরি যেন,
কাঁদে মম প্রাণ মন,
পরেরে ভাবিতে পারি যেন আপনার
ডুবে রই চিরদিন সুকাযে তোমার।

২

তুমি দেব দয়াময় রাখিয়া স্মরণ,
হৃদয়ে পুজিব আমি তোমারি চরণ।
জীবনে মরণে স্বামী,
তোমারি রহিব আমি,
ভুলি না ভুলি না যেন তোমারে কখন,
তব নাম হবে মোর কণ্ঠের ভূষণ।
পাপ হতে এ জীবন,
দূরে রাখি সর্ব্বক্ষণ,
পুণ্যেরে চাহিব আমি সানন্দ হিয়ায়,
পূরিবে বাসনা মম তব করুণায়।

৩

যত দিন রহে মম মরতে পরাণ;
স্বার্থ ছাড়ি পর তরে করিব প্রদান।
নিজ ব্যথা পরিহরি,
পরক্লেশ মনে ধরি,
মুছাব দুঃখীর সদা নয়নের জল
শ্রান্তকে আশ্রয় দিব হইতে সবল।
অন্ধজনে করি দয়া,
ঘুচাইব হায় তার যাতনা বেদন,
শুশ্রূষাকারিণী হব রোগীর কারণ।

৪

যবে উপনীত হবে অন্তিম সময়,
দয়া করে পদে তব দিও গো আশ্রয়!
এবে মোরে এ আশীষ,
কর ওহে জগদীশ,

স্বভাবে পারি হে যেন কাটাতে জীবন,
পাপ হ'তে বহুদূরে থাকি অনুক্ষণ।
মহাবিপদের মাঝে,
শুভ ইচ্ছা তব রাজে,
অটল নির্ভীকতায় রহি বিশ্বরাজ,
তোমারি শকতি লভি সাধি তব কাজ।

ছনহরা। শ্রীমতী হে—

প্রভাতে নূতন পাতা।

১

গাছের নবীন পাতা নড়িছে কেমন
আহা কি সুন্দর দৃশ্য সোণার বরণ!
নবীন পাতার গায়, কার নাম লেখা তায়,
সুচতুর শিল্পী যিনি স্রষ্টা নাম যাঁর
নবীন পাতার গায় দেখ নাম তাঁর।

২

তাঁর হস্তে সুরচিত নব পত্রদল,
সুস্বনে গাইছে নাম তাঁহার কেবল,
মৃদু মন্দ সমীরণে এক ধ্যানে একমনে
অবিশ্রান্ত নাম তাঁর করিছে ঘোষণা
তাঁর কথা কয় শুধু যাঁহার রচনা।

৩

নবীন কিরণ পড়ে নবীন পাতায়
আহা কি সুন্দর দৃশ্য প্রভাত বেলায়,
এ দৃশ্য পাতার নয়, নাম যাঁর "দয়াময়"
তাঁর রূপে পরিপূর্ণ নব পত্রদল,
যাঁহার মহিমা সবে ঘোষিছে কেবল।

৪

নমি আজ নত শিরে চরণে তাঁহার,
নমি আজ ভক্তিভরে তাঁরে বার বার,
তাঁর নাম করি গান তাঁর রূপ করি ধ্যান,
তাঁর নামে ভুলে যাই সংসারবাসনা,
তাঁহার ডেকে হোক ধন্য এ ক্ষুদ্র রসনা।

বাঁকিপুর। শ্রীমতী সু—

কোন পূজ্যতম প্রেরিতের চিত্রদর্শনে লিখিত।

আনন্দ-মূরতি তব চিত্রে নিরখিয়া দেব
আনন্দে ভাসিয়া যায় বুক।
কি এক স্বর্গের জ্যোতি বাহিরায় ও নয়নে
পুণ্য তেজে দীপ্ত ওই মুখ।
মানবের অজানিত কি এক আনন্দধারা
বহিতেছে অন্তরে তোমার,
শোক তাপপূর্ণ এই মরুময় ধরামাঝে
ও হৃদয় সুখপারাবার।
ধন ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি নাহিত তোমার কিছু
তবে কেন সম্রাটের মত
সসম্ভ্রমে পৃথীবীর নর নারীগণ সবে
ও চরণে করে শির নত।
বিদ্যার তরে কি শুধু গৌরব তোমার এত
আছেত অনেক বিদ্যাবান,
তাদের চরণে গিয়া কেহত করে না দেব
হৃদয়ের ভক্তি অর্ঘ্যদান।
রাজা মহারাজ যত পূজ্য সবে নিজ দেশে
কেন তুমি পৃথিবীপূজিত,
স্বদেশ ও বিদেশের নর নারীগণ মাঝে
হও এত আদরে গৃহীত।
পৃথিবীর কোন্ রাজা পেয়েছে সম্মান এত
এত খ্যাতি কোন্ সম্রাটের?
তোমার প্রতাপ সম কাহার প্রতাপ আছে
কার নাম এত গৌরবের।
কি এক মহিমাময় জ্যোতির মুকুট তব

অলক্ষ্যেতে শিরে শোভা পায়
জানিনাক কোথাকার অপূর্ব্ব আলোক আভা
ওই পুণ্য আননেতে ভায়।
সে সৌন্দর্য্য নয় ইহা যাহা দুই দিন পরে
পৃথিবীর ধূলীতে মিশায়,
অনন্ত সৌন্দর্য্যময় অনন্তের ছায়া এই
দূরে থেকে দেখে চেনা যায়।
মোহে অন্ধ নরনারী ফিরিয়া বেড়ায় ভ্রমে
দেখিতে না পায় ভগবান
ভক্ত মুখে বুঝি তাই পড়ে আসি ছায়া তাঁর
জুড়াইতে মানবের প্রাণ।
অথবা সে আশা হীনে আশার আলোক দিতে
ভগবান্ হন প্রকাশিত।
তাই পাপী তাপী নরে ভক্ত মুখপদ্ম হেরি
প্রাণে এত হয় আনন্দিত।
পান ভক্ত স্বর্গ হতে অনন্ত করুণাধারা
করুণায় পূর্ণ তাই এত
পৃথিবীর কোন্ কোণে কাঁদে কোন্ নর নারী
তাই শুনি হৃদয় ব্যথিত।
অনন্ত স্নেহের ধারা অনন্ত স্নেহের ছায়া
হৃদে তাঁর প্রতিভাত হয়,
তাই মানবের হিতে জীবন করেন পণ
তাই ভক্ত এত দয়াময়।
অবিশ্বাসমেঘ আসি অন্ধকার করে যবে
মানবের হৃদয় আকাশ,
দেখে নর সে আঁধারে ভক্তের পুণ্যমুখে
সেই মহা জ্যোতির বিকাশ।
ভক্ত পদধূলী পেয়ে এই ধরা পুণ্যভূমি
ভক্তালয় স্বর্গনিকেতন
ভক্ত উপদেশ বিনা কেমনে মোহান্ধ নরে
লভিবে সে বিভুর চরণ।

গাজীপুর। শ্রীমতী উ—

সংবাদ।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, কটক নগরস্থ শ্রীমতী রেবা দেবী কর্ত্তৃক নব প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ময়ুরভঞ্জের মহারাজ দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা সানুনয়ে গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের নিকটে নিবেদন করিতেছি যে, আর এক সঙ্খ্যা প্রকাশিত হইলেই মহিলার একাদশ বর্ষ পূর্ণ হইবে। বর্ত্তমান বৎসরের মূল্য ২৲ এবং যাঁহাদের নিকটে তৎ পূর্ব্ব বৎসরের মূল্য প্রাপ্য অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিলম্বে যেন তাঁহারা পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করেন।

এক জন বন্ধু আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ;—"শিবাজী উৎসবসম্বন্ধে আমার মনে হয়, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে নানা সূত্রে রাজদ্রোহের সঞ্চার করাই ইহার উদ্দেশ্য। বঙ্গদেশ বর্গীর হাঙ্গামায় জ্বালাতন হইয়াছিল। কলিকাতাকে রক্ষা করিবার জন্য মারহাট্টাগড় খনন করিতে হইয়াছিল। 'বর্গী এল দেশে' বলিয়া শিশুদিগকে ভয় দেখাইয়া ঘুম পাড়ান হইত। আর এখন শিবাজী বাঙ্গালায় পূজ্য হইলেন। তবে বক্তীয়ার খিলজী বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া কেন দেশপূজ্য হইবে না?" বন্ধুর কোন ভয় নাই, দুই চারি জন পুলিশ-পুরুষ আসিয়া ধাক্কা মারিলেই শিবাজীর আরাধ্যা সিংহবাহিনী দেবীর ভক্ত মুখসর্ব্বস্ব বীর পুরুষেরা এরূপ পলায়ন করিবেন যে, তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না!

—

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

গ্রহ নক্ষত্র * ।

আজ গ্রহনক্ষত্রবিষয়ে আপনাদিগকে কিছু বলবো মনে করিয়াছি। গ্রহনক্ষত্রের কথা জান্‌লে অনেক জ্ঞান হয় প্রথমতঃ এই সব বিষয় জানতে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল হয়। মনে কর এই চন্দ্র সূর্য্য, অসংখ্য কোটি কোটি নক্ষত্র জ্যোতি দিচ্ছে, এই চাঁদ দিন দিন নূতন আকার ধারণ করিয়া শোভা পাচ্ছে,অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার· আকাশে চাঁদ দেখা গেল না,তার পর আবার দিনের পর দিন একটু একটু করে চন্দ্রের কলাবৃদ্ধি হচ্ছে। সাধারণতঃ এই সব কি করে কি হচ্ছে, জানতে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল মনে হয়। তা ছাড়া আমার মনে হয় এ সব জানা খুব উচিত। কারণ ইহা দ্বারা মনের সঙ্কীর্ণ ভাব দূর হইয়া মনটা খুব প্রশস্ত উদার হয়, একটা বিশাল ভাব আসে। অসীম জগতের মধ্যে তাদের স্থান কোথায় ?' মনটা সর্ব্বদাই একটা অসীম ভাব অনুভব কর্‌তে পারে, আমার মনে হয় ব্রহ্মাণ্ডকে অনন্ত অসীম ভাবে ধারণা করিবার পক্ষে জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রধান সহায়। অনন্ত বোঝা খানিকটা সহজ হত, যদি মানুষ এই অসীম আকাশের বিষয় কিছু কিছু জান্‌তো। অবশ্য আকাশে ভ্রাম্যমাণ এই সকল গ্রহ নক্ষত্রাদির বিষয় জানা অতি কঠিন, জ্যোতির্ব্বিদ্যা অত্যন্ত জটিলতাপূর্ণ তবে সরল· ভাবে বল্‌লে খানিক বোঝা যেতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক ইহা অতি গোলমেলে জিনিষ। সাধারণতঃ যে সব জ্যোতিষ্কমণ্ডল শুধু চোকে দেখা যায় তাহাদের ছয়টি ভাগ করা যেতে পারে। কোন কোনটা স্থির জ্যোতি দিচ্ছে, আবার কতকগুলি তারার জ্যোতি অতি চঞ্চল, দেখ্‌লে বেশ বোঝা যায় যেন একবার জ্বলে উঠছে আবার নিবে নিবে যাচ্ছে। যে তারা গুলির জ্যোতি চঞ্চল সেই তারা গুলিই স্থির হয়ে আছে। মানে নড়ে চড়ে না, এক জায়গায় তিনটে তারা মিলে একটা ত্রিকোণ হয়েছে, চিরকালই সমান ভাবে আছে, পরস্পর সমান দূরে রয়েছে, কোন দিন কোনটা যে কাছে আসে আবার দূরে যায় তা নয়, জ্যোতি চঞ্চল বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে দূরতার সঙ্গে পরস্পরের যে সম্বন্ধ তার কখনও কম বেশী হয় না। এক স্থানে কতকগুলি ঐ তারা মিলে একটি মুকুটের মত হয়েছে, তাকে ইংরাজিতে বলে Corona। প্রত্যেক তারা ঠিক্ তার স্থানে রয়েছে, তাদের মধ্যে সম্বন্ধ ঠিক্ রয়েছে, বাঙ্গলাতে এই গুলিকে নক্ষত্র বলে। ইংরাজি নাম Fix Star ইহারা এক স্থানেই থাকে,পরস্পরের সম্বন্ধ চিরদিন স্থির রাখে, এবং ইহাদের জ্যোতি চঞ্চল, মানে আকাশের গায় যেন ঝিক্‌মিক্ করে। আর কতগুলো তারা যে গুলো তাদের ভিতর চলে ফিরে বেড়ায়, আকাশের গায়ে এক এক দিন এক· এক স্থানে বসতি করে, কোন দিন বা কালপুরুষের কাছে কোন দিন বা সিংহের

---

*. ১৯০৩ সালের ৪ঠা নভেম্বর, স্বর্গগত অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন তাহার সার এই।

কাছে দেখা যায়, তাদের নাম Planet বাঙ্গালা নাম গ্রহ। চাঁদ একটি গ্রহ, চাঁদের স্থির বসতি নেই, একটা আখ্যায়িকা আছে যে চাঁদের ২৭ জন স্ত্রী, এক একদিন এক একজনের নিকট থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক আকাশে ২৭ টি তারা আছে। তাদের নাম অশ্বিনী, ভরণী অশ্লেসা, মঘা, ইত্যাদি। চাঁদকে এক এক রাত্রিতে এক একটির নিকট দেখা যায়। সূর্য্যের চারি দিকে এই রূপ তারার দল আছে, এক একদল তারা মিলিত হইয়া এক একটি রাশি হইয়াছে। এইরূপ ১২টা রাশি আছে। পাঁজিতে সেই সব রাশির নাম আছে, যেমন, বৃষ, সিংহ, ইত্যাদি। সূর্য্যের ঐ ১২ টী রাশি ঘুরে আসতে একটি বৎসর লাগে। আর কতকগুলি তারা আছে যারা আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে একবার ঘুরে আসে, কোনটার একবার ঘুরতে এক বৎসর লাগে, আবার কোনটার অনেক বেশী সময়। এই সব তারাই গ্রহ, শনি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, Euranus, Naptune। এই গ্রহ গুলিই এক একবার আপনাদের নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরে আসে। শনি গ্রহের একবার ঘুরে আসতে ৩০ বৎসর লাগে, শুক্র গ্রহের ১৬৫ বৎসর লাগে, এইরূপ প্রত্যেকটীর নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। মঙ্গল গ্রহের একবার ঘুরে আসতে সবচেয়ে কম সময় লাগে, ২॥ বৎসরে ঘুরে আসে। তাই বলছি মঙ্গলটার ঘোরা বেশ দেখতে পাওয়া যায়, একটু নিরীক্ষণ করে দেখলে তিন মাসের মধ্যেই বেশ বোঝা যায়। যেখানে ছিল সেখান থেকে খানিকটা সরে গেছে। শুকতারার গতির স্থিরতা নেই। কখনও বা সূর্য্যের প্রথমে আবার কখনও সূর্য্যের পশ্চাতে দেখা যায়। আজকাল সূর্য্যের প্রথমে মানে সূর্য্য উঠবার আগেই যেন দূতের মত এসে সূর্য্যের কথা ঘোষণা করে। আজ কাল ভোর বেলা খুব উজ্জ্বল শুকতারা দেখা যায়। আবার কখনও সূর্য্য ডুবে যাবার পর সন্ধ্যা বেলা শুকতারা দেখা যায়। শুকতারা ও মঙ্গল এ দুটীর গতি বেশ বুঝতে পারা যায়। এই সব তারাদের ঘুরবার গতি দেখে মনে হয় যেমন যদি একদল লোক কোন একটা বাগানে বা মাঠে বেড়াতে যায়, তাহলে তাদের ভিতর একটা দল করা হয়, কড়রা একদল চলেছেন, তাঁরা কখনও দল ভাঙ্গেন না, ঠিক ঠিক ভাবেই চলেন, আর ছোটরা যেতে যেতে প্রায়ই দল ভেঙ্গে এসে কেউ বা পেছনে পড়ে আছে, কেউবা একটু দল থেকে সরে পড়েছে সেইরূপ তারকানিচয়ের মধ্যে যে গুলি বড় তারা নির্দ্দিষ্ট পথে, দল বেঁধে যায়, আর ছোট ছোট তারারা প্রায়ই তাদের স্থান বদলায়। গ্রহ আর নক্ষত্রের মধ্যে আর একটা তফাৎ এই, নক্ষত্র আপনার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্, যেমন একটা বাতি জ্বলে তার ভিতর আলো তৈয়ারী করবার সব উপাদান আছে, সেইরূপ নক্ষত্রের ভিতর এমন সব গ্যাস ইত্যাদি আছে যাহা আপনাহতেই জ্বলছে ও দীপ্তি দিচ্ছে, আর কতকগুলো তারা গ্রহ ইত্যাদি সব অন্যের জ্যোতিতে জ্বলছে। গ্রহগুলি সবই সূর্য্যের আলোকে আলোকিত, চন্দ্রের এত জোৎস্না, তাহা তার নিজের আলো নয়। অপরের আলোকে আলোকিত হওয়ার

দুইটি উপায় আছে। আলো কখনও বাঁকা হয়ে আসে না, ঠিক সমান গতিতে চলে। মনে কর পেছন দিকে একটা বাতি আছে, তার আলোটা আমরা দেখতে পাই না, কারণ সেটা উলটাদিকে ঠিক সোজা জ্যোতিতে যাচ্ছে, সুতরাং আমরা কিছু দেখতে পাই না। এই রূপ সকল আলোকেরই গতি ঠিক সোজা ভাবে চলে। এই সোজা আলোককে বেঁকান যেতে পারে' খুব স্বচ্ছ জিনিষের উপর আলো পড়লে তৎক্ষণাৎ বেঁকে যায়, সূর্য্যের আলোক আরশিতে ফেলে বেশ দেখা যায়, সূর্য্যের জ্যোতিটা প্রথম ঐ আরশির উপর পড়ে তার পর বেঁকে গিয়ে হয়ত ঘরের ভিতর দেয়ালের গায় পড়ে। জিনিষটা যত স্বচ্ছ হবে ততই আলো বেঁকাতে পারে, এমন কি খুব স্বচ্ছ হলে সম্পূর্ণভাবে আলো বেঁকাতে পারে, যাহা দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে আলো বেঁকানো হয় সে জিনিষটা দেখতে পাওয়া যায় না। ক্রমশঃ।

মূল্যপ্রাপ্তি।

৯ম বৎসর।

শ্রীমতী বিরজা সুন্দরী সিংহ,	মুনশীগঞ্জ	২৲
„ সৌদামিনী সরকার,	সিরাজগঞ্জ	১৲
„ রায়,	কাশীপুর	১৲

১০ম বৎসর।

„ সৌদালিনী সরকার	সিরাজগঞ্জ	২৲
„ বিনয়কুমারীধর,	চট্টগ্রাম	১৲
„ রায়,	কাশীপুর	২৲
„ বিরজা সুন্দরী সিংহ,	মুন্‌শিগঞ্জ	২৲
শ্রীযুক্ত রঘুনাথ সিংহ,	মান্দালা	২৲

১১শ বৎসর।

শ্রীমতী সাবিত্রীবালা দেবী,	গাজীপুর	২৲
„ প্রিয় বালা রায়,	খেরুয়া	২৲
„ সৌদামিনী সরকার,	সিরাজগঞ্জ	১৲
„ পুষ্পমালা দেবী,	রেঙ্গুণ	২৲
„ সুজাতা সেন,	কলিকাতা	২৲
„ বিনয়কুমারী ধর,	চট্টোগ্রাম	১৲
„ বিরজা সুন্দরী সিংহ,	মুন্‌শিগঞ্জ	১৲
„ রায়,	কাশীপুর	২৲
„ জ্ঞানদা সুন্দরী মজুমদার,	মেদিণীপুর	২৲
শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দে,	কুচবিহার	১৲
„ জানকীনাথ বসু,	কটক	২৲
„ রঘুনাথ সিংহ,	মান্দালা	১৷৶০
„ সুরেন্দ্র নাথ দত্ত,	শিলচর	২৲
„ মহারাজ মুনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী	কাশিম বাজার	২৲
„ সিদ্ধেশ্বর সরকার,	ভাগলপুর	২৲
„ হাজারিলাল,	পূর্ণিয়া	৷০

সূচী।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২, টাকা মাত্র।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"

১১শ ভাগ] আষাঢ়, ১৩১৩; জুলাই, ১৯০৬। [১২শ সংখ্যা।

স্ত্রী-নীতিসার।

এক্ষণ বালক বালিকাদিগের অবাধ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; তাহারা এক একটা সাময়িক হুজুকে ও আন্দোলনে পড়িয়া বালসুলভ নম্রতা ও শিষ্টতা হারাইয়া ফেলিতেছে; অনেকে ইচড়ে পাকা কাঁটালের ন্যায় বিকৃত বৃদ্ধত্ব লাভ করিয়া লেখা পড়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়িতেছে, জ্যেষ্ঠ গুরুজনদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া চলিতেছে। ছেলে মেয়েরা যে একেবারে বয়ে যাইতেছে জননী কি তৎপ্রতি লক্ষ্য করেন? কি এক ভীষণ দুর্নীতির স্রোত আসিয়া পড়িয়াছে, সেই স্রোত কোমলমতি বালক বালিকাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে; তাহারা শাসনের অতীত হইয়া পড়িয়াছে। মায়ের মনে কি একটু ভয় হইতেছে না?

বর্ত্তমান সময়ে জননী সুনীতির সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে না পারিলে বালক বালিকাদিগের ভাবী জীবন অতীব শোচনীয় হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক মা কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া উন্মার্গগামী সন্তানদিগকে প্রশ্রয় দিতেছেন, উৎসাহিত করিয়া তুলিতেছেন। অনেক জননী অন্তঃপুরে বাস করিয়া সন্তানদিগের সাক্ষাতে রসনারূপ ছুরিকাদ্বারা রাজা ও রাজপুরুষদিগকে মারেন ও কাটেন, মান্য গণ্য ও শ্রদ্ধাস্পদ লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিন্দাবাণ বর্ষণ করেন। এই সকল দেখিলে শুনিলে অবোধ বালক বালিকারা উৎসাহিত হইবে না কেন? অনেক মহিলা-সমিতি সুনীতি-প্রতিষ্ঠার জন্য না হইয়া দুর্নীতিবিস্তারের জন্য কুৎসিত আন্দোলনের পোষকতার জন্য হইতেছে!

মহিলাগণ কোন হুজুকে না চলিয়া অন্তর্দৃষ্টি অনুসারে চলিয়া, বালক বালিকাদিগকে সত্যাসত্য কল্যাণ অকল্যাণ বুঝাইয়া শাসিত ও বাধ্য রাখিতে যত্ন করিলে নিজের ও সন্তানদের কল্যাণ হইবে।

মাতৃজাতির অবমাননা।

ঈশ্বরের সুকোমল মাতৃভাব নারীজাতির জীবনে বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত। এজন্য আমরা নারীজাতিকে মাতৃজাতি বলিয়া শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। তাঁহাদিগের দ্বারা সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষিত হইতেছে, তাঁহারা সন্তান গর্ভে ধারণ করেন, পরম যত্ন স্নেহ ও অশেষ সহিষ্ণুতা সহকারে বক্ষে ধারণ করিয়া স্তন্যদানে ও নানা উপায়ে শিশুদিগকে পালন করিয়া থাকেন! নারীজাতির সন্তানপালন ও স্নেহ দয়া দেখিলে তাঁহারা যে পরমমাতার প্রতিনিধিরূপে সংসারে কার্য্য করিতেছেন, সংসারের শ্রী উন্নতি ও পবিত্র পারিবারিক বন্ধনের মূলে তাঁহাদের যে বিশেষ ক্রিয়া ও প্রভাব, তাঁহাদের অভাবে যে সংসার শ্মশানে পরিণত, গৃহশূন্য ও দুঃখের আলয় হয়; কোন্ চক্ষুষ্মান্ বিশ্বাসী ইহা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন? "স্ত্রিয়ঃ শ্রেয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।" অর্থাৎ স্ত্রী আর লক্ষ্মীতে কোন প্রভেদ নাই।

হিন্দুদিগের প্রধান অভীষ্টদেবতা কালী দুর্গা লক্ষ্মী প্রভৃতি নারীজাতীয়া মাতৃজাতীয়া। হিন্দুলোকেরা ভক্তিপূর্ব্বক সেই সকল দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন; কিন্তু তাঁহারা মাতৃরূপে জগতে অবতীর্ণা জীবন্ত দেবীমূর্ত্তি নারীর যেরূপ অবমাননা করেন, বোধ হয় পৃথিবীর কোন জাতি এরূপ করে না। পুত্রসন্তান হইলে পরিবারে কত আমোদ আহ্লাদ ও উৎসব হয়, কন্যা হইলে সকলের মুখ মলিন হইয়া থাকে, পিতা আপনাকে কন্যাদায়গ্রস্ত জানিয়া ভাবিত হন। উপর্য্যুপরি দুই তিনটী কন্যা প্রসব করিলে প্রসূতি সকলের বিরাগভাজন হন। আমাদের এক জন নির্ব্বোধ গোঁয়ার আত্মীয়, ক্রমে তিনটী কন্যা সন্তান প্রসব করাতে স্ত্রীর উপর ভয়ানক চটে গিয়াছিল। চতুর্থ সন্তান প্রসবের সময় সে একখান ধারাল দা হস্তে ধারণপূর্ব্বক আতুর ঘরের দ্বারে বসিয়া স্ত্রীকে ধমকাইয়া বলিয়াছিল, "বজ্জাত, তুই বার বার পেট হইতে মেয়ে আনিয়া আমাকে জ্বালাতন করিতেছিস্, এবার যদি তোর ছেলে না হয় তোরে কেটে ফেলিব।" প্রসূতি নিদারুণ প্রসববেদনায় ত্রাহি ত্রাহি করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন, তাহার উপর দুর্দ্দান্ত স্বামীর এরূপ তাড়না, তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন, ভাগ্যক্রমে সেইবার পুত্র সন্তান হইল। প্রসূতি বাঁচিয়া গেলেন। পরিবারে আনন্দধ্বনি, হুলুধ্বনি হইতে লাগিল। প্রসূতি স্বামীর ও আত্মীয়বর্গের প্রসন্নতা লাভ করিলেন। একটী বৃদ্ধা মহিলার নাতবৌ ক্রমে কয়েকটী কন্যা প্রসব করেন, তাহাতে ঠাকুরমার মনে অতিশয় দুঃখ ক্লেশ হয়, পুনর্ব্বার বধূর সন্তান সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি কার্ত্তিক ঠাকুরের একটী মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি বধূর বাসগৃহে রাখিয়া দেন। ঠাকুরমা ভাবিয়াছিলেন যে, ইহাতে কার্ত্তিকের মত একটী সুন্দর কুমার হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে নাতবৌ মেয়ে প্রসব করেন, তাহাতে বৃদ্ধা দুঃখ ক্লেশে ম্রিয়মাণ হন, মেয়েটী ক্ষুধায় কাঁদিয়া উঠিলেই তিনি বলিতেন, "চলে যাও, লীলা সম্বরণ কর, আর জ্বালাতন করিও না।" বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে স্তনে অহিফেণ লেপন করিয়া অনেক জননী স্বীয় গর্ভজাত স্তন্য-

পায়িনী কন্যাদিগকে বধ করেন। এই ভয়ানক নৃশংস আচরণের কথা সকলেই জানেন। বহুকাল হইতে প্রতিবৎসর এইরূপ লক্ষ লক্ষ কন্যার প্রাণবধ হইতেছিল। কিয়ৎকাল হইল রাজশাসনে এবং সে দেশের জনহিতৈষী লোকদিগের যত্ন চেষ্টায় সেই নিদারুণ হত্যা-কাণ্ডের কথঞ্চিৎ নিবারণ হইয়াছে। কন্যার ৮।১০ বৎসর বয়ঃক্রম হইলেই পিতা তাহাকে বিবাহ দিয়া 'কন্যা-দায় হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। অনেকে সময়ে সময়ে পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া অপাত্রে—সুরাপায়ী, ব্যভিচারী মূর্খ পাত্রে ন্যস্ত করিয়া কন্যাকে চিরদুঃখিনী করেন। কন্যা চাকুরী ও ব্যবসায় বাণিজ্যাদি করিয়া অর্থোপার্জ্জন-পূর্ব্বক পিতা মাতার সাহায্য করিতে পারেন না, এই অপরাধই তাঁহার প্রতি অনাদরের প্রধান কারণ। মোসলমান কন্যাদিগের প্রতি অন্য যত প্রকার অন্যায় ব্যবহার হউক না কেন, তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া থাকেন; কিন্তু হিন্দুসমাজের কন্যাগণ পৈতৃক স্থাবর অস্থাবর সর্ব্ববিধ সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হন, তাহাতে সর্ব্বতোভাবে পুত্রের অধিকার। শাস্ত্রকর্ত্তারা প্রবল পুরুষজাতি ছিলেন; দুর্ব্বল অবলাজাতির প্রতি তজ্জন্য তাঁহাদের এই রূপ পক্ষপাত বিচার হইয়াছে।

এ দেশে মাতৃজাতির যে কত রূপ অব-মাননা তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না! কোন দুষ্ট দুরাত্মা পথে একটী নারীকে অপ-মান করিলে পাঁচ জন পুরুষ তাহা দেখিয়া দুঃখিত না হইয়া বরং আমোদ করে, অবমাননা-কারী দুরাত্মাকে উৎসাহ দিয়া থাকে। মাতৃ-জাতির প্রতি যাহাদের এরূপ ব্যবহার তাহারা আবার স্বদেশপ্রেমিক বলিয়া বক্তৃতা করে ও স্পর্দ্ধা করে, দেশোদ্ধারে প্রবৃত্ত। দেশের অর্দ্ধাঙ্গ ব্যাধিগ্রস্ত বিকল রাখিয়া দেশোদ্ধার করা হইবে! মাতৃজাতির গৌরবরক্ষার জন্য ইংরাজেরা প্রাণদানে কুণ্ঠিত হন না। আজ একটী ইয়ুরোপীয় মহিলাকে কোন দুরাত্মা অপমান করুক, দেখিবে সেই অপমানকারীর কি দুর্দ্দশা হয়। ইংরাজসমাজে মাতৃজাতির উচ্চ সম্মান। তাঁহারা আমাদের ন্যায় মাতা ভগিনী ও পত্নীদিগকে রাঁধুনী ও চাকরাণীশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করেন না, ভূলোকে দেবী বলিয়া সম্মান করেন। ইয়ুরোপীয় বহু মহিলা পুরুষের সাহায্যে নানা বিষয়ে শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভ করিয়া কত উন্নত জীবন লাভ করিয়াছেন, জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত হইয়া দেশের মঙ্গলকার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছেন, তাঁহাদের চরিত্রপ্রভায় সে দেশের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। এ দেশের পিতৃগণ বালকের শিক্ষার জন্য মুক্ত-হস্তে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিবেন, বালিকার জ্ঞানোন্নতির জন্য তাহার শতাংশের একাংশ ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হন। বালিকাদের মনোবৃত্তি ও উচ্চ ভাব সকল অভিভাবক-দিগের নিষ্পেষণে স্ফূর্ত্তিলাভের অবকাশ পাইয়া উঠে না।

সৌভাগ্যক্রমে এ দেশ ইংরাজাধিকৃত হওয়াতে তাঁহাদের প্রভাবে এক শ্রেণীর মহিলাদের কথঞ্চিৎ উন্নতির দ্বার মুক্ত হই-য়াছে। তাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাইতেছেন। স্থলবিশেষে তাহার অপব্যবহার হইতেছে সত্য, কিন্তু ইংরাজদিগের নিকটে শিক্ষা পাইয়া ইংরাজদিগের দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মসমাজ

মাতৃজাতিকে সম্মানদানে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন। ইংরাজরাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকিলে কালে এই জাতির প্রতি অবমাননা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া গৌরব বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু অনেক ইংরাজের মনে মাতৃজাতির প্রতি উচ্চ পবিত্র ভাব নাই, তাহারা বাহ্যিক ভাবে নারীদিগকে সম্মান দান করে, এবং তাহাদের তোষামোদ করিয়া চলে। আমরা এরূপও শুনিয়াছি যে, কোন কোন ইংরাজ বিবীদিগের প্রতি একান্ত ভক্তি প্রদর্শনজন্য তাঁহাদের চর্ম্মপাদুকাকে পানপাত্র করিয়া তাহাতে মদ ঢালিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পান করিয়াছে। তাঁহাদের প্রতি এরূপ সম্মাননা অপেক্ষা অবমাননা বরং ভাল। নারীজাতিতে পরম জননীর আবির্ভাব দর্শন করিয়া তাঁহাদের দেবীত্বের সম্মান করিলে তাঁহাদের প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করা হয়। আর মাতৃজাতিকে নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিলে তাঁহাদের অবমাননা হয়। তাঁহাদের প্রতি সেই অবমাননার ভাব এ দেশের বহু লোকের মনে প্রবল রহিয়াছে। তাহা বিদূরিত না হইলে জাতীয় উন্নতি কিছুতেই সম্ভব নহে। পুতুল পূজা করিয়া, ৮।৯ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ দিয়া, বাহিরে আহারাদিতে হিন্দুয়ানীর চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়া ঘরে যাইয়া স্ত্রীর ভয়ে হিন্দু হইয়া দেশোদ্ধার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। এরূপ বহু ক্ষণজন্মা বীর পুরুষ এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বক্তৃতার জ্বালায় কেবল জ্বালাতন হইতে হয়।

কাহারও দুই তিনটী কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণের পর একটি পুত্র সন্তান জন্মিলে লোকে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলে, অমুকের এবার একটি সুসন্তান হইয়াছে।" তাহারা কন্যাগণকে কুসন্তানের মধ্যে গণ্য করে। পূর্ব্ববঙ্গে কোন প্রসূতি পুত্রসন্তান প্রসব করিলে পাঁচ বার হুলুধ্বনি করা হয়, কন্যা প্রসব করিলে আত্মীয়া মহিলারা চারি বার হুলুধ্বনি করেন। ব্যাটা ছেলে সম্বন্ধে এরূপ পক্ষপাত। ভাল জিজ্ঞাসা করি, বিধাতা পুত্রকন্যা দুইজনকে মাতৃগর্ভে সৃজন করিয়া কন্যা অপেক্ষা পুত্র সম্বন্ধে কি আদর যত্নে পক্ষপাত করিয়া থাকেন? ব্যাটা ছেলের জন্য মাতৃস্তনে দুগ্ধ অধিক, মেয়ের জন্য দুগ্ধ কম যোগান? ব্যাটা ছেলের শরীর সুন্দর রূপে গঠনের জন্য দশমাস মাতৃগর্ভে রক্ষা করেন, এবং কন্যার দেহ ভালরূপে গঠন না করিয়া সাত মাসের মধ্যেই ভূমিষ্ঠ করিয়া থাকেন? ছেলে মেয়ে এই দুইয়ের সম্বন্ধে তাঁহার স্নেহ যত্নের কি তারতম্য হইয়া থাকে? তোমরা কেন বিধাতার উপর বিধাতৃত্ব করিতে চাও? এ দেশের লোকের ব্যবহারে এরূপ বুঝা যায় যে, কেবল পুত্রই যেন মাতৃগর্ভে জন্মে, কন্যাগুলি বানের জলে ভাসিয়া আইসে। কন্যা বয়স্থা হওয়ার পূর্ব্বে বিধবা হইলেও বলপূর্ব্বক তাহাকে তাহার সকল সুখ ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, এদিকে বৃদ্ধাবস্থায় একজন পুরুষ স্ত্রীহীন হইলে একটী বালিকার সঙ্গে বিবাহ দিয়া তাহার নূতন সাংসারিক সুখের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে? মাতৃজাতির প্রতি এদেশে এরূপ অবমাননা হইতেছে, বড় দুঃখের বিষয়। তাঁহাদের সম্মানবৃদ্ধি না হইলে, বাগ্মিগণ, তোমাদের দেশহিতৈষণার বক্তৃতা কেবল

চীৎকারেই পরিণত থাকিবে। তাঁহারা সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ, এই অর্দ্ধাঙ্গকে বিকল রাখিয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া তোমাদের দেশসংস্কার ও সমাজসংস্কার বাতুলতামাত্র।

লীলা ও মেজদাদা।

ব্রহ্মাণ্ডের কথা।

লীলা। মেজদা, তুমি যে সে দিন ব্রহ্মাণ্ডের কথা কি বলবে বলেছিলে, আজ তা বল না। ঘরের কাজ কর্ম্ম সব সেরে এসেছি, এখন খানিক ক্ষণ বস্‌তে পারব।

মেজদা। তোমার আগ্রহ দেখে সুখী হলেম। আমি ভাবছিলেম, তুমি বুঝি ও কথাটা ভুলেই গিয়েছ।

লীলা। না মেজদা, তা ভুলি নাই। এ কয় দিন আমার মোটেই অবসর ছিল না।

মেজদা। অবসর যে ছিল না, তা আমার ছেঁড়া মোজা জোড়ার অবস্থা দেখেই বুঝতে পেরেছি।

লীলা। তোমার মোজা আমি এখনই মেরামত করে দিচ্ছি, তোমার কথাও শুনব, সেলাইও করব। সুশীলার মাকে জান তো?

মেজদা। জানি বই কি, কেন তার কি হয়েছে?

লীলা। গেল সোমবার তিনি আবার হঠাৎ খুব কাতর হ'য়ে পড়েছিলেন। তার দুদিন পূর্ব্বে সুশীলাকে তার শ্বশুর বাড়ী নিয়ে গিয়েছে। তাঁর শুশ্রূষা করে বা পথ্য প্রস্তুত করে দেয়, এমন কেহ নাই। তাঁর বড় কষ্ট মেজদা! এ কয় দিন দুপুর বেলা তাড়াতাড়ি ঘরের কাজকর্ম্ম সেরে আমি সুশীলার মার নিকট চলে যেতাম, কাল অবধি তিনি অনেকটা সুস্থ আছেন।

মেজদা। আমি ভাবছিলেম তুমি বুঝি কেবল সুশীলাকে দেখবার জন্যেই যেতে। তা বেশ ক'রেছ, সেবাব্রত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম নাই। তাঁহার পথ্যাদি তা'হলে তুমিই বোধ করি প্রস্তুত ক'রে দিয়েছ?

লীলা। না, মা নিজে এখানে সব তৈয়েরি করে দিতেন। আমি ননীতে সে সমস্ত সেখানে নিয়ে যেতাম।

মেজদা। মা আমাদের মূর্ত্তিমতী দয়া।

লীলা। মেজদা, আমি যে একটা মস্ত কাজ করেছি, তা জান?

মেজদা। তুমি না বল্লে, তা কি করে জান্‌বো? কি করেছ?

লীলা। তুমি যে আমাকে একটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্‌স ও চিকিৎসার বই দিয়েছিলে, তা তোমার মনে আছে?

মেজদা। হাঁ, রচনার প্রাইজের বাক্‌স তো?

লীলা। হাঁ, তাই। আমি যে উহার অপব্যবহার করি নি, সে জন্য আমাকে ধন্য-বাদ দিবে। বই দেখে দেখে আমি অনেককে ঔষধ দিয়েছি। পরশু দিন সুশীলার মা বেদনায় খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন, তা দেখে আমার বড় দুঃখ হয়। তখন হঠাৎ সেই ঔষধের বাক্স ও বই এর কথা মনে পড়ল, আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসে ভাল ক'রে বই খানা পড়লেম, আর একটা ঔষধ স্থির ক'রে তা সুশীলার মাকে খেতে দিলেম। শুনে আশ্চর্য্য হবে, পনের মিনিটের মধ্যে ঐ বেদনা প্রায় সম্পূর্ণ সেরে গেল।

মেজদা। তাইত, তুমি দেখছি এরি মধ্যে ডাক্তার হ'য়ে পড়লে।

লীলা। তাতে ক্ষতিই বা কি? কিন্তু সেকথা যাক, ব্রহ্মাণ্ডের কথা এখন বল।

মেজদা। ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধে দু এক কথায় কিছুই বলা যায় না, তথাপি মোটা মোটি কয়েকটী কথা তোমাকে বলিতেছি। গত মাসের মহিলাতে গ্রহনক্ষত্রসম্বন্ধে সামান্য আলোচনা ছিল, তা তুমি অবশ্যই পড়ে থাক্‌বে।

লীলা। হাঁ পড়েছি, তাহাতে প্রথমেই বলা হয়েছে যে, আমাদের এই আকাশে কোটি কোটি চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদি ভ্রমণ করিতেছে। আমার কিন্তু তা ধারণায়ই আসছে না।

মেজদা। তা না আসবারই কথা। ব্রহ্মাণ্ড এমনই বিশাল যে, তাহার চিন্তা আমাদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সাহায্যে অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব জানিতে পারা গিয়েছে।

লীলা। কিন্তু যখন এ সমস্ত যন্ত্র ছিল না, তখন ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধে লোকের ধারণা কিরূপ ছিল?

মেজদা। এ প্রশ্নের উত্তরে সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস আলোচনা করিতে হয়। তদ্‌বিষয়ে অন্য একদিন আলোচনা করা যাইবে। এখন ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতাসম্বন্ধে দু একটী কথামাত্র বলিব। ভূগোলবিবরণে পৃথিবীর পরিধি, পৃথিবী হইতে চন্দ্র ও সূর্য্যের দূরত্বের কথা লিখিত আছে, মনে আছে কি?

লীলা। হাঁ, মনে আছে, তাহাতে পড়িয়াছি, পৃথিবীর পরিধি প্রায় পঁচিশ সহস্র মাইল, আর পৃথিবী হইতে চন্দ্র দুই লক্ষ মাইল ও সূর্য্য নয় কোটি বিশ লক্ষ মাইলেরও অধিক দূরে অবস্থিত।

মেজদা। ঠিক বলেছ, কিন্তু তাহাতে যে বিশালতার ভাব প্রকাশিত হচ্ছে, তা তোমার ধারণায় আসছে কি? যখন কোনও জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে বসিয়া চন্দ্রের নির্ম্মল স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য উপভোগ কর, তখন কি সেই দূরত্বের কথা একবারও মনে জাগে, কিংবা তদ্বিষয়ে একটুও চিন্তা ক'রে থাক? সূর্য্যসম্বন্ধেও সেই কথা; তোমার হয়ত ধারণাই নাই, সূর্য্য কত বড়।

লীলা। শুনিয়াছি পৃথিবী ও চন্দ্র অপেক্ষা সূর্য্য অনেক বড়।

মেজদা। একথায় সূর্য্যের বিশালতাসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। তুমি অবশ্য জান, চন্দ্র পৃথিবীকে ও পৃথিবী সূর্য্যকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিতেছে।

লীলা। হাঁ, তাহা পড়িয়াছি।

মেজদা। আচ্ছা মনে কর, সূর্য্য যেন একটা অতি প্রকাণ্ড রকমের ফাঁপা ফুটবল, আর ঐ বলের ঠিক কেন্দ্রস্থলে আমাদের পৃথিবী। এই অবস্থায়ও চন্দ্র পৃথিবী হইতে দুই লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া ঐ কল্পিত বলের ভিতরে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবার যথেষ্ট স্থান পাইবে। এখন ভেবে দেখ সূর্য্য কত বড়।

লীলা। তোমার কথায় তবে এই অর্থ হইল যে, চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যে যে দূরত্ব আছে, তাহা ঠিক রাখিয়া সেই অবস্থায়ই

উহাদিগকে সূর্য্যের ভিতর অনায়াসে পূরিয়া রাখা যায়।

মেজদা। হাঁ, কিন্তু তাহাতেও সূর্য্যের আয়তনের প্রকৃত ধারণা হইল না। আর একটা উদাহরণ দিতেছি। আমাদের সৌর জগতে যত গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু প্রভৃতি আছে সূর্য্য ব্যতীত অপর সকলগুলিকে একত্র ক'রে যদি একটা গোলকে পরিণত করা যায়, তাহা হইলেও উহার আয়তন সূর্য্যের আয়তনের শতাংশের তিনাংশমাত্র হইবে।

লীলা। আচ্ছা, এত বড় সূর্য্য আমাদের এই ক্ষুদ্র আকাশে কি ক'রে স্থান পায়?

মেজদা। এ যে নিতান্ত হাস্যকর কথা বল্লে, আকাশ যে ক্ষুদ্র তোমাকে কে বলিল?

লীলা। কেউ বলে নি, তবে যেন মনে হয়, আকাশটা পৃথিবীকে ঠিক ঢাকিয়া রহিয়াছে, উহা পৃথিবী হইতে অপেক্ষাকৃত একটু বড় হইবে।

মেজদা। আকাশের সম্বন্ধে তোমার ধারণা নিতান্তই অসম্যক্। আকাশ যে অনন্ত, অসীম।

লীলা। আমি তা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।

মেজদা। যে নীল নভোমণ্ডল আমাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে, উহা যে কোনও দৃঢ় পদার্থ নহে, তাহা অবশ্য জান?

লীলা। হাঁ, তা জানি।

মেজদা। এই আকাশ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে। যেখানেই কেন যাও না, শূন্য বা আকাশ ছাড়াইয়া কোথাও যাইতে পারিবে না। এই অনন্ত আকাশে সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, নক্ষত্রাদি নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে।

লীলা। আকাশের তাহ'লে কোথাও শেষ নাই!

মেজদা। না, অন্ততঃ আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। ইহা যে কত বিস্তৃত, একটা উদাহরণেই তাহা বুঝিতে পারিবে। একটু পূর্ব্বে তুমি বলিয়াছ পৃথিবী হইতে সূর্য্য নয় কোটি বিশ লক্ষ মাইলেরও অধিক দূরে অবস্থিত। ঐ সূর্য্যের আলো এতটা দূর অতিক্রম করিয়া পৃথিবীতে মাত্র আট মিনিটে পঁহুছিয়া থাকে। আলোক তা হলে কিরূপ কল্পনাতীত দ্রুতগতিতে চলিয়া থাকে বুঝিতে পারিতেছ। আমাদের সৌর জগৎ ছাড়াইয়া এই অনন্ত আকাশে আরও অসংখ্য সৌরজগৎ রহিয়াছে। আমাদের সৌরজগতের ঠিক পরবর্ত্তী সৌরজগতে উক্ত আলোক তদ্রূপ গতিতে চলিতে চলিতে সাড়ে তিন বৎসরে পঁহুছিয়া থাকে। আর পরবর্ত্তী সৌরজগতে যাইতে আলোকের সাত বৎসর কাল পর্য্যটন করিতে হয়। তবেই ভাবিয়া দেখ, আকাশ কত বিস্তৃত, আমরা তাহা কল্পনাই করিতে পারি না। আর এই আকাশে যে এরূপ কত শত শত কোটি কোটি সৌরজগৎ রহিয়াছে তাহার অন্ত নাই।

লীলা। এই সমস্ত লইয়া তো ব্রহ্মাণ্ড?

মেজদা। হাঁ, কিন্তু আমরা অদ্যাপি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বলিতে গেলে কিছুই জানিতে পারি নাই। রাত্রিকালে আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র দেখিতে পাও, উহাদের প্রত্যেকটি এক একটা প্রকাণ্ড সূর্য্য অথবা তাহা হইতেও আকারে বড়। ইতিপূর্ব্বে

আলোকের গতির কথা বলিয়াছি; আকাশে এমন নক্ষত্র আছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে, জগৎ সৃষ্টি অবধি উহার আলোক নিয়ত উক্তরূপ গতিতে আকাশ পর্য্যটন করিয়াও আজিও পৃথিবীতে পঁহুছায় নাই।

লীলা। মেজদা, তোমার কথা শুনে আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিতেছে। আমার মনে হয়, ব্রহ্মাণ্ড এত বড় যে, আমরা তাহা ধারণা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

মেজদা। আমাদের ন্যায় সসীম জীবের অসীমের ধারণা করা অসম্ভব বই কি। কিন্তু যিনি এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা তিনি কোথায়?

লীলা। ঠাকুর মা বলিতেন, সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর স্বর্গে থাকেন।

মেজদা। সেই স্বর্গ কোথায়?

লীলা। কেন, ঐ উর্দ্ধে, আকাশে।

মেজদা। ইহাও একটা ভ্রান্ত ধারণা। প্রাচীনকালের লোকের বাস্তবিকই এরূপ ধারণা ছিল যে, স্বর্গলোক উর্দ্ধে, আকাশে এবং পরমেশ্বর নক্ষত্রলোকের অপর পারে সেই স্বর্গে অবস্থান করেন। একথা সত্য হইলে মনে করিতে হইবে যে, পরমেশ্বর আমাদের নিকট হইতে অনন্ত ব্যবধানে রহিয়াছেন, আর আমাদের মৃত আত্মীয় বন্ধুগণের স্বর্গযাত্রী আত্মাগুলিকে নিশ্চয়ই এক অনন্তকালব্যাপী ভ্রমণে যাত্রা করিতে হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা। আজ এ পর্য্যন্ত থাক, অন্য দিন এ সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করা যাইবে।

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

(পেশওয়ারের পথ।)

রাউলপিণ্ডি হইতে পেশওয়ারে আমরা রাত্রিতে গিয়াছিলাম, পথে কোথাও কিছু দেখিতে পাই নাই, ফিরিবার সময় দিবালোকে সমুদায় দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। আটক প্রভৃতি বড় বড় ষ্টেশন ও কয়েকটি জংশন এবং মর্দ্দানা নোশেরওয়াঁ প্রভৃতি কয়েকটি ডিষ্ট্রীক্ট অতিক্রম করিয়া ট্রেণ চলিয়াছিল, আটকের নিকটে সিন্ধুনদ সেতুযোগে পার হওয়া গিয়াছিল। দ্বিভাগে বিভক্ত একটি উপশৈলের ভিতর দিয়া পঞ্জাবের প্রধান নদ খরস্রোত সিন্ধু প্রবাহিত; সেই স্থানে সুদৃঢ় সেতুনির্ম্মিত আছে, উক্ত সেতুর উপর দিয়া বাষ্পীয় শকট পরিচালিত হইয়া থাকে। পঞ্জাব প্রদেশের পঞ্চনদী অর্থাৎ শতদ্রু, বিপাসা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিতস্তা বিশেষ বিশেষ স্থানে সিন্ধুনদকে আলিঙ্গন করিয়া আছে। পূর্ব্বোক্ত রেলওয়ে সেতুর পশ্চিম ভাগে প্রশস্ত উন্নত ভূমির উপর দিয়া সিন্ধু প্রবাহিত, সে স্থানে গভীরতা নাই। দেখিয়া বোধ হইল যেন একটি প্রসারিত মাঠে জলস্রোত ক্রীড়া করিতেছে। পথে হোসেন আবদাল ষ্টেশনে অবতরণপূর্ব্বক নানকপন্থীদিগের বিশেষ তীর্থ পঞ্জাসাহেব দর্শন করিয়া যাইব, আমাদের সঙ্কল্প ছিল। বেলা ১১টার সময় হোসেন আবদালে পঁহুছান যায়। ষ্টেশন হইতে পঞ্জা সাহেব প্রায় এক মাইল দূরে। রাউলপিণ্ডির এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের Rest House ষ্টেশনের অনতি দূরে। তিনি সেখানে যাইয়া স্নানাহার বিশ্রাম করিয়া পঞ্জা

সাহেবে যাইবার জন্ম আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, এবং আমাদের আতিথ্য সৎকার করিবার জন্য রেষ্ট হাউসস্থিত মুন্সিজীকে পত্র লিখিয়াছিলেন। আমরা উক্ত রেষ্ট হাউসে না যাইয়া একটি টম্‌টম্ ভাড়া করিয়া বরাবর পঞ্জা সাহেব দর্শন করিতে যাই। জনশ্রুতিমূলক পঞ্জা সাহেবের ইতিবৃত্ত এই ;—

একদা গ্রীষ্মকালে, দেবাত্মা গুরু নানক নিজের শিষ্যদ্বয় ভাই বালা ও মর্দ্দানাকে সঙ্গে করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার অত্যন্ত পিপাসা হয়, মর্দ্দানা বা বালা গুরুর তৃষ্ণানিবারণার্থ জলের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ান। অদূরে একজন ফকিরের আস্তানা ছিল, কোথাও জল না পাইয়া সেখানে যাইয়া ফকিরের নিকটে জলপ্রার্থী হন। ফকির বলেন,"তোমার গুরুর ক্ষমতা থাকিলে নিজে জল উৎপাদন করিয়া পান করুন; আমার নিকটে পানার্থ জল আছে বটে, কিন্তু আমি তাঁহাকে তাহা দিব না।" শিষ্য নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়া গুরু নানককে ইহা জ্ঞাপন করেন। তখন নানক পার্শ্বস্থ প্রস্তরে পঞ্জা অর্থাৎ চাপড় মারেন, পাঁচ অঙ্গুলি তাহাতে বসিয়া যায়, তাহা হইতে প্রবলবেগে নির্ম্মল জল নিঃসৃত হয়। সেই জলস্রোতের আর বিরাম হয় না। আমরা সেখানে যাইয়া দেখিলাম, চারি কূল পাথরে বাঁধা একটি ক্ষুদ্র সরোবর সুশীতল স্বচ্ছ জলে পূর্ণ। পঞ্জায় চিহ্নিত পার্শ্বস্থ প্রস্তরখণ্ড হইতে অবিরল নির্ম্মল জলস্রোত নির্গত হইয়া উক্ত সরোবরে নিপতিত হইতেছে, সরোবরকে পূর্ণ রাখিয়া অবশিষ্ট জল নহরযোগে সবেগে বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। সরোবরের গভীরতা চারি পাঁচ ফুট হইবে। জল বরফের ন্যায় সুশীতল। গ্রীষ্মকালে উক্ত সরোবরে স্নানাবগাহন করিলে অতিশয় তৃপ্ত হওয়া যায়। কয়েক জন বালককে সেই জলে পুনঃপুনঃ নিমগ্ন হইতে ও সাঁতার কাটিতে এবং জলচরের ন্যায় অনুক্ষণ জলে ক্রীড়া করিতে কখন কখন কূলে উঠিয়া জলে লাফাইয়া পড়িতে দৃষ্ট হইল। আমরা আতপতাপে তাপিত ও ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া গিয়াছিলাম, সেই সুশীতল জলে স্নান করিয়া পরম তৃপ্ত হইয়াছিলাম। এক জাতীয় শত শত মৎস্য সেই জলের উপর ভাসিয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকে, মাছগুলি এদেশের পোনা মাছের মত ওজনে এক পোয়া দেড় পোয়া হইতে পারে। জলের উপর কিছু খাদ্য দ্রব্য ছড়াইয়া দিলে নির্ভয়ে নিকটে পর্য্যন্ত আসিয়া তাহা খাইয়া থাকে। কতক গুলি শশা খরিদ করিয়া সে সকল কুচি কুচি করিয়া জলে নিক্ষেপ করা গেল, মৎস্যগুলি ছুটিয়া আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিল। সরোবরের পশ্চিম তীরে একটি মন্দির, মন্দিরের মধ্যে গ্রন্থ সাহেব স্থাপিত। সেই ধর্ম্মমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে খোলা বারাণ্ডা, ইতস্ততঃ শীতল ছায়াপ্রদ বিশাল বৃক্ষশ্রেণী আছে। যাত্রিকগণ আসিয়া বারণ্ডায় বা বৃক্ষতলে আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে। একজন নানকপন্থী মহান্ত কয়েক জন চেলা সহ সেখানে স্থিতি করেন। তাঁহারা অর্থপিপাসু নহেন, সকলেই বিনীত স্বভাব। সেই ধর্ম্মশালার একজন পরিচারক আমাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল, বিশ্রাম করিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সন্নিহিত ময়রা দোকান

হইতে দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন আনিয়া দিল। আমরা স্নানোপাসনার পর মিষ্টান্ন ভোজন, দুগ্ধপান এবং কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া টম্‌টমারোহণে ষ্টেশনে ফিরিয়া গেলাম। বেলা ৩টার সময় রাউলপিণ্ডি যাইবার ট্রেণ পাইয়া যাত্রা করা যায়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তথায় পঁহুছান গেল। ডাক্তার কালীনাথ রায় ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাইয়াছিলেন, শ্রীমান্ বিনয়চন্দ্র মজুমদার আমাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে ডাক্তার বাবুর ভবনে উপস্থিত হই। বিনয়চন্দ্রের অনুরোধমতেই হোসেন-আবদালে পঞ্জা সাহেব দর্শন করিতে যাওয়া হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া বাস্তবিক সুখী হওয়া যায়। ছুটী উপলক্ষে রাউলপিণ্ডির অনেক বাঙ্গালী বাবু সপরিবারে পঞ্জা সাহেব দেখিতে যাইয়া সেস্থানে রন্ধনাদি করিয়া বনভোজন ও আমোদ প্রমোদাদি করিয়াথাকেন। আমরা রাউলপিণ্ডি নগরে পঁহুছিয়া লাহোর নগরে যাত্রার উদ্যোগী হই।

ভিখারিণী ও অমৃতকৃষ্ণ বাবুর প্রশ্ন এবং তদুত্তর।

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের মহিলাতে ভিখারিণী কর্ত্তৃক প্রেরিত পত্রবিষয়ে আমাদের মন্তব্য পাঠ করিয়া তিনি ও অমৃতকৃষ্ণ বাবু যে প্রশ্ন করিয়াছেন তদুত্তর ;—

আমরা লিখিয়াছিলাম ;—

"দুশ্চরিত্র পিতা যেমন পুত্র কন্যার পিতৃভক্তিলাভে বঞ্চিত হইতে পারেন না, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ ও তাঁহার নিন্দা রটনা করা পুত্র কন্যার পক্ষে যেমন পাপ, রাজা ও রাজপ্রতিনিধিগণ দস্যু তস্কর এবং অত্যাচারী লোক হইতে প্রজাবর্গের ধন মান জীবন রক্ষা করেন, তাঁহাদের শিক্ষাদান ও নানাপ্রকার কুশল কল্যাণ সাধন করেন, তাঁহারা পিতৃস্থানীয়। রাজা ও রাজপ্রতিনিধিগণ অন্যায়াচরণ করিলেও পুত্রকন্যাস্থানীয় প্রজাগণ তাঁহাদের প্রতি অসঙ্গত ও অশিষ্ট ব্যবহার করিতে পারে না। অবিশ্বাসিগণ স্বীকার করুন বা না করুন আমরা বিশ্বাস করি পিতা যেমন আমাদের প্রতিপালনের জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত, রাজা ও রাজপ্রতিনিধি তদ্রূপ আমাদের শাসন সংরক্ষণের জন্য ভগবান্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত। তাঁহাদিগকে অবমাননা করা আর তাঁহাদের নিয়োগকর্ত্তা বিধাতাকে অবমাননা করা তুল্য।"

ভিখারিণী এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; "জিত ও জেতার ভিতর নিঃস্বার্থ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর নহে, মহাশয় নিজে তাহা এক প্রকার স্বীকার করিতেছেন, পিতা কিন্তু সন্তানের প্রতি নিঃস্বার্থ স্নেহই দান করেন, প্রতিদান প্রতীক্ষা করেন না, এবং শাসন করিতে হইলে তাহার মঙ্গলের জন্যই শাসন করেন, প্রতিশোধগ্রহণের জন্য কখনই করেন না। সেই জন্য বর্ত্তমান রাজা ও প্রজার সম্পর্কটা পিতা ও সন্তানের সম্পর্ক না বলিয়া প্রভু ও দাসের সম্বন্ধ বিবেচনা করা অধিক যুক্তিসঙ্গত নহে কি ?"

উত্তর। কে বলিল, সন্তানের প্রতি পিতার নিঃস্বার্থ স্নেহ। এ দেশের পিতার পুত্র ও কন্যার মধ্যে পুত্রের প্রতি পক্ষপাত কেন ? তিনি কন্যা অপেক্ষা পুত্রের প্রতি অধিকতর আদর যত্ন করেন কেন ? পুত্র অর্থোপার্জন

করিয়া তাঁহাকে সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিবে, বংশের নাম রক্ষা করিবে, কন্যা দ্বারা তাহা হইয়া উঠিবে না, তজ্জন্য কি কন্যা অপেক্ষা পুত্রের প্রতি অধিকতর আদর যত্ন নহে? পুত্রের শিক্ষা ও উন্নতিসাধনজন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতে অনেক পিতা কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু কন্যার উন্নতিকল্পে দশটী টাকা ব্যয় করিতে নারাজ। ইহাতে কি পিতার স্বার্থপরতা প্রকাশ পায় না? এখানে নিঃস্বার্থ স্নেহ কোথায় দাঁড়াইল? পুত্রের প্রতিদান প্রতীক্ষায় কি তাহার প্রতি স্বার্থসম্বন্ধ স্থাপিত হইল না? রাজা প্রজার মঙ্গলের জন্য কি শাসন করেন না? কেবল প্রতিশোধ লইয়া থাকেন? ভিখারিণী কি ইহা সত্য কথা বলিয়াছেন? ইংরাজ রাজা কি কেবল প্রতিশোধ লইয়া থাকেন, প্রজার মঙ্গল করেন না? একবার ভাবিয়া দেখুন ইংরাজ রাজা হইতে তিনি কত শত সহস্র প্রকারে কল্যাণ লাভ করিতেছেন। এক জন নারী হইয়া এইরূপ স্বাধীন ভাবে সংবাদপত্রে নিজের মতামত প্রকাশের মধ্যে কি রাজানুকূল্য ও রাজানুগ্রহ তিনি স্বচক্ষে দেখিতেছেন না? আমরা জিজ্ঞাসা করি, পিতা কি সময়ে সময়ে পুত্র কন্যা হইতে প্রতিশোধ লইয়া থাকেন না? পুত্র পিতার অনিচ্ছা ও অমতে চলিলে কত পিতা উইল করিয়া তাহাকে সমুদায় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করেন, গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন, ইহা কি সচরাচর ঘটিতেছে না? কোন্ রাজা দুষ্ট অবাধ্য প্রজাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করেন? তাঁহার শাসন ও দণ্ড যে প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্য হয় না, তিনি কেবল প্রতিশোধ লইয়া থাকেন, ভিখারিণী কোন্ যুক্তিতে এই কথা লিখিয়াছেন? তাহা হইলে আজ তিনি দস্যু-তস্কর ও অত্যাচারীর অত্যাচারে একদিনও কি সুস্থির থাকিতে পারিতেন?

অমৃতকৃষ্ণ বাবু;—

১। "বর্ত্তমান স্বদেশপ্রেমের আন্দোলনে এদেশের বহু যুবক যুবতীর ও বালক বালিকার নৈতিক অবনতি হইয়াছে, আরও হইবে, কিন্তু পরিণামে দেশের পক্ষে কল্যাণ হইবে, আশা করা যায়।" এ কেমন?

মঙ্গলময় পরমেশ্বর অমঙ্গলের ভিতর হইতে মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। জুডাস স্কেরিয়ট নিজের গুরু যীশুখ্রীষ্টকে ৩০৲ টাকার লোভে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, ভণ্ড ইহুদীগণ নানা প্রকার ক্লেশ যন্ত্রণাদানে তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছিল, বিশ্বাসঘাতক শিষ্যের ও অত্যাচারী ইহুদীদিগের পক্ষে ঘোরতর অমঙ্গল হইল, কিন্তু পুণ্যাত্মা যীশুখ্রীষ্ট জয়যুক্ত হইলেন; তাঁহার জ্যোতি নির্ব্বাপিত না হইয়া সমধিক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, লক্ষ লক্ষ নর নারীকে পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন করিল, স্বর্গের আনন্দ ও শান্তি দান করিল। এইরূপ অকল্যাণের ভিতর হইতে বিধাতা কল্যাণ সাধন করেন। বর্ত্তমান যুগেও বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। বিরোধীদিগের অত্যাচারে নবধর্ম্মের বিকাশ ও উন্নতি হয়, প্রজার রাজ্যসম্পর্কীয় অত্যাচারে পরিণামে রাজার পক্ষে কুশল কল্যাণ হয়, অন্যায় অত্যাচারী লোকেরা পাপের প্রতিফল ভোগ করিয়া থাকে। ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এবিষয়ে এক্ষণ অনেক কথা

স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত বোধ হইতেছে না।

২। "প্রজা ক্ষীণ লেখনী ও রসনাযোগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া রাজশক্তির বিরুদ্ধে কয় দিন দাঁড়াইতে পারে? রাজার হস্তে আইন ও সৈন্য বিদ্যমান।"

রাজা আইন করিয়া প্রজার বিরুদ্ধবাদিনী লেখনী ও রসনা সহজে বন্ধ করিতে পারেন। একবার প্রেস এক্ট করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করার উদ্যোগ হইয়াছিল। বক্তৃতাদি করিয়া কেহ রাজনৈতিক আলোচনা করিতে পারিবে না, এরূপ আইন হইলে রসনা বন্ধ হয়। সেই আইন অতিক্রম করিয়া চলিলে করাবাস অনিবার্য্য। ফরাসী রাজ্যের অন্তর্গত অদূরবর্ত্তী ফরাসডাঙ্গায় বক্তৃতাদিযোগে কেহ রাজনৈতিক আলোচনা করিতে পারে না, করিলে শাস্তি প্রাপ্ত হয়। যাহারা অধিক বাড়াবাড়ি করে, পুলিশ ও সিপাহি নিযুক্ত আছে কি জন্য? রাজার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার প্রজাবর্গের কি ক্ষমতা আছে? তাহাদের কারাবাস ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

৩। "ইংরাজেরা সমুদায় অর্থ শোষণ করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইতেছে, এ দেশ দিন দিন গরিব হইয়া পড়িতেছে, এই কথাগুলির কোন্ অংশ সত্য নয়?"

আমরা উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছি, ভারতে ইংরাজরাজত্বস্থাপনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মোসলমান রাজত্বের সঙ্গে তুলনা করিলে এ দেশে কি অর্থাগমের দ্বার শত গুণ মুক্ত হয় নাই? এ দেশের ধনী লোকের সংখ্যা কি শত সহস্র বৃদ্ধি পায় নাই? ইহা আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। "আজ যদি ইংরাজ জাতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিচারালয়, কার্য্যালয়, কল কারখানা রেলওয়ে ষ্টীমারাদি উঠিয়া যায়, এদেশের লক্ষ লক্ষ লোক বিষম অন্নকষ্টে পড়িয়া কি নিরুপায় হইবে না? এবং তাহাদের মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠিবে না? বিলাত হইতে বঙ্গদেশের কৃষকগণ পাটের মূল্যস্বরূপ প্রতি বৎসর ১২ কোটি টাকা প্রাপ্ত হয়। তাহাতেই তাহাদের বর্ত্তমান সুখ ও স্বচ্ছলাবস্থা। লক্ষ লক্ষ নিরন্ন কুলি ইংরাজদিগের চা-ক্ষেত্র সকলের কাজে নিযুক্ত হইয়া সপরিবারে প্রতিপালিত হইতেছে। ইংরাজদের প্রতিষ্ঠিত এক একটা বড় বড় কলে ৫।৭ হাজার শ্রমজীবী লোক কাজ করে, এক এক জনে ২০।২৫ টাকা মাসিক উপার্জ্জন করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য কল কারখানায় ও রেলওয়ে ষ্টীমারাদিতে সহস্র সহস্র শ্রমজীবী এবং ভদ্র কেরাণী প্রতিপালিত হইতেছে। নগরে ও গ্রামে কলেজ স্কুলাদিতে প্রিন্সিপাল ও প্রফেসর এবং অগণ্য শিক্ষক এবং বহু ইন্‌স্পেক্টর ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টরাদি অধিক বা অল্প বেতন পাইয়া ইংরাজ রাজানুগ্রহে প্রতিপালিত হইতেছে। এক একটি জেলার বিচারালয়াদিতে দুই শত চারি শত পাঁচ শত এবং তদধিক বেতন পাইয়া শত শত হাকিম ও কেরাণী নিযুক্ত, সর্ব্বত্র রেলওয়ে ষ্টীমারাদির গতিবিধি হওয়াতে বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছে, নানা উপায়ে অর্থাগম হইতেছে। মেডিকাল কলেজ, মেডিকাল স্কুল এবং ইঞ্জিনিয়ার কলেজ ইত্যাদিতে শত শত যুবা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বড় বড় বেতনে ডাক্তার ও

ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি হইতেছে; চিকিৎসালয়াদির কাজে কত শত লোক নিযুক্ত। ইংরাজ-রাজত্বের পূর্ব্বে ইহার কিছু কি ছিল? সমগ্র বঙ্গদেশশাসনের জন্য রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ মুর্শিদাবাদে একজন নবাব ছিলেন, এবং তাঁহার প্রধান কার্য্যালয় ছিল, ঢাকা নগরে একজন অধীন নবাবের কার্য্যালয় ছিল। দূরে দূরে এক একজন মোসলমান বিচারক কাজী ছিলেন। এক শত দেড় শত টাকার উর্দ্ধে বেতন প্রাপ্ত হয় এরূপ রাজকর্ম্মচারী অতি অল্পই ছিল। ঘুষের প্রভাবে দুই চারি জন বড়লোক হইয়াছিলেন। তখন প্রজা সাধারণের হিতের জন্য রাজকীয় সাহায্যে চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় চিকিৎসক ও শিক্ষকাদি কি কোন স্থানে ছিল? বাঙ্গলায় শত শত উকিল ব্যারিষ্টারের লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি। উহা কি ইংরাজরাজের প্রসাদে নয়? যশোহর প্রভৃতির ন্যায় বড় বড় ডিষ্ট্রীক্টে দেড় হাজার দুই হাজার টাকা বেতনে বাঙ্গালী জজ মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত। বিস্তীর্ণ জেলার কর্ত্তৃত্ব তাঁহাদের হস্তে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পরবর্ত্তী উচ্চপদে এক জন বাঙ্গালী কার্য্য করিতেছেন। তিনি চারি বা পাঁচ হাজার টাকা মাসিক বেতন প্রাপ্ত হন। হাইকোর্টের জজের পদে চারি সহস্র মুদ্রা বেতনে দেশীয় লোক নিযুক্ত আছেন। এ সকলের জন্য উপকার স্বীকার না করিলে যে ভয়ানক কৃতঘ্নতা হয়। ইংরাজেরা বহু সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিয়া সাগর মহাসাগর পার হইয়া আপনাদের বিজিত রাজ্যে আগমনপূর্ব্বক নানা ব্যবসায় ও বাণিজ্য করিয়া বুদ্ধিবিজ্ঞান ও যত্ন পরিশ্রমবলে অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। ক্ষমতা থাকিলে তোমরা ও আমরা তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেই হয়? কে বাধা দেয়? নিন্দাচর্চ্চা, দ্বেষ হিংসা ও চিৎকার করিলে কি হইবে?

নারী-জীবনের কার্য্য।

মহিলাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর মহিলারা দিন রাত ঘরকন্না করেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সংসারের কাজ কর্ম্ম করেন, একদণ্ড বসিয়া থাকিবার অবসর পান না। আর এক শ্রেণীর মহিলারা দিন রাত পুস্তক পাঠ, আমোদ, গল্প, পরনিন্দা ইত্যাদিবিষয়ে এত বিভোর যে, ঘরকন্না করিবার অবসর কই? তাঁহাদের ঘর সংসারের বন্দোবস্ত, ছেলে পিলের শিক্ষা ও তত্ত্ব খবর লওয়া ইত্যাদি বিষয়ের ভার অপরের হস্তে। কেবল বড় ঘরের গৃহিণীর কেন অনেক সচ্ছল মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতে এইরূপ দৃশ্য বিরল নহে। তাঁহারা ভাল বিষয়ে গ্রন্থ পাঠ কবিতা রচনা শিল্প কার্য্যাদিতে সময় অতিবাহিত করিলেও আমরা এই উভয় শ্রেণীর মহিলাদের কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি না।

প্রথমতঃ প্রত্যেকের গৃহকার্য্য করা অতিশয় প্রশংসনীয় এবং রমণীগণের এই বিষয়ে দক্ষতালাভ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ঝলিতে হইবে; কিন্তু সারা দিন যাঁহারা ভাঁড়ার ঘর, রান্না ঘর ও খাওয়ার ঘরেই আবদ্ধ থাকেন তাঁহাদের জীবন ও চিন্তা সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। ২৪ ঘণ্টা কেবল দাল, চাউল, নুন, তেল

ইত্যাদি বিষয়ই কেবল যাঁহাদের মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছে, যাহাদের চিন্তা-রাজ্য এই সকল বিষয়ে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না, যাঁহারা দুদণ্ড বসিয়া সৎ-প্রসঙ্গ করিবার অবসর পান না, সন্তানদের শিক্ষাবিষয়ে কোন চিন্তা করিতে পারেন না, পরিবারে নীতি ও ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগ পান না, তাঁহারা আমাদের আদর্শ হইতে অনেক দূরে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মহিলারা বাহ্যিক সভ্যতা, ভদ্রতার নিয়ম ষোল আনা রক্ষা করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের গৃহকর্ম্মে অমনোযোগ, সন্তান-পালন ও শিক্ষাদানে তুচ্ছতাচ্ছিল্য অতিশয় দূষণীয়। মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পক্ষে শারীরিক পরিশ্রম ঈশ্বরের বিধান। সন্তানপালন স্ত্রীলোকের পবিত্র কার্য্য। মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণ ইহার সঙ্গে গভীররূপে জড়িত। অতএব যাঁহারা এই সকল কার্য্যকে সামান্য বলিয়া এড়াইতে চাহেন তাঁহারা কৃপাপাত্র। উভয় শ্রেণীর কার্য্যে যথা সম্ভব সামঞ্জস্য না করিতে পারিলে বাস্তবিক সুন্দর জীবন হয় না। নারীজাতির মনে রাখা আবশ্যক যে, তাঁহাদের মাতৃত্বই প্রধান লক্ষণ ও ধর্ম্ম। যাঁহারা এই মাতৃ-ধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ তাঁহারা নারী জীবনের, গৃহিণীজীবনের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট। সন্তানের সুশিক্ষা নারীর সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য যত প্রকারের ত্যাগ স্বীকার সম্ভব তাহা করা উচিত। যে গৃহে মাতা ধর্ম্ম ও নীতিপরায়ণা সেই গৃহের সন্তানরত্ন মনুষ্যের গৌরবের আস্পদ।

আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের মহাসভার ভূত পূর্ব্ব সভাপতি গারফিল্ড নিরাশ্রয়া বিধবা ইলাইজার ক্রোড়ে পালিত হইয়াছিলেন। মাতা গৃহকার্য্যে সারা দিন ব্যাপৃত থাকিয়াও রবিবারে সন্তানদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দান করিতে তুচ্ছ করিতেন না, এবং যত্নপূর্ব্বক তাহাদের মনে সাধুতার বীজ বপন করিতেন, বালক গারফিল্ড মাতার ধর্ম্মোপদেশ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতেন, এবং কৃষক পরিবার হইতে ধীরে ধীরে সোপানের পর সোপানারোহণ করিয়া আমেরিকা দেশের সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং এক মুহূর্ত্তও ন্যায় ও ধর্ম্ম পথ হইতে বিচলিত হন নাই। অরণ্য কুটীরে বিধবা ইলাইজা ও তাঁহার সুসন্তান গারফিল্ডের চিত্র অতিশয় শিক্ষাপ্রদ। পাশ্চাত্য রাজ্য এই মহাপুরুষের অমূল্য জীবনের জন্য এই বিধবার নিকট চির ঋণে আবদ্ধ। সন্তান প্রসব করিয়াই নারী মনে করিতে পারেন না তাঁহার জীবনের কার্য্য সাধিত হইল। সন্তানকে মানুষ করিয়া তোলাই তাঁহার প্রধান কার্য্য। ইহা বিধাতার বিধান। জনৈক পণ্ডিত দেখাইয়াছেন যে, মনুষ্যশিশু পশুশিশু এই উভয়ের প্রথম অবস্থা তুলনা করিয়া বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। পশুশিশু জন্মের পরই লম্ফ দিয়া উঠে, চলে, ফিরে, মাতৃশক্তি ও শিক্ষার অধিক অপেক্ষা করে না; কয়েক দিন পরেই নিজের ভার নিজে গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু মনুষ্যশিশু জড়পিণ্ডের ন্যায় দীর্ঘকাল মায়ের ক্রোড়ে পড়িয়া থাকে, মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃস্নেহ ও শিক্ষা হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হয়। মনে কর অরণ্যের মধ্যে বানরীর যে দিন

সন্তান হইল, নিকটস্থ কুটীরে একটী রমণীরও শিশু জন্ম গ্রহণ করিল। কিন্তু মনুষ্য-শিশু অসহায় জড়ের ন্যায় যখন মাতৃ ক্রোড়ে পড়িয়া আছে, তখন বানরশিশু বৃক্ষে বৃক্ষে লম্ফ দিতেছে, মনুষ্য শিশুকে ব্যঙ্গ করিতেছে, কিন্তু দীর্ঘকাল পরে, বানর সেই বানরই রহিয়া গেল, এদিকে মনুষ্যশিশু মাতৃ-শিক্ষা ও যত্নে বর্দ্ধিত হইয়া বানরের প্রভু হইয়া বসিল। মাতার ভিতর দিয়া ঈশ্বরের মাতৃ-শক্তি সন্তানকে স্পর্শ করে, উন্নত ও বর্দ্ধিত করে। তিনিই যথার্থ জননী যিনি এই দৈব-ক্রিয়া স্বীকার করিয়া ভক্তিসহকারে তাহার সার্থকতা সাধন করেন।

স্বদেশী আন্দোলন ও মহিলাগণ।

(পূর্ব্ব বঙ্গস্থ একজন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।)

স্বদেশী আন্দোলন ও বিলাতী-বর্জ্জনের মহা ঢেউ দেশময় পরিব্যাপ্ত হইতেছে। এই সময় নারীগণও আন্দোলিত হইতেছেন, এবং কেহ কেহ মনে করিতেছেন যদি গৃহের মধ্যে মাতা ও গৃহিণীদের ভিতর দিয়া ছোট ছোট শিশুদিগের মনে বিলাতী-বর্জ্জন বদ্ধমূল করিতে পারা যায় তবেই উদ্দেশ্য সফল হইবে। এই জন্য স্থানে স্থানে নারী-সমিতি প্রভৃতি দ্বারা পরিবারে পরিবারে এই বিদেশী-বর্জ্জনের স্পৃহা বলবতী করা হইতেছে। অদ্য আমরা এই বিষয়ে কয়েকটী কথা মহিলাদিগের নিকট নিবেদন করিতেছি।

পৃথিবীর এমন এক যুগ ছিল, এমন কি এখনও অসভ্য জাতির মধ্যে ইহা বিরল নহে যে, মানুষ অন্যের গলায় ছুরিকাঘাত করিয়া আপন উদর পূরণ করিয়াছে: মনুষ্য নর-মাংস ভক্ষণ করিয়া আপনার ক্ষুদ্র পরিবার ভিন্ন অপরকে শত্রু ভাবিয়া কঠোর সংগ্রাম পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে মানব-সমাজ উন্নতি হইতে উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া অবশেষে এমন স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, মানুষ আপনার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অপরকে ঘৃণা করিবার পরিবর্ত্তে ভালবাসিতে শিক্ষিত হইতেছে। হিন্দু ম্লেচ্ছ, মুসলমান কাফের, ইহুদী জেণ্টাইল, খ্রীষ্টান পেগান, স্বদেশী বিদেশী ইত্যাদি পরস্পর বর্জ্জন-ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে গ্রহণের ধর্ম্ম আসিয়া মানবসমাজকে অধিকার করিয়াছে। ক্ষুদ্র গণ্ডী, ক্ষুদ্র প্রাচীর চূর্ণ হইয়া বিশ্বজনীন প্রেম মানবহৃদয়ে স্থান গ্রহণ করিতেছে। "অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা লঘুচেতসাং উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং।" এই এই মন্ত্র প্রাচ্য দেশে উচ্চারিত হইতে না হইতে এক জন জীবন্ত পূত চরিত্র নরদেব আবির্ভূত হইয়া ধরাতলে ঘোষণা করিলেন, "ঈশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ভালবাসিয়া আপনার প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রীতি কর।" শত্রু মিত্র ভেদাভেদ ঘুচাইয়া দিয়া তিনি নরজাতির কল্যাণের জন্য ক্রুশে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার এই উচ্চ শিক্ষা ও আদর্শ-লাভের পূর্ব্বে হইতে ভারতবর্ষ সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের শিক্ষাতে সর্ব্বজীবে আত্মবৎ জ্ঞান করিবার জন্য উপদিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গে আমরা এ কি শুনিতেছি? বিদেশীয়কে পর ও শত্রু মনে করিতে হইবে। এখন

এমনও শুনা যায় ইংরাজ দেখিলে বালকেরা থুথু ফেলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করে, কেহ বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিলে তাহাকে পতিত মনে করে, তাহার সংস্পর্শে আসিতে চাহে না। এমন কি আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, কোন ব্রাহ্মের সন্তান মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দেখিয়া থুথু ফেলিয়াছিল।

বয়কট অর্থাৎ বিদেশী-বর্জ্জনের দ্বারা যদি স্বদেশ প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়, তবে বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম ও সভ্যতার পরিণাম কোথায়? ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যেও যদি এই শিক্ষা প্রবেশ করে, তবে আর আশার স্থল কোথায়? আমাদের মনে আছে মহাত্মা রামমোহন রায় তিব্বত দেশে ও ইংলণ্ডে নারী-হৃদয়ের কোমল ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া কেমন স্বদেশ বিদেশ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এবং বিদেশে মাতৃরূপের আবির্ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে অপ্রত্যাশিতরূপে আদর অভ্যর্থনা পাইয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বিদেশে আছেন এই কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, "আমার পিতার গৃহে যে অনেক ঘর আছে এই পাশ্চাত্য দেশ তাহার এক ঘরবিশেষ, আমি পরম যত্নে সেই পিতার গৃহে বাস করিতেছি।" বীর হৃদয় প্রতাপচন্দ্র আমেরিকাতে গিয়া স্বদেশ বিদেশ ভুলিয়া পরের গৃহকে আপনার করিয়াছিলেন, এবং মুক্তকণ্ঠে তাহার সাক্ষ্য দান করিয়াছিলেন। সেই দিন আমাদের প্রীতিভাজন বিনয়েন্দ্র নাথ যুরোপ, আমেরিকা পর্য্যটন করিয়া সেই এক ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। আর এখন হইল কি? দুগ্ধপোষ্য শিশুও ইংরেজ কিম্বা বিদেশীয়ের নামে ক্ষেপিয়া উঠে! বিদেশীয়ের সংস্পর্শে আসা, তাহাদের কোন দ্রব্য গ্রহণ করা পাপজনক মনে করে; এই কি বিশ্ব-প্রেম, এই কি স্বদেশপ্রীতি; ঈশ্বর পিতা, নরনারী ভাই ভগিনী, ঈশ্বরের বিশাল গৃহে অসংখ্য পরিবারে বদ্ধ হইয়া আমাদেরই ভাই ভগিনীগণ নানা স্থানে স্থিতি করিতেছেন। আমরা প্রকৃত স্বদেশদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী হইয়া কি ভাই ভগিনীগণকে ঘৃণা করিব? ইংরেজীতে বলে Charity begins at home, অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে আপনার পরিবারে প্রীতি স্থাপন কর, পরে অন্যের কথা আসিবে। এই বাক্যের আশ্রয় করিয়া লোক পরদ্বেষিতার সুযোগ খোঁজে বলিয়াই বুঝি ভক্ত কেশব চন্দ্র বলিয়াছিলেন এই প্রেমের আপনার বলিতে কোন গৃহ নাই, পরের ঘরই ইহার আপনার ঘর, ইহা সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া পরকে আপনার করে;—"Charity begins *not* at home."

দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান আন্দোলনে বিকৃত স্বদেশ প্রীতির আদর্শ আসিয়া দেশে উপস্থিত করিতেছে। অন্দর মহলে যাঁহারা স্বদেশী বিদেশী নানা বিভিন্ন প্রকার লোকের সংস্পর্শে আসিয়া হৃদয়ের প্রসারতা লাভ করিবার সুযোগ পান না, সুতরাং কত কার্য্যে সংকীর্ণ হইয়া পড়েন, তাঁহাদের হৃদয়কে বিলাতি-বর্জ্জনের নামে বিদ্বেষপূর্ণ করিয়া আরো সংকীর্ণ করা হইতেছে, এবং ভবিষ্য-দ্বংশ যাঁহাদের শিক্ষার গুণে উন্নত হইবে, তাহাদিগকেও সংকীর্ণ পাশে দৃঢ় বদ্ধ করা হইতেছে। একটী কথা শুনিয়া বড় হাসিও

পায় দুঃখও হয়। আমাদের পরিচিতা কোন মহিলার বড় সুন্দর সাদা ধপ্‌ধপে ছেলেকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রতিবেশিনী নাকি বলিয়াছিলেন, তোমার ছেলেটি বড় সুন্দর সাহেবের মত, তাহাকে বিলাত পাঠাইও। তিনি রাগে গড়্গড় করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাকে ও সব কথা বলিবেন না, আমার ছেলেকে আমি বিলাতে পাঠাব না।" আমাদের নারীদিগের মনকে এইরূপ অপ্রেম ও অশান্তিপূর্ণ করিবার জন্ম কি কেহ দায়ী নহেন?

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আমরা সাতিশয় পক্ষপাতী, এবং যথাসাধ্য তাহা প্রচারের সাহায্য করাও উচিত। কিন্তু জোর জুলুম করিয়া ঘৃণা বিদ্বেষ উৎপাদন করিয়া কোন দেশে কস্মিন্‌কালেও ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতে পারে না। মানুষের বুদ্ধি আছে, চক্ষু আছে। সে কি এত নির্ব্বোধ যে, তাহার স্বদেশে শস্তা ভাল জিনিষ পাইলে সে বিদেশীয় জিনিষের পক্ষপাতী হইবে? তাহা হইলে বুঝিতে হইবে প্রত্যেক মানুষ আপনার ভাল মন্দ বোঝে না, সে বিদেশপ্রীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া অধিক অর্থব্যয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে চাহে। কয়েক বৎসরের মধ্যে এঁড়ি, মুগা, বাপ্তা, টুইল, বোম্বাই চাদর, ময়নামতী ছিট, ঢাকাই, পাবনা, ফরাশডাঙ্গার কাপড়, লুধিয়ানা, ধারোয়াল, কেনানোর, কাণপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কাপড় যে একেবারে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারের মধ্যে আসিয়াছে, সেই জন্ম কি কেহ সভাসমিতি করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিল, কি লোকদিগকে ক্ষেপাইয়া উঠাইয়াছিল? মানুষ শস্তা ও ভাল বুঝিয়া আপনার লাভ আপনি দেখিয়া এই সকল জিনিষ ব্যবহার করিতেছে। বিলাতী জিনিষ যদি শস্তা না হয়, টেকসহি না হয়, তোমার আমার বক্তৃতার প্রয়োজন থাকিবে না। আপনা হইতেই তাহার ব্যবহার কমিবে। না বুঝিয়া কেহ একবার ঠকিবে, দুইবার ঠকিবে, কিন্তু ৩য় বার সে অন্য ভাল জিনিষ পাইলে আর ইচ্ছাপূর্ব্বক ঠকিবে না। আমাদের মনে পড়ে বিলাতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার Dr. Smiles স্মাইল্‌স সাহেব ইংরেজ বণিক্‌দের অসাধুতায় তীব্র আক্রমণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, ইংরেজদের ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতেছে। তাহারা মাড় দিয়া কাপড় খুব মসৃণ ও গাঢ় দেখাইয়া মানুষকে ঠকাইতে চাহে; ২০ গজ লিখিয়া ১৯॥ গজ চালাইতেছে, এই সকলের ফলে এই হইয়াছে যে, বিদেশে এমন কি চীন, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে অর্দ্ধ সভ্য লোকেরা পর্য্যন্ত একবার ঠকিয়া আর ইংরেজের জিনিষ শুনিলে অমনি তাহা বর্জ্জন করে। মার্কিণ জর্ম্মাণি প্রভৃতি দেশ সেই জন্য বাণিজ্যে ইংলণ্ডকে পরাস্ত করিতেছে। তাঁহার এই সদুপদেশ বাস্তবিক মনুষ্যের প্রকৃতি পাঠ করিয়াই তিনি প্রদান করিয়াছিলেন। এই যে, ইংরেজবর্জ্জনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, ইহা কোন বক্তৃতা দ্বারা হয় নাই, আপনা হইতেই হইয়াছে।

এখন আর এক কথা। বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করার বিরুদ্ধে আন্দোলন যে অস্বাভাবিক আরও গভীরতররূপে আলোচনা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে। এই সভ্যতার যুগে আদান প্রদান অবশ্যম্ভাবী এবং উন্নতির সোপান। আমরা ভিন্ন দেশের

সংস্রবে না আসিলে, ভিন্ন জাতির মধ্যে যে সকল নূতন আবিষ্কার হইয়াছে, উন্নতপ্রণালী ঈশ্বরের বিধানে লাভ হইয়াছে তাহার অধিকারী হইতে পারি না। শিল্প ও কৃষি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের যে প্রদর্শনী হয়, তাহার অর্থ কি? ভিন্ন দেশের লোকের বুদ্ধি হইতে যে সকল অভিনব তত্ত্ব বাহির হইয়া মনুষ্যের সুখ সুবিধা ও জীবিকা অর্জ্জনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছে, তাহা গ্রহণ করা ভিন্ন আর কিছু নহে। তড়িৎ, বাষ্প, প্রভৃতির শক্তি দ্বারা ভৌতিক রাজ্যে যে যুগান্তর উপস্থিত হইতেছে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া এখন কার সাধ্য মান্ধাতার আমলের চড়কা, গোযান, ভূর্জ্জপত্র,তালপত্র, বংশলেখনী, মৃণ্ময়পাত্রমধ্যে চিন্তা ও কার্য্য আবদ্ধ রাখে। যদি কেহ এই রূপ মনে করে সে, ভ্রান্ত, একটি বিপ্লবেই তাহার চমক ভাঙ্গিয়া যাইবে। যদি বিদেশীয় বিজ্ঞানপ্রসূত শিল্পাদির আমদানি বন্ধ করিয়া দাও, তবে ক্ষতি হইবে কাহার? তোমাদের দেশের লোকের বুদ্ধির প্রসার হইবে না, নূতন আবিষ্কার ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা হইবে না, তোমরা যে অশিক্ষিত ও অশক্ত ছিলে তাহাই থাকিয়া যাইবে। প্রতিযোগিতা, স্বাধীন ভাবে আদান প্রদান প্রকৃতির নিয়ম। অবশ্য স্বীকার্য্য যে, কোন নূতন শিল্প-পরিপোষণের জন্য উৎসাহ ও রক্ষণ দরকার, কিন্তু কাপড়ের কল বম্বে, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে কত বৎসর হইতে চলিতেছে, এখনও বিলাতী কাপড়ের সমান হইতে পারিল না, ইহা কাহার অপরাধ? বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কার্পাসের চাষ, বস্ত্রবয়ন, দিন দিন নূতন ও উন্নততর যন্ত্রের আবিষ্কার না হইলে কখনও সাধ্য নাই যে, য়ুরোপীয় জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবে। অথচ না করিলে চলিবে না। গরিব দেশে স্বদেশপ্রেমের নামে স্বদেশীবস্ত্র কিনিবার জন্য অধিক অর্থের সমাগম হইবে কোথা হইতে?

স্থূলবস্তু অদৃশ্য চিন্তাশক্তিরই অভিব্যক্তি। কাপড় বল, খেলানা বল, ছবি বল, বাসনপত্র ইত্যাদি যাহা কেন বল না, বিলাত হইতে জাহাজে জাহাজে আসিতেছে। এই সকল জিনিষ দেখিয়া আমাদের দেশের লোক যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া ক্রয় করিতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এই সকল সামগ্রীর পশ্চাতে কি কোন অদৃশ্য শক্তি, মনের অভিনব চিন্তার উন্মেষ দেখ না? যদি এই সকল সামগ্রী বর্জ্জন কর, তবে মানবজ্ঞান ও চিন্তার স্রোতকেও বর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের দেশের লোকেরা সম্পূর্ণ বিলাতীবর্জ্জনের জন্য কি প্রস্তুত হইয়াছেন? বিদেশীয় হৃদয়ের ভাব, চিন্তা, যাহা শতবিধ কল্যাণকর অনুষ্ঠানে অভিব্যক্ত, যাহা সাহিত্যে, দর্শনে, ভাষায়, চিন্তায় প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা কি পরিত্যাগ করিবার সাধ্য আছে? তাড়িৎবার্ত্তাবহ, বাষ্পীয় শকট, বৈদ্যুতিক আলো, পাখা প্রভৃতি সেই অদৃশ্য শক্তির অভিব্যক্তি, সেই পাশ্চাত্য চিন্তা ও ভাবরাজ্যের প্রবল স্রোত হইতে বাঙ্গালী কবি ও লেখকগণ ভাষাকে বিমুক্ত করিতে পারিবেন কি? এবং তাহা করা কি যুক্তিযুক্ত? মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোন বঙ্গীয় লেখককে বল তোমাদের বিলাতী ভাব, চিন্তা, ছন্দাদি সব বেশ পরিত্যাগ কর।

যদি এই ভাবে নগ্নবেশে ইঁহারা এখন দণ্ডায়মান হন বঙ্গভাষার কি শোভাই থাকে? অনেক লেখকের ষোল আনা সাজসজ্জার মধ্যে আধ আনা টেকে কি না সন্দেহ। যদি বর্জ্জন অসম্ভব, তবে অনর্থক কেন দেশকে বিপন্ন করিতেছ? বিধাতার বায়ু যেমন উত্তর হইতে দক্ষিণে, দক্ষিণ হইতে উত্তরে, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে অবাধে প্রবাহিত হইতেছে, সমুদ্রস্রোত যেমন ধরাময় পরিব্যাপ্ত, সূর্য্যালোক যেমন পূর্ব্ব পশ্চিমকে সমানে আলিঙ্গন করিতেছে, মানবজাতির ভাব, চিন্তা এবং উন্নতির স্রোতও অপ্রহিতভাবে প্রবাহিত থাকিবে, কেহ বাধা দিতে পারিবে না।

নলিনীবালা দেবী।

বিগত ৯ই আষাঢ় নলিনীবালা প্রায় দুই মাস কাল রক্তামাশয় রোগে অশেষ ক্লেশ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ১৮শ বৎসর বয়ঃক্রমে কলিকাতা নগরে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার স্বামীর নাম শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, ইনি ময়ুরভঞ্জের রাজধানী বারিপদ নগরে তত্রত্য মহারাজ কর্ত্তৃক বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। নলিনীবালা ব্রাহ্মণকুলোদ্ভবা ছিলেন, কলিকাতার হিন্দু পরিবারে প্রতিপালিতা হইয়া ১৩শ বৎসর বয়সে যোগেশ বাবুর সঙ্গে পরিণীতা হন। ১৯০৫ সালে স্বামী স্ত্রী উভয়েই কটক নগরে ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন রাও কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন। নলিনীবালা নানা বিপৎ পরীক্ষার মধ্যে আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা ও শান্তভাবের পরিচয় দান করিয়াছেন। ময়ুরভঞ্জের রাজধানী বারিপদ নগরে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। তদুপলক্ষে ব্রাহ্ম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকার তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথা সকল বলিয়াছিলেন।

“সংসারে তাঁহার জীবনে আমরা অনেক শিখিয়াছি। আমরা ব্রাহ্ম সমাজে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল সত্য জীবনে নিত্য অবহেলা করিয়া যাইতেছি, তিনি হিন্দু সমাজ থেকে এসে অল্প দিনের মধ্যেই জীবনকে এত উন্নত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সত্যের প্রতি আদর জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে লক্ষ্য করিয়া আমরা বড়ই আনন্দ পাইতাম ও কত শিক্ষা পাইতাম। তাঁহার উদারতা, সরলতা, পবিত্রতা ও স্নেহশীলতার কথা জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। যাহা কর্ত্তব্য বুঝিতেন, যাহা করিলে দেশের ও সমাজের মঙ্গল হইবে মনে করিতেন তাহা করিতে কখনও ভীত বা লজ্জিত হইতেন না। স্বামীর প্রত্যেক কার্য্যে শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও প্রাণ দিয়া সাহায্য করিতে এমন একজন সাধ্বী ব্রাহ্ম সমাজে খুব কমই দেখিয়াছি। হিন্দু সমাজ থেকে এসে অনেক অভাবের মধ্যেই পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু কোন অভাবই তাঁহাকে হতাশ করিতে পারে নাই। যে সব অভাব পূর্ণ করিতে হিন্দু সমাজ ছেড়ে ব্রাহ্ম সমাজে এলেন ব্রাহ্ম বন্ধুদের নিকট সেই অভাব পূর্ণ করিবার সহানুভূতির ত্রুটি দেখিলেই তিনি বড় মর্ম্মাহত হইতেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের নিকট সেই সহানুভূতি না পেয়েই ঐ পবিত্রাত্মা অনন্ত উন্নতির পথে যাইবার জন্য এই আঁধার আলোক মিশ্রিত সংসার

হইতে চির জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে হঠাৎ চলিয়া গেলেন। আজ যেমন তাঁহার জীবনের উন্নত প্রকৃতির কথা মনে করিয়া আনন্দ পাইতেছি, তেমনি আবার আমাদের ক্রটির কথা মনে করিয়া আত্মগ্লানি ভোগ করিতেছি। মঙ্গলময় বিধাতা পূণ্যাত্মার কল্যাণ করুন, আমাদের সন্তপ্ত প্রাণে সান্ত্বনা প্রদান করুন।"

পূর্ব্ববঙ্গে তুর্ভিক্ষ এবং মহিলাদের নিকটে দয়াভিক্ষা।

পূর্ব্ববঙ্গ শস্যের ভাণ্ডার ছিল। সর্ব্বদা পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিম বঙ্গকে অন্ন যোগাইয়াছে। তুর্ভাগ্যক্রমে অনাবৃষ্টি ও বন্যা ইত্যাদি কারণে গত বৎসর হইতে উপযুক্তরূপে ধান্য উৎপন্ন হয় নাই। যাহা কিছু হইয়াছিল অনেক স্থলে কীটের উৎপাতে সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। তজ্জন্য বরিশাল ফরিদপুর নয়াখালী ময়মনসিংহ ঢাকা প্রভৃতি জিলার নানা স্থানের লোকদিগের বিষম অন্নকষ্ট উপস্থিত। ৭।৮ টাকা মণ দরে সামান্য মোটা চাউল বিক্রয় হইতেছে, অনেক স্থানে তাহাও পাওয়া যাইতেছে না। তুর্ভিক্ষের ভীষণ প্রকোপ প্রকাশ পাইতেছে, দীন দরিদ্র অধিবাসিগণ অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। সম্প্রতি ময়মনসিংহ জিলার একটী অন্নাভাবগ্রস্ত যুবতী তিন দিবস উপবাস করিয়া নিজের গর্ভজাত তিনটি ক্ষুধার্ত্ত সন্তানকে আহার যোগাইতে না পারিয়া তাহাদের ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ এবং ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, পরিশেষে আত্মহত্যা করিয়া সকল তুঃখ ক্লেশের নিবৃত্তি করিয়াছে। এইরূপ নানা পল্লীতে তুর্ঘটনা ঘটিতেছে। অনেকে অন্নাভাবে কচু সিদ্ধ করিয়া খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করিতেছে। ফরিদপুরে অন্নদানের জন্য প্রতিদিন পাঁচ শত টাকার প্রয়োজন। বরিশালে অন্নকষ্ট অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। রাজধানীর দয়ার্দ্র-হৃদয় নরনারীগণ পূর্ব্ববঙ্গের অন্নাভাবক্লিষ্ট নিরুপায় লোকদিগকে সাহায্যদান করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া তুর্ভিক্ষ আরম্ভ, ভাবী শস্যের লক্ষণও আশাপ্রদ নয়, প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং বন্দে মাতরংএর দল তুর্ভিক্ষনিপীড়িত লোকদিগের সাহায্যের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন। নববিধান ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী প্রকৃত অবস্থা জানিয়া অন্নাভাবগ্রস্ত লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ময়মনসিংহে চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার সহকারিরূপে সহযাত্রী হইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এই উদ্দেশ্যে ফরিদপুরে চলিয়া গিয়াছিলেন। স্থানীয় দয়াবান্ লোকেরাও সাহায্যদানের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এম্.এ, নববিধানসমাজের তুর্ভিক্ষ কমিটীর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পবিত্র দয়ার কার্য্যে মহিলাগণ কি উপেক্ষা করিবেন? এক এক মুষ্টি অন্নদান করিয়া অন্নাভাবে মুমূর্ষু স্বদেশের তুঃখী স্ত্রীপুরুষ ও নিরুপায় বালক বালিকাদিগের কি প্রাণ রক্ষা করিবেন না? এক্ষণ উপেক্ষা করিলে সহস্র

সহস্র দুঃখী দরিদ্র নরনারী বালক বালিকা দুর্ভিক্ষানলে জীবনাহুতি দান করিবে। যিনি যাহা দিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। ৪১নং মেছুয়াবাজার রোড উক্ত দুর্ভিক্ষ কমিটীর সম্পাদক বিনয়েন্দ্র বাবুর নিকটে, অথবা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে নববিধান প্রচার কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকটে, কিংবা কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের নিকটে স্ব স্ব দান প্রেরণ করিলে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইবে।

স্ত্রী-স্বাধীনতা।

(প্রাপ্ত।)

যে দেশে এখনও পুরুষ-স্বাধীনতার সময় আসে নাই সে দেশে "স্ত্রী-স্বাধীনতা" "স্ত্রী-স্বাধীনতা" করিয়া চীৎকার করিলে যে তাহার বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী তাহার আর সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মসমাজে দলবিশেষের মধ্যে এ সম্বন্ধে বড় একটা হৈ চৈ আরম্ভ হইয়াছে। মহিলাদিগের সঙ্গে বিশেষ সংঘর্ষণে স্ত্রী-স্বাধীনতার ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করিবার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। মহিলাগণ স্বাধীনভাবে দেশের ও লোকসমাজের কল্যাণ-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, কিন্তু স্বাধীনতা শব্দের সে অর্থ না হইয়া যদি "যথেচ্ছাচারিতা" তাহার অর্থ হয় তাহা হইলে এ স্বাধীনতা অপেক্ষা সর্ব্বনাশকারী আর কি হইতে পারে? স্থলবিশেষে পরীক্ষার বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই স্বাধীনতার হৈ চৈ মহিলাদলে বিশেষ সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। এই সাজাতিক স্বাধীনতার সংঘর্ষণে মহিলাজীবনের অনেক কোমল ভাব ক্রমে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। বিনয়, লজ্জা-শীলতা গুরুভক্তি প্রভৃতি মহিলা-সুলভ সুকোমল গুণরত্নসমূহ স্বাধীনতার নামে ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে। হিন্দুপরিবারে মহিলাজীবনে এই সমুদয় গুণনিচয় তাঁহাদের চিরদিনই অমূল্য অলঙ্কাররূপে জগতের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, আর আজ স্বাধীনতার নামে সমান অধিকার স্থাপন করিতে গিয়া যদি মহিলাগণ এ সমুদয় গুণরত্ন হারাইয়া ফেলেন তাহা অপেক্ষা আর আক্ষেপের বিষয় কি হইতে পারে? এই ভীষণ স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রাহ্ম-সমাজে যুবক যুবতীদিগের অযথা মিশ্রণও আরম্ভ হইয়াছে, স্থানবিশেষে ইহার বিশেষ কুফলও ফলিয়াছে। আমি অনেক পরীক্ষার পর বলিতেছি স্ত্রীস্বাধীনতার কথা দূরে থাকুক পুরুষ-স্বাধীনতারও এখন সময় আসে নাই। আমি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নই কিন্তু এ দেশের অকর্ষিত ও অপ্রস্তুত ভূমিতে সে স্বাধীনতার বীজ বপন করিবার সময় আসে নাই, তাহা শতমুখে বলিতে থাকিব।

গৌরী—

মোসলমান কন্যার পত্রাংশ;—

"আমরা জাপানে গিয়া চিরকাল বাস করিতেও পারি। ঈশ্বরকৃপায় আমরা প্রায় সাংসারিক পাশমুক্ত—সুতরাং ঈশ্বরের সমুদয় রাজ্যই আমাদের বাসস্থান। তবে জাপানে থাকিবার প্রয়োজন দেখি না। সুবিধামতে, একবার বেড়াইয়া আসিতে চাই। কৃত্রিম

পর্দ্দা আমাদের হাড়ে মাংসে এমন বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহা দূর করিতে গেলে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পায়। অবশ্য পর্দ্দা-ত্যাগে আমার নিজের কোন ক্ষতি নাই—ভাবি কেবল পতিত মুসলেম সমাজের জন্য। এই সময় নিম্নলিখিত গল্পটি মনে পড়িল—(গল্পটির সত্যাসত্যের জন্য আমি দায়ী নহি।)

"মহাত্মা মহম্মদ কোন যুদ্ধে এক দল বিপক্ষকে বন্দী করিয়াছিলেন। সেই দলে স্ত্রীলোকও ছিল। তন্মধ্যে একটী মহিলা প্রসিদ্ধ হাতেমের বংশজাতা ছিলেন; তিনি মহাত্মা মহম্মদকে হাতেমের সেলাম জানাইলেন। (হাতেমের মৃত্যুকালীন উপদেশ ছিল যে, হজরত মহম্মদের জন্ম হইলে, সে সময় তাঁহার বংশধরদের কেহ জীবিত থাকিলে সে ব্যক্তি যেন মহম্মদকে হাতেমের সেলাম জানান।) হজরত সন্তুষ্ট হইয়া সেই মহিলাকে মুক্তি দিলেন। হাতেম পরোপকারের জন্য প্রসিদ্ধ; তাঁহার বংশের কন্যা কি কেবল নিজের মুক্তিলাভে সন্তুষ্ট হইবেন? তিনি বলিলেন, 'আমাদের সঙ্গীদের বন্দী রাখিয়া আমি মুক্তি চাই না! যদি সকলকে মুক্তি দেন, তবে আমিও মুক্ত হইব; নতুবা তাহাদের সঙ্গে চিরবন্দিনী থাকিব।' আমারও পর্দ্দামুক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই।"

মহিলাদিগের রচনা।

নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র কবিতা দুইটী একটী মোসলমান কন্যা কর্ত্তৃক রচিত। তিনি তৎসম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছেন;—

"আমার পুরাতন খাতায় আমার বাল্যকালের রচিত অনেক কবিতা ছিল, সেগুলি প্রলাপের মত বোধ হওয়ায় আমি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। বিশেষতঃ সে সব কবিতা সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য রচিত হয় নাই। তাহার অধিকাংশ আমাদের পারিবারিক ঘটনা বা ব্যক্তিগত অবস্থা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট খসড়া হইতে আপনাকে দুই একটি (আমার ১৩।১৪ বৎসর বয়সের) রচনা দেখিতে দিব। যদি প্রকাশযোগ্য মনে করেন, তবে তাহাতে আমার আপত্তি হইবে না। * * * * * *

"প্রকৃতির সম্বোধন" কবিতাটী আমার কনিষ্ঠা ভগিনী ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে খেলা দিবার জন্য রচিত হইয়াছিল! ইহা ৮।১০ বৎসর বয়সের বালিকাদের পছন্দ হইতে পারে।"

প্রকৃতির সম্বোধন।

উঠগো বালিকে জেগে উঠ বালা,
দেখ তোমা লাগি সাজায়েছি ডালা।
নানা ফুল তুলে গোলাপী লোহিত,
পীত ফুলে সেজে লতিকা হরিৎ।
দাঁড়ায়ে রয়েছে তব অপেক্ষায়,
ধরণী সেজেছে দেখ কি শোভায়।
সারা নিশি আমি নীরবে জাগিয়া,
বরিষিনু মুক্তা তোমার লাগিয়া।
তুমি লইলে না, তাহা,—দেখিলে না,
ধন্যবাদ(ও) তুমি আমারে দিলে না।
এবে সে শিশিরে শ্যাম দূর্ব্বাদল,
রবির কিরণে করে ঝলমল।
হীরককণিকা যেন চূর্ণ করে।
ছড়ায়েছে কেহ দূর্ব্বার উপরে।

মরণ।

মানবজীবন বুঝি নিশার স্বপন!
নতুবা যে কালি ছিল, আজি তার কি হইল,
কোথায় চলিয়া গেল ত্যজি এ ভুবন?
লোকে কত আশা করে ঘর বাঁধে বায়ু'পরে—
ভাবে না,—পিছনে আছে দাঁড়ায়ে মরণ?
ক্ষীণজীবী মানবের দূরব্যাপী ভবিষ্যের
বিবিধ কল্পনা হেরি হাসেন শমন।

বিসর্জ্জন।

দিবানিশি কোলে বুকে, যে নিধি রেখেছি সুখে
সে আমার আজ বল গিয়াছে কোথায়?
নিমেষ চক্ষের আড়ে, কখন রাখিনি যারে
কোথা তারে আজ হরি! করেছি বিদায়।
আমার সোণার পাখী, নিয়ত যে কোলে থাকি
জানাত অভাব শত অফুট ভাষায়।
আজ বল কার কাছে, সে অভাব জানাতেছে
ভুলে আছে হায়! কার স্নেহ-মদিরায়।
অভাগীর মত কে বা, সব ছাড়ি নিশি দিবা
কাটাইছে তার তরে সেবাসাধনায়।
একটু অযত্ন হলে, ব্যাধি আসি নিবে ছলে
কার প্রাণ ব্যাকুলিছে নিত্য সে শঙ্কায়?
তার হাসি তার চাওয়া,রাঙ্গা ঠোঁটে স্তন খাওয়া
প্রতি অঙ্গে প্রতি ভঙ্গে হেরি সুষমায়।
এমনি কাহার হিয়া, সুখে উঠে উথলিয়া
মুহূর্ত্তে তাহার তরে কে মাগে অভয়।
কোমল অঞ্চল তলে, যাহারে রাখিতে গেলে
মনে হ'ত আকুলিবে বুঝি বেদনায়।
শত মণ মৃত্তিকায়, চাপিয়া কেমনে তায়,
রাখিনু "উত্রী"র সেই নীরব বেলায়।
গৃহের নির্ভর ছাদে, কখন রাখিয়া যেয়ে
নিশ্চিন্তে থাকিতে কভু প্যারিনি কোথায়।
হায় সে শিশুরে মোর, বিচ্ছিন্ন করিএ ক্রোড়
কেমনে রাখিয়া দিনু নদী কিনারায়।
দিদিমা মাসিমা কোলে, ভাই বোনে কুতূহলে
যাহারে লইয়া সদা থাকিত ক্রীড়ায়।
ভীষণ শ্মশান মাঝে, শৃগালী গৃধিনী কাছে
কেমনে সে শিশু আজ দিবস কাটায়।
যদি স্তন্য সুধাপানে, বিলম্ব হইত ক্ষণে
করুণ রোদনে কত ডাকিত আমায়।
কত দিন হ'ল গত, স্তনপান করেনি ত
কি পানে পিপাসা আজ তাহার মিটায়।
(সোণার পাখীটি হায়! কোথা গেলে ছুটে আয়
দেখ্ আজ স্তনক্ষীরে বুক ভেসে যায়।)
দুদিনের শিশু সে যে, আপনারে নাহি বুঝে
একাকী সে কোথা গেল প্রথম উষায়।
জগতের এত শক্তি, দিতে নারে যারে মুক্তি
সে দেশেতে গেল শিশু কাহার দ্বারায়।
কত রৌদ্র কত জল, ঝাঁপি তার শয্যাতল*
প্লাবিয়া দগ্ধিয়া নিত্য দেবে গো তাহায়।
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই, প্রতিকার নাহি চাই
হায় কি লভিয়া শিশু এমন নির্ভয়!
কত সুখ কত ব্যথা, কত আশা আকুলতা
জনমে মরণে তার দুঃখিনী হৃদয়।
উদ্বেলিত বিক্ষোভিত, সঞ্জীবিত মুমূর্ষিত
ক'রে দিল দুদিনেতে হায়! হায়! হায়!
সবে দুটী মাস তুমি, এসেছিলে মর্ত্ত্যভূমি
বিমল আনন্দে গৃহ করি মধুময়।
দুই দিন তোমা সনে, খেলিয়াছে ভাই বোনে
তথাপি তাদের প্রাণ সদা "খুকু" চায়।
ওরে মোর ক্ষুদ্র যুঁই, দুদিনের সঙ্গী তুই
হয়ে এসেছিলে মম বিশাল ধরায়

---

* সমাধিক্ষেত্র।

প্রভাতে উঠিলে ফুটি, প্রভাতেই গেলে টুটি
অতীত পবনে নিত্য সৌরভ ফুরায়।
এ বিশাল বিশ্বমাঝ, কোথাও পাব না আজ
আছে ধরা মনোহরা মণি মুকুতায়।
তুমি শুধু নাহি তথা, শুধু এ দারুণ ব্যথা
অভাগিনী জননীর ভাঙ্গিছে হৃদয়।
কত শোভা কত সুধা, মিটাতে কালের ক্ষুধা
কালের অতীত গর্ভে হইতেছে লয়।
সে শিশু তাহাতে পশি, গিয়াছে তাহাতে মিশি
ধরণী দেখাতে কভু পারিবে না তায়।
শুধু এই স্মৃতিপটে, কখন যাবেনা টুটে
সর্ব্বকর্ম্মে চিত্তমাঝে রহিবে চিন্ময়।
পাপে পুণ্যে স্বর্গে মর্ত্ত্যে, সুকৃতি বা অকৃতিতে
করে দিক এ জীবন আলো মসীময়।
আঁধারে আলোক হয়ে, আলোতে স্নিগ্ধতা লয়ে
রহিবে জীবন মাঝে সে স্মৃতিনিচয়।
এ দীর্ঘ জীবন লয়ে, যত দূর যাব বেয়ে
পড়িবে জীবন পাতে সে রেখা অক্ষয়
ওহে দয়াময় হরি! তোমারি করুণা স্মরি
করি নাই এ জীবন অশ্রুধারাময়।
হে নিপুণ চিত্রকর! জগত চিত্রের পর,
অনাদি অনন্ত কাল, এই অভিনয়।
করিতেছ দীননাথ, যবে করি অশ্রুপাত
তখনি তোমার দয়া বুঝি পূর্ণতায়।
তোমার রঙ্গিণ হাতে, মানব জীবনপাতে
সাদা আর কালো রেখা টানি দয়াময়।
কর নিত্য এই খেলা, প্রকাশি অনন্ত লীলা
জানি তুমি ওহে হরি চির রসময়।
মাঝে মাঝে কালো রেখা, যদি না টানিতে সখা
আলোকের মাধুর্য্য কি বুঝিত হৃদয়।
যেথায় আলোর লেখা, তারি পাশে কালো রেখা
সুন্দরে বন্ধুরে মিলি কত শোভাময়।

হে নাথ তোমারি আমি, কি আর বলিব স্বামী
তুমি দিয়াছিলে তুমি নিলে পুনরায়।
এইরূপে আরো দুটী, দুঃখিনীর কোলে ফুটি
স্বর্গের পবিত্র পুষ্প অকালে শুকায়।
ওহে চির অন্তর্যামী, সকলি জান তা তুমি
সেই ব্যথা মর্ম্মদাহ এ ছার কথায়।
জানায়ে কি হবে নাথ, শুধু করি জোড় হাত
এই বলিতেছে প্রাণ হইয়া তন্ময়।
ভাল ভাল উপচারে, ভক্ত তোমা পূজা করে
আমিও তেমতি প্রভু স্মরিয়া তোমায়
যাহা মোর জীবনের, আনন্দের গরবের
নির্ম্মাল্য করিয়া দিনু দিও পদাশ্রয়।

খেরুয়া, হাজারীবাগ। } দুঃখিনী মাতা
শ্রীমতী প্রি—

জন্ম—১৯এ আশ্বিন, ১৩১৩ শুক্লা নবমী।
মৃত্যু—২৯এ নবেম্বর ১৯০৫।
ব্যাধি—ডবল নিউমোনিয়া, মেণিঞ্জাইটিস্ রেমিটেন্টফিবার।

সংবাদ।

নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের পাঁচটি বালক বিগত মাঘোৎসবের সময় তাঁহাদের বিশেষ উৎসবের দিন নীতি-সম্বন্ধীয় অভিনয়ক্রিয়া অতিশয় উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদন করিয়াছিল। সেই অভিনয়দর্শনে ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ১০৲ টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন হইল উক্ত বিদ্যালয়ের বিশেষ অধিবেশনে সেই পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছে। বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ণে মিডল্ টোল রোডস্থ ময়ূরভঞ্জ মহারাজের প্রাসাদে উক্ত ছাত্রগণ শিক্ষকগণ সহ উপস্থিত হইয়া কৃতজ্ঞতাসূচক মহারাণীকে কুসুমস্তবক উপহার দিয়াছে, এবং নীতিসম্বন্ধীয় শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছে। মহারাজও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আনন্দ সহকারে ছাত্রদিগকে সাদর সম্ভাষণ করেন, এবং মহারাণী যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে মিষ্টান্নাদি ভোজন করাইয়া বিদায় দেন।